পূর্ণ-অপূর্ণ

(বধূরূপে)

শিবানীশঙ্কর

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
—অগ্রহায়ণ ১৩৭১

PURNA-APURNA
(BADHURUPAY)
SHIBANI-SHANKAR

প্রকাশনা :
তুলিলিপি
৫৭, এ-নগর
কলিকাতা-৮৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
শ্রীরাধানাথ দত্ত
অন্নপূর্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫ই, দীনবন্ধু চক্রবর্তী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

কাকা-কাকীমাকে

প্রথম অধ্যায়

পর্ব—১

এক

শবু চলেছে শশুরবাড়ী। মন্দির শহরের মৈত্র পরিবারের অতি আদরের মেয়ে শ্রাবণী মৈত্র বিয়ের পর শ্রাবণী লাহিড়ীরূপে বিয়ের ঠিক একবছর পরে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে স্বামী দীননাথের সঙ্গে চলেছে কলকাতায়। সমুদ্র তীরের পবিত্র মন্দির শহরে পড়ে রইল তার আশৈশব স্মৃতি, অতি পূজনীয়া ঠাকুমা নির্ঝরিণী দেবী, স্নেহময় বাবা গিরিনবাবু, মমতাময়ী মা পদ্মিনী দেবী, অসুস্থ ভাই নন্দু, দুরন্ত ভাই কানাই, দুই বোন মিতু তপু, কাকা কাকীমা ও অন্য ভাইবোনেরা।

শবুর মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। কি সে ভেবেছিল আর কি হল? কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরি করে দীননাথ, মন্দির শহরে তার অফিস। সেই অবস্থায় তার সঙ্গে শবুর বিয়ে হল, সেই শহরেই তারা ঘর বাঁধল। মাঝখানে দুবার কলকাতায় গিয়ে শশুরবাড়ীর চেহারা ও দুরবস্থা দেখে শবু বিস্মিত হয়েছে, বেদনা বোধ করেছে। অবশেষে সেই সংসারকে বাঁচাতে, বাবা গিরিনবাবুর একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ উঁচুতে তুলে ধরতে দীননাথের স্বেচ্ছায় বদলি নেবার প্রস্তাবে সে সম্মতি দিয়েছে। আর তারই ফলে মন্দির শহর থেকে তাদের চলে যেতে হচ্ছে।

একে কি দুর্ভাগ্য বলা যায়? তা যদি বলতে হয় তবে বিয়েটাই ত এক দুর্ঘটনা। না, তা ভাবা ঠিক নয়। বিয়ে যেমন ভবিতব্য, শশুরবাড়ী যাওয়াও তেমন অধিকাংশ মেয়ের জীবনে অনিবার্য।

শশুরবাড়ী বলতে একটা মিষ্টি মধুর অনুভূতি অন্য যে কোন মেয়ের মত শবুর মনকেও রাঙিয়ে তুলত। বড়মা বলেছিলেন—স্বামীর ঘরই মেয়েদের আসল ঘর। আর স্বামীর ঘর মানেই শশুরবাড়ী। তার মা-ও ত সেই কত কম বয়সে শশুরবাড়ী এসেছিল—পেয়েছিল আদর্শ শশুর শাশুড়ী স্বামী। দেওররাও কেউ খারাপ ছিলনা। শবুদের আগের নাই-মেয়ের সংসারে অবশ্য মার কোন ননদ ছিল না।

শশুরবাড়ী সম্বন্ধে শবুর মনের মিষ্টি মধুর অনুভূতি গত দুবারের যাতায়াতে

এখন কিছুটা ফিকে হয়ে একটা ভীতির ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সকলের সঙ্গেই কিছুটা পরিচয় হয়েছে—অপরিচয়ের দূরত্ব আর নেই। সেখানে আর সকলকে তেমন কিছু খারাপ না লাগলেও একটা জায়গায় যেন কাঁটা বিঁধে আছে। সেই কাঁটা কতটা বিঁধবে, তাকে কতখানি রক্তাক্ত করবে তা শুধু ভবিষ্যতই বলতে পারে। প্রধান ভরসা তার স্বামী দীননাথ। সে তাকে সত্যিই ভালবাসে, তাকে সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছে—যাতে তার কোন অনিষ্ট, কোন অসম্মান না হয়। এখন থেকে আর পিছন ফিরে চেয়ে লাভ নেই, একান্তভাবে দীননাথের হাতে নিজেকে সঁপে দেবে—স্বামীর সুখ দুঃখকেই নিজের বলে বরণ করে নেবে। এমনি করেই সে দেবে স্বামীর অকুণ্ঠ ভালবাসার প্রতিদান—সকলকে সুখী করে নিজেও সুখী হতে চেষ্টা করবে। বধূ-জীবনের ভাগ্যই এখন তার ভবিতব্য।

সারা রাত প্রায় না ঘুমিয়ে শবু দীননাথের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসে নামল। ফার্নিচার ও অন্যান্য মালপত্র একটা জুড়িগাড়ীর মাথায় চাপিয়ে সঙ্গে আনা ভাবী রান্নার ঠাকুর হরিবন্ধু সহ সেই ঘোড়াগাড়ীতে বসল—ট্যাক্সিতে ফার্নিচার নেয়া যায়না।

মন্থর গতি ঘোড়ার গাড়ী শহর দেখাতে দেখাতে আর তার আরোহীদের পথচারীদের দর্শনীয় করে তুলে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় বরানগরে অন্য এক ভাড়াবাড়ীর সামনে এসে থামল—এখানেই দোতলার একটি ফ্ল্যাট একশ টাকায় ভাড়া নেয়া হয়েছে।

কিন্তু নতুন বাসায় প্রথম এসেই শবুকে যে কথাগুলো শুনতে হল তার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, দায়ী ত নয়ই।

ঘোড়াগাড়ী এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই উপরের বারান্দা থেকে দেখে 'সেজদা সেজবৌদি এসেছে' বলতে বলতে ছোট দুই দেওর ভব আর সোনা নীচে দৌড়ে এল, ছোট ননদ শেফালীর সহাস্য মুখও বারান্দায় দেখা গেল। ভব সোনা হরিবন্ধুর সাহায্যে মালপত্তর উপরে তুলতে লাগল।

শবু দোতলায় উঠতে প্রথমেই সামনে দেখা হয়ে গেল দেওর মহীনাথের সঙ্গে। একগাল হেসে মহী বলল—

'এই যে বৌদি, একেবারে মালপত্তর নিয়েই এসে গেলেন তাহলে। বেশ, ভাল, ভাল।'

শবু শুধু একটু হাসল। মহীও লাজুকভাবে আর কি বলা যায় বুঝতে না

পেয়ে মালপত্তর টানাটানিতে সাহায্য করতে লেগে গেল। মহী সামনে থেকে সরে যেতে শবু বাবা কালীনাথকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। বাবা আশীর্ব্বাদ করতে করতে বললেন—

'ওখানকার সব খবর ভাল ত, বৌমা? বেয়াই বেয়ান, তোমার ঠাকুমা আর সব ভাল তো?'

শবু বলল—'হ্যাঁ তাঁরা সব ভাল আছেন, তবে ভাই নন্দু ভাল নেই, কি যে অসুখ করেছে ধরা যাচ্ছে না। তাই চিকিৎসাও কিছু করা যাচ্ছেনা।'

কালীনাথবাবু মুখ দিয়ে আফশোষসূচক শব্দ করে দুঃখিত ভাবে মাথাটা নাড়তে লাগলেন। শেফালী এসে শবুর সামনে দাঁড়াল, হেসে বলল—

'মেজদা এখন বাড়ীতে নেই, ডিউটিতে গেছে। চল, মা রান্নাঘরে আছে।'

দুখানা ঘরের মাঝে সরু একফালি রান্নাঘর, মা মঙ্গলাদেবী রান্নায় ব্যস্ত। শবু গিয়ে প্রণাম করতে তিনি বললেন—

'হুঁ। যাও কাপড় চোপড় ছাড় গিয়ে।'

ততক্ষণে মালপত্তর উপরে তুলে গাড়ীভাড়া মিটিয়ে দীননাথ উপরে উঠে এসেছে—পিছনে হরিবন্ধুও এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ সবাই ভেবেছিল লোকটা বুঝি গাড়োয়ানের সঙ্গের লোক, কিন্তু গাড়ী চলে গেল অথচ সে থেকে গেল দেখে সবাই একটু আশ্চর্য্য হল। মা মঙ্গলা দেবী বললেন—

'ওটা আবার কে? ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে।'

'ওর নাম হরিবন্ধু' দীননাথ বলল। 'এখন থেকে ওই আমাদের রান্না করবে, লোকজন বেশী ত।'

মঙ্গলাদেবী মুখ বাঁকালেন—'জন্মে এমন আদিখ্যেতা দেখিনি। আজকালকার বৌদের উনুনের আঁচে ননীর শরীর গলে যায়, সোনার অঙ্গ ফালি হয়ে যায়।' স্বামীর নাম কালীনাথ তাই 'কালি' হল ফালি।

শুরুতেই একেবারে উষ্ণ সম্বর্ধনা। বৌ কী দোষ করল, যা করার দীননাথই করেছে। যখনই সে রান্নার ঠাকুর নিয়ে যাবার কথা বলেছিল তখনই শবুর মনে হয়েছিল, এই নিয়ে কথা শুনতে হবে, বারণও করেছিল। দীননাথ বুঝিয়েছিল, বাড়ীতে ন'দশজন লোক হবে, মায়ের মতিগতির উপর ভরসা নেই, শেফালীর কলেজ পড়াশুনা আছে—একজন লোক থাকলে অনেক সুবিধে—মাসে মাত্র দশ টাকা নেবে। এখন দেখা যাচ্ছে সেই দশ টাকার ঠাকুরের জন্য উঠতে বসতে দশবার কথা শুনতে হবে।

আর কেউ কিছু বলল না, শুধু বাবা একটু খুঁত খুঁত করলেন—

'লোকটা খাঁটি ব্রাহ্মণ ত ?'

দু'দিন যেতে দেখা গেল হরিবন্ধু রান্নার ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ী। শুধু ভাত ডাল সেদ্ধর সময় তাকে উনুনের সামনে বসিয়ে রাখা যায়, অন্য কোন কাজ পারে না, জানেও না। মশলা পেষাও ভাল হয় না। শবু আর দীননাথ ছাড়া তার ভাষাও কেউ বোঝে না। দীননাথের এখন ছুঁচো গেলার অবস্থা। তবু নিজের মান বাঁচাতে একসময় সে শবুকে বলল—

'রান্না জানে না, দু পাঁচ দিনে শিখে নেবে। মার কথায় ঘাবড়াবার কিছু নেই. পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এইটুকুতেই শবু অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। স্বামী তার পাশে আছে। তবু অকারণ কথাই বা শুনবে কেন ? অভিমানী শবু অকারণ কথার আঘাত সইতে পারে না। বলতে গেলে সে এ বাড়ীর নতুন বৌ, তাই সে চুপ করেই থাকে।

দুই

তবু অকারণ কথার আঘাত শবুকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলল। এক সময় তাকে এক চরম অপমান ও অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে নেমে দাঁড়াতে হল। সেটা ছিল জুন মাস, ওদের কলকাতায় বদলি হয়ে আসার মাত্র মাস ছয়েক পরেই।

এর মধ্যে মেজো ভাসুর বিশ্বনাথের বিয়ে হয়েছে, ঘরে এসেছে আর এক নতুন বৌ, মেজোবৌ রেখা।

বিশ্বনাথ হঠাৎই বিয়ে করতে আগ্রহী হয়ে পড়ল। বিয়ে ঠিক করার দায়িত্ব অভিভাবকদের। এ সব ব্যাপারে বাবা কালীনাথ প্রায় অচল পয়সার পর্য্যায়ে পড়েন। যখন সবে পাকিস্তান থেকে রিফিউজী হয়ে এসেছেন, কিছু রোজগারের আশায় কাজ নিয়েছিলেন কোন এক রতন সরকারের ফার্মে। পাঁচশ টাকা সিকিউরিটিতে বিল কালেক্টারের কাজ। মাস মাইনে দেড়শ টাকা।

মাস যায়, কিন্তু মাইনের টাকার অর্ধেকও পাওয়া যায় না। পঁচাত্তর পঞ্চাশ পঁচিশ এই ভাবে তিন মাস যেতে রতন সরকারের ফাঁকির চালাকি বুঝতে পেরে উকিল কালীনাথ কোর্টে মামলা দায়ের করলেন। মামলায় হার অবশ্যম্ভাবী বুঝে রতনবাবু কোর্টের আঙিনায় কালীনাথের পায়ে কেঁদে পড়ল—

'লাহিড়ীবাবু, আপনি আমার বাবার মত, আপনি আমাকে জেল জরিমানার হাত থেকে বাঁচান।'

কোমল হৃদয় কালীনাথ পাওনা ও সিকিউরিটির সব টাকা ছেড়ে দিয়ে মামলা উঠিয়ে নিয়ে বাড়ীতে এসে বসেছিলেন।

এমন মানুষ বাবা কালীনাথকে মেয়ে পছন্দ করতে কে পাঠাবে? হয়ত মেয়ের বাপ হাতে পৈতে জড়িয়ে কেঁদে পড়বে আর তিনিও গলে যাবেন—মেয়ের রূপ দেখবেন না, গুণ দেখবেন না, দেনা পাওনার কথা ত নয়ই।

আর এক অভিভাবক মা মঙ্গলা দেবী। কিন্তু মা ও মেজো ছেলেতে বুঝি অহি-নকুল সম্পর্ক, কেউ কারো ছায়া মাড়ায় না।

এ অবস্থায় খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এক নিকট বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দু এক জায়গায় মেয়ে দেখে বিশ্বনাথ নিজেই রেখাকে পছন্দ করে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছিল। বিয়ে হল তেইশে জানুয়ারী।

বিয়েতে অনেক আত্মীয় স্বজন এল, আবার দূরের যারা তারা আসতে পারল না। না-আসার দলে রয়ে গেল বড় মেয়ে জবা তার স্বামী ও ছেলেমেয়েরা, কটক থেকে বড় ছেলে হরিনাথ, তার স্ত্রী বীণা ও তিন মেয়ে সুপর্ণা, সুবর্ণা, সুরমা আর কাঁথিতে এদের মামা মামী ও তাদের ছেলেরা।

এলেন পিসী মহামায়া দেবী—বৌদি মঙ্গলা দেবীকে প্রণাম করে তিনি দাদা কালীনাথের সঙ্গে কথা বলে কাটালেন অধিকাংশ সময়, মঙ্গলা দেবীকে তাঁর ননদের প্রতি তেমন একটা আগ্রহী দেখা গেল না। পিসীর সঙ্গে এসেছেন তাঁর দুই ছেলের বৌ—বড় বৌ রাণী ও মেজো বৌ দময়ন্তী।

রাণীবৌদি বেশ ছোটখাট মানুষটি কিন্তু মনে যেন তাঁর অফুরন্ত স্নেহের ফল্গুধারা—তাঁকে দেখে শবুর নিজের মায়ের কথা বারবার মনে হয়েছে।

আর মেজো বৌদি দময়ন্তী দেবী যেন খুশীর ঝর্ণাধারা। আর্থিক সৌভাগ্য তাঁকে ঘিরে রেখেছে কিন্তু তিনি সে বিষয়ে উদাসীন। এককালে নাকি কিছু সাহিত্য চর্চাও করেছেন—এখন সেকথা বললে লজ্জা পান। তাঁরই মেয়ে অরু—অরুন্ধতী খেয়াল ঠুংরী গাইয়ে হিসেবে বেশ নাম করেছে। মা মেয়ে দুজনের নামেই বেশ একটা পৌরাণিক ছাপ আছে।

মা-কাকীমা বয়সী দুই বৌদিকেই শবুর ভাল লেগেছে।

আর এসেছেন বিধবা ছোটকাকীমা—যাঁর ডাক্তার স্বামী বিয়ের অল্পকাল পরে মারা যান। সে প্রায় আড়াই যুগ আগের কথা। শুভ্র বসনে এক শোকের প্রতিমূর্তি তিনি—সাগরের একটি সফেন তরঙ্গ যেন কোন এক

অমোঘ বিধির বিধানে করুণ ছবির রূপ ধরে স্থির হয়ে আছে।

মেজো ননদ করবী এসেছে স্বামী ও দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে। করবীর গায়ে নতুন দশ ভরি সোনার গয়না ঝলমল করছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে' বিয়ের আসরে এই গয়নার প্রতিশ্রুতিতে দলিলে সই করতে হয়েছিল হৃদিনাথকে। সন্ত সন্ত সেই গয়না এক সঙ্গে শোধ করেছে বলেই সে বিশ্বনাথের বিয়েতে আসতে পারে নি। করবীর তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই— প্রাপ্য গয়না সে পেয়ে গেছে, তাতে দাদার কষ্ট হল ত বয়েই গেছে। উপযুক্ত শ্বশুরের উপযুক্ত পুত্রবধূ!

এ ছাড়া ছোট মাসী মেসো তাঁদের ছেলে মেয়ে এক ছেলের বৌ ও অন্য আরো কত আত্মীয় স্বজন এসেছিল সে বিয়েতে।

বিয়ে মিটে গেলে কয়েকটা মাস মোটামুটি এক রকম কেটে যাচ্ছিল। তিন ভাই চাকরি করে। বিশ্বনাথের দিনে রাতে ডিউটির টাইমের ঠিক নেই; দীননাথ হাট বাজার করে, খরচের টাকা পয়সা তার হাতেই থাকে। মহী যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে 'নীলাঙ্গুরীয়' নামে একখানা উপন্যাস পড়ে। মাঝে মাঝে স্কুল পড়ুয়া সোনার সঙ্গে নভেলের চরিত্র মীরার জটিল অনুরাগ বিরাগের সূক্ষ্ম বর্ণনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত আলোচনা জুড়ে দেয়।

দুই বৌদির সঙ্গে অন্য দেওর ননদের গল্পের অভাব না হলেও লাজুক প্রকৃতির মহী কোন গল্প জমাতে পারে না। একদিন হঠাৎ গল্প করতে এসে সে জিজ্ঞেস করল—

'সেজবৌদি, অলোক আপনার দাদা, তাই না?'

শবু বলল—'আমার নিজের কোন দাদা নেই, অলোক কে জানি না ত।'

গল্প জমাতে এসে উল্টো উত্তর শুনে মাথা চুলকাতে চুলকাতে মহী সরে পড়ল।

মেজো বৌদি রেখা কাছেই ছিল। তার গোলগাল হাসিখুশি চেহারা। শবুর চেহারা রোগা পাৎলা বলে রেখা তাকে আদর করে বলে 'হাড্ডি'। মহী চলে যেতে রেখা বলল—

'ভাই শ্রাবণী, তুমি শুধু হাড্ডিই নও, বোকারও একশেষ। সেজঠাকুরপোর নিশ্চয়ই অলোকের বোনের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল, সেই সূত্রে অলোককে এ বাড়ীর সবাই চেনে। তুমি সেজদাকে জিজ্ঞেস কোরোতো।'

রেখা বলল তাই কথাটা শবুর মাথায় ঢুকল। রাতে সে দীননাথকে

জিজ্ঞেস করল—

'অলোক কে বল ত? তার বোনের সঙ্গে কি তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল? তার নাম কি?'

দীননাথ বলল—'হ্যাঁ, অলোকের বোন সীমার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। কিন্তু হয় নি।'

'সে দেখতে কেমন? কোথায় থাকে? তার কি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে?' অনেক প্রশ্ন শবুর।

'দেখতে কালো, থাকে কৃষ্ণনগরে। বিয়ে হয়েছে কি না জানি না।' দীননাথের জবাব দায়সারা। যেন এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচে।

শবুর তা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই। সে নিজে সুন্দরী, তাকে ফেলে নিশ্চয়ই কেষ্টনগরের কালপেঁচার পিছনে কেউ ছুটবে না। তা ছাড়া তারও ত কটকের এক লেকচারারের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল—হয় নি। এ রকম ত হয়ই।

এমনি করেই দিন কাটছিল। মাঝখানে মার চিঠিতে জানতে পেরেছে ভাই নন্দুর অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি, আর মিতু টেষ্টে এলাউ হয়ে এক-মাস টাইফয়েডে ভুগে কেমন যেন হয়ে গেছে। কানে কম শোনে, পড়াশুনা প্রায় ভুলে বসে আছে।

চিঠি পড়ে শবু কাঁদে, দুঃখিত দীননাথ তাকে সান্ত্বনা দেয়। শুনে রেখা সমবেদনা জানায়, বাবা কাশীনাথও আফশোষ করেন—

'আহা, কী সুন্দর ছেলে মেয়ে দুটো। গিরিনবাবু ওদেরকে নিয়ে বড় বিপদেই পড়েছেন।'

কোন বিকার নেই মা মঙ্গলা দেবীর—যদিও তিনি ওদের দুজনকেই দেখে এসেছেন। তাঁর মন যেন পাষাণে গড়া।

যে হরিবন্ধুকে রান্নার জন্য আনা হয়েছিল, মাস তিনেক পরে মাইনে পত্তর নিয়ে সে চম্পট দিল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, লোকটা রান্নার কিছু জানত না। তবু মঙ্গলা দেবী প্রসন্ন নন, কিছুতেই তাঁর মন পাওয়া যায় না।

বছরের শুরুতে সোনা প্রোমোশন পেয়ে ক্লাশ নাইনে উঠেছে। ভব আবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় আছে। শেফালী বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে ফলের অপেক্ষায় না থেকে কাঁচড়াপাড়ায় এক মেয়ে স্কুলে মাস্টারী জুটিয়ে নিয়েছে।

এখানে এসে থেকেই শবু হেঁসেলে ভর্তি হয়েছে। শাশুড়ী মঙ্গলা দেবীর

সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে পৌষপার্বণ পার দিয়েছে। তারপর মেজো বৌ রেখা বিয়ে হয়ে এসে থেকে দুই বৌ পালা করে হেঁসেল সামলেছে, শাশুড়ীর সঙ্গে মিলে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেছে, অক্ষয় তৃতীয়াতে কাসুন্দী তৈরী করে ঘরে তুলেছে। মেজো বৌ রেখা রান্না ভালই জানে, তবে তার তেল পেঁয়াজ মশলা ঝালের দিকে নজরই বেশী। শবু এ বাড়ীর বিশেষ সব রান্না সুক্তো, কাসুন-পোড়া মাছের পাতলা ঝোল, চাপর ঘণ্ট, আধাভাঙা ও অন্য নিরামিষ রান্না মঙ্গলা দেবীর নির্দেশ মত ও দেখে দেখে শিখে নিয়েছে।

এত করেও দুই বৌ মঙ্গলা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তার উপর হয়েছে ঘরের সমস্যা। তিনখানা মাত্র ঘর, তার দু খানায় বিয়ে হওয়া দুই ছেলে ও ছেলের বৌরা থাকে। আর বড় ঘরটা সোনা ভব শেফালী মহী বাবা ও মা এই ছ'জনের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু মঙ্গলা দেবীর এক কথা—

'ঐ বুড়ো শকুনের সঙ্গে এক ঘরে শোব না, মরে গেলেও না।'

তাই প্রচণ্ড শীত বা গ্রীষ্মে তিনি বারান্দায় শুয়ে রাত কাটান বা মাসের অধিকাংশ দিন পাঁচমাইল দূরে তাঁর দাদার বাড়ীতে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসেন। সমস্যা একটু একটু করে সঙ্কটের রূপ ধরছে।

সেই সঙ্কটই একটা সুযোগ পেয়ে বিরাট রূপ ধরল আর শবুকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলল।

তিন

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা তিথি। বাড়ীর সবাই সন্ধ্যার মুখে যে যার কাজে বা বেড়াতে কে কোথায় গেছে শুধু রেখা আর শবু বাড়ীতে পশ্চিমের সরু বারান্দায় বসে গল্প করছে। পশ্চিমের বারান্দা হলেও সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখা যায় না, একটা বিরাট তিনতলা বাড়ী পথ আটকে আছে। সন্ধ্যে লাগতেই আশপাশের সব বাড়ী থেকে ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল, ঘরে ঘরে সব সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলছে লক্ষ্মীর আসনের সামনে। সেদিন আবার বৃহস্পতিবারও। পূব আকাশে নিশ্চয়ই ততক্ষণে সোনার থালার মত গোল চাঁদ উঠেছে।

দুই বৌয়েরই মনে বাপের বাড়ীর স্মৃতি ভেসে উঠল, সেখানে রোজ সন্ধ্যায়

প্রদীপ জ্বালানো হয়, শাঁখে ফুঁ পড়ে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর কথা শোনা হয়।

শবুর মনে পড়ে মন্দির শহরে এমনই বিশেষ সন্ধ্যায় কি সুন্দর লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়া হত—

লক্ষ্মী দেবী বামে করি বসি নারায়ণ
কহিছেন মৃদু কথা সুখে আলপন

আশ্চর্য্য! এ বাড়ীতে সে সব কিছুই হয় না।

রেখাই এক সময় জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা ভাই শ্রাবণী, তুমি ত এক বছর আগে বিয়ে হয়ে এসেছ, এ বাড়ীতে কোনদিন সন্ধ্যা দিতে দেখনি?'

শবু বলল—'না ত। আমারও কেমন অদ্ভুত লাগে।'

রেখা বলল—'এতদিন এ বাড়ীতে কোন বৌ ছিল না ত, তাই বোধ হয় এ সব কথ কেউ ভাবেনি। আমরা বেশ এখন থেকে রোজ সন্ধ্যা দেব, শাঁখে ফুঁ দেব।

শবু বলল—'চল, আজ থেকেই শুরু করি।'

তখনই দুজনে খুঁজেপেতে একটা প্রদীপ যোগাড় করে সলতে পাকিয়ে নমোনমঃ করে একটু সন্ধ্যা-দীপ জ্বালল, শাঁখে তিনবার ফুঁ দিল ওরা ঠিক করল, রাতে যে যার স্বামীকে জিজ্ঞেস করবে—এ বাড়ীতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা হয়না কেন? বাড়তি কোন কথা শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করার মত বুকের পাটা ওদের নেই। হঠাৎ রেখা জিজ্ঞেস করল—

'আচ্ছা শ্রাবণী, মা কেন বাবার সঙ্গে কথা বলেন না? বাবা কথা বললেও তাঁর কথার কোন জবাব দেন না। বাবার কথা উঠলেই কেমন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন। অথচ এরা সব ত ওঁদেরই ছেলে মেয়ে। আমি বিয়ে হয়ে এসে থেকে এই চার মাস ধরে একই অবস্থা দেখছি। তুমি ত আগে এসেছ, তুমি কিছু জান কি? তোমার ভাসুরকে জিজ্ঞেস করলে কিছু না বলে এড়িয়ে যায়। আবার দেখ কে এক দাদা আছে কথায় কথায় তাঁর বাড়ী যান রাতে থাকেন অথচ বাবা যে ঘরে শোন সে ঘরে শোয়া ত দূরের কথা সে ঘরে পা-ও দেন না। স্বামীকে কখনো খাবারের থালাটাও ধরে দেন না একটু সেবাও করেন না। আমার বাবা অনেক বছর আগে মারা গেছেন তাই এখানে বাবার এই হেনস্তা দেখে খুব খারাপ লাগে।'

রেখা চুপ করল, তার চোখ দুটো ছলছল করছে। কথাটা তবে তারও মনে জেগেছে। শুধু সে কেন, যে কেউ এ বাড়ীতে একটা দিনও থাকবে

তারই মনে এসব প্রশ্ন জাগবে। শবু আর কি বলবে, মাতুলের যে সংসার সে একবার দেখে এসেছে তার বর্ণনা দিয়ে বলল—

'কি যে ব্যাপার আমিও কিছু বুঝি না। তোমার দেওর আমাকেও কিছু বলে নি।'

'এরা মনে হয় খুব চাপা, তাই না'···রেখা কথাটা শেষ করতে পারল না এক সঙ্গে দু তিনজন বাড়ী ফিরে এল।

সেই রাতে শবু দীননাথকে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাবার কথা জিজ্ঞেস করল। উত্তরে দীননাথ খুশি হয়ে বলল—

'বেশ ত, প্রদীপ দিও। এতদিন আমরা রিফিউজী হয়ে এ বাসায় সে বাসায় যাযাবরের মত ঘুরছি তাই বোধ হয় কারো এদিকে নজর নেই।'

শবু বলল—'প্রদীপ জ্বালব, বাড়ীতে তুলসীতলা বা কোন ঠাকুরের পট নেই, সন্ধ্যা দেখিয়ে প্রদীপ রাখব কোথায় ?'

দীননাথ বলল—'বাজার থেকে একটা কিনে আনলেই হবে। তবে এ বাড়ীতে বারোমেসে লক্ষ্মী পুজোর নিয়ম নেই, নারায়ণ পুজো ছিল। অমাবস্যাতে লক্ষ্মী পুজো হয় কাঠা সাজিয়ে, আবার সরস্বতী পুজোতেও মূর্ত্তির বদলে আলপনায় সরস্বতী এঁকে বইপত্তর সাজিয়ে পুজো হয়।' বলতে বলতে সারাদিন অফিসের খাটাখাটনিতে পরিশ্রান্ত মানুষটা ঘুমিয়ে পড়ল।

'ওটা আবার কি ?'

দীননাথকে পালপাড়া বাজার থেকে একটা ছোট লক্ষ্মীর মূর্ত্তি কিনে নিয়ে সকালে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে মা জিজ্ঞেস করলেন।

'লক্ষ্মী, রোজ সন্ধ্যায় বেশ প্রদীপ জ্বালিয়ে এর সামনে রাখা হবে, শাঁখ বাজবে।' দীননাথ জবাব দিল।

'এঃ! লক্ষ্মী একেবারে উপচে পড়ছে। জানিস এ বাড়ীতে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি পুজো করা নেই, আর লক্ষ্মী বসালে রোজ সন্ধ্যায় পুজো ভোগ দিতে হয়।'

দীননাথ হেসে বলল—'এটা ত একটা পুতুল। মন্ত্র পাঠ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে না, পুজো ভোগেরও দরকার নেই। বাড়ীতে নারায়ণ নেই, তুলসীও নেই—সন্ধ্যা দিয়ে প্রদীপটাই শুধু এর সামনে রাখা হবে। গ্রামে নারায়ণ পুজো ছিল—লক্ষ্মী আর নারায়ণ ত আলাদা নয়।'

মঙ্গলা দেবী রাগে ফেটে পড়লেন—'তোদের বড় বাড় বেড়েছে—অত বাড় ভাল না, সব উড়ে পুড়ে যাবে। এ বাড়ীতে ও সব সন্ধ্যা টন্ধ্যা দেওয়া নেই,

দেওয়া চলবে না।' সংসারের উপর কর্তৃত্ব কমে গেছে, খরচের টাকা পয়সা থাকছে না তাঁর হাতে—অনেক দিনের জমা ক্ষোভে মঙ্গলা দেবী জ্বলে উঠলেন। এতদিন শুধু বিশু খারাপ ছিল এখন দীনুও খারাপ হয়ে গেছে, সে-ই সব খরচ পত্রের টাকা নিজের হাতে রেখেছে।

তবু দীননাথ জেদ বজায় রেখে ব্যাপারটা লঘু করতে হেসে বলল—

'গ্রামে থাকতে আপনি বা দিদি রোজ সকালে সারা বাড়ীতে গোবর ছড়া দিতেন, সন্ধ্যায় ঘরের দরজায় দরজায় জল ছিটিয়ে ঘরে ঘরে ও তুলসী তলায় প্রদীপ দেখিয়ে শালগ্রাম শিলার সামনে রাখতেন আমরা সবাই দেখেছি। এখানে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বাললে দোষ হবে কেন? আর নারায়ণের বদলে না হয় লক্ষ্মীর পুতুলের সামনেই সেটা রাখা হবে।' বলতে বলতে অফিসের তাড়ায় স্নান করতে গেল।

মা মঙ্গলা দেবী গজগজ করতে লাগলেন—'যার যা খুশী করুক। যে সংসারে ছাওয়াল কর্তা বৌ গিন্নী—সে সংসারে উজাড়ের চিহ্ন। এর ফল একদিন ভুগতে হবে।'

তিন ছেলে অফিস চলে গেলে মঙ্গলা দেবী শেফালী ভবর সঙ্গে কিছুক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস করে কিছু খেয়ে দুপুরে বেরিয়ে গেলেন, বলে গেলেন আজ রাতে খাবেন না, কাল সকালে ফিরবেন।

আবার সন্ধ্যা হতে দুই বৌ বিপদে পড়ে গেল, যার যার স্বামীরা বলে গেছে প্রদীপ দেওয়া যায়, শাশুড়ী আবার কি সব বলে গেলেন। বাবা বাড়ীতে আছেন তাঁকে ভয়ে ভয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন—

'সন্ধ্যাবাতি দিতে পার, তাতে দোষ নেই। তবে এ বাড়ীতে লক্ষ্মীর মূর্ত্তির বারোমেসে পুজোর চল নেই।'

দুই বৌ দোটানায় পড়ে ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দেখিয়ে নতুন কেনা লক্ষ্মীকেও একটু দেখিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে দিল। লক্ষ্মীকে কেউ যখন ফেলেও দেয়নি--তাকে পুজো ভোগ না দিলেও একটু প্রদীপ দেখালে দোষ কি? যদি মা লক্ষ্মী রাগ করেন? লক্ষ্মী ত নারায়ণেরই এক অঙ্গ। দীননাথ আবার বলেছিল—বাড়ীতে মূর্ত্তি বানিয়ে দুর্গা পূজা হ'ত, সে দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীর মূর্ত্তিও ত থাকত, বাড়ীতে লক্ষ্মীর কোন মূর্ত্তি রাখাই চলবে না এ কথার কোন যুক্তি নেই।

পরদিন দুপুরের পর বাড়ীতে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। বাড়ীর ছেলে

মেয়েরা সব অফিসে স্কুলে কলেজে, বাড়ীতে আছেন বাবা মা আর দুই বৌ। মা আজ সকালে মাতুলালয় থেকে ফেরার পর থেকেই বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব—কেউ বেশী কথা বলছে না, হাসি কাশি হাঁচিও যেন বন্ধ। দুপুরে খাওয়া মিটতে ছোটমাসী প্রমীলাদেবী ছেলের বৌকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এলেন।

ছোটমাসীর এ বাড়ীতে আসা কোন নতুন ব্যাপার নয়। তিনি বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন গত অঘ্রানে—বৌ-এর নাম রাণু, বেশ সুন্দরী। শবু এ বাড়ীতে এসে থেকে দেখছে মাসী তার ছেলের বৌকে নিয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন, মঙ্গলা দেবীও শবুকে নিয়ে, পরে রেখা বিয়ে হয়ে এলে দু বৌকে নিয়ে বোনের বাড়ী যান। দু বোনে একখানে বসে কথা বলেন আর তিন নতুন বিয়ে হওয়া বৌ পাশের ঘরে নিজেদের মধ্যে কথা বলে।

প্রথম প্রথম বেশ ভালই চলছিল, তারপর একটু একটু করে দুই বোন মুখ খুলতে লাগলেন। যে যার ছেলের বৌদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে তুলো-ধোনা করতে থাকেন। পাশের ঘরে বসে বৌরা শোনে আর ভয়ে আধমরা হতে থাকে। ধীরে ধীরে সেটা অনেকটা গা সহা হয়ে এসেছে।

রেখা একটু হাসি গল্প করতে ভালবাসে, তাই আড়ালে মজা করে দুহাতের বুড়ো আঙুল তুলে বক দেখায়, নানান মুখ ভঙ্গি করে আর বক দেখিয়ে দেবার আনন্দে তিন জনে হেসে গড়িয়ে পড়ে, কেমন জব্দ—বক দেখিয়ে দিয়েছে! ওরা এখনো ছেলেমানুষ, সবারই নতুন বিয়ে হয়েছে, ওদের প্রাণশক্তি প্রচুর, প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশী। দুঃখের মধ্যেও তাই হেসে গড়িয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। মাসী এসে দিদির সঙ্গে দুচার কথায় সব জেনে নিয়ে একেবারে ফুঁসে উঠলেন—

'কি, দীনুর এত বড় স্পর্ধা, তোর কথা অমান্য করে, তোকে অবহেলা করে? বিশ্বটাত আকাট গোঁয়ার গোবিন্দ। কিন্তু দীনু? এককালে তাকে আর হৃদিকে আমি একটু ছুঁয়ে দিয়েছিলাম (দীনু আর হৃদি দু এক-বছর তাঁর বাড়ীতে থেকে স্কুলে পড়েছে) তাই তারা একটু মানুষ হয়েছে। আজ তাদের বৌরা তোকে করে অপমান, তোর কথা শোনে না! আমি হলে এমন বৌকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিতাম।'

পরে বড় ভগ্নীপতি কালীনাথকে উদ্দেশ্য করে মাসী আবার বললেন—

'জামাইবাবু, ঘর সংসারের ব্যাপারে আপনি কি বলে বড়দির উপরে কথা বলেন? আপনার ভায়রার সাধ্য নেই আমার কথার উপরে কথা বলে।

কালীনাথ বাবু আমতা আমতা করে বললেন—'না, মানে বৌমারা ত কোন অন্যায় করছে না। বাড়ীতে সন্ধ্যাবাতি দেখানো দরকার সব গৃহস্থ বধূরই। গ্রামের বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হ'ত— এখানে…'

মাসী ধমকে উঠলেন—'বড়দি বলছে নেই, সে তার শাশুড়ীর কাছে শিখেছে—আপনি বেশী জানেন? এই জন্যই আপনার ওকালতিতে পসার হল না। এখন ছেলেদের রোজগারে খাচ্ছেন আর বৌদের মন রেখে চলছেন। অমন দুঁদে পেশকার আপনার ভায়রা, রীতিমত পেনসন পায়, আমার কথায় চলে। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছি সে ত হাফ্ বেকার, তার সাহস আছে বৌ এর হয়ে একটা কথা বলে? অন্য রোজগেরে ছেলেরা পর্যন্ত আমার এক কথায় ওঠে বসে।'

ভায়রার কথা থাক, কিন্তু নিজের মাকে কালীনাথবাবু বেশী চেনেন জানেন, না, ত্রিশ বছর পরে এ সংসারে এসে তাঁর স্ত্রী বেশী চেনে জানে তার বিচার কে করবে? তিনি নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকমন্ত্র গায়ত্রী জপ না করে জল গ্রহণ করেন না, পেঁয়াজ রসুন হোটেলের খাবার খান না, চা পর্যন্ত খান না—তিনি বাড়ীর নিয়ম নিষ্ঠার ব্যাপার জানেন না, আর কয়েক বছর শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করে বাড়ীর বড় বৌ বেশী জানে—এর ফয়সালা করতে গেলে দুই বোনের সঙ্গে যে পরিমাণ গলাবাজি করতে হয় কালীনাথবাবু চিরকালই তাতে অপারগ।

রণে ভঙ্গ দিয়ে ছোট শ্যালিকাকে প্রশ্রয়ের সুরে—'হয়েছে হয়েছে, আর জ্যাঠামী করতে হবে না' বলতে বলতে এই কোলাহল থেকে গা বাঁচাতে তিনি আড়ালে চলে গেলেন।

মঙ্গলা দেবী এই সময়ে ফোঁস করে উঠলেন—

'দেখ প্রমীলা, আমি কি সুখে আছি! এই জন্যই আমার এক দণ্ড এ বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছে করে না—এই মিনসের জন্য চিরটা কাল আমার হাড়মাস ফালি হয়ে গেল। নইলে মনে কর, আমরা কত বড় রাজার দেওয়ানের মেয়ে। এগার বছর বয়সে আমার বিয়ে দিল দোজবর ত্রিশ বছর বয়সের এক মিনসের সঙ্গে। বাবা আমার বিয়েতে বত্রিশ ভরি সোনার গয়না সোনার মুকুট দিয়েছিল, নাটোরের বাড়ী যৌতুক দিয়েছিল। আর এরা ত সব চুনোপুঁটি, আমাদের বাপ তোদের বাপদের এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারত বেঁচে থাকলে। এরা সব কেউ রূপের বড়াই করে (লক্ষ্য শবু ও রাণু), তা দেখানা সে রূপ তোদের ভাতারকে—

কেউ টাকার বড়াই করে (লক্ষ্য রেখা), ঐ দিয়ে ভোলাগে তোদের সোয়ামীকে।'

এ দিকে পাশের ঘরে তিন বৌ শাশুড়ীদের বাক্যবাণে বারবার শিউরে উঠছে। রাণু ভয়ে কাঁপতে থাকে, সে গরিব বাপ মার ঘর থেকে এসেছে, স্বামী হাফ্ বেকার—এরপর বাড়ীতে গিয়ে তার উপর নতুন কি কায়দায় অত্যাচার শুরু হয় ভেবে তার চোখে জল আসে, সেখানে যে তাকে রক্ষা করার কেউ নেই—হয়ত এখানে এসে এই বৌদের সঙ্গে হাসাহাসি করার অপরাধে আধপেটা খাবার বরাদ্দও দু' এক বেলা বন্ধ হয়ে যাবে। এত হাসি খুশি যে রেখা তার মুখটাও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। আর শবু—চিরকালের সোহাগী অভিমানী মেয়ে শবুর পিতৃনিন্দায় মুখ লাল হয়ে ওঠে, ক্ষোভে দুঃখে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। ভাবে, এ ব্যাপার আরো অনেক দূর গড়াবে।

মজার ব্যাপার পরে এসব নিয়ে কোন কথাই হল না। অন্য অনেক দিনের মত মা সন্ধ্যার সময় কোথায় এক চক্কর ঘুরে এলেন—সন্ধ্যাবাতি দেওয়া হল কি হলনা তা নিয়ে টুঁ শব্দটি করলেন না। ছেলেরা অফিস থেকে ফিরলে তিনি একেবারে ভাল মানুষ, তখন তাঁর রূপই আলাদা।

সেই পরিবেশে এসব কথা দীননাথকে বলতেও সঙ্কোচ হয়, আবার না বলেও পারা যায় না। সঙ্কট দীননাথেরও আছে—এককালে মাসীর অন্নে দু তিন বছর পড়াশুনা করেছে, আর মার বত্রিশ ভরি সোনা নাকি অভাবে দুর্ভিক্ষে এই রাবণের গুষ্টিকেই খাওয়াতে বিক্রি হয়ে গেছে।

শবুর মুখে দুপুরের ঘটনার কিছুটা শুনে দীননাথ বলল—

'রেখে দাও মা মাসীর কথা। তাদের কথায় ত সংসার চলছে না। নেহাৎ মা-মাসী, ঝগড়াই বা করি কি করে? আমরা কোন অন্যায় কাজ করিনি, সব গৃহস্থ ঘরে যা হয় তাই করা হয়েছে। এসব কথায় চুপ করে থাকাই ভাল, তুমিও চুপ করেই থেকো।'

শবু ত চুপ করেই আছে। পুরুষ মানুষ ত বোঝেনা মেয়েমানুষদের কতখানি সহ্য করতে হয়। আর্থিক কষ্ট আধপেটা খাওয়া সব মুখ বুজে সহ্য করা যায়। কিন্তু অকারণ বাবা-মার নিন্দা অপমান মেয়ে হয়ে সহ্য করা মৃত্যু তুল্য। চুপ করেই থাকে আর সেইজন্যই তার উপর মার যত আক্রোশ, যদি একটা কথারও জবাব দিত তবে তাই নিয়ে তুলকালাম ঘটাবার সুযোগ পেয়ে যেতেন। আর আক্রোশ দীনুর উপর, কারণ খরচের সব টাকা পয়সা তার হাতে। সেখানে কিছু করতে পারছেন না আর তাইতেই রাগে ফুঁসছেন

এমন মাতৃচরিত্র সংসারে দুর্লভ!

তবু গলা ধাক্কা দেবার কথাটা শবুর মনের মধ্যে বারবার বিঁধতে থাকে, বলে—

'দাওনা আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে, আমি বাবা মার পায়ের নীচে বসে তাঁদের সেবা করে জীবন কাটিয়ে দিই'—ক্ষোভে দুঃখে শবু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে, বড়মার শিক্ষার কথা—মেয়েদের স্বামীর ঘরই আসল ঘর—সে সব ভুল হয়ে যায়।

দীননাথ তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বলল—

'আমি কি তোমাকে সেকথা বলেছি? সব বাবা-মা সমান হয়না—প্রকৃতি ও চরিত্র সবার এক হয় না। তবু মনে আছে ত আমাদের প্রতিজ্ঞা—যত দুঃখ কষ্টই আসুক আমরা কেউ কাউকে ভুল বুঝব না। আমি তোমাকে ভালবাসব, তুমি আমাকে ভালবাসবে।'

স্বামীর আদরে ভালবাসায় শবুর মন অনেকটা শান্ত হল।

চার

ভব পরীক্ষায় কোন রকমে দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় পাশ করেছে—এখন তাকে আর পড়ানো হবে, নাকি চাকরি বাকরির চেষ্টা করবে তার ভাবনা চিন্তা চলছে। দীননাথ অফিসের পুরোনো পাওনা পাঁচশ টাকা পেয়েছে। ওদিকে বন্ধকের আংটি বোতামগুলো আর পাওয়া গেলনা, বন্ধকের ঘর থেকে সেগুলো নাকি হারিয়ে গেছে। সুদ আসল বাদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছে। বিয়ের আংটি বোতাম সব গেল ভবর পরীক্ষার দৌলতে যে পরীক্ষা না দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। শবু দীননাথ দুজনেরই মন খারাপ। শেষে দীননাথ শবুকে বলল—

'আমার আংটি বোতামে দরকার নেই, ক্ষতিপূরণের টাকা আর পাঁচশ টাকা থেকে কিছু যোগ করে তোমার একটা গয়না গড়িয়ে দি। কি গড়াবে বল?'

শবু অনেক ভেবে বলল—'এক জোড়া হাঙরমুখো বালার আমার অনেক দিনের শখ।'

'বেশ তাই হবে' বলে দীননাথ জুয়েলারীতে বালা গড়াতে দিল।

হঠাৎ ভব খবর আনল, সে বেলুড় পলিটেকনিকে ভর্তি হবার সুযোগ পাচ্ছে, পাশ করে বড়দার মত ওভারসিয়ার হবে—এখনই তার জন্য আড়াইশ টাকা লাগবে, ভর্তি ফী, মাইনে, ইঞ্জিনীয়ারিং এর বইপত্র, ইন্সট্রুমেণ্ট বক্স, ড্রয়িং বোর্ড, টি স্কোয়ার কত কি। এত টাকা কে দেবে, মাস খরচাতেই টানাটানি চলছে।·· সবাই চুপচাপ।

দীননাথ বলল—'ভর্তি হয়ে যা, আমি টাকা দেব।'

হাতে এখন নগদ পাঁচশ টাকা, দীননাথ একেবারে দাতাকর্ণ। বিপদ আপদের জন্যও লোকে কিছু টাকা রাখে তার সে চিন্তাও নেই। আড়াইশ টাকা দিয়ে কুম্বর সিংএর দেনা শোধ করবে বলেছিল তা আর এখন হবেনা। কুম্বর সিংও জানে দীননাথ টাকা পেয়েছে—সে তাকে বুঝিয়ে চিঠি লিখে-দিলেই হবে। বিষয়বুদ্ধির অভাব থাকলে যা হয় আর কি—বাবা গিরিন বাবু ঠিকই বলেছিলেন।

দীননাথ বলল—'ভাইয়ের একটা ভবিষ্যৎ তৈরী হবে। বিপদ আপদ? তখন এই ভাইরাই দেখবে না কি?'

একেবারে আদর্শ ভাইয়ের মত কথা। শবুর বাবারও একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ ছিল, এখন ত তার যা পরিণাম হয়েছে। না, শবু বাধা দেবে না—সেত সব ফেলে এ সংসারে এসেছে সংসারটাকে জোড়া লাগাতে, তাকে টেনে তুলতে, একান্নবর্ত্তী সংসারের আদর্শকে তুলে ধরতে। যদি সে সফল হয়, তবু বাবার মনে সান্ত্বনা থাকবে তিনি নিজে যা পারেন নি তাঁর মেয়ে শবু তা পারল। তাই সে কোন বাধা না দিয়ে শধু স্মৃতির কোঠায় সব জমা করে রাখবে।

ভব ওভারসীয়ারীতে ভর্তি হয়ে গেল।

কিন্তু এত করেও দীননাথ—শবু সবার চোখে ভাল হতে পারল না। চলছে জুন মাস। শেফালী একটা মাস্টারী জুটিয়ে নিয়েছে, ভবরও একটা হিল্লে হয়ে গেল—এখন বছর তিনেক নিশ্চিন্ত। সোনা এখনো স্কুলে পড়ছে, তার ভাবনা ভাবার সময় ঢের পাওয়া যাবে। এই সুযোগে মা মঙ্গলা দেবী নানা অজুহাতে রাগ দেখিয়ে চলে গেলেন রিফিউজী কলোনীর দাদার বাড়ীতে। যেখানে মান সম্মান প্রতিপত্তি নেই সেখানে তিনি কি করে থাকবেন? অপমান কি কেউ করেছে? মুখের সামনে কেউ করেনি বটে—চুপ করে থেকে, প্রতিবাদ না করে, মুখে মুখে জবাব না দিয়েই ত বৌরা চরম অন্যায়

রয়েছে। একেই বলে অবজ্ঞা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। তাঁর অমতে বৌরা ঘরে ঘরে সন্ধ্যাবাতি দেখাচ্ছে। নিজের মায়ের পেটের ছোট বোন যেখানে স্বামী ছেলে মেয়ে ছেলের বৌ নিয়ে প্রবল প্রতাপে রাজ্য চালাচ্ছে সেখানে বৌদের-গোলাম-ছেলেদের অন্নজলে তাঁর রুচি নেই—তেমন বাপের বেটিও তিনি নন। বাপ ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ দেওয়ান যার আমলে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। যার স্বামীর এক পয়সার মুরোদ নেই, অকর্মণ্য—তাকে দেখার কেউ নেই।

শেফালী এখন কিছুটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, এবারে সে এগিয়ে এসেছে উচিত কথা বলতে। এক রবিবারে সে রিফিউজী কলোনীতে গিয়ে সারাদিন থেকে ফিরে এসে দুই বৌদিকে বলল—

'তোমরা যদি মার অমতে সন্ধ্যাবাতি না দিতে লক্ষ্মীর মূর্তি না বসাতে মা তবে এমন করে চলে যেত না। মা আমাদের সবাইকে অনেক দুঃখকষ্টে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মানুষ করেছে। শাশুড়ীর কথামতই বৌদের চলতে হয়, শিখতেও হয়। সেজদার উপর মার অনেক আশা ছিল—সেই তার মনে বেশী আঘাত দিয়েছে।'

মেজো বৌদি কথা বলল—'সন্ধ্যা প্রদীপ ত সব বাড়ীতেই দেয়া হয়, বাবা দিতে বলেছেন, ভাইরাও বলছে।'

শবু এই প্রথম প্রতিবাদ জানাল, বলল—

'বৌদের জন্য মা চলে গেছেন বলছ, আগেও তিনি কতবার গেছেন তখন বাড়ীতে কোন বৌ ছিল? আর লক্ষ্মী বসানোর কথা? লক্ষ্মী তোমার সেজদা কিনে এনেছে তাকে বল, কিম্বা তোমরা কেউ সেটাকে বিসর্জন দিয়ে এস। ঘরে মূর্তি আছে কোন মেয়েমানুষ তার সামনে একটু প্রদীপ না দেখিয়ে পারে?'

না, শেফালী তার কোন দাদাকে কিছু বলতে যাবে না।

রাতে সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছে। সবার মাঝখানে দীননাথ কথাটা তুলল, বলল—

'আমাদের সবার মনে আছে, শেলী তোরও মনে থাকার কথা আমাদের গ্রামের বাড়ীতে সন্ধ্যাবাতি গোবরজল ছড়া সব দেওয়া হত। আর লক্ষ্মীর মূর্তি কি দোষ করল, ক্যালেণ্ডারেও লক্ষ্মীর মূর্তি আঁকা থাকে—তাকে ত ফেলে দেওয়া হয়না। পুজো ত করা হচ্ছে না।'

বিশ্বনাথ বলল—'বোঝা গেছে, খরচের টাকাগুলো হাতে পাওয়া যাচ্ছে

না, বৌদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করা যাচ্ছে না ছোটমাসীর মত সেটাই হল মূল কারণ।'

মহী নিরপেক্ষ রইল, কোন মন্তব্য করল না। ভব চোখ দুটো গোল গোল করে তাকিয়ে রইল। সোনা এখনও কৈশোরের গণ্ডি পার হয়নি। মার অভাব সে অবশ্যই অনুভব করে—তবে এও তার গা সহা হয়ে গেছে কারণ এমনটা বহুদিন থেকেই ঘটছে যখন সে স্কুলের নীচু ক্লাশে পড়ে, যখন এ বাড়ীতে বৌরা আসেনি তখন থেকেই।

শেফালী কথা শোনাতে এসেছিল, তাকে দু কথা বলতে পেরে শবুর মন অনেকটা হাল্কা লাগছে। মনে হয়—মার নাম মঙ্গলা কে রেখেছিল? সংসারে মঙ্গলের চিহ্নমাত্র রাখেন নি। তিনি মঙ্গলাও নন মঙ্গলচণ্ডী ও নন। ঠিক খাণ্ডারণীও বলা যায় না, কারণ মুখের সঙ্গে হাত পা চালান নি এখনও। তবে বোধ হয় মনসা ও রণচণ্ডীর একটা মিলিত রূপ কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। বাবা গিরিনবাবু বলতেন, শবু কথা বলতে পারে না, ওর সঙ্গে যে ঝগড়া করবে সে নেহাৎই দজ্জাল। বলতেন, বোবার শত্রু নেই। শবু বেশী কথা বলতে পারে না, তর্ক করতে জানে না। এই না পারা না জানাটাই বুঝি তার সঙ্গে শত্রুতা করে। সে কি করে মা ঠাকরুনকে সন্তুষ্ট করবে? আর অলক্ষীর কথা? স্ত্রী হয়ে তিনি স্বামীকে দুচোক্ষে দেখতে পারেন না, কাছ দিয়ে ঘেঁষেন না, সেবা করা ত দূরের কথা একবেলা খাবারটা বেড়েও সামনে ধরে দেন না। এই ছন্নছাড়া সংসারে লক্ষ্মী কি সত্যই ছিল, না আছে!

জুন মাসের প্রায় শেষ, অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে। এক ছুটির দিনে দীননাথ শবুকে বলল—

'চল, আজ একবার রিফিউজী কলোনীতে গিয়ে হালচাল বুঝে আসি, মা সত্যিই কি বলতে চায়। যদি দরকার হয় ঝগড়া তর্কও করব।'

শবুর অবাক হবার পালা। সেখানে গিয়ে কি শাশুড়ী ঠাকরুনের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে? অপরাধ?

দীননাথ একটু অসহিষ্ণুভাবে বলল—

'আহা, ক্ষমা চাইবার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে—শুধু কি বলতে চায় জেনে আসি। পরের মুখে, সে নিজের বোন হলেও, ঝাল খাওয়ার চাইতে নিজেরা পরখ করা ভাল। কোন অন্যায় ত করি নি, কি বলবে মুখের উপর বলুক।'

শবু ভেবে বলল—'তবে তুমিই যাও না, আমাকে আবার টানছ কেন ?'

এই প্রথম শবু নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করল। না করেই বা কি করবে ? দীননাথ কেন অমন অসহিষ্ণু ভাব দেখাল, তাকে বকল কেন ?

দীননাথ নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে বলল—'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। দোষী আমিও নই, তোমাকেও আমি দোষী বলছি না। সত্যিই কোন দোষ করে থাকলে সেটা বলতে বা স্বীকার করে নিতে আমার কোন দ্বিধা নেই। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছি সৌজন্যের খাতিরে—যদি তোমার উপস্থিতিতে মা খুশি হন শুধু সেই জন্য। আমরা এখানে বদলি নিয়ে এলাম সংসারটাকে জোড়া লাগানোর জন্য—সেটা আমাদের মস্তবড় দায়িত্ব। তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে, তোমাকে কোন কথাও বলতে হবে না।'

শবু বলল—'মনে থাকে যেন, আমি কোন কথা বলবনা।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শবু চলল শাশুড়ীর মানভঞ্জন করতে।

ওদেরকে দেখে মা মঙ্গলা দেবী খুশি হয়ে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন, দাদার এক ছেলেকে দিয়ে গাছের ডাব পাড়িয়ে খাওয়ালেন, কত হেসে গল্প করতে লাগলেন। দীননাথ মায়ের ব্যবহারে অভিভূত, শবুও।

দীননাথ বলল—'মা, আপনি কতদিন এখানে থাকবেন ?'

মা বললেন—'দাদার সংসারে বৌদি মারা যাবার পর ছোটগুলোকে দেখার কেউ নেই বলেই থাকা।'

দীননাথ বলল—'ওখানে আমরাও ত আছি, আছে সোনা, ভব, শেফালী—তাদের দেখাশোনা কে করবে তবে ?'

মা বললেন—'আহা সে ত আমি করি, করবও। এতদিন একাই করলাম, এখন তোদের বৌরা এসেছে, সেজ বৌমা শ্রাবণী আমার লক্ষী বউ, কাজের বউ, এত অল্প দিনেই বাড়ীর সব কাজ বাড়ীর রান্নার ধরন সব শিখে নিয়েছে ওরা চালাক্ থাক, আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে আসব, দরকারে দু চারদিন থেকেও আসব।'

ঘণ্টা দুই থেকে সন্ধ্যার মুখে ওরা ফিরে চলল। দীননাথ তার কর্তব্য করে এল—মাকে ফেরার কথাও বলল আবার কোন বাড়াবাড়িও করল না। মাও মুখে খুব অমায়িক উদার ব্যবহার করলেন, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কথাও দিলেন না ফিরে আসবেন বলে। পথে আসতে দীননাথ শবুকে বলল—

'দেখলে ত, আমাদের উপর রাগ করা বা দোষ দেওয়া সব বাজে কথা। কই, আমাদের সামনে কিছু বলল কি ? আমরা আমাদের কর্তব্য করে গেলাম

এখন ফেরা না ফেরা তাঁর ইচ্ছে।'

শবু মনে মনে পরিমাপ করতে লাগল, এখানে মার যে রূপ দেখা গেল সেটা কতখানি অকৃত্রিম। ওবাড়ীতে সব সময় না হলেও বিশেষ করে ছোট মাসীর উপস্থিতিতে যে রূপ দেখা যায় তার সঙ্গে এর ঘোর অমিল। বাড়ীর কাজ কাম হাতে ধরে শেখান, কাজের বেলা কাজ পাগল—কিন্তু কাজ না থাকলেই দেখা যায় অন্য রূপ, অন্য ব্যবহার, একবার এক বৌকে মাথায় তুলছেন ত অপরজনকে মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছেন। কোনটা তাঁর আসল রূপ ?

সব মিলিয়ে মনে হয়, এখানে না আসাই ছিল ভাল, কোনই ত ফল হল না। শুধু শুধু নিজেকে ছোট করা হল। এখানে এসে শবুর ভূমিকা কি ছিল ? এসে একবার, ফেরার সময় একবার প্রণাম করা, দুচারটে মামুলি কথা বলা, মাঝে মাঝে একটু হাসা, ব্যস।

দীননাথ বোঝায়, গুরুজনের কাছে মাথা হেঁট করাতে কোন অপমান নেই, শুধু মিথ্যাকে অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিলেই হ'ল। তা সে বলতে পারে, নিজের মা ত। শবু ত পরের মেয়ে। যে মা তাঁর নিজের ছেলেদেরই আপন করে নিতে পারেন না, পরের মেয়ে তাঁর কাছে আপন হবে কি করে ? এ সব কথা সে স্বামীকে বলতে, বোঝাতে পারে না। শুধু ক্ষোভে গ্লানিতে তার মন ভরে ওঠে।

জুন মাসের এ সব ঘটনা তার স্মৃতিকোঠায় জীবনের অন্ধকারতম দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। স্বামী হয়ত তাকে ভুল বোঝেনি, অপমানও করতে চায় নি—কিন্তু এক গ্লানিকর পরিস্থিতির মধ্যে টেনে নামিয়ে তার প্রতি কোন সুবিচারও করেনি। স্বামীর প্রতি একটা অভিমান শবুর মনে জমা হয়ে রইল চিরদিনের মত।

পাঁচ

এক দিকে মা মঙ্গলা দেবী বৌদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দূরে সরে রইলেন। এদিকে ভাইরাই কি একসঙ্গে থাকতে পারল ? শবুরা বদলি হয়ে কলকাতায় আসার ঠিক এক বছরের মাথায় সামান্য কারণে এত সাধের একান্নবর্তী সংসার ভেঙে গেল। সেও কি বৌদের দোষে ?

বিশ্বনাথকে মা মঙ্গলা দেবী যত দুর্মুখ গোঁয়ার বলুন না কেন, সে মার দূরে থাকা চায় নি। মূল কারণ ঘরের অভাব দূর করতে কাছাকাছি চারখানা ঘর নিয়ে একটা বাড়ী প্রায় ঠিক করে ফেলল। ভাড়া বাড়ীর ফাঁকা আঙিনাতে একটা দুটো গরুও রাখার ইচ্ছে, কিন্তু বাড়ীওয়ালা নিজে দোতলায় থাকে—গরু রাখাতে তার ঘোর আপত্তি। হল না সে বাড়ী নেয়া। অন্য বাড়ীর খোঁজ চলতে লাগল।

কিন্তু সুবিধেমত বাড়ী পাওয়া যায় না। বিরক্ত বিশ্বনাথ বলল—

'এর চাইতে দু পাঁচ কাঠা জমি কিনে চালাঘর তুলে থাকলে অনেক স্বাধীন ভাবে থাকা যাবে। মাসে মাসে একশ দেড়শ টাকা বাড়ী ভাড়াও বাঁচবে।'

ততদিনে শবুর জন্মমাস শ্রাবণ মাস গিয়ে শারদোৎসব, লক্ষ্মী পুজো, ভাই ফোঁটাও চলে গেছে। এবারও সে মার সঙ্গে দুর্গা পূজা দেখতে পেল না, ভাই ফোঁটাও নেয়া হল না। তবে বিজয়া দশমীতে মেজবৌদিকে সঙ্গে পেয়েছে সিঁদুর খেলার সময়।

এক ছুটির দিনে বিশ্বনাথ সব ভাই বোন ও বাড়ীর দুই বৌকে সঙ্গে নিয়ে চলল জমির খোঁজে। বরানগর থেকে অনেক দূরে একটা স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে জমির দর হাঁকছে তিন থেকে চারশ টাকা কাঠা—অথচ পাকিস্তানে ফেলে আসা এক বিঘে জমির দামই দুশ টাকা পাওয়া যায় না।

নিরাশ হয়ে ফিরতে হল। কিন্তু সেখানকার চারদিকে ফাঁকা মাঠ, গ্রাম্য পরিবেশ সবারই খুব ভাল লাগল। গ্রাম অথচ শহর থেকেও বেশী দূরে নয়। সকলেরই মনে স্বপ্ন—ওখানে একটা বাড়ী হলে বেশ ভাল হয়।

ঘর সমস্যার সমাধান না হতেই সংসারে আর্থিক সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে। দীননাথের পাঁচশ টাকার আর এক পয়সাও অবশিষ্ট নেই। শ' দেড়েক টাকা বালা তৈরী করতে লেগেছে, বাকি সব টাকা ভবর ভর্তি হওয়া আর মাসে মাসে খরচের ঘাটতি মিটাতে শেষ হয়ে গেছে। ঝি ঠাকুর চাকরের বিলাসিতা নেই তবু কুলিয়ে উঠা যাচ্ছে না। মাসের মাঝখানে একদিন রাতে খেতে বসে দীননাথ প্রস্তাব দিল—

'অন্য বাসা পাওয়া যাক আর না যাক সামনের মাস থেকে তিনজনে প্রত্যেকে আরো পঁচিশ টাকা করে বেশী দিতে হবে, না হলে চালানো যাচ্ছে না।'

মেজদা বিশ্বনাথ বলল—'কথাটা ঠিক। আগের থেকে খাওয়া দাওয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড একটু ভাল হয়েছে, তবে আরো ভাল হওয়া দরকার। পঁচিশেও কুলোবে না, পঞ্চাশ টাকা করে বেশী দিলে তবে ঠিক হয়।'

দীননাথ বলল—'তা হলে ত আরো ভাল। আমি দিতে রাজী।'

এবারে মহী বলল—'বাড়ী ভাড়া বাদ দিয়ে দুশ টাকাই যথেষ্ট—হিসেব করে চললেই হয়।'

বিশ্বনাথ বলল—'দুশ কেন দেড়শতেও চলে যদি বাজারের পচা মাছ পোকা ধরা তরকারি কিনে চালান হয়। মা তাই করত আর টাকা বাঁচিয়ে মাতুলের সংসারে ঢালত।'

মহী বলল—'সে সব খেয়েও ত আমরা বেঁচে আছি। বাজে খরচ না করলেই হল।'

বারবার হিসেব করে চলা, বাজে খরচের কথা বলছে। দীননাথের মাথা গরম হয়ে গেল। ও কি তবে শবুর বালা গড়াবার প্রতি কটাক্ষ করছে? বলল—

'তুই তবে চালিয়ে দেখা এই স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রেখে।'

মহী বলল—'বেশ ত, দিয়েই দেখ পারি কি না।'

'নিবি, নে। কিন্তু একটা কথা। এ কয়মাসে ভবকে ওভারসীয়ারীতে ভর্ত্তি করা আর সংসারের ঘাটতি মিটাতে আমার যে চারশ টাকার মত খরচ হয়ে গেছে তার কি হবে?'

'সে সব কথা আমি জানিনা।'

দীননাথ আরো রেগে গেল। বলল—'যখন ভবকে আড়াইশ টাকা দিয়ে পলিটেকনিকে ভর্ত্তি করা হল তখন ত কেউ রা কাড়লি না। কি করে তাকে ভর্ত্তি করা হল?'

'আমি কোন আগের হিসাবের জের টানতে পারব না' মহীর সাফ জবাব।

একেবারে অচল অবস্থা। বিশ্বনাথ দুই ভাইকে কত বোঝাল কিন্তু তারা কেউ কারো বক্তব্য থেকে একচুল সরে আসতে রাজী নয়।

শেষে দীননাথ বিতৃষ্ণ হয়ে বলল—'ঠিক আছে, এই মাসটা আমি কোন রকমে চালিয়ে দিচ্ছি, পরের মাস থেকে যে যার ব্যবস্থা করিস। আমি এখন থেকেই অফিসের কাছাকাছি ছোট বাসার খোঁজ শুরু করছি।'

'ভেরি গুড্!' মহী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। সে বোধ হয় মনে মনে এইটাই চাইছিল।

হঠাৎ বিস্ময়ে ঘর সুদ্ধ সবাই নির্বাক হয়ে গেল। বাবা কালীনাথ খাওয়া সেরে অনেক আগেই শোবার ঘরে চলে গেছেন। এখন ঘরের মধ্যে তিন ভাই ছাড়াও শেফালী ভব সোনা রেখা ও শবু ছিল তারা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। তিন ভাই খেয়ে উঠে যে যার ঘরে চলে গেল।

ভেঙে গেল একান্নবর্তী পরিবারে থাকার সাধ ও স্বপ্ন। ঠিক এক বছর আগে এ বাসা ভাড়া নেয়া হয়েছিল কত আশা কত সদিচ্ছা নিয়ে। সংসারটাকে সবাই মিলে দাঁড় করাতে হবে, একখণ্ড জমি কিনে একসঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখছিল—আর বছর ঘুরতেই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই। শবুর বিয়ের পর সে শহরে এক বছরের বেশী থাকতে পারেনি, একান্নবর্তী পরিবারের তাগিদে ও আকর্ষণে সেখানকার সুখ ও সহজ জীবন ছেড়ে ওরা চলে এসেছিল এই ঝামেলার শহর কলকাতায়। সে একান্নবর্তী সংসারও ভেঙে যাচ্ছে মাত্র এক বছরের মাথায়।

এরপর কোথায়? আরো প্রশ্ন, কি দরকার ছিল তবে নিজে থেকে যেচে বদলি নিয়ে আসার? আর ত সেখানে আগের অবস্থায় ওরা ফিরে যেতে পারবে না। সংসার শুধু এগিয়ে চলায়, পিছন ফিরে তাকানও যায়, কিন্তু পিছন দিকে ফেরা যায় না। সেই যদি আলাদাই থাকতে হবে শবু তবে বাবা মার কাছ থেকে এত দূরে এল কেন?

এ ঘটনায় সব থেকে কষ্ট পেল মেজদা বিশ্বনাথ, সে চিরকাল চেষ্টা করেছে সবাইকে নিয়ে এক হয়ে থাকতে। মানুষটা খাটি, যা ভাবে তাই বলে, যা বলে তাই করে। মনে মুখে কাজে সে এক। আর ব্যথা পান পিতা কালীনাথ। ছেলে মেয়েরা কে কোথায় থাকবে, তিনি কোথায় থাকবেন। তিনি অক্ষম তিনি অসহায়। এখানে বৌদের বক্তব্য কে শুনছে!

কথা উঠেছে, কে কোথায় থাকবে? দীননাথ বলেছে ভবকে পড়াবার দায়িত্ব আমি নিয়েছি সে আমার সঙ্গে থাকতে পারে। সোনা বরানগরের স্কুলে পড়ে, মেজদাও মনে হয় বরানগর ছেড়ে যাবে না—সোনা মেজদার কাছে থাক। শেফালী ইচ্ছে করলে দু'জায়গার যে কোন একটায় থাকতে পারে। মহী আলাদা বাসা করে বাবা মাকে নিয়ে থাকুক।

মহী জানাল— কারো দায়িত্ব সে নিতে পারবে না। সে মেসে বা হোটেলে থাকবে, কারো জন্য এক পয়সাও খরচ করতে পারবে না।

বাবা কালীনাথ সব শুনে অসহায়ভাবে বললেন—

'তোমরা ত সব যে যার মত আলাদা হয়ে থাকবে, আমি তাহলে কোথায় যাবো হে ?'

দীননাথ বলল—'মহী যদি আপনার দায়িত্ব না নেয় আপনি তবে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।'

সারা বাড়ীতে একটা অস্বস্তিকর থমথমে অবস্থা। হাসি কথা বার্তা কমে গেছে, বিশ্বনাথ তার রেডিও সারানো, বাজানোর কথা ভুলে গেছে। দুই বউ একান্তে বসে চোখের জল ফেলে। রিফিউজী কলোনীতেও খবর পৌঁছে গেছে, সেখান থেকেও সংসারটাকে আবার জোড়া লাগানোর কোন উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাচ্ছে না। মা মঙ্গলা দেবী বোধ হয় মনে মনে খুশিই হয়েছেন। ঠিক হয়েছে, বুঝুক এখন সবাই। মহীর আচরণের পিছনে তাঁর কোন গোপন হাত আছে কিনা বোঝা যায় না।

রেখা কেঁদে বলে—'ভাই শ্রাবণী, একি হল বলত ? কি সুন্দর সবাই মিলে একখানে ছিলাম। আমার বাবা নেই, ভাইও ছিলনা—এখানে এসে একসঙ্গে বাবা, ও ভাইয়ের মত এতগুলো দেওর পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কপালটাই খারাপ, না হলে ভাল করে জ্ঞান হবার আগে বাবাকে হারাই ?'

শবুও চোখের জল ফেলে বলে—'কি বলব ভাই মেজবৌদি, বিয়ের আগে শুনেছিলাম তোমার দেওরের অফিস ঐ শহরেই। সব ফেলে আমরা এখানে এলাম সবাই একখানে থাকব বলে, এক বছরের মধ্যেই তার কি দশা হল দেখ।'

দুই বৌ কাঁদে, আর মুখ বুজে সংসারের কাজ করে চলে। ওরা যেন দুই জা নয়, মায়ের পেটের দুই বোন।

সাতদিন পরে দীননাথ খবর আনল পার্কস্ট্রীটের কাছে মল্লিক বাজারের পিছনে সাহেব পাড়ায় বাসা ঠিক করেছে—দুখানা ঘর, দেড়খানাই বলা উচিৎ, মাসে ষাট টাকা ভাড়া। শেফালী বলল সে সেজদার সঙ্গে সাহেব পাড়াতেই থাকবে। নভেম্বর মাসের শেষ দিনেই এ বাসা ছেড়ে, বরানগর ছেড়ে কলকাতার বাসায় যাবার প্রস্তুতি চলছে। বিশ্বনাথ বরানগরেই একটা ছোট বাসা ঠিক করে ফেলেছে।

বাসা ছেড়ে যাবার মাত্র দুদিন আগে শবুদের দ্বিতীয় বিবাহ বার্ষিকী নিঃশব্দে এল আর গেল—জীবনটা এখনই যেন কেমন বিস্বাদ লাগছে। চোখের জলে একে অপরের কাছে বিদায় নিয়ে রেখা আর শবু চলল নতুন করে আলাদা সংসার পাততে।

ছয়

এর পরে যা ঘটল তার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। শবুর উনিশ বছরের জীবনে বাপের বাড়ীতে যে সব ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেছে—দাদুর অস্বাভাবিক মৃত্যু, দাদুর বাড়ী থেকে উচ্ছেদ, ছোট ভাই ভাবুর অকালে চলে যাওয়া বা হালে নন্দুর অসুস্থতা, মিতুর অসুখ—এ ঘটনা তার সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল।

মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার অসুখে মেজদা বিশ্বনাথ সকলের মায়া কাটিয়ে চলে গেল। মনে হয় যেন তার অতি সাধের একান্নবর্তী সংসার ভেঙে যাওয়ার দুঃখে সে অভিমান করে চলে গেল।

মাস দেড়েক হল শবুরা সাহেব পাড়ার এক পুরোনো ভাঙাচোরা বাড়ীতে এসে উঠেছে। নামেই সাহেব পাড়া আসলে পার্কস্ট্রীটের পাশেই প্রায় বস্তি এলাকা। বাড়ীতে আরো দুঘর ভাড়াটে। পাশেই মল্লিক বাজার, হাতের কাছে ট্রাম বাস, ওপাশে কবি মাইকেল মধুসূদনের কবর 'দাঁড়াও পথিকবর', একটু দূরে দূরে গড়ের মাঠ আর পার্ক সার্কাস ময়দান। শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলেই বলা যায়। পিসতুতো ডাক্তার দাদা ও রাণী বৌদিরা খুব কাছেই থাকে। দীননাথের অফিস হাঁটা পথে দশ মিনিট।

এ বাড়ীতে বাবা কালীনাথ শেফালী ও ভব আছে। এখনও বরানগরের নতুন বাসায় যাতায়াত শুরু হয় নি—শবু আর রেখা নিজের নিজের সংসার গোছাতে ব্যস্ত।

তবে মাঝখানে করুণার ছেলের মুখেভাতে সকলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার ওদের কালিঘাটের ভাড়া বাড়ীতে। মঙ্গলা দেবী ও মহীও এসেছিল আলাদা আলাদা ভাবে। একই পরিবারের লোক সব এসেছে চারটে ভিন্ন জায়গা থেকে। অনেক দিন পরে দেখা হতে শবু আর রেখা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বাঁচে না—হোক না উৎসবের বাড়ী।

সুযোগ বুঝে মেজ ননদাই মন্তব্য ছুড়েছে—

'ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই। এখন আর কেঁদে কি হবে? আমরা ত জানি সব ভাইয়ের ছেলে মেয়েরা এক মশারীর নীচে মানুষ হবে।'

মেজ ননদাইদের পরিবার কালিঘাটে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নাম মাত্র ভাড়ায় থাকে, আশা আছে ঐ বাড়ীর একটা অংশ তারা পাবে। সেটা অন্ত

কথা। কিন্তু দুই বৌ রেখা ও শবু সংসারটিকে ভেঙেছে কিনা ছোটশালী শেফালীকে জিজ্ঞেস করলেই ত জানা যাবে।

রেখা ও শবু কোন জবাব দেয়নি, শুধু নিজেদের দুঃখের গল্পই করেছে আর কেঁদেছে।

তারও আগে এক স্কুল ছুটির দিনে সোনা এসেছিল একা। সে এবার ক্লাশ টেনে উঠেছে।

'কেমন আছো, সোনা? মেজ বৌদি কেমন আছে?' শবু সাগ্রহে জানতে চেয়েছে।

করুণ হেসে সোনা বলেছে—'এই এক রকম। এখানে সবাই ভাল ত?'

ছোট ছেলেকে দেখে বাবা কালীনাথ আনন্দে অধীর হলেন, খুশি শেফালী আর ভব।

অনেক কথা বার্তার মাঝে ভব বলল—

'সোনা, তুই যদি এখানে থাকতিস তবে সাহবদের কাছ থেকে ইংরেজী শিখতে পারতিস, পরীক্ষার সময় সুবিধে হত।'

'কেমন করে?' সোনা জানতে চেয়েছে।

'বলবি, কাম্ হ্যারি, লেট আস্ টক্ টুগেদার এণ্ড গসিপ্। অমনি দেখবি তোকে কত ইংলিশ বুলি শুনিয়ে দেবে।'

এখানে পথে ঘাটে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেদের দেখা যায়। তারা ইংরেজী ছাড়া কথাই বলে না—খুব দরকার হলে অতি কষ্টে যেন 'হিন্দী বলে—বাংলা কথা একটাও বলে না। তবে গাউন পরা কিছু দেশী মেম সাহেবকে শবু দেওয়ালে ঘুঁটে দিতেও দেখেছে।

ভবর কথায় রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের মানুষ বাবা কালীনাথ বললেন—

'ওরা আবার ইংলিশ জানে নাকি? নেস্‌ফিল্ডের গ্রামারের নাম শুনেছে? ওরা মুখে বলে ভুল স্পোকেন ইংলিশ আর ড্যাম ব্লাডি ফুল আওড়ায়।'

দেড় মাসে এই টুকুই যা দুই সংসারের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ হয়েছে।

হঠাৎ এক বিকেলে দীননাথ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ী ফিরল। অসময়ে তাকে ফিরতে দেখে শবুর বুকটা কেঁপে উঠল।

তক্ষুণি ছুটে বেরিয়ে যাবার মুখে দীননাথ বলল—

'বাবা, অফিসে টেলিফোনে খবর পেলাম, মেজদার ভীষণ অসুখ করেছে, কয়েকবার রক্তবমি করেছে। আমি বরানগরে যাচ্ছি। আপনি বাড়ীতে

সব দেখে শুনে রাখুন, ভব এলে বরানগরে যেতে বলবেন।' শবুকে বলল 'আমি হয়ত রাতে না-ও ফিরতে পারি, বাবাকে দিয়ে কাল সকালের বাজার আনিয়ে নিও।' বলতে বলতে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল।···

বাবা নিরুপায়ভাবে বিলাপ করতে লাগলেন—

'এখন কি হবে? বিশ আগেও বারদুই পেটের অসুখে মর মর হয়েছিল অনেক চিকিৎসায় ভাল হয়েছিল। মহীটাই যত গণ্ডগোল করল, একসঙ্গে থাকলে সবাই মিলে ভাল করে চিকিৎসা করানো যেত, দেখাশোনা করা যেত। আর সবের মূল তোমাদের ঐ মাতাঠাকুরানীটি—তিনি মনের সুখে কোথাকার এক ভাইয়ের ঘর গোছাচ্ছেন। দীনুটারও একবার প্লুরিসি হয়েছিল পার্টির কাজ করতে করতে—তার ভাল খাওয়া দাওয়া দরকার তাও হচ্ছে না। ছোট বেলায় টাইফয়েড নিউমোনিয়া কালাজ্বর ম্যালেরিয়া সবরকম অসুখে সে ভুগেছে। আমি নিজেও পেটের অসুখে ভুগে ভুগে প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। এতদূর—বিশুকে যে একটু দেখতে যাব তাও পারিনা। ডাক্তার বিধান রায়কে দিয়েও দেখিয়েছি—তাঁর ব্যবস্থামতই কোনরকমে টিকে আছি।··'

শবু শুনে যাচ্ছে, কিন্তু মন পড়ে আছে মেজদা ও মেজবৌদির চিন্তায়। রক্ত বমি কেন হয়, কিসে সারবে কিছুই সে জানেনা। শেফালী ভব ফিরল। ভব সঙ্গে সঙ্গে বরানগর রওনা হয়ে গেল। বাবা শেফালী ও শবু তিনটি অসহায় প্রাণী ঘোর দুশ্চিন্তায় সারা রাত কাটিয়ে দিল।

সকালেও কোন খবর এলনা, শেফালী স্কুলে যায়নি। দুপুর গড়িয়ে সোনা মেজবৌদিকে নিয়ে এসে উপস্থিত হল, মেজদাকে দুপুরের পর আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, সেজদা সেখান থেকে সোজা একবার অফিস সামলাতে গেছে, ভব এবং তার তিন চারজন বন্ধু মেজদার কাছে আছে। সেদিন বৃহস্পতিবার।

মেজবৌদির মুখে সব খবর জানা গেল। কদিন ধরেই মেজদার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না, বলত পেটে ব্যথা, যন্ত্রণা। আগের দিনও তাই নিয়ে অফিসে গেছে, ইন্সিওরের প্রিমিয়াম দিতে গিয়ে দেয়া হয়নি। পলিসি নম্বর নিয়ে যায়নি বলে। কাল সকাল থেকে রক্ত বমি, রক্ত পায়খানা। দুপুরে বরানগরের বড় ডাক্তার গুপ্ত এসে দেখে ওষুধ পত্তর দিয়ে গেল, তখনও রক্ত বমি চলছে। সন্ধ্যায় দীননাথ পৌঁছল, কিছু পরে ভব। তখন ওষুধও

চলছে বমিও হচ্ছে তাজা রক্ত—কত রক্ত যে শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, রুগী নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। রাতেই আবার ডাক্তারকে কল দেওয়া হল—তিনি এলেন না। সারারাত রেখা সোনা ভব আর দীননাথ দুজন দুজন করে পালা করে সেবা করতে লাগল ওষুধ দিতে লাগল। সকালেই আবার ডাক্তারের কাছে একজন গেল—তিনি এলেন আজ বেলা এগারোটায়। রোগী ততক্ষণে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। ডাক্তারেরও মুখ শুকিয়ে গেল বলল, এখানে আর করার কিছু নেই হাসপাতালে নিয়ে যান, বলে কাগজে লিখে দিয়ে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ফী নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল।

'ভর দুপুর বেলায় তোমাদের মেজদাকে যে কি অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেছি কি বলব, কথা বলার শক্তি নেই, করুণ চোখে বারবার আমার দিকে তাকাতে লাগল, দু চোখে নেমেছে জলের ধারা। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই চলছিল ফিরছিল মানুষটা কি হয়ে গেল। আমার কি হবে ...' বলতে বলতে মেজবৌদি রেখা কেঁদে আকুল হল।

কাঁদছে শবু, শেফালীর চোখেও জল। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

অফিসে একটা ঢুঁ মেরে এসে দীননাথ বলল—

'এমন এক কঠিন রোগীকে ডাক্তার কি করে চব্বিশ ঘণ্টা হাসপাতালে না পাঠিয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখল, পাঁচবার ডাকলেও তার আসার সময় হয় না। সব ক্রিমিন্যাল। যাক্ এখনি সব চল হাসপাতালে মেজদাকে দেখে আসি। বাবা আপনি আর সোনা বাড়িতে থাকুন।'

দীননাথ রেখা, শেফালী ও শবুকে নিয়ে আবার হাসপাতালে চলল মেজদাকে দেখতে।

হাসপাতালে পৌঁছে শবু মেজদাকে দেখে ভাবে, এ সে কাকে দেখছে? মাত্র দিন দশেক আগেও দেখা সেই লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান লোকটি কি? মেজদার গায়ের ফর্সা রং স্বাস্থ্যের আভায় লাল টকটক করত, এখন রক্তশূন্য হয়ে একেবারে সাদা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, শরীরটা যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। জ্ঞান নেই বোধ হয়, চোখ দুটো বন্ধ. কোনরকমে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইছে।

ভব বলল—'রক্ত দিতে হবে, ডাক্তাররা বলেছে।'

কে রক্ত দেবে? ওরা বলল, কাউকে রক্ত দিতে হবে না, ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত কিনে দিলেই চলবে, ব্লাড গ্রুপিং করা হয়ে গেছে, পাঁচ ছ বোতল রক্ত দরকার, প্রায় তিনশ টাকা লাগবে।

দীননাথ বলল—'আমার কাছে ত অতটাকা এখন নেই।'

মেজবৌদি রেখা কেঁদে বলল—'আমার গয়নাগুলো নিন সেজদা, বিক্রি করে রক্ত এনে দিন, ওকে আপনারা বাঁচান।'

ভবর বন্ধু বাচ্চু বলল—'না, এখন গয়না বিক্রি করার দরকার নেই, আমরাই এখনকার মত টাকা যোগাড় করে দিচ্ছি। রক্ত দিলেই বিশুদা ভাল হয়ে উঠবে।'

টাকার যোগাড় হল, রাত থেকেই রক্ত দেওয়া হবে জেনে করুণ চোখে মেজদাকে দেখে সবাই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ওরা আবার বাসায় ফিরে এল, ভব বন্ধুদের নিয়ে হাসপাতালেই সারা-রাত থাকবে বলে রয়ে গেল। দীননাথ নাকি এককালে এখানে চাকরি করত, পুরোনো নার্সদের সঙ্গে কথা বলে সে খুব গম্ভীর হয়ে আছে। বিশ্বনাথের নাম উঠেছে ডেঞ্জার লিস্টে।

সকালে এসে ভব খবর দিল, রাত থেকেই রক্ত দেওয়া হচ্ছে, মেজদা প্রায় একই রকম আছে। সামান্য কিছু খেয়ে সোনাকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেল। দীননাথের অফিসে নাকি জরুরী কাজ আছে, আজ যেতেই হবে। সেখান থেকে বিকেলে সে সোজা হাসপাতালে যাবে। বলে গেল দুপুরের পরে শেফালী যেন মেজ বৌদিকে নিয়ে হাসপাতালে যায়, বাবা ও শবু বাড়িতে থাকবে।

হাসপাতালে সারাদিন যমে মানুষে টানাটানি চলল। বিকেলে রেখা ও শেফালী যখন হাসপাতালে পৌঁছল, ভব সোনা জানাল মেজদার নাকি জ্ঞান ফিরে এসেছে। রেখা পাগলের মত স্বামীর বিছানার পাশে ছুটে গেল। বিশ্বনাথ সবার দিকে তাকাতে লাগল। রেখা স্বামীর গায়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল—

'কেমন আছো?'

'ভাল। তোমরা?' গলার স্বর খুব দুর্বল।

শেফালী বলল—'মেজদা, এই দেখ আমরা সবাই এসেছি। ছোড়দাও এসেছে।'

বিশ্বনাথ আস্তে আস্তে বলল—'মহী এসেছে?' তারপর সবার দিকে একে একে তাকিয়ে বলল—'শেফালী। ভব। সোনা। বাচ্চু, মনোজ, রবি। দীনু কোথায়?' বলে ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

রেখা বলল—'সেজদা এক্ষুণি আসবে।'

আর একবার চোখ মেলে বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করল—'বাবা'?

শেফালী বলল—'বাবা ও সেজবৌদি বাড়ীতে আছে।'

'সবাই একখানে আছ তো?' বলে বিশ্বনাথ নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চোখ বুজল।

দীননাথ প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছল ছটার একটু আগে।

সোনা বলল—'মেজদা এখন একটু ভাল আছে, সবার সঙ্গে কথা বলছিল।'

নিভে যাবার আগে প্রদীপ কি জ্বলে ওঠে?

ভিজিটিং আওয়ার্সের পরে সবাই নীচে অপেক্ষা করছে আর একটুক্ষণ থেকে খবরাখবর নিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে একজন করে গিয়ে খবর নিয়ে আসছে। আশা নিরাশার মধ্যে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।

ঠিক সাতটার সময় ডাক্তাররা জানাল—রেখার কপাল পুড়েছে, বিশ্বনাথকে বাঁচানো গেলনা।

হাসপাতালেই হতভাগিনী রেখা কান্নায় লুটিয়ে পড়ল। আজ শুক্রবার একুশে জানুয়ারী, বিয়ের একটা বছরও পূর্ণ হলনা, দুদিন বাকি থাকতেই বিশ্বনাথের জীবনদীপ নিভে গেল—রেখা সব হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। রেখা হাসপাতালের দেওয়ালে, মেঝেতে মাথা ঠুকে কাঁদছে, তাকে সামলাতে গিয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছে—শেফালী সোনা ভব, কাঁদছে বাচ্চু রবি মনোজ। মাথার উপরে বড় কেউ নেই ওদের দেখবার, সান্ত্বনা দেবার পরামর্শ দেবার। বাবা বাড়ীতে, মা তার দাদার বাড়ীতে, বড়দা নেপালে। এখানে যারা আছে তাদের কারো বয়সই চোদ্দ থেকে আঠারোর বেশী নয়, কারো কোন অভিজ্ঞতা নেই, কি করবে কেউ জানেনা। সবাই ভাসে চোখের জলে, সবাই শোকে বিহ্বল। হঠাৎ কি মনে করে দীননাথ বিশ্বনাথের অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিল, তাদের একজন সহকর্মী এইমাত্র মর্ত্যের মায়া কাটিয়ে চলে গেল।

এখন কি করা হবে কেউ কিছু ভেবে পাচ্ছে না। বরানগরের বাসায় গিয়ে কি হবে, সেখানে ত কেউ নেই, ঘরে তালা বন্ধ। বাবা রয়েছেন সেই কতদূরে মল্লিকবাজারে। কি করবে, কোথায় যাবে?

হঠাৎ দেবদূতের মত অফিসের তিনখানা গাড়ী নিয়ে বিশ্বনাথের অফিসের কিছু সহকর্মী সেই রাতেই এসে উপস্থিত। তারা সব দেখাশোনা করে বিশ্বনাথের দেহসহ সবাইকে তিনটে গাড়ীতে তুলে নিল—ঠিক হল গাড়ী-

গুলো প্রথমে যাবে মল্লিক বাজারের বাসায়, সেখানে বিশ্বনাথের বাবা পুত্রের মঙ্গল সংবাদের অপেক্ষায় রয়েছেন।

এদিকে সাহেবপাড়ার বাসায় বাবা কালীনাথ ও শবু গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে। রাত আটটা বাজল, নটা বাজল, এখনও কেউ ফিরল না। শবু সবার জন্ত রান্না করে রেখেছে, বাবাকে খেয়ে নিতে বললেও তিনি কিছু খেলেন না—কোন খবর না পেয়ে তিনি খান কি করে?

রাত দশটায় গলির ভিতরে পর পর তিনখানা গাড়ী এসে থামল। আশঙ্কায় বাবা ও শবুর গলা শুকিয়ে উঠল। পরমূহর্তেই উচ্চ কান্নায় রোল তুলে শেফালী ও ভবর কাঁধে ভর দিয়ে রেখা বাড়ীতে ঢুকল, বিশ্বনাথের দেহ এনে নামান হল বাড়ীর উঠোনে। শবু ছুটে গিয়ে রেখাকে জড়িয়ে ধরল, বাবা ছুটে এলেন ছেলের শেষ শয্যার পাশে।

বাবা কালীনাথ দুহাতে কপাল চাপড়ে কেঁদে হাহাকার করে উঠলেন—'হায়রে, ছেলের মরা মুখ দেখতে আমি এখনও বেঁচে আছি!'

মেজ বৌ রেখা—'ওগো, তুমি আমাকে রেখে কোথায় চলে গেলে' বলে বুকফাটা কান্নায় লুটিয়ে পড়ল। পাগলের মত কাঁদছে; অফিসের লোকদের বলল 'সেদিন বলে গেলেন ওর নাকি শিগগীরই প্রমোশন হবে, প্রোমোশন দেবেন না!' বাবার পায়ে লুটিয়ে বলতে লাগল 'এ আমার কি হল, বাবা? আপনার ছেলে যে আর কথা বলছে না।' শবুকে শোকে বেদনায় জড়িয়ে ধরে বলল—'এখন আমার কি হবে শ্রাবণী, আমার সব সাধ আহ্লাদ ঘুচে গেল—এ পোড়া মুখ কাকে দেখাবো' বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

হায়রে, এমনি করেই সব কেড়ে নিতে হয়! শবু শোকে ভয়ে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেফালীর সাহায্যে রেখার জ্ঞান ফেরাতে ব্যস্ত। কাঁদছে শেফালী ভব সোনা, ওদের তিন বন্ধুর চোখেও জল। মহী হাত দুটো পিছনে করে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে চোখে জল নিয়ে—হয়ত নিজের অপরাধের পরিমাপ করছে—কেন সে সংসারটা ভেঙে দিল, এক সঙ্গে থাকলে হয়ত মেজদাকে বাঁচান যেত। এখন আর ভেবে কি হবে!

শুধু জল নেই দীননাথের চোখে—বোধ হয় সে কাঁদতে জানেনা, কিংবা কর্ত্তব্যের চাপে তার কান্না শুকিয়ে গেছে।

ঘণ্টাখানেক বাদে বিশ্বনাথের দেহকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে সবাই চলে গেল কেওড়াতলার দিকে—তার নাকি জন্মও হয়েছিল কলকাতায়—কলকাতায়

মাটিতেই তার দেহ মিশে যাবে। যাবার আগে বাবা কালীনাথ তার মেজ ছেলের মুখে এক গণ্ডূষ জল দিলেন কানের কাছে মুখ নিয়ে কয়েকবার হরিনাম উচ্চারণ করলেন। বাসাংসি জীর্ণানি বোধ হয় বলতে পারলেন না— তরতাজা দেহটাকে জীর্ণ বলা যায় না।

সব চাইতে কঠিন কাজ মুখাগ্নি করতে যেতে হল রেখাকেই—সে যে ছিল বিশ্বনাথের অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় এবং শেষবারের মত সহধর্মাচরণ। অবশ অবসন্ন দেহে শোকের প্রতিমা রেখা, এ সংসারের নব পরণীতা মেজবৌ, প্রবল কান্নার মধ্যে গাড়ীতে উঠে বসল স্বামীর দেহের পাশে—সহমরণে নয় সহগমনে। শূন্য ঘরে পড়ে রইলেন শুধু বৃদ্ধ পিতা কালীনাথ ও শবু—রোরুদ্যমান, শোকাহত—হঠাৎ ঝড়ে বিধ্বস্ত। প্রায় শুরুতেই শেষ হয়ে গেল একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ, তার সাধ আহ্লাদ, আশা আকাঙ্ক্ষা। স্পষ্টবাদী, ভাই বোনদের প্রতি দরদী বিশ্বনাথ স্বপ্নের একান্নবর্তী পরিবারের আশাভঙ্গে জীবনের মাঝপথেই যাত্রা শেষ করে চলে গেল অস্তলোকে।

খবর পেয়ে পরদিন একটু বেলায় ছুটে এলেন মা মঙ্গলা দেবী। কেঁদে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তিনি এলেন—

'কেউ আমাকে আগে সংবাদ দিলিনা! আমি ওকে অকালে যেতে দিতাম না। আমার বত্রিশ বছরের জওয়ান ছেলেটা চলে গেল, একবার চোখের দেখাটাও দেখতে পেলাম না! আমার অভাগিনী কচি বৌটার কি হবে—ওর যে বিয়ের এক বছর পূর্ণ না হতেই সব সাধ আহ্লাদ ঘুচে গেল।'

কত আফশোষ, কত হা হুতাশ! কান্নাটা অকৃত্রিম নিশ্চয়ই—হাজার হোক নিজের পেটের ছেলেত বটে। ততটাই অকৃত্রিম স্নেহে ও সহনশীলতায় নিজের স্বামী সংসার ছেলে মেয়ে বৌদের নিয়ে যদি ঘর করতে পারতেন তবে হয়ত আজকের এই পরিণতি হত না। ক্ষুব্ধ অভিমানে সদ্য বিধবা রেখা দ্বিগুণ কাঁদতে থাকে; শবু কাঁদে আর চোখের জল মুছে সংসার আগলায়।

একে একে সব আত্মীয় স্বজনরা আসতে লাগল। এল করবী স্বামীপুত্র কন্যাসহ। উত্তরবঙ্গ থেকে দিদি জবা এল সঙ্গে স্বামী পুত্র কন্যারা। আর এল রেখার দিদি জামাইবাবু খড়্গপুর থেকে। দুই বোন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল—সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য।

নেপাল থেকে বড় ভাই হরিনাথও এসেছে—একা।

কোনরকমে কাজ কাম মিটল। দিদি জামাইবাবু চাইলেন রেখাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে।

হৃদিনাথ বলল—'তার চাইতে বৌমা আমার সঙ্গে কাঠমণ্ডুতে চলুক—সেখানে তাঁর বড়জা ও ছেলে মেয়েরা আছে, নতুন দেশ নতুন পরিবেশে হয়ত তাঁর মনটা শান্ত হবে। ভাল না লাগলে শেষে দিদি জামাইবাবু ত রইলই।'

কথাটা সবাই মেনে নিল। চোখের জলে রেখা তার দিদি-জামাইবাবু, নতুন বোন শবু আর এক বছরের শ্বশুর বাড়ীর সবার কাছে বিদায় নিয়ে অপরিচিত ভাসুর হৃদিনাথের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল দমদমে প্লেন ধরতে। শবু এক সমব্যথী মরমের সাথীকে কাছাকাছি পেয়েছিল—মর্মভেদী এক ঘটনায় নিজে কেঁদে শবুকেও কাঁদিয়ে সে চলে গেল বহুদূরে—শোকাহত, রিক্ত, সর্বস্বান্ত।

কাজ মিটে যেতে মহী স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে আবার মেসে চলে গেল—মাসে মাসে কিছু সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে। দিদি জবারা দশ বারোদিন থেকে উত্তর বঙ্গে ফিরে গেল, বড় ছেলেটাকে রেখে গেল মামা-বাড়ীতে মানুষ হবে বলে। মা মঙ্গলা দেবী এখানেই রয়ে গেলেন কিছুটা বিবেকের দংশনে।

বিবেকবান বলতে হয় ঐ তিনটি ছেলে বাচ্চু, রবি আর মনোজকে। বিশ্বনাথের ইন্সিওরের টাকা পাওয়া যাবে না, অফিসের নানা ফাণ্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা যখন রেখার হাতে দিয়ে গেল তখন তাদের তিনশ টাকা দিতে গেলে কিছুতেই নিল না, বলল—

'বিশ্বদাকেই বাঁচাতে পারলাম না, ও টাকা আমরা নিতে পারব না।'

সাত

মাত্র তিন মাস আগে মেজবৌ রেখার জীবনে ঘটে গেছে চরম ভাগ্য বিপর্যয়। সে শোকের রেশ এখনও কাটেনি। কোথা দিয়ে সরস্বতী পূজো, দোল গিয়ে কবে এল বাংলা নববর্ষ কারো সেদিকে নজর ছিল না।

এবার বুঝি শবুর জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপদ। দীননাথের যক্ষা হয়েছে।

রেখার পরে এবার শবুর পালা। দুরারোগ্য যক্ষার জীবাণু নাকি

দীননাথের বুকে বাসা বেঁধেছে—অর্থাৎ তার উপরও মৃত্যুর পরোয়ানা জারী হয়েছে।

মাঝখানে বসন্তের শেষে কলকাতায় এসেছিলেন শবুর বাবা মা ও ভাই-বোনেরা, উঠেছিলেন সাদার্ন মার্কেটের কাছে এক বন্ধুর বাড়ীতে।

সেখানে প্রায় দেড় বছর পরে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা পার হয়ে মা মেয়েতে দেখা হয়েছে এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে। এখানে কানাই তপু রাস্তার মাঝখান দিয়ে ট্রেন (ট্রাম) যেতে দেখে অবাক হয়, বড় বড় দোতলা বাস দেখে ভয় পায়। মা বাবা এসেছেন বেড়াতে নয়, নন্দু আর মিতুর চিকিৎসার জন্য।

দেড় বছরে নন্দুর অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে, শরীর রোগা হয়েছে। কথা বার্ত্তা প্রায় বন্ধ, ডাকলেও সাড়া দেয় না। শুধু খিদে পেলে ডাকে—'মা খেতে দাও।'

শবু বারবার আদর করে ডেকেও তার সাড়া পায়নি।

বড় বড় সব স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে নন্দুকে নিয়ে যাওয়া হল। কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা ইলেকট্রিকের শক দেওয়া স্থির করল। কদিন পর পর তাদের চেম্বারে চলতে লাগল শক দেওয়া। মাত্র এক দিনই শবু সে সময় সামনে উপস্থিত ছিল। কিন্তু শক দেবার যন্ত্রণায় নন্দুর কাতর গোঙানি ও অস্থিরতা দেখে সে কেঁদে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ঐ টুকু ভাইটার উপর এমন আসুরিক চিকিৎসা শবুর দুর্বল মন সহ্য করতে পারে নি। নন্দু যে ওদের সবার আদরের প্রথম ভাই। একদিন শক দিলে দুদিন সে নিস্তেজ হয়ে বাড়ীতে পড়ে থাকে।

বাবার বন্ধু সন্তোষকাকার সাহায্যে মিতুকেও বড় ডাক্তার দিয়ে দেখানো হল। ডাক্তার বলেছে—কানে কম শোনার জন্যই তার অন্য উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। অন্তত একটা কানে অপারেশন করে দেখা যেতে পারে অবস্থার কোন উন্নতি হয় কিনা। তার জন্য মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে টিকিট করে রাখা হয়েছে, বেড পেতে দেরী হবে। এমনি করে মাসখানেক চলে গেলে, মা বাবাদের ফিরে যাবার পালা, বাবার ডিস্পেন্সারী একমাস হল বন্ধ।

কর্মব্যস্ত কলকাতা শহরে শবু আরো বেশী ব্যস্ত। ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী দেওর ননদ ও ভাগ্নে। সংসারে তার অনেক কাজ। তবু কখনো অফিস ছুটির পর কিম্বা ছুটির দিনে দীননাথের সঙ্গে গিয়ে মা বাবা ভাইবোনদের সঙ্গে ঘন্টা দুতিনেকের মত কাটিয়ে আসতে পেরেছে—তেমন জমিয়ে গল্প করা

রনি। মেজো ভাসুর বিশ্বনাথের সব খবর আগেই তাঁরা পেয়েছিলেন, শবুর
:খ আরো বিস্তৃত সব শুনে মা পদ্মিনী দেবীও চোখের জল ফেলেছেন না-
খা বিশ্বনাথের অকাল পরিণতিতে আর হতভাগিনী রেখার জন্য, বলেছেন—

'এ এমন এক ঘটনা, যে শুনবে সেই না কেঁদে পারবে না। আমি ত
চিঠিতে খবর পেয়েই কেঁদে বাঁচিনা, মা-ও কত কাঁদলেন। তবে দেখ, যে
।কারবর্তী সংসারের জন্য তোরা মন্দির শহর ছেড়ে এলি তার কি হাল হ'ল?
।তী ত বললি আবার মেসে চলে গেছে। দীনু তবু সবার জন্য প্রাণপাত
করছে—সে একা কতদিক সামলাবে? ওর শরীরও খুব রোগা হয়ে গেছে
কোন অসুখ বিসুখ হয় নি ত?'

হয়নি, তবে হতে কতক্ষণ। যা ঝামেলা চলছে!

এরই মধ্যে ছুটির দিন দেখে মা, শবু, মিতু কানাই তপুকে নিয়ে দীননাথ
চিড়িয়াখানা যাদুঘর এমন কি মেট্রোর এয়ার কণ্ডিশন হলে চিত্রাঙ্গদা দেখিয়ে
নেছে। মেট্রোতে ঢুকে চৈত্র বৈশাখের গরমে সবার শীত লেগেছে, তপু
চৌরঙ্গীর পথে সাহেব মেমদের দেখে 'সাহেব' বলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে
।কেছে। চিড়িয়াখানায় গিয়েই সবাই বেশী আনন্দ পেয়েছে, মা এসব
।াপারে চিরকালের শিশু।

কলকাতা থেকে চলে যাবার আগে বাবা-মা কানাই তপুকে নিয়ে মল্লিক-
জারে এসে শোকের পরিবেশের উপযোগী শিষ্টাচার দেখিয়ে গেছেন বেয়াই
।য়ানের সঙ্গে।

কানাইয়ের মেজদিদের এখানকার বাড়ীটা মোটেই ভাল লাগেনি।
লছে চুপি চুপি—'মেজদি, তোদের এ বাড়ীটা একটুও ভাল না, মন্দির
বে তোদের বাড়ীটা কি সুন্দর ছিল।'

দিদি কিনুরা এখন ভবানীপুর থেকে উঠে গিয়ে চেৎলায় বাসা নিয়েছে।
রাও এসে এক দুবার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে গেছে।

অবশেষে প্রায় মাসখানেক পরে ভাই বোনদের নিয়ে বাবা মা মন্দির শহরে
র গেছেন।

হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে গিয়ে শবু কেঁদে বলেছে—

'মা গো, নন্দুর জন্য মন খারাপ লাগছে। পৌঁছে চিঠি দিও—নন্দুর খবর
দিও। কত কথা বলা হল না।'

।মা বলেছেন—'দেব চিঠি। তোরা সাবধানে থাকিস। দীনু, সাবধানে
।। তোমার শরীর খুব খারাপ দেখাচ্ছে, একবার ছুটি নিয়ে শবুকে

সঙ্গে করে এসো।'

দীননাথ বলেছে—'আমার শরীর ভাল আছে। সামনের পূজোয় ছুটি নিয়ে যাব।'

মা বাবা চলে গেছেন। বাড়ীতে ঘটে যাওয়া অত বড় শোকের ঘটনার পর এই এক মাসের ব্যস্ততার শবু খানিকটা মানসিক শান্তি পেয়েছে। শুধু মা বাবা ভাই বোনদের সঙ্গে দেখা হবার আনন্দ বেদনার স্মৃতিই মনে রয়ে গেছে—সময়ের অভাবে মার সঙ্গে মন খুলে গল্প করা হয় নি।

আর তার কদিন পরেই হঠাৎ মৃত্যুর সমন জারী হয়েছে দীননাথের উপরে দীননাথের নাভিতে কি একটু ঘা হয়েছে। কাছেই পি জি হাসপাতালে গেল চিকিৎসা করাতে। সেখানে ডাক্তার তার নাভি ছেড়ে বুকের এক্সরে করে জানিয়ে দিল—আপনার টিবি হয়েছে, ভাল খাওয়া, বিশ্রাম আর স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইঞ্জেকশন নিতে হবে।

ভয়ে শবুর মুখ শুকিয়ে গেল, হাত পা অবশ হয়ে আসছে। স্বাস্থ্য বইতে পড়া বিদ্যায় সে জানে যক্ষ্মা বড় মারাত্মক রোগ—রাজ-রোগ। এই অভাবের সংসারে সে কি তার স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে পারবে!

সুযোগ পেয়ে মা মঙ্গলা দেবী আবার স্বরূপে আবির্ভূত হলেন। বলতে লাগলেন—

'বৌরা এসে এক এক করে আমার ছেলেদের গিলে খাচ্ছে, মেরে ফেলছে। হবে না? গুরুজনদের অমান্য করা, বাড়ীর নিয়ম কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখানো, মায়ের পেটের ভাইদের আলাদা হয়ে যাবার কুমন্ত্রণা দেওয়া সব ফল হাতে হাতে ফলছে। সংসারটা উচ্ছন্নে যাবে। এতদিন বলতাম—নয় নয়টা ছেলে মেয়ে জন্মালো—একটাও না মরে বেঁচে রইল! এখন সব এক এক করে যাবে। দীনুটাও মরবে।'

বাবা কাশীনাথ আড়াল থেকে মন্তব্য করলেন—

'মর মর করে ত একটাকে শেষ করল তাতেও তৃপ্তি হলনা, এখন আবার আর একটাকে শাপ শাপান্ত করতে লেগেছে।'

মঙ্গলা দেবীর মুখ দিয়ে মধু ঝরতে লাগল—

'ঐ হয়েছে আর এক শকুন, জোয়ান জোয়ান ছেলেগুলো চোখের সামনে এক এক করে মরছে আর এই বুড়্যা শকুনের মরণ নাই। মরলে আমার হাড় জুড়ায়।'

'হ্যাঁ, মরলে ত খুবই ভাল হয়, কিন্তু তা আর হচ্ছে কই, আমার মরণ নাই।'

'তা মরবে কেন, শকুনের পরমায়ু নিয়ে এসেছে যে। মরলে গঙ্গায় এক ডুব দিয়ে ঝাড়া হাত পা হয়ে থাকতে পারতাম।'

'তাই ত চাই, না হলে সুবিধে হবে কেন?'

শবু কানে আঙুল দেয়। কোথায় এই বিপদের মধ্যে শবু চাইবে সান্ত্বনা পাবে শক্তি—উল্টে বৌদেরই ঘাড়ে সব দোষ। আবার নিজের স্বামীর প্রতি কি সব উক্তিই করছেন। দীননাথ বাড়ীতে নেই, ডাক্তারখানায় ইঞ্জেকশন নিতে গেছে।

মঙ্গলা দেবী গজগজ করতে লাগলেন—'পেট রোগা বংশ, সব বারবার পেটের অসুখে মরণাপন্ন হয়, আমি টেনে তুলি। বেশী তেল ঝাল মশলা কারো পেটে সহ্য হয়না। মেজ বৌ মনের সুখে তেল ঝাল দিয়ে রেঁধে খাইয়ে বিশুকে মেরে ফেলল, এখন আমার দোষ!' বলতে বলতে তিনি বাজারের থলে হাতে বেরিয়ে গেলেন।

বাবা কাশীনাথ আবার মন্তব্য করলেন—'ছেলে মেয়েদের প্রতি এতই যদি দরদ তবে তাদের ফেলে রেখে বারবার যাওয়া হয় কেন পাতানো দাদার বাড়ী?'

শবু ভয়ে আতঙ্কে কুঁকড়ে থাকে। সবার আড়ালে, গোপনে চুপেচুপে কাঁদে, চোখের জল ফেলে। দীননাথের সামনেও কাঁদেনা, পাছে অসুস্থ মানুষটা মনের বল হারিয়ে ফেলে। এক বাবা ছাড়া কেউ বুঝি তার মুখের দিকে চায় না।

তবু একটা বিষয়ে শবু নিজের মনকে শক্ত করে। নিজের বিবেক তার কাছে পরিষ্কার, সে কোন অন্যায়, কোন অসৎ কাজ করেনি। তাই যদি হয়, সে যদি সতী মায়ের সতী মেয়ে হয়, আর বাবা কাশীনাথের গণ নির্ধারণে যদি কোন ভুল না থাকে তবে দীননাথ ঠিক ভাল হয়ে উঠবে, স্বামীকে সেবায় যত্নে সুস্থ সবল দেহে রেখে এ বাড়ীর ঠাকুমা, মেজকাকীমার মত শাঁখা সিঁদুর আলতা পরে সে নিজে আগে যাবে। তার জন্য যে মূল্যই দিতে হয় সে দেবে।

নেপালে হৃদিনাথের কাছে দীননাথের অসুখের খবর দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে হৃদিনাথ লিখেছে, দীনুকে যেন এখনই কোন টিবি

হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করা হয়, কাছেই যাদবপুর হাসপাতালের ডাক্তার বড়দা আছে তার মতামত নেয়া দরকার, ও বাড়ীটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর কলকাতার বাইরে খোলামেলা একটা বড় বাড়ী যেন ভাড়া করা হয়, খবর পেলে বৌছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠাবে আর মাসে মাসে তিনশ টাকা করে সংসার খরচ দেবে, এসব ব্যবস্থার জন্য এখনই পাঁচশ টাকা পাঠাচ্ছে। আরও জানিয়েছে, টিবি এখন আর তেমন মারাত্মক অসুখ নয়, ঠিকমত ওষুধ পথ্য বিশ্রামে ভাল হয়ে যাবে।

হৃদিনাথের চিঠিতে শবু মনে বল ফিরে পায়; এই ত উপযুক্ত অভিভাবকের মত কথা, সারাদিন শুধু শাপ শাপান্ত করলে কারো ভাল হয়না।

ডাক্তার দাদার সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইঞ্জেকশনের ডোজ বেশী হয়েছে, অর্দ্ধেক মাত্রায় দিলেই যথেষ্ট। তিনি বড়মামা কালীনাথকে বললেন—

'দীনু ছুটি নিয়ে বাড়ীতে থাকলেই শুধু হবে না, ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে তবে পূর্ণ বিশ্রাম, ভাল খাবার ও ওষুধে ওর অসুখ সারবে— রোগটা এখন প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। আমি ওকে আমাদের হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করছি, তবে এক সঙ্গে অনেকগুলো টাকা লাগবে ভর্তি হতে। বেড খালি হলেই আমি খবর দেব। দীনু যেন সব সময় শুয়ে থাকে, আর মাছ মাংস ডিম দুধ কলা এসব খায়। কোন চিন্তা নেই বড় মামা, আমি দেখছি।'

ডাক্তার দাদা চলে যেতেই দীননাথ বলল 'বাড়ীতে সবার খাবার জুটবে না, আমাকে সব ভাল ভাল জিনিষ খেতে হবে! আমার কিছুই হয়নি, শুধু শুধু শুইয়ে রেখেছে।'

পাগলেও নিজের ভাল মন্দ বোঝে এ মানুষটা তাও বোঝে না। হাসপাতালে ভর্তি করা গেলে তবে শবু নিশ্চিন্ত হয়, খাওয়া দাওয়াটা অন্তত ভাল পাবে।

শিগগিরই মেডিক্যাল কলেজে বেড পাওয়া যাবে খবর পেয়ে বাবা গিরি বাবু মিতুকে নিয়ে কলকাতায় এলেন, উঠলেন শবুদের বাসায় কারণ মেজো কাকা কাছেই ইলিয়ট রোডে থাকেন। শবু বাবার কাছে শুনল, নন্দ অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, বাড়ীর আর সব ভাল আছে।

বাবা একদিন থেকে বড় ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে জানলেন বেড পেতে আরো পাঁচ সাত দিন দেরী হতে পারে। দীননাথ ও শবুকে মিতুকে ভর্তি

করার ভার দিয়ে কিছু টাকা পয়সা ও মিতুকে রেখে গিরিনবাবু পরদিনই ফিরে গেলেন—ওখানে ডিস্‌পেন্সারী বন্ধ রাখতে হয়েছে।

বাবাকে শবু দীননাথের অসুখের কথা জানাতে পারল না—ভয় হল বাবা মা যদি বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে। নিজের যা হয় হোক মা বাবার অশান্ত মনকে আরো চিন্তায় সে ফেলতে পারে না। পরে যা হবার তা ত হবেই। বাবা দেখে গেলেন দীননাথ খাচ্ছে দাচ্ছে—বাড়ীতে ছুটি নিয়ে বসে আছে, সেই ছবিই তাঁর মনে আঁকা থাক। দীননাথকেও বলতে বারণ করেছিল।

হৃদিনাথের কথামত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অসুস্থ অবস্থাতেও দীননাথ কলকাতার বাইরে দমদম বেলঘরিয়া ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে পাঁচখানা ঘরওয়ালা একখানা বাড়ী ভাড়া ঠিক করে এল, মাসে আশী টাকা ভাড়া। এক মাসের ভাড়া এডভান্স করে এসেছে—সামনের পয়লা তারিখেই সেখানে যাওয়া। আর মাত্র সাত দিন বাকি আছে।

দুদিন যেতে মেডিক্যাল কলেজে বেড পাওয়া গেল। অসুস্থ দীননাথ শবু ও মিতুকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মিতুকে সেখানে ভর্ত্তি করে দিল। বেডে পৌঁছে মিতু কান্নাকাটি করতে লাগল।

শবু বলল—'ভয় কি রে মিতু, আমরা রোজ এসে তোকে দেখে যাব।'

মিতু বলল—'আমার ভয় করছে, অপারেশন করবে।'

দীননাথ বলল—'অপারেশন করলে তুমি ভাল হয়ে যাবে তবে ত তোমার বিয়ে হবে।' পরে হেসে বলল—'কানে অপারেশন করবে, কান ত কেটে নেবে না।'

বিয়ের কথায় মিতু ফিক করে হেসে ফেলল। নন্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাবা মার মিতুকে নিয়েও আর এক ভাবনা। কি করে এই খুঁতো মেয়েটার বিয়ে দেওয়া যাবে।

দীননাথ শবুকে মেডিক্যাল কলেজে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পথ ঘাট চিনিয়ে দিতে। সে হয়ত যে কোনদিন যাদবপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়ে যাবে। তখন শবুকেই রোজ এসে মিতুকে দেখে যেতে হবে। অবশ্য জামাইবাবু সুশীলকেও চিঠিতে সংবাদ দেয়া হবে যাতে সেও খোঁজখবর করে।

ডাক্তার দাদা খবর পাঠিয়েছে—যাদবপুরে বেড পাওয়া গেছে, দীনু যেন এখনই সেখানে গিয়ে তিন মাসের টাকা জমা দিয়ে ভর্ত্তি হয়।

দীননাথ হাসপাতালে ভর্ত্তি হবে, তাকে পৌঁছোতে সঙ্গে যাবে শব আর

সোনা। যাবার আগে দীননাথ শবুকে বলল—

'আমার জন্য চিন্তা কোরো না। টিবি হাসপাতাল ভাল জায়গা নয়, রোগটাও ছোঁয়াচে। তুমি আমাকে দেখতে যেয়ো না—কেউই যেন না যায়। তুমি মিতুর দেখাশোনা কোরো। বাড়ীতে সবাই রইল—তুমি সাবধানে থেকো।'

বাবা মাকে দীননাথ বলল—'তিন দিন পরে পয়লা তারিখে আপনারা সবাইকে নিয়ে নতুন বাসায় চলে যাবেন—বাড়ীওয়ালাকে বলা আছে।'

দীননাথ রওনা হয়ে গেল। অনেক কষ্টে শবু তার চোখের জল আটকে রাখল। মনটাকে শক্ত করতে হবে—সামনে তার কঠিন পরীক্ষা। হাসপাতালে গেলে পরিপূর্ণ বিশ্রাম, ভাল পথ্য আর ওষুধে তার স্বামী নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।

তিন দিন পরে মালপত্তর সহ আর সকলের সঙ্গে শবু রওনা হল নতুন ভাড়া বাড়ীর উদ্দেশ্যে। মাত্র দেড় দুবছরে যে কতবার বাসা-বদল করতে হল। আর ভাল লাগেনা!



পর্ব-২

এক

তিনটি মাস দীননাথ যাদবপুর টিবি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে রইল। আর এই সময়টাতে গভীর মানসিক দুশ্চিন্তা নিয়ে শবু সংসারের জোয়াল বয়ে চলল নীরবে। তার স্বামী কঠিন অসুখে পড়েছে, যতদিন সে সুস্থ হয়ে ফিরে না আসছে ততদিন তার মনে নেই সুখ, মুখে নাই হাসি। তার সঙ্গে আবার মিতুর জন্য মেডিক্যাল কলেজে যাওয়া আসা।

ওরা এখন আর কলকাতা শহরে থাকে না, শহর থেকে বেশ দূরে বহু পুরোনো বর্ধিষ্ণু এক গ্রাম চাঁপাতলায় এখন ওদের বাস। ষ্টেশন থেকে একটা খোয়া ওঠা রাস্তা সোজা গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। প্রথমে প্রায় মাইলখানেক ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে গিয়ে তবে রাস্তাটা গ্রামে ঢুকেছে। লোকে বলে চাঁদমারীর মাঠ, এখনও রাস্তার একপাশ প্রায় দু মানুষ উঁচু ও আধমাইলটাক লম্বা ইটের প্রাচীর দিয়ে আড়াল করা। সেই বড় রাস্তার দু পাশে অতি প্রাচীন দুটি গ্রাম, চাঁপাতলা ও নিমপুর—লোকে দুটোকে মিলিয়ে চাঁপা-নিমপুরও বলে। কলকাতা থেকে দূরে হলেও কিছু নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা আছে, একটি পৌরসভাও আছে।

ভাড়া বাড়ীটা কিন্তু গ্রামের বাইরে নতুন গড়ে ওঠা একটা পাড়ায়, যার এখনও কোন নামকরণ হয়নি। মাঠের মধ্যে কিছু দূরে দূরে মাত্র আটদশটা বাড়ী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে নাই পাকা রাস্তা, ইলেকট্রিকও নাই। এতদিন ওরা ছিল আলো ঝলমল পার্কস্ট্রীটের পাশে কলকাতা শহরে, হাতের কাছে ট্রাম বাস গড়ের মাঠ পার্কসার্কাস ময়দান। এখানে এসে প্রথম রাতেই ঘরে ঘরে ল্যাম্প—লণ্ঠন জ্বালাতে হয়েছে, বিদ্যুতের অভাবে মেজদা বিশ্বনাথের হাতে তৈরী যে রেডিওটা এতদিন সরব থেকে তার স্মৃতি বহন করে চলেছিল সেটা নীরব হয়ে রইল আর সন্ধ্যা লাগতে অসংখ্য মশা সবাইকে ছেঁকে ধরে। পাশেই গ্রামের ঝোপঝাড় জঙ্গলে শেয়ালেরা রাতে থেকে থেকে ডেকে উঠে প্রহর ঘোষণা করে, ভয়ে শবুর ঘুম ভেঙে যায়। পাশে আবার দীননাথ নেই একখানা আলাদা ঘরে শেফালীকে সঙ্গে নিয়ে সে শোয়। বাড়ীখানা কিন্তু মস্ত বড়, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সেবার মেজদার সঙ্গে এসে যে মাঠে জমি দেখেছিল, বাড়ীটা সেই জমি থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে। বড়ই আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত যোগাযোগ!

আর সব যেমন তেমন কিন্তু রোজ মেডিক্যাল কলেজে মিতুকে দেখতে যাওয়া এক বিরাট সমস্যা। শবু কলকাতার পথঘাট কিছু চেনে না। প্রথম দিন শেফালী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পথঘাট চিনিয়ে দিয়েছে। প্রায় দুমাইল পথ হেঁটে মেইন লাইনের ট্রেনে চেপে শিয়ালদা, সেখান থেকে ট্রামে করে দিলখুসা কেবিনের গায়ে বড় বড় করে লেখা 'মোগলাই পরোটার' সামনে নামা, তারপর কলেজ ষ্ট্রীটের বইপাড়া, বড় বড় থামওয়ালা সিনেট হল, সব শেষে মেডিক্যাল কলেজের উঁচু সিঁড়ির গায়ে লেখা 'ব্লাড ব্যাঙ্ক'। এই সব চিহ্ন নজরে রেখে রোজ খেয়ে উঠে একা একা হাসপাতালে যাওয়া, ট্রেনেট্রামে ঠেলাঠেলি করে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরা—চার ঘন্টার পথের ধকলে রোজ নাকাল হতে হয়। এদিকে বাড়ীতেও কাজের অন্ত নাই।

অপারেশনের পর এক কানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মিতুকে ছেড়ে দিয়েছে। তবু সপ্তাহে দুবার করে তাকে আবার নিয়ে যেতে হয় ড্রেসিং করাতে আউট ডোরে। সেই সকালে বেরিয়ে আউটডোরের রোয়াকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে ড্রেসিং করিয়ে বাড়ী ফিরতে বেলা দুটো তিনটে বেজে যায়।

সব শবু মুখ বুজে করে চলেছে। এখন তার একমাত্র চিন্তা দীননাথ কত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবে। টিবি হাসপাতালে কাউকে যেতে বারণ করে দিয়েছে। বারণ না করলেও কোথায় কতদূরে যাদবপুর হাসপাতাল সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই।

এখানে চারপাশে কত ফাঁকা জমি পড়ে আছে, মাঝে মাঝে দু একটা নতুন বাড়ীও তৈরী হতে দেখা যাচ্ছে।

কদিন যেতেই বাবা কাশীনাথ একদিন বললেন—'রিফিউজীরাই এ সব বাড়ী করছে, আমরাও ত রিফিউজী আমাদেরও একটা বাড়ী করা দরকার। দীনু হাসপাতালে গেছে, তারও ভালমত চিকিৎসা পথ্য দরকার। আর সবেতেই চাই টাকা। আমি পাকিস্থানে একবার গিয়ে দেখি কিছু জমি জমার বন্দোবস্ত করতে পারি কিনা। এখানে আমার হাতে একটা পয়সাও নেই, বাজার থেকে যা আসে তার একটাও আমার মুখে দেবার উপযুক্ত নয়। পেটে সহ্য হয় না। আমার রোজ কই বা শিং মাছের পাতলা ঝোল, থানকুনির পাতা সেদ্ধ এই সব লাগে, বাজার থেকে তার কিছুই আসে না।'

সংসারের কর্তৃত্ব এখন মঙ্গলাদেবীর হাতে। তিনি জলে উঠে মন্তব্য করলেন—

'এঃ, একেবারে নবাব পুত্তুর এসেছেন, জমিদারী থেকে হাজার হাজার টাকা আসছে, ছেলেরা সব রোজগার করে পাঁচশ হাজার টাকা মাসে মাসে দিচ্ছে আমি সেই টাকা দিয়ে তাদের বাপের জন্য রোজ কৈ, মাগুর, দই, রসগোল্লা এনে খাওয়াব। কথায় বলে না—অত সুখ যদি তোর কপালে, তবে কেন তোর চট বগলে। কোন মুরোদ নেই কেবল প্যাচাল পাড়া আছে।'

শেফালী মার পক্ষ নিল—'বাবা, এখন যে অবস্থায় সংসার চলছে তাতে এর থেকে ভাল খাওয়া দাওয়া হতে পারে না।'

বাবা বললেন—'তা তো তোমরা বলবেই হে। তোমরা ত রোজ চায়ের সঙ্গে দু চামচ করে দুধ খাও আমি ত তাও পাই না হে, আমার ভাগ্যে এক চামচ দুধও জোটে না। যদি পাঁচশ টাকা পাঠাল সে টাকা সব কোথায় গেল?'

'গুষ্টির পিণ্ডি দিতে লেগেছে' মঙ্গলা দেবীর তাৎক্ষণিক উড়ো জবাব।

শেফালী বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করল—'সেজদা দুই মাসের মাইনের টাকা এক করে হাসপাতালে ভর্তি হল, এখন বড়দার ঐ টাকাতেই ত সংসার চলছে।'

বাবা বললেন—'আমার সে সব হিসাবে দরকার নাই। তুমি ত মাসে মাসে কিছু টাকা দাও বাড়ীর খরচে, মহীও দু তিন মাস হল সত্তর পঁচাত্তর টাকা করে দিচ্ছে। এ বাড়ীতে যত টাকাই দাও কিছুতেই কুলাবে না যতদিন তেলীবন্ধের গুষ্টি আছে।'

মঙ্গলা দেবী তেলে বেগুনে জলে উঠলেন - 'তেলীবন্ধের কেউ কারো খায়ও না পরেও না। তাদের নিজেদেরই ঢের আছে। সেখানে দাদার যা জমিদারী বিক্রি করলে এখনই লাখ দুলাখ টাকা পায়, যায়ে একবার দেখে আসুক।' বলতে বলতে মঙ্গলা দেবী রান্নাঘরে চলে গেলেন।

বাবা বলতে লাগলেন—'ভারী ত, পরের ধনে পোদ্দারী। দত্তকের ব শ. মূর্খ— জোলাদের মত গামছা বুনে আর বেচে খেত তার আবার জমিদারী।'

রান্নাঘর থেকে মঙ্গলা দেবী চিৎকার করে উঠলেন—

'ওরে আমার বিদ্যার জাহাজ রে! ওকালতি করে রোজগার করে আমাকে ত রাণীর হালে রেখেছিল! আমার বত্রিশ ভরি সোনার গয়না সব এক এক করে খাচ্ছে, এমনই রোজগার যে বাপ মরে যেতে নিজের দেনায় বারো আনা সম্পত্তিই ক্রোক নিলাম হয়ে গেল।'

বাবা বললেন—'সে দেনা কি শুধু আমার জন্য? ওনার মাতা ঠাকুরানী বিধবা হবার পরে অসুস্থ হয়ে কতমাস আমাদের নাটোরের বাড়ীতে এসে রইলেন তার মানসিক চিকিৎসা চলতে লাগল, শেষে মারা গেলে শ্রাদ্ধশান্তিও করতে হল। তখন ত আর টাকা যেখান থেকে পায়। হুদির থেকে সামান্য বড় নাবালক ছোট শ্যালক শুভ্রাংশুকে কত বছর কাছে রেখে মানুষ করা হচ্ছিল, সেহাৎ গ্রামের বাড়ীতে চলে যেতে হল তাই। না হলে আমি কি মদ খেয়ে বেশ্যাবাড়ী গিয়ে টাকা উড়িয়েছি, ধার দেনা করেছি, কেউ বলুক। কিছু ধার দেনা অবশ্য আমার বেকুবিতে পরের উপকার করতে গিয়ে হয়েছিল।'

বাবার কথাগুলো হয়ত খাঁটি ছিল। মঙ্গলা দেবী আর সাড়া শব্দ করলেন না।

স্কুলে গরমের ছুটি শুরু হতে বাবা কালীনাথ সোনাকে নিয়ে পাকিস্তান রওনা হয়ে গেলেন, ফিরলেন প্রায় দেড়মাস পরে। সঙ্গে বড় এক হাঁড়ি নাটোরের বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা।

ততদিনে নেপাল থেকে বড়বৌদি বীণা দেবী এসে পড়েছে। বলতে গেলে বাবা ও সোনা পাকিস্তানে গেল আর বড় বৌদিরাও এল। বড়বৌদির সঙ্গে তার তিন মেয়ে—সুপর্ণা, সুবর্ণা, সুরমা আর কোলে মাসদুয়েকের শিশু পুত্র। আর সঙ্গে আছে দুঃখিনী মেজবৌদি রেখা।

বড়বৌদি এসেই যথারীতি হেসে গল্প করে বাড়ী মাতিয়ে তুলল—একবার মন্দির শহরের গল্প, কটকের গল্প, একবার নেপালের গল্প।

'মনে আছে শ্রাবণী, সেই তোমাদের বিয়ের সময় আমরা কি সুন্দর সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াতাম, কটকে কি ভাল সৈঁউভাজা পাওয়া যেত। ও কে মিতু? মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন? অপারেশন হয়েছে? নেপালে কত বড় কোয়ার্টার, দারুণ কাপী। আরে ভব, তুমি কত বড় হয়ে গেছ। সোনা কোথায়? ও, পাকিস্তানে গেছে? ইস্, সেখানে বাড়ীর পাশেই নদী, নদীতে কত মাছ।...

'আরে ওটা কে? অপার ছেলে হাবলু? আমাদের বিয়ের সময় হাবলুকে কোলে করে অপা এসেছিল। আরে এ কে? ঝণ্টু, না? জান শ্রাবণী, কলকাতায় ফায়ার ব্রিগেডের কাছের বাসায় কিছুদিন আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। তখন দিন রাত হাসি গল্প, একেবারে নরক গুলজার। সে সময়

ঝণ্টুদের মা পক্ষ হয়ে হঠাৎই মারা গেল। উঃ, তিনদিন ধরে মামীমা পক্ষের যন্ত্রণায় কি কষ্টটাই না পেয়েছিলেন।'…

বড়বৌদি একাই বলে চলে, দুঃখের কথায় কাঁদে, হাসির কথায় হেসে গাড়িয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, নতুন বাড়ীতে আসার পর সংসারের পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে প্রথম সুযোগেই মা মঙ্গলা দেবী মাতুলের ছোট ছেলে ঝণ্টুকে এনে এ সংসারে ভর্তি করেছেন. বলেছেন—

'ঝণ্টু এখন এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। আহা, মা মরা ছেলেটা ও। দাদা ওর জন্য মাসে ত্রিশ টাকা করে দেবে।'

আর সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে রোজ মাতুলের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া—মা মঙ্গলা দেবীই দু মাইল হেঁটে ট্রেন ধরে খাবার নিয়ে যান, কোন কোনদিন রাতে না ফিরে পরদিন সকালে ফেরেন।

মিতু দিন দশেক হাসপাতালে থেকে ছাড়া পেলে শ্বশুর মঙ্গলা দেবীকে বলেছে—'যতদিন মিতু থাকবে ওর জন্য মাসে ত্রিশটাকা করে দেব, আমার বাবা ওর জন্য টাকা রেখে গেছেন।'

আগে থেকে সব বলে রাখা ভাল, না হলে পরে কথা উঠতে পারে।

বড়দা হরিনাথ সবাইকে পৌঁছে দিতে একদিনের জন্য এসেছিল। যাবার আগে মা মঙ্গলা দেবীর হাতে তিনশ টাকা দিয়ে বলে গেছে—

'মা, আমি মাসে মাসে তিনশ টাকা পাঠাব। ছেলে মেয়েদের জন্য এক সের করে দুধ, আর বাচ্চাটার জন্য কৌটোর দুধের ব্যবস্থা করবেন। বাড়ীটা বেশ ভাল হয়েছে অনেকগুলো ঘর আছে, চারদিক খোলা মেলা আর সবুজের সমারোহ। এখানে সবার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, দীনুর জন্য এরকম জায়গাই আদর্শ। তবে এটা ধানীজমির মাঠ, বাড়ীটা বেশ উঁচু হলেও বর্ষায় আশপাশ ডুবে যাবে। আমি কলকাতায় বদলির চেষ্টা করছি।'

'এই ত এখন বাড়ীতে চাঁদের হাট বসে গেছে'—বলে মঙ্গলা দেবী হেসে টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে গোয়ালাকে দুধের কথা বলতে গেছেন।

অতএব বড়দা নেপালে ফিরে গেলেও আর দীননাথ হাসপাতালে থাকলেও বাড়ীতে এখন চৌদ্দ পনেরো জন লোক। বাড়ীতে এত লোকজন থাকাতে এই প্রথম একজন ঠিকে ঝি বহাল হয়েছে—পূর্ব পাকিস্তান থেকে সদ্য আসা শ্যামা নামে এক মাঝ বয়সী বৌ।

এত লোকের মাঝেও শবু প্রায় একা—দীননাথ এখনও হাসপাতালে। আর একা মেজবৌদি রেখা। সে বেশীর ভাগ সময় বড়জার ছেলে মেয়েদের দেখা শোনা করে, রান্নার কাজেও শবুকে সাহায্য করে।

মেজদা, বিশ্বনাথের বিয়োগান্ত পরিণতির ছয় মাস পর শবুতে আর রেখাতে দেখা। সেদিনের সেই সব স্মৃতি দুজনের চোখে আনে জল। প্রথম দিনই রেখা কেঁদে বলেছে—

'সেবারে আমরা জমি দেখতে এখানেই কোথাও এসেছিলাম মনে হয়, তাই না শ্রাবণী?'

শবু বলেছে—'ঠিক বলেছ ভাই মেজবৌদি। কি আশ্চর্য্য! একটা বড় বড় বাড়ী খোঁজা হচ্ছিল, আর পাওয়া গেল এখানেই।'

রেখার কান্না আরো বেড়ে গেছে, বলেছে—'নিশ্চয়ই তার আত্মা সবাইকে এখানে নিয়ে এসেছে। সে যে সবার জন্ম কত ভাবত।'

নেপালে গিয়ে বড়দা হরিনাথ মেজবৌ রেখাকে মাছ মাংস সব খাবার অনুমতি দিয়েছে, পোষাকেও কান বৈষম্য রাখতে দেয়নি। শবু ভাবে, এ একদিক থেকে ভালই হয়েছে, সব ব্যাপারে আলাদা করে রেখে পদে পদে দুর্ভাগ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি লাভ? কপালের সিঁথির যে চিহ্ন মুছে গেছে, শাঁখা নোয়া আলতার যে শোভা ঘুচে গেছে তার ত আর করার কিছু নেই। তাই এই ব্যবস্থাই ভাল।

শবুর ভাগ্যেই বা কি আছে কে জানে। মানুষটা টিবি হয়ে হাসপাতালে আছে সেখান থেকে সুস্থ হয়ে না ফেরা পর্য্যন্ত তার মনে শান্তি নেই।

মনের এই অবস্থায় একদিন ভর দুপুরে একজন বুড়োমত লোক এসে কান্নাকাটি জুড়ে দিল—

'আমার একমাত্র রোজগেরে ছেলের টিবি হয়েছে। আপনারা আমাকে কিছু সাহায্য করুন, ছেলেটাকে বাঁচাতে না পারলে আমার সংসারটা ভেসে যাবে।'

করুণায় গলে গিয়ে শবু তাকে নিজের সামান্য পুঁজি থেকে পাঁচটা টাকা বের করে দিল। বুড়ো মানুষটা আশাতিরিক্ত প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে বারবার শবুর কল্যাণ কামনা করতে করতে চলে গেল। ভর বাড়ীতেই ছিল লোকটা চলে যেতে বলল—

'মেজবৌদি, তোমাকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে গেল ত?'

শবু কোন জবাব দেয় নি। তার স্বামীর টিবি হয়েছে, অপরের ঐ কঠিন

অসুখ করেছে শুনে সে কি স্থির থাকতে পারে? তার জন্য কেউ তাকে বোকা বলুক আর যা-ই বলুক সে গায়ে মাখবে না।

দুই

শেষে বাবা কাশীনাথ সোনাকে নিয়ে পাকিস্তান থেকে ফিরেছেন। ক'দিন ধরে বাড়ীর সবাই মুঠো মুঠো করে কাঁচাগোল্লা খাচ্ছে আর সোনার মুখে গ্রামের গল্প শুনছে।

বাবা কাশীনাথ একসময় বললেন—'তোমরাই সব খেয়ে ফেলোনা হে, যে কদিন ভাল থাকে আমি রোজ একটু করে খাব।'

বাবা মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসেন, তাঁর বালিশের নীচে বাতাসা-মিছরির মোড়ক প্রায়ই গোঁজা থাকে।

শেফালী বাবাকে আশ্বস্ত করে বলল—'আপনার জন্য আলাদা করে রেখেছি।'

সোনার মুখে গ্রামের গল্প শুনতে শুনতে বীণা প্রচণ্ড উৎসাহে একসময় বলল—'চল শ্রাবণী চল রেখা, আমরা একবার সবাই মিলে গ্রাম থেকে বেড়িয়ে আসি। সেখানে বাড়ীর পাশেই নদী, কত মাছ, বারোয়ারী কালীপুজো, মেলা। গোয়ালপাড়ার ভাল ভাল দই মিষ্টি, কুমোর পাড়ার মাটির হাঁড়ি কলসি, কাঁসারীপাড়ার সুন্দর সুন্দর কাঁসার থালা বাটি গেলাস

বৌ বলল—'না বাবা, আমার ভয় করে। ওখানে নাকি কি সব মারামারি কাটাকাটি হয়। আপনার মত শ্বশুরের ভিটে দেখার সৌভাগ্য আমাদের বোধ হয় হবে না।'

সোনা বলল—'ওখানে যায়ে থাকবে কুনঠি? টিপুদা আর আমরা এক এক করে সবগুলো কাঁচাঘর টিনের চালাসহ বিক্রি করিছি। এখন পুরোনো দালানটাই শুধু আছে। গাঁয়ের নতুন মাতব্বর জয়নাল সেটা পুরোনো ইটের দরে কিনতে চাচ্ছিল, দরে পোষালনা বলে বেচা হল না।'

দেড়মাস ধরে গ্রামে থেকে এসে সোনার চেহারায় যেমন একটা গ্রাম্য ছাপ পড়েছে, মুখেও তেমনি দুচারটে গ্রামের ভাষা বেরিয়ে পড়ছে।

রেখা শুধু চুপ করে শুনছিল, এবার সে একটা মোক্ষম কথা বলল—শ্রাবণী, সোনার কি ভাষায় কথা বলছে, অর্ধেকই বুঝতে পারছিনা। এরা

ভাইবোনেরা ত ঐ গ্রামেরই মানুষ, এরাও নিশ্চয় আগে ঐরকম ছিল।'

রেখা শবুর মনের কথাটাই বলেছে।

দুদিন যেতে মঙ্গলা দেবী বললেন—

'কিরে সোনা, তোরা সম্পত্তি থেকে কি লাখ—পঞ্চাশ টাকা নিয়ে এলি তা ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কম বস্তা টাকা আনলি চোখেও দেখলাম না।'

কথাটা যাঁর কানে যাবার তাঁর কানে ঠিকই গেছে। বাবা কাশীনাথ সবাইকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন –

'লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে। সেখানে আর আছেটা কি? অর্ধেক সম্পত্তি প্রায় টিপুই বিক্রি করে দিয়েছে—স্বাভাবতঃ সেও অর্ধেক সম্পত্তির মালিক। তার উপরে পাকিস্তান হয়ে শেখ-মিঞাভায়েরা কি দাম দিতে চায় নাকি—বলে হিন্দুদের ওসব সম্পত্তি এমনিতেই আমাদের হবে। সরকার পাঞ্জাবীদের বেলায় জমির বদলে জমি টাকা সবরকমভাবে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে আর আমাদের বেলায় ঘণ্টা। যাও বা কিছু বেচে, আদায়বাদ করে হাজার দুই টাকা যোগাড় হয়েছিল, দর্শনার চেকপোষ্টে এসে তার অর্ধেকই কেড়ে নিল। এক হুণ্ডি করে আনলে অনেকটাই আনা যায়—কে এখন অত ঝঞ্ঝাট করে

'চেক পোষ্টে কাউকে আড়াই শ টাকার বেশী আনতে দেয় না। দু জন মুসলমান যাত্রী কাছে ছিল, তাদের সঙ্গে বেশী টাকা পয়সা ছিলনা—তারা আড়াইশ আড়াইশ পাঁচশ টাকা পার করে দিল আর আমাদের দুজনের কাছে পাঁচশর বেশী যা ছিল সব কেড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেল।'

মঙ্গলা দেবী বিদ্রুপ করে উঠলেন—একেবারে ন্যায়ের পুত্তুর যুধিষ্ঠীর! টীপু অর্ধেক ভাগের মালিক, সেই সম্পত্তি রক্ষা করতে খাজনা দিতে আমার যে ভাল ভাল সোনা গেল তা কে দেবে? আবার চেক পোষ্টে এসে নিশ্চয়ই সত্যিবাদী যুধিষ্ঠীরের মত আগে ভাগেই বলেছে, আমার কাছে হাজার হাজার টাকা আছে—তখন তারা কি আর ছেড়ে কথা বলবে? এসব জিনিষ লুকায়ে আনতে হয়।'

কাশীনাথ বললেন—'হ্যাঁ, ঐ সব করতে গিয়ে আমাকে জেলে পুরে রাখুক আর কি।' বাবা উকিল হলে কি হবে ওসব ঘোরপ্যাঁচের বুদ্ধি তাঁর মাথায় আসে না।

'জেলে নিয়ে গেলেই হল? যাক না, কতদিন বসে বসে খাওয়াবে খাওয়াক না। কোন কষ্টের না। শেফালী, তোদের বাপকে বল, যা এনেছে

আমার কাছে দিয়ে দিক। না হলে ঐ রসগোল্লা কাঁচাগোল্লা খেয়েই সব টাকা শেষ করবে।'

'আমার যা খুশি তাই করব, কাউকে দেবনা। কেউ কি আমার দেখা শোনা করে, সেবাযত্ন করে? এই যে ছেলেরা শয়ে শয়ে টাকা দেয় আমাকে কি তা থেকে দশ বিশটা টাকাও দেয়? আমি এ টাকা দিয়ে দু পাঁচ কাঠা জমি কিনব। যে টাকা বাঁচবে সেটা আমার ওষুধ পত্তর কেনার জন্য রাখব।'

মঙ্গলা দেবী ফুঁসে উঠলেন—'কোন মুরোদ নেই বলে কিনা জমি কিনবে বাড়ী করবে! বাড়ী করতে কত ট্যাকা লাগে তা জানা আছে? ওখানে দাদা বাড়ী করছে—সেই বলে ফতুর হয়ে যাচ্ছে। কত হাতী গেল তল—ভেড়া বলে কত জল! ভালমানুষের মত টাকাগুলো বের করে দিক, আমি ঐ টাকা দিয়ে গোটাদুই গরু কিনব। রোজ একসের করে দুধের যোগান দিতে মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা লেগে যাচ্ছে। সেটা বাঁচবে, দুধ বেশী হলে গোয়ালাদের কাছে বিক্রি করাও যাবে। ঝিগিরি বাঁদীগিরি করা, ধান সেদ্ধ করা ধান ভানা এ সংসারে এসে আমি কি না করেছি। আমিই গরু দোয়াবো, গরুর দেখাশোনা করব।'

ক'দিন ধরে টাকার ব্যাপার নিয়ে তুমুল কাণ্ড চলতে লাগল, একবার সকালে ঝগড়া চেঁচামেচি, একবার বিকেলে। শেষে বাবা কালীনাথ রণে ভঙ্গ দিলেন। শেফালীও বাবাকে বোঝাল, ঐ কটা টাকায় দু চার কাঠা জমি হয়ত হতে পারে কিন্তু বাড়ী করতে গেলে যে হাজার হাজার টাকা লাগবে তা আসবে কোত্থেকে? তার চাইতে গরু কিনলে বড়দার ছেলে মেয়েরা সবাই দুধ খেতে পাবে, আপনারও দুধ জুটবে, সেজদা হাসপাতাল থেকে এলে সেও দুবেলা দুধ খেতে পারবে।

বুঝলেন তিনি। হাজার হোক লেখাপড়া জানা মানুষ, অবুঝও নন। ওদিকে দেশ গাঁ জমিজমা বাড়ী ঘরদোর সব গিয়ে একটা মাথা গোঁজার জায়গার যে চাহিদা সে আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তাই দিলেন তিনি উপায়ান্তর না দেখে। এক মুঠো নোট বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় ছুড়ে দিয়ে কালীনাথবাবু বললেন—

'নাও হে, ওতে সাড়ে সাতশ না আটশ কত আছে, ঐ নিয়ে যা খুশি কর তোমরা। শ'দুই টাকা আমার কাছে রাখলাম আমার দরকারের জন্য। গরু কেনা হলে আমাকে যেন রোজ দুধ দেয়া হয়।'

মঙ্গলা দেবী শেফালীর হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে আঁচলে বাঁধতে

বাঁধতে বললেন—

'গরু কেনা হোক, তখন কব্জি ডুবায় ডুবায় রোজ দুধ খাওয়াবোনি। আবার ত্রিশ টাকা রেখে দেওয়া হল। ঐ টাকা নিয়ে বুড়্যা শকুন মরুক—ওটাকা তার পিণ্ডি দিতে লাগবে।'

তারপর কদিন ধরে গরু-হাটে খোঁজাখুঁজি ঘোরাঘুরি করে ঝণ্টু আর হাবলুর সাহায্যে মঙ্গলা দেবী বাছুর সহ দুটো গরু কিনে নিয়ে এলেন। একটা দেশীগাই সের দেড়েক দুধ দেয় কিন্তু তার দুধটা বেশ ঘন ও সুস্বাদু। অন্যটা বেশ বড় ভাগলপুরী গাই, তিনসের মত দুধ দেয়—তার দুধটা পাতলা। মঙ্গলা দেবী সবাইকে শুনিয়ে বলতে লাগলেন—

'ঐ কটা টাকায় একটা গরু হয়না, আবার দুটো। শেষে দাদার একগাদা টাকা যোগ করে তবে দুটো গরু কেনা গেল।'

বাবা কালীনাথ শুনে মন্তব্য করলেন—'আমরাও ধানের চালের ভাত খাই। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি দেশী গাইটার দাম তিনশর বেশী হতেই পারে না আর বড়টা কত হবে, বড়জোর পাঁচশ টাকা।'

ঠিক কত দামে গরুদুটো কেনা হল তা মঙ্গলা দেবী কারো কাছে ভাঙলেন না। আর দাদার টাকায় কেনা গরু দাদার বাড়ীতে না গিয়ে এ বাড়ীতে উঠল কেন সে প্রশ্নেরও কোন মিমাংসা হলনা। তা না হোক, এখন বাড়ী শুদ্ধ সবাই দুধ, দুধ ভাত খাচ্ছে—আবার কিছু দুধ মাতুলালয়েও যাচ্ছে। কিন্তু যার মাথায় প্রথম এই গরু কেনার চিন্তা এসেছিল সেই বিশ্বনাথ আর নাই, মেজবৌদি রেখার চোখে নামে গোপন অশ্রুধারা।

এই সব গরু বাছুরের ঝামেলার মধ্যে এসে গেল শবুর জন্মমাস শ্রাবণ মাস—কবে চলে গেল তার জন্মদিন টেরও পেলনা। এখন তার মনে অন্য চিন্তা। হিসেব মত এই ইংরেজী মাস শেষ হওয়ার আগেই দীননাথের তিন-মাস হাসপাতাল বাস শেষ হবার কথা—তখনই সে ফিরে আসবে বলে গিয়েছিল। কিন্তু দিন যায় মানুষটা আর আসেনা—শবু দিন গুণে চলেছে। পয়লা তারিখও গেল, দুই তারিখ বিকেলে দীননাথ তার জামা কাপড় নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এল।

বলল—'গত মাসেই আমার চলে আসার কথা, তার আগে এক্সরে হয়ে গেছে, আমাকে নিয়ে ডাক্তারদের বোর্ডের মিটিং বসল—হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছেড়ে দিতে চাইল। মাঝখান থেকে ডাক্তারদাদা বলল—

ও রেখে চলে যাক, আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি। তারপর দাদা কি বোঝাল জানিনা, আমার আরো তিনমাসের মেয়াদ হয়ে গেল। পরদিন সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন। তিনি বললেন, আপনার দাদাই ত রাখতে বললেন। আমি অফিসের ছুটি, মাইনে, হাসপাতালের টাকা, বাড়ীর অবস্থা সব বলাতে তিনি বললেন—ঠিক আছে, আপনি নিজে লিখে দরখাস্ত করুন আমি ছেড়ে দেব, তবে হাসপাতালের বাকি কদিনের টাকা চুকিয়ে দিয়ে যাবেন আর তিনমাস রেষ্টে থাকতে হবে। সেই সব ঝামেলা মিটিয়ে আজ একেবারে ছুটি করিয়ে নিয়ে এলাম। ডাক্তারদার সঙ্গে ভয়ে আর দেখা করিনি, নিশ্চয়ই খুব রেগে গেছে।'

শেফালী বলল—'সেজদা, তুই যে চলে এলি তোর অসুখ কি সম্পূর্ণ সেরেছে? আবার তিনমাস রেষ্ট লিখে দিয়েছে।'

দীননাথ বলল—'ওটা ওখানকার বাঁধা গৎ, সবাইকেই তাই লিখে দেয়। আসলে আমার টিবিই হয়নি। এ অসুখে কারো মুখ দিয়ে রক্ত পরে, থুথুতে রোগ ধরা পড়ে, জ্বর হয়—আমার সে সব কিছুই ছিল না। সেই একবার প্লুরিসি হয়েছিল তারই কিছু চিহ্ন বোধ হয় এক্সরেতে দেখা গিয়েছিল, বলে দিল টিবি। মাঝখান থেকে ওষুধ খেয়ে খেয়ে আগে মাঝে মাঝে প্লুরিসির জন্য বুকে খচখচ করে যে ব্যথা করত সেটাও সেরে গেছে।'

এ মানুষকে ডাক্তারে আর কি চিকিৎসা করবে, হাসপাতালে থেকে নিজেই ডাক্তার হয়ে ফিরেছে, পারলে সে-ই ডাক্তারদের চিকিৎসা করে। তবু যা হোক স্বাস্থ্যটাত ভাল হয়েছে। আর এতদিনে মানুষটার হুঁশ হয়েছে, নজর গেছে নিজের খাওয়া দাওয়ার দিকে। রোজ সকালে তার জন্য চাই ডিম, একটা ছুটো কলা, ছুবেলা দুধ।

অন্যান্য অনেক সংসারের মত এ সংসারেও দেখা যায় বাড়ীর বৌরা খায় কি না খায় কেউ খোঁজ করে না—তারা ত একবেলা খেয়ে, আধপেটা খেয়ে সকলের পাতকুড়োনি খেয়ে থাকবার জন্যই এসেছে। বৌরা খাবে কম—কাজ করবে বেশী এই যখন সংসারের রীতি তখন শবু নিজের জন্য ভাবেনা। কিন্তু এখন থেকে যেমন করেই হোক সে দীননাথের ভাল খাবারের দিকে, স্বাস্থ্যের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে তার জন্য কোন কিছুই সে গায়ে মাখবেনা। হোক না অনর্থ, ছুনিয়া যাক রসাতলে—সে এ কাজ করবেই, বাকি জীবনে স্বামীর যাতে এ ধরনের কঠিন অসুখ আর না হয় তার জন্য দরকার হলে নিজের জীবন পাত করবে।

দিন পনরো বাড়ীতে থেকে দীননাথ বলল—

'তিন মাস ছুটির দরখাস্ত দিয়েছি, বাড়ীতে সবাই আছে, মিতুকে পৌঁছাতে হবে—মাস দুইয়ের জন্য মন্দির শহর যাওয়া যাক।'

মা বাবাকেও সেকথা বলল। পরে বীণাকে বলল—

'বড়বৌদি, বাড়ীতে এখন অনেক দুধ দু দুটো গরু, মনের আনন্দে সবাই দুধ খেতে থাকুন, আমরা মাস দুই শ্বশুর বাড়ী ঘুরে খেয়ে দেয়ে আরো মোটা হয়ে আসি।'

বীণা করুণভাবে বলল—'যাও ঠাকুরপো', ঘুরে এস। তোমাদের দাদা ত বলে গেছে কলকাতায় বদলির চেষ্টা করবে। আমাদের আর কোথাও যাওয়া হবেনা, এখানেই পচে মরতে হবে। নেপালে আমরা কত আরামে ছিলাম!'

শবু জিজ্ঞেস করল—'পুজোর সময় আমরা কোথায় থাকব?'

দীননাথ বলল—'মন্দির শহরে।'

শবু খুব খুশি—দীননাথের হাওয়া পরিবর্তন হবে, মিতুকে বাড়ী পৌঁছানো হবে, দু'মাস মা বাবার কাছে থাকতে পাবে। আর একটা কথা, গত বছরই মেজবৌদি রেখার সঙ্গে গিয়ে বিজয়া দশমীতে মা দুর্গাকে সিঁদুর পরিয়েছিল. এবারে সেই মেজবৌদিকে রেখে কি করে সে পুজোর আঙিনায় যাবে?

তিন

প্রায় দুবছর পর অনেক ঘাত প্রতিঘাতে পোড় খাওয়া শবু এল বাপের বাড়ী। এই প্রথম শবুর মুখ থেকে বাবা মা শুনলেন, দীননাথের নাকি টিবি হয়েছিল, তিনমাস টিবি হাসপাতালেও কাটিয়ে এসেছে। মা পদ্মিনী দেবী আশ্বাস দিয়ে বললেন—

'ভাল খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম পেলে ভাল হয়ে যাবে। এখন যেরকম স্বাস্থ্য আছে সেটি বজায় রাখতে পারলে আর কোন ভয় নেই।'

দীননাথও খায়দায়, অধিকাংশ সময় বাড়ীতেই শুয়ে বসে থাকে। সকালে কোন কোনদিন সমুদ্রের ধারে আর বিকেলে বা সন্ধ্যায় দুর্গাবাড়ীতে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসে। ওদের এখানকার অফিস ভুবনেশ্বরে উঠে গেছে।

একদিন বীরার সঙ্গে দেখা হতে সে শবুকে বলল—

'কি ব্যাপার রে, তোর বরটিকে দেখলাম খাইয়ে দাইয়ে গোলগাল করে এনেছিস, আর তুই যে রোগা সেই রোগাই আছিস।'

সামাজিক সংস্কারের কথা ভেবে শবু অসুখের কথা বলতে পারল না, তা সে এককালের যত নিকট বন্ধুই হোক। এ অসুখকে লোকে যমের মত ভয় করে, ধারে কাছে ঘেঁষে না। কথা ঘোরাবার জন্য বলল—

'থাক ওসব কথা, তোর কথা বল। তোর বিয়ের খবর কি? দিদির বিয়ে হয়েছে?'

হীরা বলল—'না, কোন কিছুই হয়নি। আমি এবারে বিএ পাশ করে বসে আছি, মাষ্টারীর জন্য চেষ্টা করছি।'

এদিকে বাড়ীতে নন্দু আর মিতুর সমস্যা একই রকম রয়ে গেছে। নন্দু আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, ডাকলেও কোন সাড়া দেয় না। শুধু খিদে পেলে মা ডাকটা শোনা যায়, না হলে চুপচাপ শুয়ে বসেই থাকে। শবু বার বার নন্দুর কাছে যায়, কথা বলে, হেসে গান শুনিয়ে ওর মুখ থেকে একটা কথা বের করতে চায় কিন্তু পারেনা। একবার এরকম সময় বড়কাকীমা ঘরে এলে শবু জিজ্ঞেস করল—

'নন্দু বলতো কে এসেছে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নন্দু বলল—

'তল জন'। বলে খিল খিল করে হেসে উঠল।

উত্তর শুনে সবাই অবাক! উপর নীচে দুটো আলাদা সংসার, আলাদা হেঁসেল। স্থানীয় ভাষায় নীচের বাসিন্দাদের বলে 'তল জন'! সে সব ত বোঝে, বুদ্ধিসুদ্ধি তবে ঠিকই আছে। তবু কেন কথা বলে না, দিন দিন কেন রোগা হয়ে যাচ্ছে!

মিতুটারও অপারেশন সত্ত্বেও কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। জোরে কথা না বললে তার শুনতে পায় না। এই বয়সেই মেয়েটা খুঁতো হয়ে গেল, কি করে তার বিয়ে দেওয়া যাবে মা ঠাকুমার এখন দিন রাত্রি সেই এক ভাবনা।

মা নন্দুর মঙ্গল কামনায় বার ব্রত উপোষ শুরু করেছেন। মিতুর জন্য সময়ের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। এদের দুজনের কথা উঠলেই মার চোখে জল নামে। বাবা গিরিনবাবুর দুঃখ বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

তার মধ্যেই মা ঠাকুমা শবুর গত দুবছরের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চান।

বুশ বলে—'শোনো মা গো, শোনো ঠাকুমা—কলকাতায় ও বাড়ীতে এ দু বছরে কত কি ঘটে গেল। ভাঙা সংসার জোড়া লাগল, মেজ ভাসুরের বিয়ে হল, আবার সংসার ভাঙল, মেজভাসুর অকালে চলে গেল—মেজবৌদির সব সাধ আহ্লাদ ঘুচে গেল, ওর টিবি হল, হাসপাতালে গেল, এখন বড় ভাসুরের চেষ্টায় সবাই একখানে থেকে সংসারটাকে বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে, যদিও মণী ঠাকুরপো এখনো আলাদা থাকে। এত সবের মধ্যেও শাশুড়ী ঠাকরুনের মুখ একটুও কমে নি। কথায় কথায় খোঁটা দেন—বৌদের জন্যই নাকি তাঁর জোয়ান জোয়ান ছেলেরা কেউ মারা যাচ্ছে কেউ টিবি হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে। বৌদের কি দোষ—না, তারা সন্ধ্যের সময় ঘরে প্রদীপ দেখিয়ে অমঙ্গল ডেকে এনেছে। এখনকার বাড়ীটাতে ইলেকট্রিক নেই—সেখানে রোজ সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে ল্যাম্প লণ্ঠন জ্বালতে হচ্ছে, তাতে অমঙ্গল হবেনা? এই শাশুড়ীকেই পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে ঘরে নিয়ে আসার জন্য তোমাদের জামাই আমাকে জোর করে নিয়ে গেল ওদের কে সেই মাম না ধামা তার বাড়ীতে গত বছর জুন মাসে। বৌরা কিছু করলই না, দেবতার মত শ্বশুরকে শাশুড়ী দু চোক্ষে দেখতে পারে না, মায়ে ছেলেতে বনে না, ভাইয়ে ভাইয়ে একমত হতে পারে না—যার যত দোষ বৌদের। গিয়ে তাঁর পায়ে কেঁদে পড়তে হবে?' বলতে বলতে ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে শবু ঝর ঝর করে কাঁদতে থাকে। কান্না জড়ানো গলায় বলে—

'ছেলের কঠিন অসুখ করেছে, তাকে সেবা যত্ন করে ভাল করে তুলতে হবে। আমি কার কাছে চাইব সাহস সান্ত্বনা—তার বদলে দিনরাত চলছে শাপশাপান্ত, বাপান্ত করতেও ছাড়েন না।'

শবু বলে আর কাঁদে, আবার বলে—'আমার বাবাকে নাকি তাঁর বাবা এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারত।'

শুনতে শুনতে মার চোখেও জল নামে, কেঁদে বলেন—'কি যে তোর শাশুড়ী হল, এমনটা কখনো শুনিনি।'

ঠাকুমা দীননাথের কথার জের টেনে বললেন—

'শাশুড়ী নেই পুত আছে, সেই শাশুড়ী বহাল আছে। দোষ করল কে আর ছেলে ঠেঙাচ্ছে তার বৌকে।'

শবু তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'অমন করে বোলো না ঠাকুমা। তোমার নাত-জামাই খুব ভাল, আমাকে কোন কষ্ট দেয় না। ঐ একবারই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে ও রকম করেছিল। আসলে মানুষটা ভীষণ বোকা,

কোন ব্যাপার তলিয়ে বুঝতে পারে না, সব ওপর ওপর দেখে।'

ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা গালে হেসে বললেন—'এই ত দেখছি নাতনীর আমার প্রাণনাথের উপর কতখানি দরদ, কত মমতা। এইটাই ভাল, দুজনের প্রতি এমনি টান না থাকলে কিসের স্বামী-স্ত্রী?'

বাবার উপস্থিতিতে শবু ঠাকুমার ঠাট্টায় লজ্জা পেল। পর মুহূর্তেই বলল—

'জানো ঠাকুমা, আমার শাশুড়ীর কারবার। সব ছেলের এবং শেফালীর-ও কিছু টাকা প্রথমে যার হাতে এসে পড়ে—আমাকে আবার সেগুলো রাখতে দেন। এ খরচ সে খরচের নাম করে সেখান থেকে টাকা নেন, তারই ফাঁকে একবার বলেন, এই নাও ঝণ্টুর আর তার বাপের খাইখরচ ত্রিশ টাকা। বেশ বোঝা যায় বাড়ীর টাকাই হাত ঘুরে ঝণ্টুর খাইখরচ হয়ে আসে। আমি চলে আসাতে মেজবৌদির উপর টাকা রাখার ভার পড়েছে। সে ত আরো বোকা, ত্রিশটাকার রহস্য সেও বুঝবে না। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুন এমন নিপাট ভাল মানুষের মত ভাব করবেন যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। মেজ ভাশুরই ঠিক চিনেছিল—সেইজন্যই তাকে সহ্য করতে পারতেন না। আবার পাকিস্তান থেকে আনা সাত আটশ টাকা দিয়ে দুটো গরু কেনা হয়েছে, উনি বলছেন একটা গরু তাঁর দাদার টাকায় কেনা হয়েছে।'

ঠাকুমা শুনে অবাক হয়ে বললেন—

'বলিস কি শবু! কথায় বলে, কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কক্ষনো নয়। কিন্তু মা ছেলেদের শত্রু হয় একথা তোর কাছে না শুনলে আমার অজানাই থেকে যেত। আমার সত্তর বছরের জীবনে এমনটা কখনো শুনিনি।'

শবু বলল—'শুধু কি তাই? আবার বড় গলা করে বলবেন, ঝণ্টু যে এখানে খায় সে কি অমনি অমনি, তার বাপ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয় তাই খায়। এক এক সময় শ্বশুর মশাই ঠাকরুনের অনুপস্থিতিতে ক্ষোভে দুঃখে বলেন —মাতৃদোষে রাবণ রাক্ষস—বুঝলে বৌমা, ছেলেরা যে সব থেকে থেকে এমন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে সে সবের মূলে আছেন ওদের মাতা ঠাকুরানীটি।'

বাবা গিরিনবাবু পাশে খাটে শুয়ে শুয়ে সব কথা শুনছিলেন, হঠাৎ মন্তব্য করলেন—

'শবুর শাশুড়ীর বোধ হয় হাটবারে জন্ম, তাই কথায় কথায় হাট দেখায়।'

এত দুঃখের মধ্যেও সবাই হেসে উঠল।

ঠাকুমা বললেন—'শুনেছি তোর শ্বশুর বেশী বয়সে দোজবরে বিয়ে করেছিল,

বয়সের ফারাক নাকি ছিল প্রায় কুড়ি বছরের। সে বৌ ত স্বেচ্ছাচারিণী হবেই—বয়সের একটা প্রভাব থাকবে ত। তার উপরে আবার দেওয়ানের মেয়ে বলে কথা।'

মা বললেন—'সে কথা বলবেন না, আমার দিদিও দোজবরে শ্বশুরঘর করল—এ রকম ত নয়।'

ঠাকুমা বললেন—'তাদের বয়সের অতটা পার্থক্য নেই।'

ব্যাপারটার কোন মিমাংসা হয় না। এমন একটা সৃষ্টিছাড়া মাতৃ-কথা-শাশুড়ী চরিত্রের তুলনা বা ব্যাখ্যা কোন রামায়ণ মহাভারতে লেখা হয় নি।

হাটবারে জন্ম কথাটা এখন এ বাড়ীতে হাসির খোরাক হয়েছে। কানাইয়ের বয়স এখন ন দশ বছর, ক্লাশ সিক্সে পড়ে। এক নম্বরের দুষ্টু হয়েছে, এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারে না। এই তপুকে মেরে কিম্বা তার খেলনা কেড়ে নিয়ে কাঁদাচ্ছে, শঙ্খকে ধরে টানাটানি করছে, পারলে জামাইবাবুর সঙ্গেই একহাত কুস্তি লড়ে। ওর একমাত্র আদর্শ ওর শ্রীলাদি, সে এখন ক্লাশ টেন এ পড়ে। শ্রীলা ক্লাশের লীডার, সামনের সরস্বতী পূজোয় সে হবে সেক্রেটারী। কানাইয়ের চোখে শ্রীলা এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব, বলে—কজন মেয়ে শ্রীলাদির মত ক্লাশের লীডার, স্কুলের লীডার হতে পারে?

সেই কানাই মা ঠাকুমার মুখে বাবা—মার জীবনের অনেক অতীত ঘটনার কথা শুনেছে। তাই গিরিনবাবু আজকাল ছেলেকে শাসন করতে হলে আগে নিজের মাকেই সাবধান করে দেন—মা, তুমি কিছু বলবে না। কারণ এ রকম সময় অনিবার্যাভাবেই ঠাকুমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—তোরাও ঐ রকম ছিলিরে।

মা পদ্মিনী দেবীর জন্ম সেই অজ পাড়া গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতে। সেখানে জন্মের সাল তারিখ বার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। শোনা যায় মার জন্ম হয়েছিল কোন এক হাটবারে। কানাই মাকে রাগাবার জন্ম মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে—

'মা, তোমার জন্ম কি বারে?'

মা কানাইয়ের রঙ্গ বুঝে জবাব দেন—'জানিনে বাবা, ছাড়।'

কানাই আবার আদুরে গলায় বলে—'বলনা, কোন হাটবারে তোমার জন্ম—রবিবারের হাটের দিন না বৃহস্পতিবারের হাটবারে?'

সপ্তাহে দু দিন হাট বসে—কোন হাটবারে জন্ম তাও গুলিয়ে গেছে।

আবার কানাই বেশী দুষ্টুমী করলে বা কখন পুরো একটা বেলা বন্ধুদের সঙ্গে খেলে কাটিয়ে এলে মা যখন রাগারাগি করেন, কানাই তখন মার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—

'মা, মামাবাড়ীতে নাকি একটা তোতা ছিল সেটা কী কথা বলত?'

মা বলেন—'তোতা বলত—খুকী কনে গেল, খুকী কনে গেল।'

কানাই খুব সরলভাবে বলে—'মা, তোমার ডাক নাম ত খুকী, তাই না?'

'হ্যাঁ তাই, তাতে কি হয়েছে? তোতাটা আমাকে খুব ভালবাসত, আমিই ওকে দুবেলা খেতে দিতাম।'

কানাই এবারে হাততালি দিয়ে বলে—'না, তা নয়। তুমি এমন পাড়া বেড়ানী ছিলে যে দিদিমা দিনরাত বলত 'খুকী কনে গেল' আর সেই শুনে শুনে পাখীও শিখে গেল 'খুকী কনে গেল'। ভালবাসলে শুধু 'খুকী' নামটাই বলবে, 'কনে গেল' শিখবে কেন? কেমন ঠিক বলেছি কিনা? আর এখন আমি বেড়াতে গেলেই দোষ? পশু পাখী ত আর মিথ্যা বলতে পারে না।

কানাইয়ের ব্যাখ্যা শুনে মা ঠাকুমা শবু সবাই হাসবে না কাঁদবে বুঝে পায় না। এ ছেলেকে কে শাসন করবে? শবু ভাবে, তোতার কথা সেও ছোট বেলায় শুনেছে, তার যে এমন একটা অর্থ হতে পারে তা ওর মনেই আসেনি। কি দুষ্টু হয়েছে ওদের ভাইটা।

কানাই শুনে শুনে সব মনে করে রেখেছে। মামা বাড়ীর গ্রামটা একটু বড় ছিল, সেখানে সপ্তাহে দুদিন হাট বসত। কিন্তু বাবাদের গ্রামে, মানে ঠাকুমার বাপের বাড়ীর গ্রামে কোন হাট বসত না। একবার সে গ্রামের মাতব্বরেরা ঠিক করল তাদের গ্রামেও হাট বসাবে। নাম হবে ফুৎনি গঞ্জের হাট—বসবে শনি ও মঙ্গলবার।

ফুৎনিগঞ্জের পাশের গ্রামেও ঐ দুদিন হাট বসত। এত কাছাকাছি দুটো হাট চলবে কি করে—অত দোকানী অত খদ্দের কোথায়? মাস খানেক চলার পরে ফুৎনিগঞ্জের হাট উঠে গেল—একটা পুরোনো প্রতিষ্ঠিত হাট ছেড়ে নতুন হাটে কে যাবে? অন্য গ্রামের লোকেরা নতুন হাটকে ঠাট্টা করে বলত 'ফুটানী গঞ্জের হাট'। কানাই সে গল্পও জানে।

বাবা সেই কথা তুলে সেদিন মাকে বললেন—

'তোমার ত হাটবারে জন্ম, তোমরাও কি হাটে গরু ছাগল কেনা বেচা করতে নাকি?'

মা-ও ঠাট্টা করলেন, বললেন—'না, সেখানে ফুটানী গঞ্জের লোকেরা কেনা

বেচা করতে আসত। আমার দাদারা কখনো তাদের বোনদের শ্বশুরকে হাটে বিক্রি করতে চায় নি।'

বাবা বললেন—'কানাইয়ের বিয়ে হলে দেখা যাবে তার শ্বশুরের ভাগ্যে কি জোটে।'

ঠাকুমা নিজের বাপের বাড়ী গিয়ে হাসি ঠাট্টা শুনেও মিটিমিটি হাসেন আর চোখ দুটো পিট পিট করেন। শবু ভাবে, ঠাকুমাও শাশুড়ী আর মঙ্গলা দেবীও এক শাশুড়ী। সবই ভাগ্য!

দুর্গা পূজা এসে গেল। দীননাথ এবার শিং ভেঙে বাছুর হয়ে মিত্তবর ভিক্টরদের দলের একটা নাটকে পার্ট নিয়েছে—সে হবে এক মস্তান। তার অনেক দিনের শখ এখানকার দুর্গাবাড়ীতে ছেলের পার্ট করবে, তা পূরণ হবে।

তিনদিন ধরে পূজো হল, অন্যান্য নাটকের সঙ্গে দীননাথদের নাটকও হল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে তাকে ঠিক মস্তানের মতই লাগছিল।

নাটকে পার্ট করার গুণেই হোক আর মস্তানের ভূমিকার জন্যই হোক, কানাই এখন তার জামাইবাবুকে একটু সমীহ করে চলে, কথায় কথায় আর কুস্তি লড়তে যায় না।

বিয়ের পর এই প্রথম শবু বিজয়া দশমীতে মা কাকীমার সঙ্গে মা দুর্গাকে সিঁদুর পরিয়ে এসে পরম তৃপ্তিলাভ করল। দুর্গাবাড়ীতে স্থানীয় সধবাদের সে মিলন মেলায় শবু ছিল যেন এক বয়স্ক শিশু, অধিকাংশ মহিলাই যাদের বন্ধুস্থানীয়া। বড় মাসীও ছিলেন। রেবা কাকীমারা নাকি এখন এখানে থাকেনা, জয়ন্ত কাকার কাজের জায়গায় চলে গেছে। ছোটকাকা ও কাকীমারা আসেন নি, তাঁরা এবার ভুবনেশ্বরের পূজো দেখবেন। বোধ হয় উপর নীচে দুটো সংসার হওয়াতে এখানে আসতে উৎসাহ পান নি। শ্রীলা পূজার ছুটিতে মা বাবার কাছে গেছে।

দু মাস একটানা বাপের বাড়ীতে কাটিয়ে, লক্ষ্মী পূজোর দুদিন পরে শবু আবার চলল শ্বশুর বাড়ী। আরো কিছুদিন থাকা যেত, কিন্তু ওখানে সেই অমাবস্যায় লক্ষ্মী পূজা আছে, বাড়ীতে হৃদিনাথ আর মহী ছাড়া সবাই আছে, তাই কিছু আগ দিয়ে যাওয়া দরকার। দীননাথের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে কোন দুর্বলতা নেই। শবুর শরীর এতদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর দু মাস বিশ্রাম পেয়ে আবার শ্বশুর বাড়ীর ঘানি টানার জন্য প্রস্তুত। এখানে সবাই বেশ ভাল আছে তবু নস্তুর জন্য এক বুক কান্না নিয়ে শবু রওনা হচ্ছে।

মা দীননাথকে বললেন—'বাবা দীনু, এখন থেকে নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিও— সব সময় সাবধানে থেকো। যখন যেমন থাক চিঠি লিখে জানিও। মেয়ে জামাই সুখে থাকলেই বাপ মায়ের আনন্দ। শবু, দীনুর শরীরের যত্ন নিস, নিজের শরীরের প্রতিও নজর রাখিস।'

মিতু কানাই তপু দিদি-জামাইবাবুকে প্রণাম করে বলতে লাগল—'মেজদি আবার আসিস, জামাইবাবু আসবেন।' শবু তপুকে আদর করে মাকে জিজ্ঞেস করল—

'মা, তপুকে স্কুলে ভর্তি করবে না?'

মা বললেন—'আর দুমাস পরে নতুন বছরে ওকে বড়মার স্কুলে ভর্তি করব।'

বাবা মা ঠাকুমা কাকা কাকীমাকে প্রণাম করে শবুরা রিক্সায় উঠে বসল। শবুরা রওনা হবে বলে বাবা ডাক্তারখানায় যান নি, এখন তিনিও আর একখানা রিক্সায় উঠে বসলেন। মা ঠাকুমা দুর্গা নাম স্মরণ করতে রিক্সাগুলো চলতে আরম্ভ করল। শবু পিছন ফিরে মাকে দেখতে লাগল, রিক্সা এগিয়ে চলেছে, পিছনে বাবার রিক্সা কিছুদূর পর্যন্ত এসে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাবা মা আর নন্দুর কথা ভাবতে ভাবতে শবুর চোখ জলে ভরে উঠল।

চার

সংসারে আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছে।

দুমাস পরে শবু শ্বশুর বাড়ীতে এসে দেখল এখানে অবস্থা বেশ ঘোরালো। বড়জা বীণার সে হাসি গান গল্প কিছুই নেই। শবু কথা বলতে গেলে তেমন আমল দিল না, ছেলেমেয়েদের আদর করতে গেলে তাদের নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। মঙ্গলা দেবীর মুখ থমথমে। শেষে শবু শেফালীকে জিজ্ঞেস করল—

'শেফালী, কি ব্যাপার বল ত?'

শেফালী ঠোঁট উল্টে জবাব দিল—'কি জানি বাবা, কিসে যে কি হয়।'

মেজজা রেখাকে জিজ্ঞেস করেও বিশেষ কিছু জানতে পারল না শুধু এই টুকু আভাস পাওয়া গেল শাশুড়ী ও বড় বৌতে জোর মন কষাকষি চলছে।

শুধু বাবা কালীনাথ ঠিক আগের মতই আছেন। হাতে কিছু টাকা পয়সা

আছে, সন্ধ্যের সময় নিজেই বাজার থেকে দু চারটে জ্যান্ত মাছ নিয়ে এসে জল দিয়ে জিইয়ে রাখেন। দুবেলা খেতে বসে বলেন—

'আর একটু ভাত দাও তো বৌমা। আমি ত খাচ্ছি না, ওষুধে আমাকে খাওয়াচ্ছে।'

তিনি একদিকে কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য এ্যাগারস ইমালশন খাচ্ছেন আবার তার সঙ্গে কবরেজী ওষুধ আর থানকুনি পাতার ঝোলও আছে। ভাত চাইতে সময় বলবেন-'এক মুঠ ভাত দাও' কিম্বা আধ মুঠ ভাত দাও।' একটু কম বেশী হলে তাঁর মন ভরে না। বলেন 'বৌমারা ঠিক মত পরিবেশন করতে পারে না—এই ভাত কটা বেশী হল।'

অত কি মেপে দেওয়া যায় না। কি না খেতে পারলে থাক, বাড়ীতে হাঁস আছে গরু আছে খাবে। বাবা অবশ্য রাগ করেন না। এবারে গ্রাম থেকে হুঁকো কলকে নিয়ে এসেছেন. খেয়ে উঠে বলেন—

'সেজ বৌমা, উনুন থেকে চিমটের করে একটু আগুন তুলে দাও ত কলকেটায়, তামাক খাব।'

এককালে নাকি খুব তামাক খেতেন, মাঝখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন দিনে দু চারবার খান। আর অবসর সময় সোনা বা হাবলু কোন ইংরেজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলে সঙ্গে সঙ্গে অর্থটা বলে দিয়ে তাঁর বিছানার পাশে রাখা একটা পুরোনো ইংলিশ—টু—বেঙ্গলী ডিক্‌শনারী খুলে, চশমা নেই তাই চোখের সামনে ধরে ঐ ইংরেজী শব্দটার আর কি কি অর্থ হয় তাই খুঁটিয়ে দেখতে ও বলতে থাকেন। ততক্ষণে প্রশ্নকর্তা হয়ত একটা অর্থ শুনেই সরে পড়েছে তবু তিনি দু চোখ ডিকশনারীর পাতায় আবদ্ধ রেখে কিম্বা চোখ বুজে সেই শব্দ দিয়ে ইংরেজীতে বাক্য রচনা করে চলেছেন।

দেওয়ালীর অমাবস্যা প্রায় এসে গেছে, লক্ষীপুজোর প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। সবাই মিলে কাজে হাত লাগিয়েছে। বড় জা বীণাও। পুজোর আগের সন্ধ্যায় মেজননদ ও ননদাই ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে হাজির হল। এবার আর ননদাই-এর মুখে এক মশারীর গল্প শোনা যাচ্ছে না। আর লক্ষীপুজোর দিন এল বড় ভাসুর হরিনাথ দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে।

পুজো ভালয় ভালয় মিটে গেল। পরদিন ননদ ননদাইরা চলে গেল। হরিনাথ মাঝে মাঝে ছেলে মেয়েদের খোঁজ খবর করছে আর অধিকাংশ সময় বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় বসে সবার চলাফেরা ও কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখছে। ভাইফোঁটা গিয়ে আরও দুটো দিন গেল।

এরপর যা ঘটল সেইরকম একটা কিছুর আশঙ্কা সবু এ কয়দিন ধরে করছিল। আকাশে ঝড়ের সঙ্কেত ছিলই শুধু তা সময় আর সুযোগের আপেক্ষায় থমকে ছিল, এবার তা হুড়মুড় করে এ সংসারটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সকালে চা খেতে খেতে হৃদিনাথ জিজ্ঞেস করল—

'মা, বাড়ীর খাওয়া দাওয়া এত খারাপ কেন? রোজ রোজ পচা মাছ অখাদ্য তরিতরকারি খেয়ে কি কেউ সুস্থ থাকতে পারে?'

মঙ্গলাদেবী বললেন—'এত কম টাকায় এর চাইতে ভাল খাওয়া জোটে না। বাড়ীতে এতগুলো লোক।'

হৃদিনাথ বলল—'আমি পাঠাই তিন শ টাকা, দীনু বোধ হয় দুশর মত দেয়, শেফালীও নাকি পঁচিশ ত্রিশটাকা দেয়। মণীর টাকাতে মোটামুটি বাড়ী ভাড়াটা চলে যায়। স্কুল কলেজের মাইনে বাদ দিলেও অন্ততঃ সাড়ে চারশ টাকা, তাতে সংসার চলে না? এই চাঁপাতলার হাটে ১৫।১৬ টাকায় এক মণ ভাল চাল পাওয়া যায়। এ কদিন যে চালের ভাত খেলাম তা কুকুর বেড়ালেও খায় না। খাবার মধ্যে আছে শুধু গরুর দুধ।'

ভীষণ কথা কাটাকাটি হতে লাগল। এক সময় হৃদিনাথ বলল—

'বাবা, আপনিই বলুন, এ সব জিনিস কি খাওয়া যায়?'

বাবা সোজাসুজি কিছু না বলে, বললেন—'আমার তো আলাদা মাছ তরকারি হয়, তবে তাতে বড় দুর্গন্ধ।'

'আর দীনু, বলতো, এটা কোন ভাল খাওয়া?'

দীননাথ অসুখের জন্য ছ মাস হল সংসারের দায় থেকে মুক্ত। সে বলল—

'আমার ছুটি বেশী পাওনা ছিল না, দুমাস হল পুরো দুশ দিতে পারছি না, পঞ্চাশ টাকা মত কম দিচ্ছি।'

হৃদিনাথ বলল—'তা হলেও এত খারাপ অবস্থা হবার কথা নয়। আগেই আমি চিঠিতে জানতে পেরেছি, এখন কয়দিন ধরে নিজে চোখে সব দেখলাম। ছেলেমেয়েদেরকে না খাইয়ে মেরে ফেলার জন্য এখানে পাঠাইনি, অতগুলো টাকাও নিজে না খেয়ে পাঠাই না। আমি ওদেরকে নিয়ে চলে যাব।'

মঙ্গলাদেবীর সাফ জবাব—'আমি ছেলে মেয়েদের খাওয়াতে জানি না, তোরা সব অমনিই এত বড় হলি। তোদের জন্য আমি গায়ের একটা একটা করে বত্রিশ ভরি গয়না বিক্রি করেছি—এখন ত সে কথা বলবিই।'

হৃদিনাথ বলল—'নিজের ছেলে মেয়েদের খাইয়েছেন, আর কাউকে নয়। তখন যেমন জুটেছে খেয়েছি, এখন যেমন জুটছে তেমন সবাইকে খাওয়াব। প্রথম ছেলেটা হয়ে আপনার দুর্ব্যবহারে অযত্নে অবহেলায় মারা গিয়েছিল সে কথা আমি ভুলিনি। ভেবেছিলাম বিশু মারা গেল, আপনারই এক ছেলে গেল, আপনার মনের পরিবর্তন হবে। কিন্তু তা হয়নি। এখন নতুন ছেলেটা হয়েছে তাকে আমি আপনার হাতে রেখে মরতে দিতে পারি না। আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।'

হৃদিনাথ রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। অফিসে গিয়ে মহীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তার নামে দমদমে একটা অফিস কোয়ার্টারের বন্দোবস্ত করে সেই রাতেই বৌ ছেলেমেয়েদের সেখানে তুলল। মহীও তাদের সঙ্গে সেই কোয়ার্টারেই থাকবে।

আশ্চর্য্য, বাড়ীতে বাবা মা কেউ তাকে বাধা দিল না, বোঝাবার চেষ্টা করল না যে এভাবে আমার জোড়া-সংসার ভাঙা উচিত নয়! দীননাথ থেকে আরম্ভ করে ছোট ভাই বোনেরাও কেউ স্নেহে মমতায় তাদের দাদা-বৌদি ভাইঝি ভাইপোদের আটকে রাখার চেষ্টা করল না। একবার মহীর গোঁয়ার্তুমী ও দীননাথের জেদে সংসারটা ভেঙেছিল—বিশ্বনাথ যতদূর সম্ভব দুজনকে বোঝাবার চেষ্ট করেছিল কিন্তু সফল হতে পারে নি। বড় কাকা-ও যখন সংসার আলাদা করার কথা বলেছিলেন তখন বাবা গিরিনবাবু বেদনায় কোন কথা বলতে না পারলেও প্রবীণ রাখহরিবাবু ও অন্য বন্ধুরা হৈমকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, এখানে তাও হল না। হৃদিনাথ স্ত্রী বীণা, তিন মেয়ে ও কোলের ছেলেটাকে নিয়ে কোয়ার্টারে চলে গেল। অনাথা মেজবৌ রেখা এ সংসারেই পড়ে রইল। হৃদিনাথ দু এক মাসের মধ্যে বদলি নিয়ে দমদমে চলে আসবে।

আর একটা জিনিষ হঠাৎ শবুর মনে এল। এ ঘটনাও ঘটল সেই অমাবস্যা লক্ষ্মীপূজার পরেই। প্রথমবার ছুটিতে এসে এই লক্ষ্মীপুজোর পরেই দিল্লী থেকে দীননাথের বদলীর অর্ডার এসেছিল। দ্বিতীয়বার লক্ষ্মীপুজোর পর মহী সংসারটাকে ভাঙনের মুখে ঠেলে দিল। এবারে স্বয়ং বড় ভাসুর হৃদিনাথ আলাদা হয়ে গেল। শবুর জীবনে এই অমাবস্যা ও লক্ষ্মীপূজা কোন মঙ্গল না এনে শুধু অমঙ্গলই ডেকে আনছে একের পর এক। অথচ মা মঙ্গলাদেবী বলেন, এ বাড়ীতে সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে ও লক্ষ্মীর সামনে প্রদীপ জেলেই নাকি বৌরা বংশের অকল্যাণ করেছে। এ সংসারে যখন শবু এসে

পড়েছে তখন আরো কত মঙ্গল তাকে দেখতে হবে, দেখতে দেখতে হয়ত একদিন তার নিজের জীবনটাই চলে যাবে।

আশ্চর্য্য ব্যাপার আরো আছে। বীণা তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসাতে বাবা কালীনাথ নাতি নাতনীদের পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন, ফোকলা দাঁতে তাদের সঙ্গে হাসি মস্করা করতেন। মঙ্গলাদেবী সেই প্রথমদিনই মাত্র একবার চাঁদের হাটের কথা বলেছিলেন, তারপরে আর বিশেষ তাদের দিকে ফিরেও তাকান নি। কারো অসুখ করলে মৌখিক দু একটা নির্দেশ দিয়ে নিজের দায়িত্ব শেষ করতেন। তিনি কাজের মানুষ, অত আদিখ্যেতা করার তাঁর অবসর নাই।

একমাত্র নাতি—তার অন্নপ্রাশনের কথা চলছিল। বাবার বিছানায় যেমন ভিক্‌শনারী তাঁর সঙ্গী তেমনি একটা পাঁজিও সেখানে থাকে। তিনি সেই পাঁজি দেখে অন্নপ্রাশনের একটা দিনও ঠিক করে ফেলেছিলেন, হয়ত তাঁর অত কষ্টের দুশ টাকা থেকে কিছুটা এ ব্যাপারে খরচ করার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সে সব সাধ আহ্লাদ পড়ে রইল—নাতির অন্নপ্রাশন না হতেই সে নাতি তার বাবা মা দিদিদের সঙ্গে অন্য বাড়ীতে চলে গেল। সেখানে তার অন্নপ্রাশন হবে কিনা তা কেউ জানেনা, অন্ততঃ এই অন্নপ্রাশনের জন্য যে তাদের ধরে রাখা দরকার ছিল তা-ও কেউ ভাবল না।

সংসারটা আবার ভেঙে গেল, সাধের একান্নবর্ত্তী সংসারের আবার কি দশা হল। এ এক অদ্ভুত মায়ামমতাহীন ছন্নছাড়া সংসার!

পাঁচ

সে যা হবার হল। মঙ্গলাদেবীও রাগ দেখিয়ে রিফিউজী কলোনীতে চলে গেলেন—কদিন এলেনই না। ওদিকে দুদিনাথ আর মহী একসঙ্গে বাসা বাঁধাতে মহীর পঁচাত্তর টাকা যে আর মাসে মাসে পাওয়া যাবে না সেটা নিশ্চিত। ফলে পূর্ণ সুস্থ না হতেই সম্পূর্ণ সংসারের দায়িত্ব এবং আর্থিক চাপ একা দীননাথের ঘাড়ে চাপল। ছুটি শেষ হতে সে আবার কাজে যোগ দিয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে হাল্কা কাজে আছে, দেরীতে অফিসে যায় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফিরে আসে। নিজে হাতে হাট বাজার করে। ভাল খাদ্য বলতে যথেষ্ট দুধ খেতে পাচ্ছে আর রোজ সকালে একটা করে ডিম

বরাদ্দ আছে তার জন্য।

মা মঙ্গলাদেবী দিন দশেক পর থেকে আবার এ বাড়ীতে আসা যাওয়া শুরু করলেন। না, দীননাথ এবারে তাঁকে ডেকে আনতে যায়নি, শবুকেও পায়ে ধরে সাধতে বলেনি। শেফালী গিয়ে মাকে বলে কয়ে আসতে রাজী করেছে কিনা জানে না। তবে সেই যে সংসার ফেলে রেখে মঙ্গলাদেবী চলে গিয়েছিলেন এখন তিনি সংসারের দায়িত্বের বাইরেই রয়ে গেলেন। দীননাথ সংসার চালাবার দায়িত্ব হাতছাড়া করল না, তাকেই যখন সব দায় বইতে হবে, সে-ই সব করবে। এখন সংসার শান্তিতেই চলছে। বাড়ীতে বাবা মা, এরা চার ভাইবোন শবু রেখা হাবলু ও উপরি ঝন্টুকে নিয়ে মোট দশ জন লোক, গরু বাছুর চারটিও পোষ্য। রোজগার একমাত্র দীননাথের আর শেফালী কিছু বেশী, চল্লিশ টাকা মত দেবে বলেছে। খাওয়া দাওয়া খুব একটা খারাপ হচ্ছে না; শ্যামা ঝি বহাল আছে।

আরো দুটো মাস কেটে গেছে। শীতকাল—চারদিকে মাঠ ঘাট শুকনো। নীচু ধানী জমিগুলো সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে। গরু দুটোকে মাঠে খুঁটো পুঁতে দড়ি বেঁধে সেই মাঠে চরতে দেওয়া হয়। মঙ্গলাদেবী দুপুরে খাবার খেয়ে ও খাবার নিয়ে প্রায়ই কলোনীতে চলে যান। শবু আর রেখার উপর দায়িত্ব থাকে গরু চরাবার, হাঁসগুলো দেখাশোনা করার। কারণ হাবলু স্কুলে ভর্তি হয়েছে, অন্য সবাই অফিস স্কুল কলেজে যায়। বাড়ীতে থাকে শুধু বাবা কালীনাথ ও দুই ছেলের বৌ।

শবু আর রেখা এক সঙ্গে থাকাতে এত কষ্টের মধ্যেও বেশ মিলেমিশে আছে, ভালই আছে। রেখা তার মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে মোটামুটি যতটা সম্ভব হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করে। দুজনে খাওয়া সেরে শীতের রোদে খোলা মাঠে রোদে ঘাসের উপর বসে গরু দুটোর ঘাস খাওয়া, বাছুর দুটোর নাচানাচি দেখে, নিজেদের মধ্যে গল্প করে। বেশীর ভাগই যার যার বাপের বাড়ীর সুখ দুঃখের গল্প, স্মৃতি। এখানকার সংসারের হাল নিয়েও আলোচনা হয়। পাড়ার দু চারজন বৌ-ঝির সঙ্গেও দেখা হয়, কারো সঙ্গে একটু হাসি, কারো সঙ্গে বা দুটো কথা। ওরা ভাড়াটে বলে বৌ-ঝিরা যেন একটু দূরত্ব বজায় রাখে, কারণ তাদের সব নিজেদের বাড়ী আছে।

শীতের ছোট বেলা। একটু পরেই রোদ পড়ে আসে, দূরে গ্রামের ঘন গাছপালার সামনে একটা কুয়াশায় মেঘ একটু একটু করে আস্তরণ বিছায়।

ওরা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে গরুর খুঁটো তুলে একটু সরিয়ে ইট দিয়ে ঠুকে পুঁতে দেয়। সেই সময় বা বেলা পড়ে আসছে দেখে যখন ওরা গরু দুটোকে দড়ি ধরে বাড়ী আনতে যায় তখন একজন দড়ি ধরে টানে আর একজন একটা কঞ্চি হাতে নিয়ে হেট হেট করে পিছন থেকে গরুকে তাড়া দিতে থাকে। ওদের ভাল লাগে, মজা লাগে—বেশ একটা গ্রাম্য গ্রাম্য ভাব। কিন্তু এক এক সময় বড় মুস্কিল হয়। কখনও দড়ি ছিঁড়ে বা বাড়ী নিয়ে আসার সময় হঠাৎ এক একটা গরু অন্য দিকে ছুট দেয়। তখন বিশেষ করে বড় গরুটাকে ওরা দুজনে দড়ি ধরেও টেনে রাখতে পারে না, হাত ছুটে আরো দূরে চলে যায়। দিশেহারা হয়ে রেখা বলে—

'ভাই শ্রাবণী, চল আমরা বাড়ীর দিকে দৌড় দি।'

শবু বলে—'তারপর? বাড়ীতে ত বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। গরু যদি হারিয়ে যায়? মা এসে আমাদের তুলোধোনা করবে।'

দুজনে গালে হাত দিয়ে আবার মাঠেই বসে পড়ে। কিছু পরে উঠে 'আয়, আয়' বলে গরুর পিছনে হাঁটে আর ঘরে ফেরার মিনতি জানাতে থাকে অসহায়ভাবে।

এমন সময় হয়ত দেখা যায় হাবলু বইখাতা হাতে স্কুল থেকে ফিরছে। সে মাসীদের হাতে বইখাতা দিয়ে একাই দুই গরুকে বাছুর সহ খেদিয়ে বাড়ী নিয়ে আসে। ঐ-টুকু টিঙ্‌টিঙে পুঁচকে ছোঁড়া হাবলু যা পারে ওরা দুই বোতে মিলেও তা পারেনা।

গরু দুটো বাড়ীতে ঢুকলে খড় কেটে তাদের জাবনা মেখে দিতে হয়। গরু দোয়ানর কাজটা মা মঙ্গলা দেবীই করেন, তিনি না থাকলে কাছের এক গোয়ালাকে ডেকে আনতে হয় চার আনার বিনিময়ে।

হাঁসগুলো কোন ঝামেলা করে না, দুটো মর্দ্দা ও চারটে মাদী হাঁস সারাদিন বাড়ীর পিছনে ডোবাটায় কাটিয়ে দেয়, সন্ধ্যে হবার আগ দিয়ে নিজেরাই প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ করতে করতে বাড়ী ঢুকে নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এক পায়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা বেঁকিয়ে পিঠের মধ্যে ঠোঁট দুটো গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। যেদিন ডোবা থেকে উঠতে ভুলে যায় বা দেরী করে, একবার গিয়ে আয় আয় বলে ডাকলেই প্যাঁক প্যাঁক করে গরবিনীর মত শরীর দোলাতে দোলাতে জল থেকে উঠে আসে। হাঁসীগুলোর কল্যাণে দুদিন পর পরই ডিমের ডালনা রেঁধে খাওয়া হয়—প্রত্যেকের ভাগে এক বেলায় আধখানা করে পড়ে।

পৌষ সংক্রান্তি নমো নমো করে পার হল। এ বাড়ীতে মস্ত বড় উঠোন জুড়ে আলপনা দিয়ে পদ্ম, হাতী, লতাপাতা আঁকা হল। সকালে গরু দুটোর শিংএ পায়ের খুরে তেল মাখানো হল, পিঠেও খেতে দেয়া হল। বাছুর দুটোর গায়ে শীত বস্ত্র চাপানো হয়েছে চটের বস্তা—কিন্তু তারা কিছুতেই গায়ে রাখতে চায় না।

সকাল থেকেই জানান দিচ্ছে আজ তেইশে জানুয়ারী। দূরের রাস্তা দিয়ে দলে দলে ছেলে মেয়েরা ভাল ড্রেস পরে ব্যাণ্ড বাজিয়ে মার্চ করে যাচ্ছে আসছে জয় হিন্দ, নেতাজী জিন্দাবাদ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। হাবলুও সকালে তার স্কুলে গেছে নেতাজী জয়ন্তী করতে। আজ সব ছুটি।

সব ছুটি হলেও দীননাথদের কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলোতে ছুটি নেই। তাকে দশটার মধ্যেই খেয়ে অফিস রওনা হতে হল। যাবার সময় মন্তব্য করে গেল—

'এখানে সবার ছুটি, আমাদের ছুটি নেই। আর নেতাজী উৎসব করেই বা কি হবে, নেতাজীর আদর্শ কে মানছে? কিছু লোক নেতাজীর নাম ভাঙিয়ে করে খাচ্ছে, সামনে ইলেকশন আসছে, তখনও তারা ঐ নাম ভাঙাবে।'

শবু ভাবছে অন্য কথা। ঠিক দু বছর আগে এই দিনে মেজদা মেজ বৌদির বিয়ে হয়েছিল, একবছর আগে সাহেব পাড়ার বাড়ীতে এই দিনে কি দুর্যোগ চলছে—মেজো ভাসুর সন্তু মারা গেছে, মেজদা রেখা বিধবা হয়েছে। আজ মেজবৌদির মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না - তার মনেও নিশ্চয় আজ শোকের বন্যা নেমে এসেছে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। এমন স্মরণীয় দিনের কথা এ অবস্থায় কেউ কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারে না, তাতে শুধু বেদনাই বাড়বে। মেজবৌদির মুখ চেয়ে শবু এবার তার বিবাহ বার্ষিকীর কথা মনেও আনেনি।

দীননাথ বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টা পরেই রেখার জামাইবাবু খড়্গপুর থেকে হঠাৎ এসে উপস্থিত হল। রেখার জামাইবাবু বাবা কালীনাথ ও মা মঙ্গলা দেবীকে বলল—

'রেখার চিঠিতে আপনাদের এখানকার সংসারের কথা সব জেনেছি। এখানে একজনের রোজগারে এতগুলো লোকের চলা খুবই কষ্টকর। আমাদের ওখানে কোন ঝামেলা নেই, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরী করি। সেখানে

আমাদের বোনটি বোধ হয় ভালই থাকবে, যদি চার স্কুলের পড়াটা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে. আমরা ওকে সাহায্য করব। আপনারা অনুমতি দিন, আমি রেখাকে নিয়ে যাই। অনেকদিন ধরেই আসব ভাবছিলাম, কিন্তু মাঝখানে পৌষমাস পড়ে গেল। আজ ছুটি আছে, আজই নিয়ে যাই।'

কারো কিছু বলার নেই, আপত্তিই বা করবে কোন মুখে। বাবা মা অনুমতি দিলেন। বাবা শুধু একবার বললেন—

'দীনুটা আবার অফিসে গেছে, সে জানল না মেজোবৌমা চলে যাচ্ছে।'

'আপনারাই বুঝিয়ে বলবেন, তালুই মশাই।'

গোছগাছ আরম্ভ হয়ে গেল। রেখা চোখের জলে শবুকে বলল—

'ভাই, সেজদার অবস্থা ত দেখছি, তার উপরে অনেক বোঝা। নাহলে ভাই শ্রাবণী, তোমাকে ছেড়ে, বাবা আর সোনাকে ছেড়ে আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি নিয়ে যাবার কথাও লিখিনি. শুধু এখানকার অবস্থার কথাই জানিয়েছিলাম। আমি যে দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম সেই দুর্ভাগ্যই আমাকে শশুর ঘর করার সুখ থেকে বঞ্চিত করল। তুমি যেখানেই থাক, আমি যেখানেই থাকি—তুমি আমি কেউ কাউকে ভুলব না।'

শবু বেদনায় রুদ্ধবাক—মুখে কোন কথা সরে না। দুই জা আপন মায়ের পেটের দুই বোনের মত গলা জড়িয়ে ধরে কান্নায় উতলা হয়ে পড়ল। কাঁদছে শেফালী। আর কাঁদছে সোনা—সে যে মেজদাকে খুব ভালবাসত, এখন মেজদা নেই, মেজবৌদিও চলে যাচ্ছে।

কোন রকমে দুপুরের খাওয়া মিটিয়ে শুধু মাত্র বিয়ের বাক্সটি গুছিয়ে নিয়ে বাবা মাকে প্রণাম করে, শবু ও আর সবার কাছে চোখের জলে বিদায় নিয়ে মেজবৌদি রেখা তার জামাইবাবুর সঙ্গে রওনা হল। বাবা কাশীনাথের মুখ দিয়ে বিদায় কালে বুকফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল—'ভগবান! ভগবান!' বেদনাভরা বুকে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়ে শবুরা মেজবৌদিকে রিক্সায় তুলে দিয়ে এল। মঙ্গলা দেবী বিদায় কালে কোন অস্বাভাবিক ব্যবহার করেননি —এ ছাড়া আর কি-বা করার ছিল? তবু রেখা ও জামাইবাবুকে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে এসে শুনতে পেল মঙ্গলা দেবী প্রায় নিজের মনে বলছেন—

'স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে, রেখাকে নিয়ে গেল তাদের ঘর সংসার আগলাতে।'

এমন অবস্থায় কেউ এরকম কথা ভাবতে পারে? শবু শোবার ঘরে গিয়ে

শুয়ে শুয়ে প্রাণভরে খুব কাঁদল। তারপরে ভাবতে লাগল—ভালই হল। এখানে থেকে, যে সংসারে ভাল করে আপন হবারই সুযোগ পেলনা, নাই যেখানে কোন আকর্ষণ বা নাড়ীর টান—সেখানে বারোভূতের সংসার টেনে জীবনপাত করার চেয়ে এই ভাল। সেখানে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় হয়, মন যদি অন্যদিকে যেতে চায়ও তাতেও দোষের কিছু নেই। সেখানে দিদি-জামাইবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় থাকবে, মা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁর সান্নিধ্যও পাবে, মা চলে গেলেও দিদি থাকবে—সেও ত মায়ের মতনই। এখানে শাশুড়ীর মুখ ঝামটা খেয়ে পড়ে থাকার কোন সার্থকতা নেই।

মেজবৌদি রেখা চলে গেল শুধুমাত্র তার ব্যবহারের কাপড় চোপড় আর নিজের গয়নাগুলো নিয়ে। বিয়েতে দেওয়া বাকি সব কিছু এমন কি বিয়ের খাট বিছানা বাসন কোসন পর্যন্ত রয়ে গেল। যতদিন সেগুলো চোখের সামনে থাকবে ততদিন স্মৃতি জাগিয়ে রাখবে মেজদা বিশ্বনাথ ছিল, মেজ-বৌদি রেখা মাত্র দু বছরের হাসি-কান্নার সংসার করে ফিরে গেছে নিঃস্ব, রিক্ত। সে তার আপন দিদি ও মার কাছে সুখে থাক, তার মনে শান্তি নেমে আসুক।

শবু আবার এ বৃহৎ সংসারে একা, এক মরমী মেজদি পেয়েছিল সেও চলে গেল, জীবনে আর হয়ত কখনো দেখা হবে না।

আবার এক বিপদ। বিপদ যে কোন দিক দিয়ে কি ভাবে আসবে কেউ বলতে পারে না।

শীত কমে আসছে, দোল উৎসবও প্রায় এসে গেছে। অন্য দিনের মত কালীনাথ বাবু সন্ধ্যের পর বাজার থেকে নিজের জন্য কয়েকটা জ্যান্ত কইমাছ ও থানকুনির পাতা নিয়ে এসেছেন। একটা নির্দিষ্ট মাটির হাঁড়িতে এখন মাছ-গুলো জিয়োনো হবে।

আগে বাড়ীতে তিন ছেলের-বৌ ছিল—এখন বড় বৌ নেই, মেজও চলে গেছে। না হলে তারাই কেউ মাছ জিয়োনোর কাজ করে দিত। এখন সেজ বৌ একা—তার উপরেই সংসারের বেশী কাজের ভার পড়েছে। তাঁর স্ত্রী ত তাঁর ত্রি-সীমানা দিয়ে ঘেঁষেন না। অবশ্য হাত খালি থাকলে শবু এ রকম সময় এগিয়ে এসে মাছ জিইয়ে রাখে। কালীনাথ বাবু ভাবলেন, সেজবৌমাকে আর কত খাটাবেন, নিজেই করবেন। হাঁড়িটা হাতে করে কলতলায় রেখে কল পাম্প করতে গেলেন। বাড়ীতে লাইট নেই, কলতলাটা

অন্ধকার আবার পিছলও বটে। কল পাম্প করতে গিয়ে পা পিছলে বাবা হুড়মুড় করে পড়ে গিয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। শবু রান্নাঘরে ছিল সেখান থেকে রান্না ফেলে ছুটে এল। অন্দরঘর থেকে মঙ্গলা দেবী ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বললেন—

'দেখ, দেখ, বুড়্যা বুঝি এবার মরে, তোরা গিয়ে মুখে একটু জল দে।'

ততক্ষণে ছেলে মেয়েরাও ছুটে এসেছে। বাবা পা পিছলে পড়ে কলতলার পাকা মেঝেতে দু হাঁটুতে প্রচণ্ড চোট পেয়েছেন, উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। ছেলেরা ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। মঙ্গলা দেবী একবারও কাছে এলেন না, শেফালীকে বললেন—

'জলপটি বেঁধে রাখগে যা, অত চেঁচাবার কি আছে ?'

এক ছেলে গিয়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যথা কমাবার ওষুধ এনে খাইয়ে দিল, দুই হাঁটুতে জল পটিও বাঁধা হল।

দশ বারো দিন বাবা পায়ের ব্যথায় শয্যাশায়ী রইলেন, দুদিন জলপটির পর কবরেজী মালিশ চলেছে এ কয়দিন। শবু শেফালী সোনা ও হাবলু সেবা শুশ্রূষা করেছে, বাথরুম পায়খানা করিয়েছে বেড প্যানের সাহায্যে, হাঁটুতে মালিশ লাগিয়েছে। যন্ত্রণা ও হাঁটু ফোলা কমেছে। কিন্তু প্রথম দিন বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি পায়ের উপর দাঁড়াতে পারছেন না, হাঁটু দুটো সোজা করতে পারছেন না। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে, হাতে ভর দিয়ে ছেঁচড়ে কোন রকমে ভিতরের বারান্দায় এলেন। খবর গেল ডাক্তার ভাগ্নের কাছে।

পড়ে যাবার পনরো দিনের মাথায় ভাগ্নে এসে দেখে বলল—

'বড়মামা, দেখে মনে হচ্ছে কোন ফ্র্যাক্‌চার হয়নি, তবে বুড়ো হাড়ে লেগেছে, সারতে সময় লাগবে। কষ্ট হলেও হাঁটু সোজা করবার চেষ্টা করবেন। আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি, দেখুন যদি কোন উপকার পান।'

ডাক্তার ভাগ্নে চলে গেল। দীননাথ বাড়ীতে ছিল না, অফিসে গেছে তাই তার হাসপাতাল থেকে পালাবার প্রসঙ্গ আর উঠল না। নিশ্চয়ই খুব রেগে আছে, তাই একবারও জানতে চাইল না,—দীনুর শরীর কেমন আছে ?

ওষুধে মালিশে বাবা কালীনাথের কোন উপকারই হচ্ছে না, ফলে তাঁর হাঁটা চলা একেবারে বন্ধ। হামাগুড়ি দিয়ে ছিঁচড়ে শুধু এ ঘর ও ঘর করতে পারেন, স্নানের পর কাপড় পাল্টাতেও লোকের সাহায্য লাগে। বড়ই অসুবিধার মধ্যে আছেন, দেখে কষ্ট হয়।

কষ্ট হয় না শুধু মঙ্গলা দেবীর, তাঁর গলায় অন্য সুর শোনা যায়—

'এখন ভাংড়া খোঁড়া হয়ে আর কতকাল জ্বালাবে কে জানে। ভালই হয়েছে, বাড়ীর বৌরা যে বাটি ভরে দুধ দিচ্ছিল আর কব্জি ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাওয়া হচ্ছিল—ঠ্যাং দুটো থাকলে গায়ে শক্তি হলে কবে হয়ত আমার গলা টিপে ধরত। এখন আর সে মুরোদ নাই। আমার সাফ কথা, খাটের মড়া আমি টানতে পারব না। মরলে আমার হাড়ে বাতাস লাগত।'

এমন স্ত্রী-ভাগ্য খুব কম লোকের হয়। মঙ্গলা দেবী তাঁর স্বামীর কোন কাজই করেন না, সেবা যত্ন ত দূরের কথা। বু কথার হুল ফুটিয়ে চলেন। আর গলা টেপার কথা যদি হয়, দুজনের যা স্বাস্থ্য, স্ত্রী অনায়াসে তাঁর স্বামীকে হয়ত তুলে আছাড় মারতে পারেন। পা অচল হবার আগেও এই রুগ্নস্বাস্থ্য স্বামী তাঁর স্ত্রীকে ধরে ঠেঙাচ্ছেন একথা কেউ দেখলেও বিশ্বাস করত না।

বাবা কাশীনাথের এখন বিছানায় শুয়ে থাকা, হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে বসা, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছু ক্ষমতা নাই। আর সব সময় শবুই তার নীরব শ্রোতা।

ছয়

বাবা কাশীনাথের ইচ্ছা, মেজদা বিশ্বনাথের স্বপ্ন, দীননাথের আশা ও শবুর সাধ বুঝি এতদিনে পূর্ণ হতে চলেছে। বাবা ত সেই পাকিস্তান থেকে টাকা পয়সা কিছু নিয়ে এসেই একখণ্ড জমি. একটা মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। মঙ্গলা দেবীই তাতে বাদ সেধে টাকাগুলো গরু কিনতে খরচ করলেন। যে ছেলেমেয়েরা দুধ খাবে বলে গরু কেনা তারা সব চলে গেছে, গরুর দুধও কমে আসছে আর দু দুটো গরুর খাবার জোটানোও বোঝা হয়ে দেখা দিচ্ছে। জমির কথা সবারই মনে যে আশা জাগিয়েছিল তা পূরণ না হলেও সকলের মনে স্বপ্ন হয়ে ছিল। কিন্তু সংসারের বর্তমান অবস্থায় জমি বাড়ীর কথা কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

আজ সেই কল্পনাই বুঝি বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। দীননাথের হাসপাতালে থেকে চিকিৎসার জন্য যে খরচ হয়েছিল সেই বাবদ এতদিনে অফিস থেকে শ' ছয়েক টাকা পাওয়া যাবে শোনা যাচ্ছে। দীননাথ চাইছে সেই টাকা দিয়ে সে একটু জমি কিনবে।

এদিকে মাসচারেক হল দীননাথের অফিসের সেই কুমর সিং বদলি হয়ে

এসেছে দমদমের এক অফিসে। প্রায় আড়াই বছর আগে তার যে আড়াইশ টাকা বাকি ফেলে রেখে আসা হয়েছিল তার এক পয়সাও শোধ দেয়া হয়নি। কুয়র সিং বাড়ীতে এসে দীননাথের সঙ্গে কথা বলে মাসে মাসে পঁচিশ টাকা করে নিয়ে যাচ্ছে, দশমাসে তবে পুরো টাকাটা শোধ হবে। হাজার হোক বিয়ের সময়কার ঋণ, এ টাকা শোধ না দিলে কি ওরা সুখী হতে পারবে? তবু ত একটা পয়সা সুদ নিচ্ছে না। সিংজী বড় ভালমানুষ, প্রত্যেক মাসের মাইনের পরদিন সকালে আসে, শবুকে 'বৌমা বৌমা' বলে ডাকে, শবুর হাতে তৈরী রুটি চা খেয়ে টাকা নিয়ে চলে যায়। এই নিঃস্বার্থ নিঃসম্পর্কীয় উপকারী বৃদ্ধ লোকটিকে তার ভাল লাগে।

বাড়ীর এই আর্থিক দুর্গতির মধ্যে কুয়র সিং এর মাসে মাসে পঁচিশ টাকা, বাড়ী ভাড়া আশী টাকা--এ দুটো যেন বোঝার মত চেপে বসেছে। অন্য বাসায় যে উঠে যাবে, বাড়ীতে এতগুলো লোক, গরু বাছুর, হাঁস—সে রকম দেখেশুনে তিনখানা ঘরের বাড়ী নিতে গেলেও পঞ্চাশ ষাট টাকার কমে হবে না। খরচের চাপে নাজেহাল অবস্থা। তাই একটুকরো জমি কেনা খুবই দরকার—সম্ভব হলে সেখানে কুঁড়ে ঘর তুলেও থাকা যাবে, বাড়ী ভাড়ার হাত থেকে বাঁচা যাবে। আর সবার উপরে আছে মাটির টান—জমি হবে, ভিটে হবে, বসত বাটি হবে। ভাবতেই শরীরে মনে জাগে পুলক শিহরণ।

এমন সময় দেশে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন শুরু হল। পাড়ার খেলার মাঠেও দু একটা মিটিং হয়ে গেল। বার বার বাসা বদলের ফলে এ বাড়ীর কার কোথায় ভোটার লিষ্টে নাম আছে কেউ খোঁজ রাখেনা। বাড়ীর কারও সে বিষয়ে উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য একখানা খবরের কাগজ রাখা হয়।

বাবা কালীনাথ বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে অনেক সময় ধরে বিনা চশমায় খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়েন। সময় সময় কিছু বিশেষ অংশ যেমন এডিটোরিয়াল শবুকে পড়ে শোনাতে বলেন।

খবরের কাগজ পড়ে বা শুনে তিনি মন্তব্য করেন—

'কেন্দ্রে পণ্ডিতজী আর এখানে বিধান রায়ই জিতবে। এরাই পারবে দেশের উন্নতি করতে।'

দীননাথ তা মানতে রাজী নয়। আলাদা করে একখানা স্বাধীনতা পত্রিকা কিনে পড়ে আর বলে—

'এদের রাজত্বে রিফিউজীদের যে হাল করেছে—শ্রমিক কৃষক রাজ না হলে কিছু হবে না।'

ভোটের ফল বের হতে বাবা বললেন—'যা বলেছিলাম তাই হল তো। আরে চল্লিশ পঞ্চাশটা এম এল এ দিয়ে কিছু হবে না। বৌমা আজকের এডিটোরিয়েলটা একটু পড়ে শোনাও তো। দেখ, কাল যা বলেছিলাম সেই বিষয়ের উপরই আজ এডিটোরিয়েল দিয়েছে।'

শবুর আশ্চর্য্য লাগে বাবা কি করে আগে থেকেই বলে দিতে পারেন। ওদিকে দীননাথের মুখ শুকনো দেখায়। শবুর কষ্ট লাগে। রাজনীতির কথা সে বোঝে না, শ্রমিক কৃষকদের ব্যাপারটা ত মাথায়ই ঢোকে না। তবু না বুঝেও দীননাথের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি জাগে।

একদিন ঘরে বসেই এক বড়সড় নেতা-দর্শনও ঘটে গেল। নেতাকে বাড়ীর সামনে দিয়ে ভর দুপুরের রোদে নিয়ে গিয়ে একটা ক্লাবে বিজয় সম্বর্ধনা জানায়। অসুস্থ শরীরে দীননাথ সেখানে গিয়েছিল। যাতায়াতের পথে সে ছবারই নেতার মাথায় নিজের ছাতা ধরে পাশে পাশে হেঁটে গেছে। সঙ্গে এক দঙ্গল লোক, মুখে তাদের জিন্দাবাদ ধ্বনি। যাবার সময় নেতা বলছিলেন—

'আজ আমাকে ছ সাত মাইল হাঁটিয়েছে, আমি আর পারছি না। আমার এখনও খাওয়া হয়নি।'

সবাই বলাবলি করছিল নেতার নাম নাকি জ্যোতিবাবু। শবু এই প্রথম একজন নেতাকে যার নাম রোজ কাগজে বের হয়, খুব কাছে থেকে দুবার দেখল। বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভব মন্তব্য করল—

'দেখলে বৌদি, সেজদা কেমন রামের ভাই লক্ষ্মণের মত নেতার মাথায় ছাতা ধরে ছিল। ভাসুর ঠাকুরের কল্যাণে এবার তোমাদের ভাগ্য ফিরবেই।'

'আমাদের' 'তোমাদের' কথা শুনে শবুর পিত্তি জ্বলে গেল, বলল—

'তোমাদের আর আমাদের ভাগ্য কি আলাদা?'

আর কেউ দীননাথের পক্ষে না থাকলেও শবু আছে, কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক। তবু জিন্দাবাদ কথাটাতে তার হাসি পায়, কে 'জিন্দা' আর কে 'বাদ' কিছুই বুঝতে পারে না।

মাসদুই ধরে জমির মালিক আর দালালের বাড়ী ঘোরাঘুরি করে জুতোর তলা ক্ষইয়ে দীননাথ একটা জমি কেনা ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু কার নামে জমি কেনা হবে তাই নিয়ে এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। রিফিউজী

লোন ছাড়া বাড়ী তৈরী করা অসম্ভব আর সেজন্য চাই রিফিউজী রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট।

কালীনাথ বাবু বললেন—'আমার নামে জমি কিনতে পার কিন্তু আমার সে সার্টিফিকেট নাই হে। তা ছাড়া শরীরের এই অবস্থায় লোনের জন্য দৌড়োদৌড়িও আমি করতে পারব না।'

'সে সব যা করার আমিই করব, কিন্তু সার্টিফিকেট না হলে ত চলবে না। মা, আপনার সার্টিফিকেট আছে?' দীননাথ জানতে চাইল।

মঙ্গলা দেবী জানালেন—'না, আমার সে সব কিছু নাই।'

দীননাথ বলল—'কটকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে সেখানে আমার রিফিউজী সার্টিফিকেট করাতে হয়েছিল। জমিটা তাহলে আমার নামেই কিনতে হয়।'

বাবা বললেন—'তাই কর। একজনের নামে হলেই হল।'

স্ত্রীর নামে যে জমি কেনা হচ্ছেনা তাতেই তিনি বেশী নিশ্চিন্ত বোধ করলেন যেন। স্ত্রী কবে হয়ত বলে বসবে—আমার বাড়ীতে ঘাটের মড়ার ঠাঁই হবে না, কিম্বা—এ জমি আমার দাদার টাকায় কেনা—যেমন বলেছে গরু কেনার বেলায়।

কিন্তু তাতেও সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। টাকা ত মাত্র শ ছয়েক, এদিকে তিনশ টাকা কাঠা দরে চার পাঁচ কাঠা জমি কিনতে গেলে কম করে হাজার দেড়েক টাকা লাগে। তার উপর দলিল লেখা, রেজিস্ট্রেশন ফী। জমির মালিককে বলে একটা ছোটখাট আড়াইকাঠার প্লট কেনা ঠিক হয়েছে। তবু আরো শ আড়াই টাকা চাই। কুমুর সিংয়ের আগের দেনাই শোধ হয়নি, তার কাছে আর চাওয়া যায় না। শেষে দীননাথ অফিসের সুদখোর মহাজনের কাছে হাত পাতল। সেখানে মাসে সুদ লাগে একশ টাকায় দশ টাকা—সবাই ঠাট্টা করে বলে 'দশশালা বন্দোবস্ত'। সেইভাবেই টাকা যোগাড় করতে হল। দালালের মারফৎ জমির মালিককে ধরতে না হলে হয়ত আড়াইশ টাকা করে কাঠা পাওয়া যেত—ধারদেনাও কম হত।

তারপর এক গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুঘুডাঙার সাব—রেজিষ্ট্রি অফিসে জমির মালিক হাকিমের সামনে টাকা গুণে নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে দলিলে দস্তখত করলে জমি রেজিস্ট্রী হয়ে রেজিস্ট্রার-এর সীলমোহর লাগল—ক্রেতা শ্রী দীননাথ লাহিড়ী—পিতা কালীনাথ, হাল সাকিন গ্রাম-চাঁপাতলা পোঃ—নিমপুর, জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক। সারা বাড়ীতে খুশীর ঢেউ উঠল।

সব থেকে খুশি বাবা কাশীনাথ। রিফিউজী হয়ে দশ বছর ধরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার পর এতদিনে পায়ের নীচে মাটি পেলেন যেন। নেহাৎ পদযুগল বাদ সেধেছে, না হলে তিনি ছুটে যেতেন জমিটা দেখতে। না-ই বা যেতে পারলেন। প্রবল উৎসাহে জমির নক্সা দেখে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি বর্তমান বাড়ীর আঙ্গিনা হাত দিয়ে মেপে মেপে জমির আয়তন বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চিরকাল জমি নিয়ে নাড়াচাড়া করে এসেছেন, জমির মর্ম তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে? হাত দিয়ে মেপে দেখে মাথা নাড়লেন— নাঃ, বড্ড ছোট জমি, এ বাড়ীর মত এতগুলো ঘর হবে না, ঘরগুলো বেশী বড়ও করা যাবে না। এ বাড়ীটা বেশ বড়সড় পছন্দসই ছিল, তার সঙ্গে ঐ ছোট্ট জমিটাকে মোটে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছেনা।

সেদিনই বিকেলে মহা উৎসাহে দীননাথ শবু ও ভাইবোনদের জমি দেখাতে নিয়ে গেল। প্রায় মাইল খানেক দূর, চাঁপাতলা গ্রামেরই আর এক প্রান্তে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে পাঁচ ছটা কাঠি পুঁতে জমিটার একটা আন্দাজ দেওয়া হল—হবু ওভারসীয়ার ভব সাহায্য করল। রাস্তাঘাটের কোন চিহ্ন নেই, সে শুধু নক্সাতেই দেখানো আছে। না থাক, তবু ত নিজেদের জমি, মনের জোরই আলাদা। সকলে জমির চৌহদ্দির মধ্যে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আশেপাশে অনেকটা দূরে পাঁচ সাতটা বাড়ী আছে, পূব দিকটা বহুদূর পর্য্যন্ত ফাঁকা মাঠ—ধানী জমি। সন্ধ্যা নেমে আসতে সবাই খুশি মনে বাড়ী ফিরে এল।

রাতে শুয়ে শুয়ে দীননাথ তার স্বপ্নের বাড়ীর কথা বলতে লাগল—

'বড়দা, মহী আলাদা হয়ে চলে গেল। মেজদা আর নেই। আমরা তিন ভাই একসঙ্গে আছি। আমরা একান্নবর্তী পরিবার হয়ে থাকব। তারজন্য অন্ততঃ তিনখানা শোবার ঘর করতে হবে, রান্না ঘরটা বেশ বড়সড় করতে হবে সবাই একসঙ্গে বসে যাতে খাওয়া দাওয়া করা যায়। যতদিন দুভাইয়ের বিয়ে না হচ্ছে বাবা মার থাকার জায়গার অভাব হবেনা। পরে দরকারে দোতলায় ঘর তুললেই হবে, আমরা নীচের ঘরে থাকব শেষ পর্য্যন্ত—মাটির কাছাকাছি থাকব।

'কিন্তু সবই নির্ভর করছে লোন পাবার উপরে। তারও আগে চাই বাড়ীর প্ল্যান, ইছাপুর থেকে জমির পর্চা বের করতে হবে, পৌরসভা থেকে বাড়ীর নক্সা পাশ করাতে হবে, মিউটেশন হবে। ওদিকে লোন পেতে হলে

আগে নাকি ভিৎ পর্য্যন্ত গেঁথে দেখাতে হবে। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, সময় লাগবে। তোমার আনন্দ হচ্ছেনা?'

শবু মনের আনন্দে বলল—'নিশ্চয়ই, তার জন্য জমিদার মশাইকে এই সেলামী'—বলে স্বামীকে আদর করে চুমু খেল।

দীননাথও আদর করে প্রতিদান দিয়ে বলল—

'আর এটা হল জমিদার গৃহিণীর নজরানা।'

ওদের মনে অদ্ভুত পুলকের আবেশ, দু আড়াই কাঠা জমি কিনে ভাবছে বুঝি দুনিয়াটাকেই কিনে নিয়েছে।

স্বামীর হাতে মাথা রেখে শবুও স্বপ্ন দেখতে থাকে, ঐ জমিটাতে একদিন পাকা বাড়ী উঠবে, নিজেদের বাড়ী। সবাইকে নিয়ে সুখে ঘর সংসার করবে। বাবার কাছ থেকে পাওয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ শবুর মনে-ও যদিও ইতিমধ্যে ছয় ভাইয়ের সংসার তিন ভাইতে এসে ঠেকেছে। পিছনে আছে বাবা গিরিনবাবুর তিক্ত অভিজ্ঞতা। তবু কল্পনা করতে ভাল লাগে। শুধু ভবর মতিগতি কেমন হবে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। আর আছেন অঘটন পটিয়সী মা মঙ্গলা দেবী। সোনাটাকে ভালই মনে হয়।

সাত

অবশেষে সত্যিই একদিন বাড়ী হল। বাড়ী বললে যা বোঝায় ঠিক তা নয়, মূলিবাঁশের বেড়া দিয়ে কাঁচা মাটির মেঝে ও টালির চালা সহ একটি কুঁড়ে ঘর। সেও অত সহজে হয়নি, তার জন্য শবুর অর্দ্ধেক গয়না ঢাকা জুয়েলারীতে টাকা প্রতি মাসে দু পয়সা সুদে বাঁধা পড়েছে। মাঝখানে বর্ষা গেছে, শরৎ ও হেমন্ত চলে গেছে।

প্রথমে দীননাথ দুটো ঘরের ভিৎ গেঁথে রিফিউজী লোনের আশায় হাঁ করে বসে ছিল। কিন্তু এ, আর, ও সাহেবের অফিস থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। সেখানে নাকি টাকার খেলা চলে। দীননাথ টাকার খেলায় নেই, খেলার মত টাকাও তার নেই।

এদিকে একার রোজগারে ন দশজনের সংসার, আশী টাকা বাড়ী ভাড়া মাথার উপর বোঝার মত চেপে বসেছিল। উপায় না দেখে তাড়াতাড়ি এক খানা চালা ঘর তুলে কাছাকাছি অল্পভাড়ায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সব

শুদ্ধ সেখানে গিয়ে ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বর্ষায় আবার জমিতে জল দাঁড়িয়েছিল দেড়ফুট মত। তার থেকে উঁচু করে ঘরের ভিৎ দেওয়া হয়েছে।

কালীপুজোর সময় এসেছিলেন মঙ্গলা দেবীর ছোটভাই শুভ্রাংশু, এদের ছোটমামা, সঙ্গে মামীমা ও ছোটছোট তিন ছেলে। মামীমা একদিনেই শবুকে আপন করে নিয়েছিলেন। একজোড়া সোনার কান পাশা ভাগ্নে বৌ শবুকে দিয়ে বলেছিলেন—

'তোমাকে আমি বৌমা না বলে শ্রাবণীই বলব, কেমন? তোমাদের বিয়ের অনেক আগে জামাইবাবু কাঁথিতে বেড়াতে গিয়ে গল্প করেছিলেন, একটি মেয়ের সঙ্গে মেজ ভাগ্নের বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে মন্দির শহর থেকে কিন্তু তখন মেজ ভাগ্নের বিয়ে হয়নি বলে মেয়েও দেখেন নি তিনি। এখন জামাইবাবুর কাছে শুনছি সেই মেয়েই তুমি।...তোমাদের বিয়েতে আমরা যেতে পারিনি, মেজ ভাগ্নের বিয়েতেও আমাদের আসা হয় নি। এখন মেজ ভাগ্নেও নেই, তার হতভাগিনী বৌকে যে ঐ বেশে কি করে দেখতাম ভাবলে দুঃখে বুক ফেটে যায়।'

মাত্র একদিন থেকে তাঁরা চলে গেছেন। মামীমা বয়সে প্রায় দীননাথের সমান—মামীশাশুড়ীর চাইতে বড়জা বা দিদি বললেই মানায়। মামীমাকে শবুর ভাল লেগেছে।

আর কদিন পরে এসেছিলেন শবুর ছোটকাকা অবিনাশবাবু। তখনও ভাল করে বিকেল হয়নি, বাইরে নিজের নামে ডাকাডাকি শুনে শবু বাইরে এসে আশ্চর্য্য হয়েছিল—

'একি, ছোটকাকা তুমি? কোত্থেকে আসছ?'

'অমন ভূত দেখার মত তাকিয়ে আছিস কেন? আমিই রে, তোর ছোটকাকা। আগে প্রণাম কর।'

কাকার মুখেই শুনেছিল, তিনি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন। বরানগরে ষষ্ঠীতলায় একখানি বাসাও ভাড়া ঠিক করে এসেছেন, মাসখানেকের মধ্যে কাকীমাদের নিয়ে আসবেন ভুবনেশ্বর থেকে।

দীননাথ তখন অফিসে, মা মঙ্গলা দেবীও বাড়ীতে ছিলেন না। ছোটকাকা ঘণ্টাখানেক থেকে, বেয়াই-মশাই কালীনাথবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে ও তাঁর শারীরিক দুরবস্থার জন্য আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে চলে গেছেন।

ছোটকাকা কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছেন, কাকীমাও মাসখানেকের

মধ্যে আসছেন শুনে শবু আনন্দে সে রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। দীননাথকে সে আনন্দের কথা জানাতে সে বলেছে—বেশ ত, ভালই হল, যার বদলে কাকীমাকে এখন হাতের কাছে পাবে—ষষ্ঠীতলা আর কতই বা দূর।

নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে। কলকাতায় এসে প্রথম প্রথম সে দিদি কিন্নুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু এখানে এসে থেকে চাঁপাতলা ও চেৎলা অনেক দূর হয়ে গেছে। তাছাড়া জামাইবাবু সুশীল অফিস—ট্যুইশানি নিয়ে মোটে সময় পায় না, দিদিও দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত।

কাকা-কাকীমারা ষষ্ঠীতলায় এসে থেকে শবু বেশ কয়েকবার সেখানে যাতায়াত করেছে, এখন চাঁপাতলা থেকে ষষ্ঠীতলার পথ তার মুখস্ত।

শবুদের গত বিবাহ-বার্ষিকীতে কাকীমা নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেদিন সারাটা দিন খুব আনন্দে, বেলুড় দক্ষিণেশ্বর বেড়িয়ে হৈ হৈ করে কেটেছে। কাকাকাকীমার বড় দুই মেয়ে শ্রীলা ও এলা আসেনি, তারা মন্দির শহরে বড় জ্যেঠার কাছে থেকে পড়ছে, শ্রীলার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেলে দুই বোন একসঙ্গে আসবে। ওরা না এলেও ওদের আরো দুটি বোন হয়েছে—সাড়ে তিন বছরের নীলা ও একবছরের বেলা। তার উপরে আছে বাবুলাল আর পুটু। সবাই মিলে দিনটা আনন্দেই কেটেছে।

মা-তে কাকীমাতে অনেক মিল, বিশেষ করে ছেলে মেয়ের দিক থেকে। শবুরা চার বোন দুই ভাই, শ্রীলারাও। শবুদের আর এক ভাই ছিল ডাবুলাল কিন্তু সে অল্প বয়সেই চলে গেছে।

ডিসেম্বরের শেষে নতুন বাড়ীতে যাবার প্রস্তুতি চলছে। এই সময় আবার উত্তর বঙ্গ থেকে দিদি জবা স্বামী ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছে। অভাবের তাড়নায় লৌকিকতা কুটুম্বিতা ভুলে দীননাথ জবাকে বলল—

'দিদি, পয়লা জানুয়ারীতে আমরা এই বড় বাসা ছেড়ে দেব। তোরা তার আগ দিয়ে চলে যাস। হাবলু এখানে থাক, স্কুলে পড়ছে পড়ুক।'

দিদিরা চলে গেছে। কাল নতুন বাড়ীতে আর কাছাকাছি কুড়ি টাকা ভাড়ার একখানা ঘরে যাওয়া। রাতেই দীননাথের এল প্রবল জ্বর অর্থাভাব কাজের বোঝা আর মানসিক চাপে তার শরীর ভেঙে পড়েছে।

তবু পরদিন গায়ে জ্বর নিয়ে দীননাথ ভাড়া ঘরখানিতে গিয়ে শয্যা নিল, শবু সেখানে হেঁসেলের হাল ধরল। বাকি সবাই, গরু বাছুর হাঁস নিয়ে উঠল নতুন চালাঘরে—দু বাড়ীর দূরত্ব তিনচার মিনিটের পথ। জিনিষ পত্তর সব

দু বাড়ীতে ভাগাভাগি করে তোলা হল। ঝণ্টু ফিরে গেছে তার বাপের কাছে।

নতুন বাড়ীউলী জিজ্ঞেস করলেন—'নিজেদের নতুন বাড়ীতে উঠলেন, গৃহ প্রবেশের নারায়ণ পূজা করছেন নি?'

মঙ্গলা দেবী অম্লান বদনে জবাব দিলেন—'ওসব আমাদের নাই, পূজা ফুজা করে কি হবে?'

বাড়ীউলী ঠাকুমার কথায় শবুর মনে খটকা লাগল—কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছাড়াই নিজেদের নতুন বাড়ীতে আসা হল, ফল শুভ হবে ত! দীননাথও গায়ে জর নিয়ে এল—কি যে হবে!

দীননাথ জর গায়েই অফিস যাতায়াত করছে, ছুটি বিশেষ পাওনা নেই। শবু মনের দুশ্চিন্তা চেপে রেখে সংসারের সেবা করে চলেছে। এবাড়ীতে রান্না খাওয়ার কাজ সেরে দিনে অন্তত দুবার নতুন বাড়ীতে যায়, একবার খাবার নিয়ে গিয়ে বাবাকে খাইয়ে আসে, পরে গরুর জন্ম বালতি ভর্ত্তি ভাতের ফ্যান নিয়ে। মঙ্গলা দেবীও বসে থাকেন না, সকালে গরু দুটো দুইয়ে দুধ নিয়ে আসেন, সকালের রান্নার যোগাড় করে দিয়েও বাড়ীতে গিয়ে গরু বাছুর দেখা শোনা, হাবলু সোনার সাহায্যে বাড়ীর সীমানা ঘেঁষে বেড়া বাঁধা এসব কাজে লেগে থাকেন।

নতুন বাড়ীতে এসে সব থেকে খুশি মনে হয় বাবা কালীনাথকে। এখন আর শুধু জমির নক্সা নয়, একেবারে খাস জমিতেই তাঁর বাস। মনের আনন্দে হামাগুড়ি দিয়ে জমিটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত আসা যাওয়া করছেন, দুটো ঘরের ভিৎ হাত দিয়ে মেপে মেপে দেখছেন। কুঁড়ে ঘরের মেঝেতে আসন পেতে শবু খেতে দিলে তিনি গভীর তৃপ্তি নিয়ে নিজের বাড়ীতে বসে খাবার আনন্দ অনুভব করেন। খেতে খেতে, খেয়ে উঠে তামাক টানতে টানতে চোখ দুটো বুজে শবুকে দেশের বাড়ীর জায়গা জমির বর্ণনা দেন--

'জান বৌমা, সেখানে বসত বাড়ীটাই ছিল প্রায় তিন বিঘে জমির উপর। রাস্তা থেকে বাড়ীতে ঢুকতে প্রথমে ধান মাড়াইয়ের আঙ্গিনা পাশে গোয়াল ঘর, অন্যপাশে একটা বাগানে সজনে পেঁপে আম এ সবের গাছ, তারপর বার বাড়ীর উঠোনের এক পাশে পুজোমণ্ডপ সেখানে প্রতিবছর দুর্গাপূজা হত, আর এক পাশে আটচালার বিরাট বৈঠকখানা ঘর। একটু এগিয়ে মাঝের আঙ্গিনা বাবার শোবার দালান মেজভাই ছোটভাইএর ঘর দিয়ে তিনদিক

ঘেরা। তারপর ভিতরের আঙিনা বা অন্দর মহল দক্ষিণ দুয়ারী আমার শোবার ঘর উত্তর দুয়ারী হবিষ্য ঘর ও পূব মুখী রান্নাঘর। সব শেষে একেবারে পিছনে গোলাঘর ঢেঁকিঘর কয়েকটা আমগাছ পেয়ারা গাছ কিছু ঝোপঝাড় বেতের ঝাড় গিয়ে মিশেছে গ্রামের নদীর সঙ্গে। সেই নদীতেই স্নান করা বাসন মাজা, আবার নৌকোয় এসে সেই নদীর ঘাট দিয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হয়। রাস্তা থেকে নদীর ঘাট পর্য্যন্ত যেতে—তা ঐ ধর মিনিট তিনই লাগবে—ঠিক এ বাড়ী আর তোমাদের ঐ ভাড়াবাড়ীর মত দূরত্ব হবে।

'এখানে মাত্র আড়াই কাঠা জমি। তা হোক, নিজেদের একটা জমি একটা ঘর হয়েছে ত। এই আমার সুখ, আমার তৃপ্তি। বয়স হয়েছে, শরীরও ভাল নয়—কতদিন বাঁচব জানি না। আশীর্ব্বাদ করি দীনু যেন এখানে একসময় পাকাবাড়ী করে.তোমরা সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার কর। এটাই হবে তোমার শ্বশুরের ভিটে। দীনুই প্রথম আমাকে নিজের ভিটের বাসের আনন্দ দিল, তোমাদের আমি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করি।'...

দেশ বিভাগের পর হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর মত বাবা কালীনাথের-ও মন বাঁধা পড়ে মাটির টানে, তাঁরও ধ্যানজ্ঞান একটা বসত বাটি। তাই আজ হয়েছে পুত্র দীননাথের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে। বাবা তাকে অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন। আর কোন ছেলে আজ পর্য্যন্ত তাঁকে আর যে সুখই দিক, বাস্তুভিটার মুখদর্শন করাতে পারেনি। সবাই সুখে থাকুক।

শবু নিজেও দেখেছে বাস্তুচ্যুত হয়ে ঠাকুমার সে কি বুকফাটা কান্না। কত বছর ভাড়া বাড়ীতে কত কষ্টের মধ্যে সবাইকে কাটাতে হয়েছে। এতদিনে সেখানে নিজেদের নতুন বাড়ী হয়েছে। এখানেও দশবছর ভেসে বেড়াবার পর এতদিনে একটুকরো জমির উপর একখানি কুঁড়ে ঘর হয়েছে এই কি কম? লোকে বলতেই বলে—খাই না খাই নিজের ঘরে পড়ে থাকব—এ ত সেই নিজের ঘর।

বাবার কথা শুনে, তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে শবুর মনের মেঘ একটু একটু করে কেটে যেতে লাগল। মনে পড়ে যায় বিয়ের পর মন্দির শহরে ভাড়া বাড়ীতে গল্পে পাওয়া সেই শিশু-বৃদ্ধের কথা, খেয়ে উঠে নিজের মনে অতীত দিনের কথা বলতে বলতে বিভোর হয়ে যান, শবু নিজের নাওয়া খাওয়ার কথা ভুলে যায়। মনের সেই প্রশান্তি ও ততোধিক তৃপ্তি নিয়ে তিনি আজও স্মৃতির পর্দায় দেশের বাড়ীর ছবি দেখে ও গল্প করে শবুর নাওয়া খাওয়ার কথা ভুলিয়ে দিচ্ছেন। বয়স্ক-শিশু বাবা কালীনাথের মুখে বর্ণনা

শুনে সে যেন চোখের সামনে দেখতে পায় ধানের মড়াই, আম পেঁপে সজনে পেয়ারা গাছে ঘেরা নদীর পাড় ঘেঁষে তিন আঙিনাওয়ালা একটা বিরাট বাড়ী প্রায় তিন বিঘে জমি জুড়ে।

সেই তিন বিঘে এখন আড়াই কাঠায় ঠেকেছে। শবু ভাবে—না-ই বা হল ভিৎ পুজো বা গৃহ প্রবেশের কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, স্বয়ং বাবা কালীনাথ এই ভিটেতে বাস করছেন, তাঁর পায়ের স্পর্শে ও আশীর্বাদে এই কুঁড়েই হয়ে উঠবে শবুর স্বর্গ - সব ভুল ত্রুটি ভগবান মার্জনা করে দেবেন। শাস্ত্রে আছে—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ। যে ভিটেতে শ্বশুরমশাই বাস করছেন সে-ই ত শবুর শ্বশুরের ভিটে, স্বর্গতুল্য। তিনি তৃপ্ত হয়েছেন—পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ। না, আর কোন দ্বিধা সংশয় নয়—ভালই হোক মন্দই হোক, ছোট হোক বড় হোক এটাই শবুর পরম আরাধ্য পুণ্যভূমি শ্বশুরের ভিটে। মনে মনে সে এর প্রতিটি ধূলিকণাকে প্রণাম করে পবিত্রজ্ঞানে। দীননাথ যেমন তার প্রাণনাথ, তেমনি এই ভিটেই হোক তার প্রাণ—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে যেন এই ভিটেতে থেকে শান্তিতে চোখ বুজতে পারে।



পর্ব-৩

এক

না, শবুর মনের সুখ শান্তি তৃপ্তি কিছুই তার নিজের আয়ত্বাধীন নয়। বিশেষ করে যেখানে মঙ্গলাদেবীর মত অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শাশুড়ী বিদ্যমান সেখানে ত নয়ই।

'ঐ বুড়্যা শকুনের সঙ্গে কিছুতেই এক ঘরের নীচে বাস করতে পারব না, থাকলই বা ঘরে আর সব ছেলে মেয়েরা। দিনরাত বিড়বিড় করে প্যাচাল পাড়ছে—এটা তোমার বাপ ভাইয়ের বাড়ী নয়, রীতিমত আমার ছেলের নিজের রোজগারের বাড়ী।'

মাত্র দুটোদিন যেতে না যেতে মঙ্গলাদেবী একেবারে রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। এসব তাঁরই উক্তি।

নাটোরে যে কাঁচা বাড়ীতে থেকে কালীনাথবাবু ওকালতী করতেন সেটা তিনি বিয়েতে যৌতুক পেয়েছিলেন—বড় মেয়ে জবার বিয়েতে সেটা মাত্র নয়শ' টাকায় বিক্রি করতে হয়েছিল। এখন মঙ্গলাদেবীর বাপের দেয়া বাড়ী নেই, গয়নাও নেই—সব এই রাবণের গুষ্টীর পেটে গেছে। তবু তিনি কারো কথা শুনতে রাজী নন। তাঁর দাদা আছে, সেখানে গেলে দাদা তাঁকে মাথায় করে রাখে।

সুতরাং তাঁর এক কথা—'এ বাড়ীতে হয় ঐ মিনসে থাকবে, না হয় আমি থাকব—দুজনে একসঙ্গে কিছুতেই নয়।' উচ্চ স্বরে মঙ্গলাদেবী তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে চলেছেন সময়ে অসময়ে।

এ আবার কি উটকো ঝামেলা, কিছুতেই কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না! শবু ভর দুপুরে দ্বিতীয়বারের জন্য নতুন বাড়ীতে এসেছে ভাতের ফ্যানের বালতি পৌঁছাতে। খানিক আগে বাবাকে খাইয়ে দিয়ে এঁটো পরিষ্কার করে বাসন নিয়ে গেছে। বাবা তামাক টানা শেষ করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছেন। বাড়ীতে আর কেউ নেই, শবুকে আসতে দেখেই মঙ্গলাদেবী গলা চড়িয়েছেন উঠোনে কাজ করতে করতে।

কুঁড়ে ঘর হলেও নেহাৎ ছোট নয়, তিনখানা খাট চৌকি পেতেও মাঝখানে

একটু জায়গা আছে। ছ'জন লোক একটু আঁটোসাঁটো হলেও মোটামুটি চলে যাবার কথা। কথায় বলে—যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন' জন। এখানে ত আস্ত একখানা ঘর, আর মানুষও ন' জন নয় ছ'জন। কিন্তু ঐ যে মঙ্গলাদেবীর এক কথা—স্বামীর সঙ্গে এক ঘরের নীচে বাস করবেন না।

কথাটা শুধু শবুই শুনল না। কদিন ধরে একই কথা শেফালী ভব সোনাও শুনছে, দীননাথের কানেও গেছে।

অসুস্থ শরীর, এদিকে আর্থিক অনটন ধারদেনা—দীননাথ আর কিছু ভাবতে পারে না। কোন উপায় না দেখে গায়ে জ্বর নিয়েও অফিসে যাবার আগে নতুন বাড়ীতে আসার চতুর্থ দিনের সকালে দীননাথ ভবকে বলল—

'তুই এখনই একবার বড়দার কাছে যা। বাড়ীতে এতগুলো লোক তার উপর আবার এই সব ঝামেলা। বড়দা এসে হয় একটা মিমাংসা করে দিক না হয় দুজনের একজনকে নিজের কাছে রাখুক।'

দীননাথ অফিসে চলে গেল। ভব বড়দার সঙ্গে দেখা করতে রওনা হল।

বড়দা হৃদিনাথেরও এখন বিচিত্র অবস্থা। বৌ-ছেলেমেয়েদের মহীর কোয়ার্টারে রেখে হৃদিনাথ নেপাল চলে গিয়েছিল। দু-তিন মাসের মধ্যে বদলি নিয়ে আবার কলকাতায়ও এসেছে। সেখানে মহীর সঙ্গে তাদের সুখে শান্তিতে থাকার কথা। কিন্তু বছর পুরো না হতেই তারা আলাদা হয়ে গেছে, মহী নাকি বলতে গেলে দাদা বৌদিদের বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে। মহী কোয়ার্টার ছেড়ে হোটেল মেসে গিয়ে উঠেছে। কি নিয়ে তাদের অশান্তি হল তাও জানা নেই। হৃদিনাথ কলকাতায় বাসা ভাড়া করে বৌ ছেলে মেয়েদের নিয়ে উঠে গেছে সেই খবরটাই শুধু জানা।

এই ত এদের ভাইয়ে ভাইয়ে এক হয়ে থাকার নমুনা। এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্বপ্নে বিভোর দীননাথ সবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে, শবুও সেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শকে উঁচুতে তুলে ধরতে ভূতের বেগার খেটে চলেছে। কিন্তু সেখানেই কি শান্তি আছে নাকি? মঙ্গলাদেবী কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না।

বড়বৌদি বীণা সেদিন নেপালের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরামের গল্প করছিল। তার না জানি কি অবস্থা। মহী তাদেরকে কলকাতার কোন এঁদো স্যাঁতসেঁতে ঘরে ঠেলে দিয়েছে—ভব এখন সেইখানেই গেল। কালীনাথবাবু ঠিকই বলেন, মাতৃ-দোষে রাবণ রাক্ষস—এ পরিবারে শান্তি নাই।

ফ্যানের বালতি হাতে করে শবু দুপুরবেলা নতুন বাড়ীতে এসেছে ; বাবা খেয়ে উঠে তামাক টানা শেষ করে সবে একটু দিবা নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সে সময় ভবর সঙ্গে হৃদিনাথ এসে উপস্থিত হল। জমি বাড়ীর অবস্থা দেখে তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। বলল—

'কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে দাদু এই জলে ডোবা জমিটা কিনল—টাকাগুলোই সব জলে গেল।'

গত বর্ষায় জমিতে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছিল সে কথা বাড়ীর সবার জানা। বাবা বললেন—

'সে যেমনই হোক, একটা জমি ত হয়েছে। একটু বেশী করে মাটি ফেলে উঁচু করে নিলেই হবে। আর বেড়া দিয়ে টালির চালাঘরখানাও বেশ বড় হয়েছে, তিনখানা খাট চৌকি আলমারী ও এত জিনিষপত্র থাকলেও অনেকটা জায়গা ফাঁকা আছে।'

হৃদিনাথ বলল—'কুঁড়েঘর বাইরে থেকে দেখতেই ভাল লাগে, সেখানে বাস করা কষ্টকর। নাই লাইট নাই জল। আর শুধু জমি উঁচু করলেই হল—রাস্তাঘাট দেখতে হবে না, জল বেরোবার পথ আছে কিনা দেখতে হবে না? আপনারা এসব জিনিষ বোঝেন না।'

বাবা কালীনাথকে যেন বাড়ীর নেশায় পেয়ে বসেছে। বললেন—

'রাস্তাঘাট আজ নেই কাল হবে। জল বেরোবার ব্যবস্থাও মিউনিসিপ্যালিটি নিশ্চয়ই করবে। এক শ হাত দূর দিয়ে ইলেক্ট্রিকের লাইন গেছে, এখানেও একদিন আসবে। আর কুঁড়ে ঘর হল ত কি হয়েছে? তোরাও যে ঘরে জন্মেছিস, বড় হয়েছিস সেও ত মাটির ঘর টিনের চালা ছিল। চলন বিলের কাছে নদীর ধারে আমাদের বাড়ী ছিল—জলের সঙ্গে পরিচয় আমাদের আজন্মকাল। সেবারে সেই পঁচিশ সনের বর্ষায় আমাদের বাড়ীর উঠোনে নৌকো চলেছিল, তুই তখন খুব ছোট, বারান্দা থেকে বড়শীতে মাছ ধরতে গিয়ে জলে পড়ে গিয়েছিলি। অত জলেও আমাদের কিছু হয়নি, এটুকু জলে আমাদের কি করবে?'

শহরে পাকাঘর গড়ার ইঞ্জিনীয়ার হৃদিনাথের পক্ষে এই স্বভাব-সরল, অল্পে-তুষ্ট বৃদ্ধ পিতাকে সব কিছু বোঝানো সম্ভব নয়। তিনি এখন নতুন বাড়ীর মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। অতএব আর বৃথা চেষ্টা না করে হৃদিনাথ এবারে আসল সমস্যায় হাত দিল, জিজ্ঞেস করল—

'এখানে বাবা মা দু জনের একসঙ্গে থাকতে কী অসুবিধে হচ্ছে?'

বাবা বললেন—'কই, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমি কোন সমস্যাও সৃষ্টি করিনি—খাচ্ছি দাচ্ছি, ভালই আছি। শুধু এই পেটের ব্যারামটার জন্যই যা একটু অসুবিধে। তা, খাটা পায়খানা আছে, এরা সব বালতিতে করে জল এনে দেয় তাতেই কাজ চলে যায়।'

মঙ্গলা দেবীর এক কথা—'তুই তোদের বাপের অন্য ব্যবস্থা কর। এ মড়া মরবেও না পথও ছাড়বে না। আমি এখানে একদণ্ডও থাকতাম না—নেহাৎ গরু দুটোর দেখাশোনা, দুধ দোয়ানো আমি ছাড়া হয়না বলে যেতে পারছিনা।'

হৃদিনাথ সব শুনে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপরে বলল—

'বাবা, আপনার বয়স হয়েছে, পা দুটোর জন্য চলাফেরা করতে পারছেন না। কাঁচা ঘরে থাকতে থাকতে আপনার পেটের ব্যারাম ছাড়াও অন্য অসুখ বিসুখ হতে পারে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে বর্ষাকালে হাঁটুজল ভেঙে কোন ডাক্তার এসে আপনার চিকিৎসা করাতে চাইবে না। কিছুদিন নিজের বাড়ীতে বাস হল, এখন আমার ওখানে চলুন—সেখানে নাতিনাতনীদের নিয়ে একটা অন্য পরিবেশে থাকবেন, বড়বৌ আপনার দেখা শোনা করবে, আপনার সব আহ্লাদই পূরণ হবে। এই জানুয়ারীর শীতে বেড়ার ঘরে আপনার কষ্ট হবে।'

'আপনার খাওয়া হয়ে গেছে? আমার হাতেও বেশী সময় নেই। আপনার দরকারী জিনিষপত্তরগুলো আমরা গুছিয়ে নিচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। মা আপনি দীনুকে বলে দেবেন, আমি বাবাকে নিয়ে গেলাম, বাবা এখন আমার কাছে থাকবেন। এ সমস্যার অন্য কোন সমাধান আমার মাথায় আসছেনা।'

চিরশান্ত নির্বিরোধী বাবা কালীনাথের পক্ষেও তাঁর বড় ছেলের এই সমাধান মেনে নেয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। যে প্রবলপ্রতাপান্বিত স্ত্রীভাগ্য তিনি করেছিলেন, তার উপযুক্ত গলাবাজি করার ক্ষমতা যদি থাকত তবে আজ তাঁর এ অবস্থা হ'ত না! অনিচ্ছা সত্বেও মাটির মায়া ছেড়ে তিনি যেতে রাজী হলেন, নাতিনাতনীদের কাছে পেয়ে যদি বাড়ীর আকর্ষণ ভুলে থাকতে পারেন সেটাই হবে তাঁর বৃদ্ধ বয়সের শেষ সান্ত্বনা। বলতে গেলে তাঁর নিজের স্ত্রী তাঁকে ঘর ছাড়া করলেন। বাবার বক্ষভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—এই দীর্ঘশ্বাস কি মঙ্গলা দেবীর পক্ষে মঙ্গলজনক হবে? পারবেন কি তিনি এই বাড়ীঘর নিয়ে একা সুখভোগ করতে? না, বাবা এজন্য কোন অভিশাপবাণীও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন না।

শবু চোখের জলে ভর সোনার সাহায্যে বাবার জিনিষ পত্র সব গুছিয়ে দিয়ে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করল। বাবা কালীনাথও শবুকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেললেন, মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলনা, চোখের জলে তাঁর চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। নতুন বাড়ীতে তিনদিন তিন রাত্রি কাটিয়ে শবুর দেবতুল্য শ্বশুর কালীনাথ বড় ছেলের কোলে চড়ে রিক্সায় গিয়ে বসলেন, বারবার দূর থেকে ফিরে ফিরে কুঁড়ে ঘরটা দেখতে লাগলেন। শবু বুকে জমাট কান্না, চোখে জল নিয়ে বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে সে দেব-মূর্ত্তিকে ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যেতে দেখল।

শবুর শ্বশুরের ভিটের স্বাদ বিস্বাদ হয়ে গেল। ভালমানুষ, মাটির মানুষ ভিটের আকর্ষণ ছেড়ে অনিচ্ছা সত্বেও চলে গেলেন বড় ছেলের কাছে। শবুকে এখন ঘর করতে হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রণচণ্ডী শাশুড়ী ঠাকরুন মঙ্গলা দেবীর সঙ্গে। তার জীবনের চলার পথ দুর্গমতর হয়ে উঠছে। ঋষিতুল্য শ্বশুরের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়ে সে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করছিল সে সুখও কপালে সইল না। এখন নতুন বাড়ীতে একা রাজত্ব করবেন মঙ্গলা দেবী।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার, শ্বশুর কালীনাথ চলে গেলেন হয়ত আর কোনদিন তিনি এ বাড়ীতে ফিরে আসতে পারবেন না—তাঁর বিদায়কালে শাশুড়ী ঠাকরুন মঙ্গলা দেবী একবারও তাঁর কাছে এলেন না, জিনিষপত্রও কিছু গুছিয়ে দিলেন না, প্রণাম করা ত দূরের কথা। তিনি তখন অন্য কাজে এতই ব্যস্ত যে একবার ফিরে তাকাবারও অবসর নেই।

সন্ধ্যায় দীননাথ অফিস থেকে ফিরতেই শবু কেঁদে বলল—

'জান, বড়দা এসে আজ বাবাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় বাবা রীতিমত কাঁদছিলেন, বাড়ীটার উপর ভীষণ মায়া পড়ে গেছিল।'

দীননাথ সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'দুঃখ কোরো না, এই বোধ হয় ভাল হল। বাবা আর মাকে এক ঘরে যে কিছুতেই রাখা যাবে না। যাক্, একটা দিক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি আর পারছি না—শরীর খুব খারাপ লাগছে।'

শবু গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বরে দীননাথের গা পুড়ে যাচ্ছে। দীননাথ আবার শয্যা নিল।

দুই

শবুর মাথায় বুঝি দুর্যোগের পর দুর্যোগ লেগেই আছে। এই সেদিন দীননাথ টিবি থেকে ভুগে উঠল। আর নতুন বাড়ীতে আসার এক বছরের মধ্যে সে দু দুবার টাইফয়েডে ভুগল। আশ্চর্য্য, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় শবুকে টাইফয়েড রোগীর জ্বরের চার্ট আঁকতে হয়েছিল। বাস্তবেও তাকে সেই পরীক্ষা দিতে হল।

বলতে গেলে যেদিন হৃদিনাথ এসে বাবাকে তার বাসায় নিয়ে গেল তার পরেই দীননাথ পড়ল অসুখে। তিন সপ্তাহ ধরে টাইফয়েডে ভুগে হাড় জির-জিরে শরীর নিয়ে অবশেষে সে উঠে দাঁড়াল। মাঝখানে ত জ্বরের ঘোরে সে প্রলাপ বকতে শুরু করেছিল—

'আমি আর বাঁচব না, টিবি রুগীকে রোজ মাছ মাংস ডিম দুধ খেতে হয় আর আমাকে শুধু ডাবের জল বার্লি এই সব খাওয়াচ্ছে। আমি না খেয়েই মরে যাব।...

'ডাক্তার শুধু বার্লি খেতে বলে গেছে? ডাক্তারটা কিছু জানেনা, ওর ডাক্তারী করার লাইসেন্স বাতিল কর।...'

'শ্রাবণী, তোমার আর শাঁখা সিঁদুর পরা হবে না। তোমার কোন সাধই আমি পূরণ করতে পারলাম না শ্রাবণী।...

একবার ত ঘর ভর্ত্তি লোকের মাঝখান দিয়ে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় সে চলল বাথরুমে। শবু কাপড় গামছা নিয়ে ছুটল তার পিছুপিছু, কেঁদে বলতে লাগল—

'ওগো, তুমি কেন এমন করছ? এক ঘর লোকের সামনে দিয়ে তুমি এইভাবে এলে!'

'আর কি হবে? শিবতলা ঘাটে যখন নিয়ে যাবে তখন কি এর চাইতে ভাল পোষাক পরা থাকবে?'

চাঁপাতলায় জমি কিনে থেকেই দীননাথ বলত—এখানে জমি কেনা হল, শিবতলা ঘাটও আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রইল—চাঁপাতলা থেকে শিবতলা সোজা পথ। প্রলাপের ঘোরেও সে সেই কথা বলে চলেছে।

ভয়ে শবুর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঘোর বিপদে সে একমনে মাকে

ডেকেছে আর মনে জোর এনে প্রাণপণে স্বামীর সেবা করেছে। শেষ পর্য্যন্ত সে তার স্বামীকে সুস্থ করে তুলেছে।

পরে সে স্বামীর কাছে অনুযোগ করেছে—'তুমি ওরকম বারবার শিবতলা ঘাটের কথা বলবে না ত।'

দীননাথ বোকার মত লাজুক হেসে বলেছে—'আমার কিন্তু তখন সত্যি মনে হয়েছিল আমি মরে যাব।'

শবুর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস তার শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় থাকবেই। বাবা কালীনাথের 'গণ' নির্ধারণ যদি সঠিক হয় আর সে যদি সতীমায়ের সতী মেয়ে হয় তবে শাঁখা সিঁদুর পরে সে-ই আগে যাবে শিবতলা ঘাটে। এখন তার সামনে একমাত্র সাধনা, স্বামীকে আবার খাইয়ে দাইয়ে সেবায় যত্নে আগের মত সুস্থ সবল করে তুলতে হবে।

এতবড় বিপদের মধ্যেও মা মঙ্গলা দেবী তাঁর কাজ ঠিক করে চলেছেন। নতুন বাড়ীতে আসার চতুর্থ দিনেই তিনি স্বামীকে ঘরছাড়া করেছেন আর দীননাথের অসুখের মধ্যে দাদার ছেলে ঝন্টুকে এনে সংসারে ভর্ত্তি করেছেন।

ভালভাবে সুস্থ না হতেই দীননাথের উপর অফিসের কাজ ও সংসার খরচের চাপ পড়েছে। চৈত্র বৈশাখে জলের অভাবে নতুন বাড়ীতে টিউবওয়েল বসাতে হল। আষাঢ়ে রথের মধ্যে গ্লোব নার্সারী থেকে দুটো নারকেল আর তিনটে সুপুরী গাছ এনে লাগাল, পরে আরো দু একটা সুপুরী ও নারকেলের চারা বসাতে হবে। এল শ্রাবণ মাস, শবুর জন্মমাস। নামল ঘনঘোর বর্ষা। আশপাশের মাঠঘাট ডুবে গিয়ে একরাতে নতুন টালি ছাওয়া ঘরেও জল ঢুকে ভাসিয়ে দিল। হাঁসগুলো বাড়ীর উঠোনেই জল পেয়ে মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে। টিউবওয়েলটা এক হাঁটু জলে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে, নতুন লাগানো নারকেল ও সুপুরীর চারাগুলো কোনরকমে জলের উপরে নাক উঁচু করে আছে। ইঞ্জিনীয়ার হৃদিনাথ ঠিকই বলেছিল, মাটি ফেলে ঘর উঁচু করলেও মাঠের জলের সঙ্গে বহুদিন লড়াই করতে হবে।

সব থেকে অসুবিধে হল গরুবাছুরগুলোকে নিয়ে। অবলা জীবগুলো হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে 'হাম্বা হাম্বা' 'ব্যাঁ ব্যাঁ' করে ডাকছে। অনেক চেষ্টা করে তাদেরকে অসমাপ্ত দ্বিতীয় ঘরের ভিতের উপর তোলা হল। ঠিক হল বড় ভাগলপুরী গাইটাকে বাছুরসহ মাতুলের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হবে—সেটা নাকি তার টাকাতেই কেনা হয়েছিল। ছোট দেশী গাইটার কয়েকমাস পরে

বাছুর হবে, তাই সেটাকে রাখা হবে। বড় গাইটা মাতুলের বাড়ী গেল না বিক্রি হয়ে গেল জানার উপায় নেই।

দীননাথ এসব ব্যাপারে মাথা ঘামায় না।

দীননাথের মাথায় তখন অন্য জিনিষ ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে দুর্গাপূজা লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজাও চলে গেছে। নতুন বাড়ীতে কালীপুজোর রাতে লক্ষ্মীপুজোও হয়েছে। গত বছর দুর্গাপুজোয় শবুর বাপের বাড়ী যাওয়া হয়নি এবারও হ'ল না। দীননাথ তাকে বুঝিয়েছে—

'দেখ, কথামত এ বছর তোমাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাবার কথা, কিন্তু বাড়ী তৈরী টিউবওয়েল বসান অনেক খরচ গেল। বন্ধকের গয়নাগুলো কোনরকমে ছাড়ানো গেছে। ভব সবে ওভারসীয়ারী পাশ করে চাকরি পেয়েছে। সোনা স্কুল ফাইনাল পাশ করে এখানকার কোন পলিটেকনিকে চান্স না পেয়ে আই এস সিতে ভর্তি হয়েছে, সামনের বছর ওকে আবার ওভারসীয়ারীতে ভর্তি করবার চেষ্টা করতে হবে। চাবলুটা স্কুলে পড়ছে। শেফালীর বিয়ের কথা ত ভাবাই যাচ্ছে না। তাই এবার আর বাপের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই—সামনের বছর পুজোয় আমরা দুজনেই যাব, কেমন?'

শবু অবুঝ নয়, বুঝিয়ে বললে সে সব বোঝে। বড় কথা, বন্ধক দেয়া গয়নাগুলো যে তুলে আনা গেছে সেটা কি কম? বলেছে—

'ঠিক আছে, সামনের বছরেই তবে নিয়ে যেয়ো।'

দীননাথ সেই সঙ্গে আরো বলেছে—

'এখন আমার মনমেজাজ ভাল নেই। অফিসে একটা গণ্ডগোল চলছে। যে বছর আমি এখানে বদলি হয়ে আসি তখন আমাকে অন্য কাজে বসিয়েছে আর আমার উপযুক্ত কাজে বাইরে থেকে অন্য লোক আনিয়েছে, কারণ আমার নাকি অভিজ্ঞতা কম, এটা বড় অফিস এইসব বলেছে। এখন একটা নতুন উঁচু পোষ্ট ঐ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সব ব্র্যাঞ্চের জন্যই, মন্দির শহরে আমার যে জুনিয়র আমি চলে আসাতে প্রোমোশন পেয়েছিল তাকে পর্য্যন্ত ঐ নতুন পোষ্টে তুলে দিয়েছে, অন্য সব ব্র্যাঞ্চেও তাই দিয়েছে—অথচ এখানে বাইরের লোককে রেখে আমার প্রোমোশনের পথ আটকে রেখেছে। আমিও দরখাস্ত দিচ্ছি দিল্লীতে,—ও সব বাইরের লোক রাখা চলবে না, মুখ চিনে চিনে অন্য ব্র্যাঞ্চে জুনিয়ারদের প্রোমোশন দেয়াও চলবে না। এর জন্য দরকার হলে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে কে উপযুক্ত লোক বেছে নাও, না

হলে আমাকে সরাসরি প্রোমোশন দিয়ে হয় এখানেই রাখ কিম্বা বাইরে পাঠাতে চাইলে তাতেও রাজী আছি। এটার ফয়সালা না করে আমি অন্য দিকে তাকাতে পারছি না।'

সুতরাং দীননাথের মাথায় এখন দিনরাত অফিস চিন্তা, প্রোমোশনের চিন্তা, এখানকার উপরওয়ালার অন্যায়ের প্রতিকারের চিন্তা। তিন মাস ধরে একনাগাড়ে লেখালেখি করে. লড়াই চালিয়ে জানুয়ারীর প্রথমে দিল্লী থেকে হুকুম আদায় করেছে—সকলকে পরীক্ষায় বসতে হবে, যারা পাশ করবে শুধু তারাই নতুন পোষ্টে প্রোমোশন পাবে। পরীক্ষা হবে সামনের এপ্রিলে। লড়াইতে দীননাথের একরকম জিৎ হয়েছে। ভাবছে পরীক্ষার আগে মাস খানেকের ছুটি নেবে পড়াশুনা করার জন্য।

তার আগেই গত বছরের টাইফয়েডের বর্ষপূর্ত্তির মাথায় দীননাথ আবার অসুখে পড়ল। তিনমাসের লড়াইয়ের মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তাতেই এমন হয়েছে। আবারও টাইফয়েড—তবে পুরো নয়—প্যারা।

পুরো হোক আর প্যারা হোক টাইফয়েড ত বটে। চৌদ্দ দিন ধরে চলল শবুর অক্লান্ত সেবা যত্ন পাশাপাশি চলল ঘর সংসারের কাজও। বাড়ীর আর কেউ বোধ হয় অসুখ নিয়ে এবারে মোটেই ব্যস্ত নয়—সবারই গা সহা হয়ে গেছে। কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত শবুদের বাড়ীওয়ালা ও বাড়ীওয়ালী। বাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোক একদিন বলেই ফেললেন—

'ওহে দীননাথ, তোমার এই সালানা অসুখটা বন্ধ কর ত। হগ্‌গোল লোক ভাইব্যা মরতাছে।' তাঁরই দুশ্চিন্তা বোধ হয় বেশী, কারণ তিনি ও দীননাথ প্রায়ই অবসর সময় দাবা নিয়ে বসেন আর প্রতিবারই তিনি জেতেন। এমন হেরো পার্টি অসুখ হয়ে পড়ে থাকলে আর খেলা হবে কি করে?

বাড়ীউলী ঠাকুমা আবার বললেন অন্যকথা—

'শ্রাবণী গো, আমি কইতাছিলাম কি, তোমার নাকটিরে ফুটা কইরা সোনার একডা নোলক না হয় নাকছাবি লাগাইয়া লও। মাইয়া মানুষের নাকে সোনা থাকলে সেই নিঃশ্বাসে সোয়ামীর হগ্‌গল অমঙ্গল দূর হইয়া যায়। পোলার এত যে বারবার অসুখ করতাছে, আর হইবো না।'

এই বুড়ো বয়সে নাক ফোঁড়ানো, তাতে আবার নোলক পরা! নাক ফোঁড়ানোতে যে প্রচণ্ড ব্যথা লাগবে। তা লাগুক—দীননাথের মঙ্গলের জন্য শবু তার একটা হাতও আগুনে বাড়িয়ে দিতে পারে— নাক ফোঁড়ানো ত সামান্য ব্যাপার।

একদিন বাড়ীউলী ঠাকুমা নিজেই একটা মোটা নূতন সূচ আগুনে পুড়িয়ে শবুর নাকে নোলকের ফুটো করে দিলেন। সূচ ফোটাবার সময় যন্ত্রণায় তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল—কিন্তু সব সে সহ্য করল স্বামীর মঙ্গল কামনায়, মুখ বুজে—যেমন সে শাশুড়ীর সব দুর্ব্যবহার সয়ে যায় শুধু স্বামীর মুখ চেয়ে। একবারো কখনো বলেনি, শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করতে পারব না। তার চোখের সামনে বাবার আদর্শ, সেই একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্বপ্ন।

এমনি করে দু দুটো ঝড় যেন শবুর মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে গত এক বছরে। আশ্চর্য্য হয়ে সে লক্ষ্য করেছে বাড়ীর প্রধান রোজগেরে ছেলে অসুখে পড়ে থেকেছে অথচ বাড়ীর অন্য মানুষগুলো কেমন নির্বিকারে দৈনিক কাজকর্ম খাওয়া দাওয়া করে চলেছে। মঙ্গলা দেবীত সেই সুযোগে ঝণ্টুকে এনে আবার ঢুকিয়েছেন।

প্রথমবারের অসুখ সেরে গেলে একদিন ভব বলেছে—'বৌদি, বাজারে ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীর সামনে দেখে এলাম খুব ভীড়, তার নাকি লাইসেন্স কাটা গেছে এক টাইফয়েডের রোগীকে ভুল চিকিৎসা করে মেরে ফেলেছে বলে।'

কথাটা সে ঠাট্টা করেই বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে দাঁত বের করে হেসেছেও। কিন্তু মনে মনে কি কেউ তা চায় নি? শবুর মনে হয়েছে একদিকে দীননাথ ভাড়া বাড়ীতে রোগশয্যায় পড়ে থেকেছে, ওদিকে নিজেদের বাড়ীতে কুঁড়ে ঘরে আর সবাই কুটিল পরামর্শে মেতেছে—মানুষটা মরে গেলে এই জমিবাড়ীর দখলীস্বত্ব কার হবে?

সে তুলনায় বাড়ীউলী ঠাকুমার সস্নেহ সহানুভূতি ও সাহায্য শবুর মনের বলকে অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। তাঁরই পরামর্শে সে এই বুড়ো বয়সেও নাক ফোটাতে রাজী হয়েছে। যেমন করেই হোক তার স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে হবে, তার পুরোনো স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতেই হবে।

দীননাথ এখন মোটামুটি সুস্থ আছে। তিনমাসের ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। অফিসের পরীক্ষার পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে।

শবুকে দিনে এক দুবার নিজেদের বাড়ীতে যেতে হয়, কাজ থাকলেও যায় না থাকলেও যায়। কিছু গাছপালা লাগিয়ে বেড়া দিয়ে চারপাশ ঘিরে বাড়ীটাকে এখন ছবিতে দেখা গ্রামের বাড়ীর মত সুন্দর লাগে। দীননাথ একদিন গাইবাছুরসহ এই বাড়ীরই একটা ফটো তুলে ফেলল। সবাইকে ফটো দেখিয়ে মনের আনন্দে বলতে লাগল—

'মা কি ছিলেন এটা তারই ছবি। মা কি হইবেন তা পরে দেখা যাবে।'

এদিকে বাড়ীর সবাই শবুর নাক ফুটো করা নিয়ে হাসাহাসি করে। শবু শুধু মিটিমিটি হাসে—সে ত আর শখ করে নাকে ফুটো করেনি। আসল ব্যাপারটা কাউকে বলে না। এ যে একরকম ব্রত পালন—আগেভাগে বলে দিলে যদি ফল পাওয়া না যায়।

তিন

দীননাথ পৌষ সংক্রান্তির পরই অসুখে পড়েছিল। অসুখ সারলেও সে অফিসে যাচ্ছে না, তিনমাস ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বাড়ীতে বসে আছে, একেবারে পরীক্ষার আগ দিয়ে অফিসে যাবে। এই অবসরে একবার মন্দির শহর থেকে ঘুরে আসবে কিনা ভাবছে। ওখানে গেলে পরীক্ষার প্রস্তুতির অসুবিধে হতে পারে মনে করে দোটানায় পড়েছে। কিছু দিনের জন্য হাওয়া পরিবর্তন খুবই দরকার—অসুখের পর স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়েছে।

এমনি সময় একদিন বিকেলে খবর পাওয়া গেল কলকাতায় বড়দার বাসায় বাবা কালীনাথ গুরুতর অসুস্থ—বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ। যে যে অবস্থায় ছিল সব ফেলে রেখে সকলে ছুটল হৃদিনাথের বাসায়। কর্তব্যের খাতিরে মা মঙ্গলা দেবীও চললেন সবার সঙ্গে।

বাবা কালীনাথ শুয়ে আছেন বড় ছেলে হৃদিনাথের ভাড়া বাড়ীর একখানা ঘরে—অচৈতন্য। শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কি না বোঝা কষ্ট নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ। চোখ দুটি বোজা। বেশ কিছুটা বড় হওয়া দাড়িগোঁফে তাঁকে দেখাচ্ছে—যেন সৌম্য শান্ত নির্বিকল্প এক যোগী। ছেলে মেয়ে দুই পুত্র বধু, এক জামাই নাতি নাতনীরা উদ্বেগ আকুল চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, এসেছেন চির অবহেলাকারিণী স্ত্রী মঙ্গলা দেবী, এসেছেন তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ ছোট শালী প্রমীলা দেবী স্বামী পুত্রদের নিয়ে—কিন্তু তিনি এখন একটু একটু করে সকল মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসার বন্ধন কাটিয়ে অন্য জগতের পথে এগিয়ে চলেছেন! অদ্ভুত একটা প্রশান্তি ও সমাহিত ভাব তাঁর মুখখানায় ছড়িয়ে আছে। ছেলে মেয়েরা ডাকছে 'বাবা' 'বাবা' বলে, নাতনীরা কাঁদছে 'দাদু' 'দাদু' বলে—সজ্ঞাহীন কালীনাথের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না—এপারের ডাক ও কান্না বুঝি আর তাঁর কানে পৌঁচচ্ছে

না। শরীরে নেই কোন যন্ত্রণার চিহ্ন, মুখে নেই যন্ত্রণায় প্রকাশ। যেন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন তিনি।

স্থানীয় ডাক্তার আগেই দেখে জবাব দিয়ে গেছে। ছেলেরা কেউ তাদের শ্রদ্ধেয় ও পরম স্নেহশীল পিতাকে কাছেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফোঁড়াফুঁড়ি করাতে রাজী নয়, পরিণত বয়সে যিনি যাচ্ছেন তাঁকে শান্তিতে যেতে দাও। পার্ক সার্কাস থেকে ডাক্তার ভাগ্নে এসে মামাকে দেখে সেই কথাই বলে গেলেন—

'কিছু করার নেই, কোথাও টানাহ্যাচড়া করারও দরকার নেই। বড় মামাকে শান্তিতে যেতে দাও।' ডাক্তার ভাগ্নে চলে গেলেন।

দীননাথ সখেদে বলল—'বাবার আর নিজেদের বাড়ীতে যাওয়া হল না।'

সবারই তাই ধারণা। ডাক্তার ভাগ্নে বলে গেছে, রাত পার দেবে কিনা সন্দেহ। রাত একটু একটু করে বাড়ছে, বাবা কালীনাথের হাত পা হিম-শীতল হয়ে আসছে। বাবার পায়ের কাছে আগুনের মালসা রেখে শেফালী ও শবু হাত গরম করে বাবার পায়ে ঘষে তাঁর পা দুখানিকে গরম করার চেষ্টা করছে। বড়বৌ বীণা শশুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হৃদিনাথ ও দীননাথ বাবার হাত দুটো গরম রাখার চেষ্টা করছে ও মাঝেমাঝে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করছে। মহীও এসেছে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাতদুটো বগলে পুরে বাবার মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। ভব সোনা করবী বাবার দু পাশে বসে গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মঙ্গলা দেবী ছোট বোনের পাশে একটু দূরে মেঝেতে বসে আছেন।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাবা কালীনাথের গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় শব্দ উঠতে লাগল, ঠোঁটের দুপাশ বেয়ে কষ গড়িয়ে পড়ল, বীণা তাড়াতাড়ি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে কষ মুছিয়ে দিল। শ্বাস কষ্ট শুরু হয়েছে। এতক্ষণে মঙ্গলা দেবীকে একটু বিচলিত দেখা গেল, বললেন—

'হৃদি, দীনু—তোরা একটু কানের কাছে মুখ নিয়ে হরির নাম শোনা, হরি নাম কর।'

হৃদি, দীনু, মহী, ভব সোনা সবাই যেন কেমন অসাড় হয়ে গেছে—কানে হরিনাম শোনাবার অভিজ্ঞতা তাদের কারো নেই। শেষে মঙ্গলা দেবী এগিয়ে এসে স্বামীর কানে হরিনাম শোনালেন—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন।'

নাম শুনিয়ে তিনি সরে এলেন। হৃদিনাথ বাবার মুখে দু তিন চামচ জল দিল। আরও কিছু পরে রাত প্রায় ঠিক বারোটায় বাবা কালীনাথের শ্বাস প্রশ্বাস চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল, বালিশের উপর মাথাটা একপাশে ঢলে পড়ল—সব শেষ। এতক্ষণের রুদ্ধ আবেগ এখন সকলের চোখে জলের ধারা হয়ে নেমে এল, কেঁদে আকুল হল শেফালী করবী, বীণা, বধূ ও নাতনীরা কাঁদছে ভব সোনা হাবলুও। চিরসত্যনিষ্ঠ, মৃদুভাষী, নিষ্ঠাবান, সদাপ্রসন্ন শ্রী কালীনাথ লাহিড়ী স্ত্রী-পুত্র কন্যা পুত্রবধূ নাতিনাতনী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হয়ে পরিণত বয়সে সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন।

শোকের বেগ কমে এলে সব যোগাড় যন্ত্র করে রাতের তৃতীয় প্রহরে—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কালীনাথকে তাঁর পাঁচ ছেলে ও অন্য পুত্রস্থানীয় আত্মীয় স্বজনরা নিয়ে শেষ যাত্রায় রওনা হবে নিমতলা শ্মশানের উদ্দেশ্যে। সবে ফাল্গুনের শুরু, পথে নামতেই হঠাৎ ঝিরঝির করে কিছুক্ষণ বৃষ্টি পড়তে লাগল বসন্তের প্রায়-নির্মল শেষ রাতের আকাশ থেকে। দোর্দণ্ড প্রতাপ ছোট শ্যালিকার শোক উথলে উঠল, বললেন—

'আহা, জামাইবাবু মহাপুণ্যবান। আজ শুক্রবার, ফাল্গুন মাস, বসন্তকাল—মধুবাতা ঋতায়তে, শুক্লপক্ষ, সূর্যদেব এখন উত্তরায়ণে—একমাত্র মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা এমন আদর্শ সময়ে মহাপ্রয়াণে যাত্রা করে থাকেন। একমাত্র পুণ্যাত্মা মহাপ্রাণ মানুষের বিদায় কালেই মাতা বসুমতী কাঁদেন তাঁর প্রিয় সন্তানের জন্য, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেন—বসন্তের এই অকাল ঝিরঝিরে বৃষ্টি সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের লক্ষণ। জামাইবাবু ছিল যুধিষ্ঠিরের মত সত্যবাদী, নিরভিমান, নিরহংকার, অজাতশত্রু পুরুষ। আমাদের পরম সৌভাগ্য মাতা ধরিত্রীর এক প্রিয় সন্তানের মহাপ্রয়াণ প্রত্যক্ষ করে আমরা ধন্য হলাম।'

তাঁর কথায় উপস্থিত শোক বিহ্বল সকলের দেহ-মন কোন এক অজানা অনুভূতিতে শিহরিত হতে লাগল—নশ্বর দেহ, দিব্যধাম, বাসাংসি জীর্ণানি—মর্তলোক, সুরলোক, অমৃতলোক সব বুঝি একাকার হয়ে সকলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে অজাতশত্রু কালীনাথের এক দিব্য রূপ—সদাপ্রসন্ন, সদাশান্ত।

মিনিট পাঁচেক পরে বৃষ্টি থামতে সবাই রওনা হল নিমতলার পথে। মেজ ছেলে বিশ্বনাথকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কেওড়াতলা ঘাটে—সেটাও ছিল এক শুক্রবারের রাত, মাঘমাস, সূর্য ছিল উত্তরায়ণে। কেওড়াতলা থেকে নিমতলাও বেশ কিছুটা উত্তরে।

যে যায় সে আর ফিরে আসেনা। সকলের শ্রদ্ধাভাজন পরম সহিষ্ণু কালীনাথ চলে গেছেন, তিনি আর এ জগতে ফিরে আসবেন না। কলকাতায় হৃদিনাথের বাসায় এখন পুরুষ বলতে এক ছোট মেসোমশাই, হাবলু, আর হৃদিনাথের প্রায় তিন বছরের ছেলে পার্থ। বাকি সব মেয়েমানুষগুলো এখানে সেখানে শোকবিহ্বল স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, ছোটরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সবাই অপেক্ষা করছে ঘাট থেকে ফেরার পর করণীয় কাজ করার জন্য। নিস্তব্ধতার মাঝে মাঝে করবী একটু করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে, ছোটমাসী থেকে থেকে তাঁর ভগ্নীপতির গুণকীর্তন করছেন। রাত ভোর হয়ে আসছে, নিঃশব্দ কলকাতার বুকে দূরে দিনের প্রথম ট্রাম চলার আওয়াজ ঘুমন্ত মহানগরীকে নূতন দিনের যাত্রা শুরু করার আহ্বান জানিয়ে গেল। তবু এ বাড়ীর শোকের জড়তা কাটছে না, যে যেখানে বসেছিল সেখানেই নীরবে বসে রইল। সকলেই আপন চিন্তার সাগরে ডুবে আছে।

ভাবছে শবুও। চোখের সামনে অনেক ছবি ভেসে উঠছে, অনেক ঘটনা মনে ভিড় করে আসছে। প্রথমেই মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে এমনি এক শুক্রবারে সন্ধ্যে সাতটায় মেজভাসুর বিশ্বনাথ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেদিন মেজবৌদি রেখার বুকফাটা কান্নায় পাষাণ-হৃদয় মানুষের চোখেও জল নেমে এসেছিল। তার ঠিক তিন বছর একমাস পরে স্ত্রী-উপেক্ষিত বাবা কালীনাথ চলে গেলেন, তাঁর জন্য ছেলে মেয়ে নাতিনাতনী ছেলের বৌরা কাঁদছে, ছোট শ্যালীকাও দুচার ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার স্ত্রী মঙ্গলা দেবীকে একবারও কাঁদতে দেখা যাচ্ছে না। একি সেই অধিক শোকে পাথর যাকে বলে সেই অবস্থা? তাও ত মনে হয় না. স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্ত্তা বলছেন, ঘাট থেকে ফিরলে করণীয় কাজের জিনিষ পত্র ঠিক রাখছেন। কচি বৌ-এর স্বামী হারানোর মত প্রবল কান্নার অভিব্যক্তি এখানে হয়ত আশা করা যায় না, কিন্তু চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনসাথী, জীবন-স্বামীর জন্য যে মমতা দরদ ভালবাসা থাকার কথা তারই বা প্রকাশ কোথায়? বেঁচে থাকতে কোনদিন ভাল মুখে কথা বলতে দেখেনি, মরণের পরেও কোন শোক করতে দেখছে না— তবে এই প্রথম ও শেষ শবু দেখল যাত্রা কালে মঙ্গলা দেবী তাঁর স্বামীকে প্রণাম করলেন। সেও হয়ত এত লোকের সামনে লোক লজ্জার জন্য। আর সেই লোকাচারের জন্য হয়ত এরপর তিনি শাখা সিঁদুর শাড়ী ত্যাগ করবেন, আমীষ আহার ছাড়বেন, তার বেশী কিছু আশা করা যায় না। অথচ

এমন বয়সের স্বামী স্ত্রীও একে অপরের বিচ্ছেদে শোকে অস্থির হয়, এমন কি জ্ঞানও হারায় বলে দেখা যায় বা শোনা যায়। একটা কর্তব্যই তিনি করেছেন কানে হরিনাম শুনিয়ে—সে নামকীর্তন পরলোকের যাত্রীর কানে সুধাবর্ষণ করেছে কিনা তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন।

এই সময়ে আরো কয়েকটা মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। দাদুর মৃত্যু সংবাদ শুনে ঠাকুমার বারবার জ্ঞান হারাবার ছবি শবুর চোখের সামনে আবছা আবছা ভাসে। ছোটভাই ভাবুর মৃত্যুতে সে বুকভরা কান্না কেঁদেছে। মেজো ভাসুরের মৃত্যুতে ও বেথার দুঃখে সে অকৃত্রিম কান্নায় সহভাগিনী হয়েছে। আর দেখেছে কত্তামার মৃত্যু। আজকের এই মৃত্যুর সঙ্গে বুঝি সেই মৃত্যুরই একমাত্র মিল খুঁজে পাওয়া যায়—এমনি পরিবার পরিজন পরিবৃত হয়ে পরিণত বয়সের যাওয়া একরকম আনন্দের—সুখের যাওয়া।

বিয়ের পর পরই প্রথম সংসার পাততে গিয়ে যে শিশুসুলভ সরল বৃদ্ধের সেবা করার সুযোগ শবু পেয়েছিল তিনি হলেন এই পরম পূজনীয় শ্বশুরমশাই কালীনাথ। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এমন শ্রদ্ধাভাজন মানুষটিকে হারাতে হল। মনে পড়ে তাঁর ছোট্ট মুখখানিতে সরল শিশুর মত স্বর্গীয় হাসি। অনেক কথা এখনো কানে ভেসে আসে—'বৌমার রান্নার হাত একেবারে আনকোরা', 'বেয়ান ঠাকরুন মেয়েকে রান্না শেখান নি' 'তোমরা তো চায়ের সঙ্গে তবু একটু করে দুধ খাওহে—আমিতো তাও পাই না' 'আমিতো খাচ্ছি না—ওষুধে আমাকে খাওয়াচ্ছে' 'বৌমা—আধমুঠ ভাত দাওতো' 'এই জমি এই কুঁড়ে ঘরই তোমার শ্বশুরের ভিটে।' মাসী শাশুড়ী একটা সত্যি কথা ঠিকই বলেছেন—এক নির্লোভ নিরহংকার মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে আজ মাতা ধরিত্রী চোখের জল ফেলেছেন, দেবতারা করেছেন পুষ্প বৃষ্টি। বাবা কালীনাথ চলে গেলেন অমরধামে। নিঃশব্দে চলে গেছেন তিনি, তাঁর সারা শরীরে কোন যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা যায় নি, ঘটেনি কোন বিকৃতি তাঁর নির্মল নিষ্পাপ মুখখানিতে—যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন জননী ধরিত্রীর কোলে। তাঁর দেহ হয়ত এতক্ষণে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে, তবু তাঁর সেই সুন্দর নিষ্পাপ মুখখানি এখনও শবুর চোখের সামনে ভাসছে।

সকাল সাতটা নাগাদ সবাই ঘাট থেকে ফিরে এল। এমন সহজ সরল মানুষটিও নাকি ঘাটে গিয়ে রেহাই পাননি। ঘাটের রেজিষ্ট্রার প্রথমেই দেখতে চাইল ডেথ্ সার্টিফিকেট। পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু তার জন্য

আবার সার্টিফিকেট কিসের ? সে সব ত লাগার কথা অপঘাত বা অপরিণত বয়সের মৃত্যুর বেলায়।

রেজিস্ট্রার বাবু বলেছিল—'তা বললে কি হয়—নিয়ম কানুন আছে না?'

তখন বুঝি আবার পাঁচ মাইল পথ পার্কসার্কাস ছুটতে হয় ডাক্তার দাদার কাছে কারণ সে-ই শেষ জবাব দিয়ে গিয়েছিল। ঘাটবাবুই সঙ্কট সমাধান করতে বলল—

'আমারও সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা আছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। উপযুক্ত ফী পেলে আমি তা দিতে পারি।'

পাঁচ টাকা ফী দিলে ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হল—কালীনাথ লাহিড়ী, বয়স তিয়াত্তর বছর, মৃত্যুর কারণ—ন্যাচার্যাল ডেথ। তবে গিয়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিয়ম পালন করে বড় ছেলে হৃদিনাথ তার পিতার শেষ কৃত্য সমাধা করতে পেরেছে।

চার

শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে গেছে। চার রোজগেরে ছেলে হৃদি, দীনু, মহী ও ভবর প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা একত্র করে মোট মাত্র দুশ টাকায় কোনরকমে গরিবী মতে হৃদিনাথের বাসায় শ্রাদ্ধের কাজ হল। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়াতে এর বেশী খরচ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি -মাঝখান থেকে হৃদিনাথেরই বুঝি কিছু ধার দেনা হয়ে গেল।

দীননাথ এখন তিনমাসের ছুটিতে আছে। কিন্তু তার মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, অসুখের পর শরীরও খুব দুর্বল। মন ত কারোরই ভাল না। মাঝেমাঝে শবুকে বলে—

'কিছু ভাল লাগছে না, কিছুদিনের জন্য কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসতে পারলে ভাল হ'ত।'

কোথায় যাওয়া যায় ? শেষে দীননাথেরই এক পুরোনো বন্ধু এখন মধুপুরে থাকে—শবুকে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য সেখানেই যাওয়া ঠিক হল।

মধুপুরে এসেও কিছু সুবিধে বোধ হচ্ছে না। বন্ধুর আতিথেয়তায় মনোরম পরিবেশে শরীর মন দুইই সুস্থ হয়ে ওঠার কথা তবু দীননাথের মনের অস্থিরতা দূর হচ্ছে না।

রোজ সকালে বিকেলে দীননাথ আর শবু বেড়াতে বের হয়। দীননাথের শরীর দুর্বল, তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না, বেশী দূর যাওয়াও হয়না। কাছাকাছি যেখানে একটা নির্জন মত টিবি পেয়ে যায়, সামনে বিস্তৃত মাঠের ওধারে শাল মহুয়ার গাছের সারি দেখা যায় সেখানেই দুজনে বসে পড়ে। পাশের পথ দিয়ে সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষেরা নিজেদের কাজে আসা যাওয়া করে। এখানে জীবন বড়ই শান্ত নিস্তরঙ্গ। প্রকৃতির শোভা দেখে, প্রকৃতির খুব কাছের মানুষ সাঁওতালদের নিশ্চিন্ত চলা ফেরা দেখে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার সাঁওতালদের সুন্দর করে লেপাপোছা মাটির ঘর ও আঙিনার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা বন্ধুর বাসায় ফিরে আসে। বন্ধু পত্নী জিজ্ঞেস করে—আজ কোন দিকে গিয়েছিলেন, ওদিকে অমুকের বাড়ী দেখেছেন? বলে এক একদিন এক একজন নাম করা বাঙালীর কথা বলে। ওরা তার কি জানে, কোনটা স্যার আশুতোষ মুখার্জীর বাড়ী, কোন বাড়ীতে কবে কোন সিনেমার হিরো এসে উঠেছিল তা ওরা কি করে জানবে?

এমনি এক বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে একটা সাঁওতাল পল্লীর কাছাকাছি একটা টিবির উপর দীননাথ ও শবু বসেছে। দীননাথ কেমন যেন অন্যমনস্ক, চিন্তাক্লিষ্ট। শবু কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কোমল স্বরে বলল—

'আচ্ছা, তুমি আজকাল দিনরাত কি অত ভাব বল ত? তোমার কিসের অশান্তি, কেন এই অস্থিরতা?'

দীননাথ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে আস্তে আস্তে বলল—

'আমি অনেক পাপ করেছি, সেই পাপের গ্লানিই আমাকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না।'

কিসের পাপ, কিসের গ্লানি? শবুর মন উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে। মানুষটাকে ত বেশ নিরীহ গোবেচারা বলে মনে হয়, সে আবার কি এমন মহাপাপ করল? আবার নিজে ত পাপ পূণ্য ঠাকুরদেবতা কিছুই মানে না মনে হয়। কৌতূহল দমন করতে না পেরে শবু জিজ্ঞেস করল—

'পাপ পুণ্যের কথা থাক, আমাকে একটা কথা বল ত। বাবা যখন মারা গেলেন তখন সবাই কাঁদল এমন কি বড়দা, মহী তাদের চোখেও আমি জল দেখেছি। দেখিনি শুধু মাকে একফোঁটা চোখের জল ফেলতে, আর তোমাকেও দেখিনি একবারো চোখ মুছতে। একজনের স্বামী চলে গেল, তোমার বাবা চলে গেলেন—অথচ তোমাদের দুজনের চোখে জল নেই, একটু

কাঁদলে না? আবার দেখলাম তুমি আর সবার মত দশদিন কাচা—চাদর না পরে পায়জামা পাঞ্জাবী পরে রইলে। আরো শুনলাম ডাক্তার দাদার এক ভাইকে তুমি নাকি মাথাও মুড়োবে না বলেছিলে?'

দীননাথ তার ন্যাড়া মাথা থেকে মাড়োয়ারী টুপিটা খুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—

'কাচা চাদর পরা, খালি পায়ে থাকা, মাটিতে শোয়া এসব মনের সংস্কার। খৃষ্টান মুসলমানদেরও বাপ মা মরে তারা ঐ ভাবে থাকে না বলে কি তাদের শোক কিছু কম হয়? তাছাড়া আমি সদ্য অসুখ থেকে উঠেছি, তখন বেশ শীতও আছে বলে বড়দা আমাকে অনুমতি দিয়েছিল—কড়াকড়ি নিয়ম পালন না করলেও চলবে। আর সেই কথা যখন হচ্ছিল তখন ঐ পিসতুতো দাদা তার মামার প্রতি দরদ দেখিয়ে বলেছিল—তা করবে কেন, বাবার প্রতি তোমার কোন কর্তব্যই করা দরকার নেই। তার জবাবেই বলেছিলাম আমি মাথাও ন্যাড়া করব না।

'ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে যখন আমাদের বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল তখন এক ডাক্তারদাদা ছাড়া তার অন্য ভাইরা তাদের মামাবাড়ীতে থেকে লেখা-পড়া শিখেছে, কারণ তাদের বাবার অবস্থা ভাল ছিল না। পরে আমাদের অবস্থা পড়ে গেল ঠাকুরদা মারা যাওয়াতে আর ওদের অবস্থা খুব ভাল হল বিশেষ করে অক্রূর বাবার কণ্ট্রাক্টরীর রোজগারে। সে সময় ঐ ভাইরা যখন আমাদের গ্রামে আসত, কোন রকমে বড়মামাকে একটা প্রণাম সেরে আমাদের শরীকদের বাড়ীতেই সব সময় ওঠা বসা করত—কারণ সে কাকাদের অবস্থা ভাল ছিল, আমরা গরিব। ওদের এক ভাই ত মহা শয়তান, দু বছর আমাদের বাড়ীতে থেকে খেয়ে গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করতে করতে দিদির গায়ে কলঙ্ক দিয়ে গ্রাম থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছিল। ব্যাপারটা বাবা মা মেজদা আর আমি শুধু জানতাম। এরাই যখন বাবার জন্য দরদ দেখাতে আসে, কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে তখন মেজাজ খারাপ হয় কি না বল? মাথা মুড়িয়েছি কিনা আমার ন্যাড়া মাথাই তার প্রমাণ। কিন্তু আমার অশান্তি সেজন্য নয়।'

দীননাথ চুপ করল। শবুর বুক থেকে একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল। বাবা চলে গেলেন অথচ ছেলে হয়ে দীননাথ সকলের মত কৃচ্ছ্রসাধন করল না বলে তার মনে একটা ক্ষোভ ছিল। ভাবত, সে কি তার স্বামীকে ঠিকমত চিনতে পারেনি, সে তার বাবাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করেনা? দীন-

নাথের ব্যাখ্যায় শবুর মনে আর কোন সংশয় রইল না। কিন্তু ঐ যে কি সব যেন বলছিল। জিজ্ঞেস করল—

'তবে পাপ পুণ্য, মনের গ্লানির কথা বলছিলে যে, কেন? তুমি কোন অন্যায় গর্হিত কাজ করতে পার বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

দীননাথের মুখটা বেদনায় যেন কালো হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—

'তবে শোনো সে কলঙ্কের কথা, না বললে—কাউকে বলতে না পারলে হয়ত আমি মনে শান্তি পাব না। তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী, তোমাকে বলি, বললে হয়ত মনের বোঝা একটু হাল্কা হবে।

'আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন আমরা সবাই দমদমে বড়দার কোয়ার্টারে থাকতাম। আমি চাকরি, কলেজে পড়া-ও পার্টির কাজ নিয়ে থাকতাম। সেই সময় দাদা-বৌদির প্রথম ছেলেটা হয়ে আঁতুড়েই মারা গেল। তার জন্য মার দুর্ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের উদাসীনতাও বোধ হয় কম দায়ী ছিল না। দাদা মনের দুঃখে বদলি নিয়ে কটকে চলে গেল, মাস শেষ হলে আমাদের কোয়ার্টার ছাড়তে হবে।

'এই সময় ঘটল মাতুলের আবির্ভাব—যাকে আমরা কোনদিন দেখিনি চিনিনা—সে নাকি আমাদের দূর সম্পর্কের মামা হয়। মাতুল এসেই মাকে ভজাতে আরম্ভ করল—মঙ্গলা. কলকাতায় ফায়ার ব্রিগেডের কাছে একটা বড় বাসা ঠিক করেছি, দুটো পরিবার সেখানে বেশ ভাল ভাবে এঁটে যাবে। মতী ওদিনে দমদমেই একটা বড়সড় কোয়ার্টার নিয়ে সেখানে আমাদের সবাইকে তুলল। একমাস সেখানে থেকে মাতুলের হাতছানিতে ভুলে কলকাতা শহরে থাকতে পারা যাবে সেই আনন্দে কোয়ার্টার ছেড়ে সবাই গিয়ে কলকাতার ভাড়া বাড়ীতে উঠলাম।'

শবু বলল—'সে বাড়ী আমি দেখেছি, শেফালী একবার আমাকে দেখিয়ে এনেছিল। সবাই নাকি বলে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার আমলে তৈরী বাড়ী, রাস্তা থেকে ফুট দুয়েক নীচু সে বাড়ীটা।'

দীননাথ বলল—'দেখেছ? তবে ত ভালই, তোমার বুঝতে সুবিধে হবে। সে বাড়ীতে একেবারে ভিতরের অংশে উপর নীচ নিয়ে আমরা থাকতাম, আর থাকত ঐ মাতুল পরিবার। দুটো আলাদা পরিবার, রান্না খাওয়া সব আলাদা। মামী তখন বেঁচে। তখনই দেখা যেত মা ও মাতুল প্রায়ই বিকেলে বাইরে বেড়াতে যেত। প্রথম প্রথম ব্যাপারটাকে কেউ আমল

দেয়নি। আমরা নয় ভাই-বোন মাতুলের তরফেও ডজন খানেকর মধ্যে মরে বিয়ে হয়ে গিয়েও প্রায় আধডজন—সেখানে মা ও মাতুলের সম্পর্ক আর কি খারাপ হতে পারে।

'কিন্তু মেয়ে মানুষের চোখকে ফাঁকি দেয়া যায় না। মামী মনে মনে খুব অসুখী বোধ করেন, প্রচণ্ড মর্ম বেদনায় গুমরে মরেন। মাঝ বসন্তে সেই মর্মবেদনা তাঁর সর্বাঙ্গে ফুটে বের হল, সাপ্রেস্‌ড্‌ মিজল্‌স্‌—চাপা হাম বসন্ত হয়ে তিন দিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। মরে বুঝি তাঁর মনের জ্বালা জুড়োল।

'শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে যেতে প্রশ্ন উঠল, মাতুলের সংসার চলবে কি করে, একটি সাবালক ও চার পাঁচটি নাবালক ছেলে মেয়েকে খাওয়াবে কে? মা সমাধান দিল—দুটো সংসার এক হাঁড়িতে খাবে। এবারে মা ও মাতুল দুজনে হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য, রোজ বিকেলে দুজনে মিলে কোথায় কোথায় বেড়াতে যায়।

'দু সংসার এক হতেই মেজদা বাড়িতে টাকা দেয়া বন্ধ করল, বলল—মাতুল গুষ্টিকে খাওয়াতে একটা পয়সাও দেবনা।

'এবার বাবার পালা। তাঁর কোন রোজগার নেই, কিছু করতেও পারেন না।

'বাবা প্রথম প্রথম মন্তব্য করতেন—কৃষ্ণ রাধিকার বাল্য লীলা, নিঃসম্পর্ক এক দাদা—ছোটবেলার পরিচয়, এখন দুজনে রোজ রাসলীলা করতে যান। এসব মন্তব্যেও কেউ দমে না।

'এদিকে জায়গার অভাবে দোতলায় একখানা বড় ঘরে একটা চৌকিতে শোয় মাতুল আর মেঝেতে ঢালা বিছানায় মা, করবী, শেফালী, ভব, সোনা, আর মাতুলের ছোট দুতিনটি শোয়। শয়তান মাতুল ঐ ঘরভর্তি লোকের মধ্যে রাতের অন্ধকারে করবী শেফালীর দিকে হাত বাড়ায়।'

শবু বলল—'শেফালীর মুখে আমিও সে কথা দু একবার শুনেছি।'

দীননাথ বলতে লাগল—'আবার রোজ বিকেলে বেড়ানোও আছে। বাবার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে তাঁকে প্রায় উন্মাদ করে তুলল। রোজ বিকেলে বেড়াতে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন—কিন্তু রোজই খাঁচা খুলে পাখী পালিয়ে যায়।

'একদিন বিকেলে আমি বাড়ী ফিরছি অফিস থেকে। সেদিন যে দৃশ্য আমি দেখলাম, ছেলে হয়ে সে বর্ণনা দিতে আমার মত নাস্তিকও

শিউরে ওঠে। ভিতরের উঠোনে পা দিতেই দেখি মা ও মাতুল বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত, বাবা তাদের পথ আগলে সটান মাটিতে শুয়ে—একেবারে গান্ধী পন্থায় অহিংস প্রতিরোধ। আমি যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। অবশ্য বাইরের কারো সে দৃশ্য দেখার সম্ভাবনা ছিল না, বাড়ীটা এমন ভাবে চারদিক ঘেরা, তবু বাড়ীওয়ালাদের পক্ষে উকিঝুঁকি মেরে দেখা শোনা সম্ভব। বাড়ীতে ছোট দু চারজন যারা ছিল তারাও মুখ লুকিয়েছে। আমাকে দেখে মাতুল এক পাশ দিয়ে সরে পড়ল।

'মা আমাকে বলল—দীনু দেখ, তোর বাপের ভীমরতি হয়েছে, পাগল হয়ে গেছে। ওকে টেনে হিঁচড়ে পথ থেকে সরিয়ে দে, মাথায় জল দিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দে। বাবা চীৎকার করে উঠলেন—আমি পাগল, আমার ভীমরতি হয়েছে? আর উনি যে পাতানো দাদার প্রেমে উন্মাদ—উনি একেবারে সতীলক্ষ্মী! রোজ দুজনে কেলি করতে যাওয়া হয়! মা বলল—শুনছিস কথা? আমি নয় ছেলেমেয়ের মা, আমার সম্বন্ধে কি সব উক্তি! শিগগীর পাগলকে সরা, মাথায় জল ঢাল।

'আমার মাথার মধ্যে সব যেন কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। একি কেলেঙ্কারী, লোকজানাজানি! আমি ভুলে গেলাম, রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য হাসিমুখে বনে গিয়েছিল। বিস্মৃত হলাম রাজা যযাতির পুত্র পুরু পিতার জরা নিজ দেহে ধারণ করে পিতাকে সুখী করেছিল। জামদগ্নি পুত্র রাম পিতার আদেশে স্বৈরাচারিণী মাতা রেণুকাকে পরশু দিয়ে হত্যা করে পরশুরাম নামে অমর হয়ে আছে সে কথাও মনে পড়ল না। উল্টে আমি কি করলাম? স্পষ্টতই ভ্রষ্টা মায়ের কথায় আমি বাবাকেই সেখান থেকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেলাম, উত্তেজনায় এই হাত দিয়েই বাবার মত পরম সহনশীল মানুষকে দু একবার আঘাতও করে বসলাম। আমার এইহাতে কুষ্ঠ হয়ে হাত কেন খসে পড়ে না!······

'আমি কি করব? আমার একদিকে 'জননী জন্মভূমিশ্চ' আর একদিকে 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ'—আমি অধর্মকেই বেছে নিয়েছিলাম। বাবা আমাকে একবারও অভিশাপ দেননি, শুধু নিজের অক্ষমতায় নিজেকে ধিক্কার দিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকেছেন আর অভিশাপ দিয়েছেন মাকে—বিধবা হয়ে, ব্যাভিচারিণী কুলটা হয়ে, ছেলে ছেলের বৌদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করিস—নরকেও ঠাঁই হয় না যেন। ওদিকে মা বেড়াতে চলে গেল···'

বলতে বলতে অবসন্নভাবে দীননাথ মাথাটা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে

রইল—তার বুক ফেটে কান্না আসতে চাইছে কিন্তু কাঁদতে পারে না, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বের হয় না। আবার অনুতাপে জলে পুড়ে বলতে লাগল—

'আমি মহাপাপ করেছি. বাবার অনুচ্চারিত অভিশাপ আমি মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছি। তাই আমি কাঁদতে পারিনা, বাবার মৃত্যুতেও আমার চোখে আসেনা এক ফোঁটা জল। হয়ত এর চাইতেও বড় কোন আঘাতের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে যে আঘাতে আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছাও বিস্বাদ হয়ে যাবে—কিম্বা আমি বোধ হয় জীবনে কোনদিন কাঁদতে পারব না।' বলতে বলতে দীননাথ দুহাতে মুখ ঢাকল।

শুনতে শুনতে শবুর কানে আঙুল দেবার অবস্থা। এ কি শুনল সে আজ! শ্বশুর-শাশুড়ী পিতৃ-মাতৃতুল্য পূজনীয়। তাদের কেউ যদি এমন চরিত্রের হন তবে তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে কি করে? এতদিন সে তার শাশুড়ীকে ভীতির চোখে দেখত, আতঙ্কে কাছে ঘেঁষতে পারতনা, আবার প্রচণ্ড কাজ করার ক্ষমতাকে সমীহ করত। শ্রদ্ধা ভক্তি মায়া মমতার ভাব কোন দিন তার মনে আসেনি। কিন্তু আজ যা শুনল তাতে সবকিছু ছাপিয়ে তীব্র ঘৃণা, একটা গা ঘিনঘিন করা বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত মন ভরে গেল। এ ত নিজের ছেলের মুখে শোনা কথা, যার এক বর্ণও অবিশ্বাস্য বা মিথ্যা হতে পারে না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, যে স্ত্রী তার স্বামীর চোখে অসতী তার জীবনে গর্বের আর কি রইল—তাকে অপরে শ্রদ্ধা করবে কি করে? ছেলে মেয়ের জন্মদাত্রী! তবে ত পথের সারমেয়ীরাও সতী সাধ্বী!

শবুর জানতে ইচ্ছে করছে, এমন মাকে দীননাথ মাথায় করে রাখে কি করে যেখানে কোন সম্পর্কই রাখা উচিত নয়। কিন্তু সে-ই বা কি করবে, হাজার হোক নিজের মা। ফেলবেই বা কি করে? শবুর দুর্ভাগা, এই চরিত্রের শাশুড়ীর সঙ্গে তাকে ঘর করতে হবে - যে চরিত্রহীনতাকে সে জগতের ঘৃণ্যতম স্বভাব বলে জানে তার সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তির অভিনয় করতে হবে। সবই করতে হবে যান্ত্রিকভাবে, থাকবে না আন্তরিকতার লেশমাত্র। শেফালীর কাছে যেটুকু শুনেছিল এ যে তার চাইতেও জঘন্য। সেখানে ছিল শুধু মাতুলের কথা—কিন্তু এ যে স্বয়ং মা, শাশুড়ী ঠাকরুন। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁকে কাঁদতে দেখা যায়নি, তাঁর ত কাঁদার মুখও নেই।

দীননাথকে এখন কিছু জিজ্ঞেস করা উচিৎ নয়—বরং যেভাবে অবসন্নের মত বসে আছে, দুর্বল শরীরে যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয়? আঁচল দিয়ে বাতাস করে তাকে একটু সুস্থ করে তোলা দরকার। পরে ধীরে ধীরে তার গায়ে

হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শবু সান্ত্বনার স্বরে বলল—

'ওগো শুনছো, তুমি দুঃখ কোরো না, এতে তোমার কোন দোষ নেই, তুমি কোনমতেই দায়ী নও। চল, এখন আমরা বাসার দিকে যাই।

শবুর কথায় দীননাথ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল। লজ্জায় সে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। চলতে চলতে একসময় সে শবুর একখানা হাত ধরে গভীর স্বরে বলল—

'বিবেকের দংশন থেকে আমি কিছুতে যেন মুক্ত হতে পারছি না। ঐ অপরাধের জন্য পরে লজ্জায় কোনদিন বাবার কাছে মুখ ফুটে নিজের দোষ স্বীকার করতে পারিনি, পায়ে ধরে তাঁর মার্জনাও চেয়ে নিই নি। এখন আর কোন উপায় নেই—এমন হঠাৎই খবর পেয়ে বাবার কাছে গেলাম শেষ সময়ে যখন আর তাঁর জ্ঞান ফিরে এলনা, আমি শেষ সুযোগটাও হারালাম।

'তোমাকে আমার অপরাধের কথা বলতে পেরে এখন কিছুটা হাল্কা বোধ হচ্ছে। তোমারও মার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, জীবনে আরো কত সঙ্কট আসতে পারে তখন আজকের কথাগুলো তোমাকে পথ নির্ণয় করতে সাহায্য করতে পারে। তবে তোমার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ, তুমি আমাকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দিওনা। এই রকম একটা সংসারে নিয়ে করে এনে তোমার সুন্দর জীবনটা আমি নষ্ট করে দিয়েছি।'

শবু দীননাথের হাতটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল—'অমন করে বোলো না, তুমি ত আমাকে কোন কষ্ট দাও নি, আমার জীবনে তুমিই সব। বাবা চলে যাওয়াতে তোমার মন খারাপ, আমারও মন খারাপ। অনেকদিন বাবা মাকে দেখিনি। তোমার এখনও মাসখানেক ছুটি বাকি আছে। চলনা গো, আমরা বাবা মার কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসি।'

দীননাথ বলল—'হ্যাঁ, তাই চল। আমারও এখানে আর ভাল লাগছে না। এখানকার মাটি আকাশ গাছপালা এই কলঙ্ক কাহিনী শুনে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে—আমার চোখে আর কোন সৌন্দর্য্য ধরা দিচ্ছে না। চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

পরদিন তাড়াহুড়ো করে বন্ধু বন্ধু-পত্নীর কাছে বিদায় নিয়ে একবেলায় বৈদ্যনাথধাম দেখে রাতের গাড়ীতে দুজনে কলকাতায় ফিরল—আর একদিন পরেই দীননাথের সঙ্গে শবু চলল বাপের বাড়ী প্রায় আড়াই বছর পরে।

পাঁচ

মন্দির শহরের বাড়ীতে পৌঁছে সবাইকে প্রণাম করে শবু আগে ছুটল ভাই নন্দুকে দেখতে। না, ওর অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। শবুর মন ভীষণ খারাপ লাগে, কি যে হবে আদরের এই ভাইটার! নিজের ইচ্ছায় যদি দু একটা কথা বলল ত ভাল, না হলে শুধুই চৌকিতে শুয়ে বা বসে থাকে। কখন হয়ত বিছানা থেকে নেমে বাইরের বারান্দায় এসে কিছুক্ষণ বসে রইল, খিদে পেলে খেতে চাইল, নিজে হাতে খেল। কেউ আঁচিয়ে না দিলে নিজে থেকে আঁচাবার চেষ্টাও করে না।

মা পদ্মিনী দেবী বললেন—'কত ওষুধ পত্তর ঝাড়ফুঁক তাগা তাবিজ করালাম, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। যে যা করতে বলছে তাই করছি। প্রতি মঙ্গলবার উপোস করছি, জাগ্রত দেবতা মা রামচণ্ডীর মন্দিরে পূজো দিচ্ছি সেদিন। এদিকে ও দিনদিন আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে।'

শবু বলল—'জানো মা, আমাদের ওদিকে কুসুমপুরে এক জাগ্রত পীরের মাজার আছে, সেখানকার কবচে তাবিজে নাকি কত কঠিন রোগী ভাল হয়ে যায়। এবারে ফিরে গিয়ে সেখানে একবার যাব মা?'

মা যেন আর কোন কিছুর উপর ভরসা করতে পারছেন না। বললেন 'যাস, দেখ কোন ফল পাওয়া যায় কি না। মিতুটারও অপারেশন করে কোন উপকার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না—ওর যে কোথায় কি করে বিয়ে দেব ভেবে পাচ্ছি না।'

দিন পনরো শবুরা এখানে থাকবে। শুয়ে বসে গল্পে সল্পে দু তরফের খবরের আদান প্রদান হতে লাগল। একটা বড় খবর—শুভেন্দুদার বিয়ে হয়ে গেছে আর বছর খানেক না যেতেই বড়মাসীমা ছোটবোন খুকীর কাছে দুঃখের গল্প করতে আসেন। শুভেন্দুদার মাতৃ ভক্তিতে ভাটা পড়েছে।

নতুন চাকরি পেয়ে মনের আনন্দে ভব গত ভাদ্রের ভরা বর্ষায় শেফালী সোনাদের নিয়ে মন্দির শহরে বেড়াতে এসেছিল সে গল্পও হ'ল। মা বললেন

'গত বর্ষায় হঠাৎ দেখি শেফালী ভব সোনা, তোর তিন দেওর ননদ এখানে বেড়াতে এল। আমি ত ভয়ে মরি বর্ষায় বুঝি ওদের বেড়ানোটাই পণ্ড হয়।

ভগবানের ইচ্ছেয় ওরা যে কদিন ছিল বৃষ্টি বাদলা হয়নি। পরে এখান থেকে ওরা ওয়ালটেয়ার না কোথায় গেল। ওরা ভালয় ভালয় বেড়িয়ে বাড়ী ফিরেছিল ত? যে কদিন এখানে ছিল কানাই ওদের সারা শহর সব মন্দির ঘুরে দেখিয়েছে—সে-ই যেন মন্দিরের বড় পাণ্ডার ছড়িদার।'

পাশ থেকে কানাই বলল—'দেখনা মেজদি, ভববাবু বলে সে সব চেনে, কিন্তু কাজের বেলায় ঢু ঢু, অনেক কিছুই চেনে না।'

শবু কানাইকে আদর করে বলল—'না ভাই, তুই এখন কত বড় হয়েছিস তোর মত অতসব সে চিনবে কি করে?' পরে আফশোষ করে মাকে বলল, 'ওদের ঐ বর্ষার মধ্যে বেড়াতে যাবার কথায় তোমাদের জামাই বারণ করেছিল তখন না গিয়ে পরে যেতে। কিন্তু নতুন চাকরি পাবার আনন্দে কেউ সে কথা শুনল না, দুজায়গায় বেড়িয়ে ভালই ত ফিরল। কিন্তু ফেরার পথে দমদম ষ্টেশনে ওদের স্যুটকেশটা চুরি হয়ে গেল। শেফালী আমার বিয়েতে পাওয়া তিন চারখানা ভাল শাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিল সেগুলো সব হারিয়েছে।'

মা বললেন—'হ্যাঁ ঐ শাড়ীগুলো পরেই ত শেফালী এখানে বেড়াতে যেত আমি জিজ্ঞেস করতে বলেছিল, হ্যাঁ, এ গুলো সেজবৌদির শাড়ী। ইস্ অমন সুন্দর শাড়ীগুলো সব হারিয়ে গেল?'

ঠাকুমা বললেন—'সে কিরে শবু, তোর বিয়ের সব শাড়ীই কি হারাবে নাকি? সেবার তোর বিয়ের বেনারসীটা হারিয়ে গেল।'

শবু বলল—'আর বল কেন ঠাকুমা, আমার কিছুই থাকবে না। তবে শেফালী পরে পুজোর সময় একটা ভাল শাড়ী কিনে দিয়েছে।'

মা শবুর মাথায় হাত রেখে বললেন—'ষাট ষাট, ও কথা বলে না। এই ত তোদের বাড়ী হচ্ছে—কেমন বাড়ী কেমন ঘর একটু বল আমরা শুনি।'

বাড়ীর কথায় শবুর আনন্দ আর ধরে না, সঙ্গে সঙ্গে বাক্স থেকে বাড়ীর ফটোটা বের করে মা বাবা ঠাকুমা আর সবাইকে দেখাল। সত্যি সত্যি একটা কুঁড়ে ঘরের ছবি দেখে সকলে যেন একটু দমে গেল।

তাই দেখে শবু বলল—'জান মা, কলকাতার অত কাছে, কিন্তু একেবারে অজ পাড়াগাঁ, একটু দূরে বাঁশ ঝাড়ে রাতে শেয়াল ডাকে। আমাদের বাড়ীটাও সেই পাড়াগাঁয়ের উপযুক্তই হয়েছে, তাই না? আমাদের গ্রামের নাম হল চাঁপাতলা—পাশের গ্রাম নিমপুর, লোকে আদর করে দুটোকে জুড়ে বলে চাঁপা-নিমপুর, কেউ কেউ উল্টে নিম-চাঁপাপুরও বলে।'

তপু সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল—

'মেজদি, তোদের ওখানে লাইট নেই ?' তপুর কথা এখন স্পষ্ট হয়েছে, বড়মার স্কুলে পড়ছে। সাহেবকে আর 'থাহেব' বলে না।

শবু উত্তর দিল—'না'।

'মাটিমাটি ঘর ?'

'হ্যাঁ।'

'কাদামাটির রাস্তা ?'

'হ্যাঁ।'

তপুর পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে—বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বলল -

'তবে ত পাড়াগাঁ।' ওর মনে আর সন্দেহ নেই।

ঠাকুমা জ্ঞানীগুণী মানুষ, বললেন—'আজ পাড়াগাঁ আছে শহর হতে কতক্ষণ, বিশেষ কলকাতা যখন অত কাছে। কুঁড়ে ঘরও একদিন নিশ্চয় পাকা হবে।'

কানাইটা দুরন্ত হলে কি হবে বাস্তব বুদ্ধি খুব কম। জিজ্ঞেস করল—

'বা রে, কুঁড়ে ঘর পাকা হবে কি করে ? এখানে আমার কত বন্ধুর বাড়ী আছে নীচেটা পাকা কিন্তু উপরে কুঁড়ে ঘরের চালা। মেজদিদের বাড়ী দেখছি শুধুই বেড়ার ঘর।'

ঠাকুমা চোখ দুটো পিটপিট করে বললেন—'সে মন্তর ত আমার জানা নেই দাদু, জানে রাজমিস্ত্রিরা আর জানত তোদের দাদু।'

মা বললেন—'কানাইটার বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে কে জানে। পড়াশুনাও ঠিকমত করে না। শোন শবু সেবার কি হয়েছিল··'।

মার কথায় জানা গেল, গত হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, কানাই অঙ্কে পেয়েছে শূন্য। পরীক্ষার ফল দেখে ছেলের বাবা রেগে আগুন, কানাইকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল—অঙ্কে কত পেয়েছিস ? কানাই কথা বলেনা, বড় বড় চোখ করে শুধু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাপার ঘোরালো আন্দাজ করে মা ঠাকুমারা এসে জড়ো হল। রাগে বাবার গলা একটু একটু করে চড়তে লাগল—'বল কত পেয়েছিস, বল কত পেয়েছিস ?' কানাই এর মুখে তবু রা নেই, শুধু বড় বড় চোখ করে তাকিয়েই আছে। বাবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল, হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে এক ঘা মেরে বসল—যে বাবা কোন দিন কারো গায়ে হাত তোলে না তার এই কাণ্ড।

মা ঠাকুমা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলে আগলাচ্ছে. তপু বাবার একটা হাত ধরে ঝুলে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছে আর বলছে—'ও বাবা, তুমি আর দাদাকে মেরো না, দাদাকে আর মেরো না।' কানাই ভাবতেই পারেনি বাবা সত্যি সত্যি তাকে মারবে, এক ঘা খেয়ে কেঁদে বলে উঠল—'কিছু পাইনি।' সঙ্গে সঙ্গে বাবার রাগ জল হয়ে গেল, বলল—'এই ত হয়ে গেল, একবারে কথার জবাব দিলে আমার রাগ হয় না, কিছু বলিও না।' ঠাকুমার অভ্যস্ত মন্তব্য—'তোরাও ঐ রকম ছিলিরে, তুইও ক্লাশ এইটে একবার সংস্কৃতে ফেল করেছিলি।' বাবার জবাব 'মা, তুমি কিছু বলবে না, পরে আমি সংস্কৃতে ক্লাশের মধ্যে ফাস্ট হয়েছিলাম।' 'হ্যাঁ, সে কথাও ঠিক'—ঠাকুমার স্বীকৃতি।

মার কথা শেষ হতে বাবা গিরিনবাবু বললেন—'কানাইটার কিছু হবে না। মা, তুমি শবুদের সঙ্গে ওকে নিয়ে বরানগরে গিয়ে থাক—ওখানে থেকে স্কুলের পড়াশুনা করুক। আমাদের ছোটবেলায় কর্ত্তামা দেখা শোনা করেছেন, এবার তুমি এদেরকে দেখ।'

কথাটা ঠাকুমার কাছে নির্বাসন দণ্ডের মত, তবু বড় ছেলের কথায় অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন না। বরানগরে ছোটছেলে অবিনাশ আছে, তার কাছেও কিছুদিন থাকা হবে। এদিকে বাবার কথায় মার চোখে জল এসে গেছে—এক ছেলে নন্দু ঐ রকম হয়ে আছে, ভাবু ত চলেই গেছে, এখন সকলের চোখের মণি কানাইও দূরে চলে যাবে। কি-ই বা করা যাবে, ছেলেটার লেখাপড়া হওয়াটাও ত দরকার।

শবু বলল—'মাগো, তুমি কিছু ভেবো না, ঠাকুমা কাছে থাকবে, কাকা কাকীমা থাকবে, আর আমিও সপ্তাহে একবার করে গিয়ে কানাইকে দেখে আসব।'

মা বাবাকে ছেড়ে, এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে শুনে কানাইয়ের মুখটা করুণ হয়ে উঠল—সারাদিনের খেলা ও মারপিটের সাথী তপু শঙ্খরা থাকবে না, পাড়ার বন্ধু বান্ধবদের থেকে দূরে যেতে হবে। মন খারাপ হবারই কথা—ছেলেমানুষ ত। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—

'মেজদি, আমাকে দেখতে ঠিক যাবি ত?'

শবু তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল—

'যাব না কি রে, নিশ্চয়ই যাব। তুই যে আমাদের সকলের আদরের ভাই। আমি কি না গিয়ে থাকতে পারি?' ভাই বোনরা যেমন তাদের মেজদিকে সব চাইতে ভালবাসে ওদের প্রতি শবুর স্নেহ ভালবাসাও তেমনি অফুরন্ত।

মেজদির আশ্বাস পেয়ে কানাই মুহূর্তে তার দুঃখ ভুলে গেল। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে তপুকে দু হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল—

'থাক তুই এখানে পড়ে আমি কলকাতায় যাব। সেখানে কত ট্রামে বাসে চড়ব।' তার কাছে কলকাতা মানেই শুধু ট্রাম বাস—সেবারে দাদার চিকিৎসার সময় গিয়ে দেখে এসেছে।

তপু অসহায়ের মত কেঁদে বলল—'মা, দাদাকে দেখ ত—আমাকে শুধু শুধু বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে।'

এই সব কথার মাঝে ঠাকুমা আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন দেখে শবু বলল—

'ওকি ঠাকুমা, তুমি উঠছ কেন? কোথায় যাচ্ছ?'

ঠাকুমা বললেন—'যাই দেখি গোছ গাছ করতে হবে, বরানগরে যেতে হবে ত!' ঠাকুমার কণ্ঠে শিশুসুলভ অভিমানের সুর।

কানাই বলল—'চল ঠাকুমা আমি তোমাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ঠাকুমা চলে গেলে মা শবুকে চুপি চুপি বললেন—

'মা ভীষণ ব্যস্তবাগীশ, তোরা যাবি দিনদশেক পরে, এখন থেকেই মার গোছ গাছ শুরু হয়ে গেল। তা একদিক থেকে ভালই হল, 'সে' যে বরানগরে যেতে বলল, আগে কিন্তু আমাকে কিছুই বলেনি। নিজের মুখেই 'সে' বলল আর মা তার মুখ থেকেই শুনলেন, না হলে হয়ত ভাবতেন আমি বরানগরে যাবার পরামর্শ দিয়েছি। এত বছর এখানে আছেন, এখানেই সব স্মৃতি পড়ে আছে—ছেড়ে যেতে গেলে মনে দুঃখ, অভিমান হয়ই। তবু তেমন কোন অমত আছে বলে মনে হচ্ছে না।

'আসল ব্যাপার কি জানিস? মার মেজবৌ প্রীতি এই চারবছরে অনেক কমে গেছে। এত বছর আমরা মাকে নিয়ে ঘর করছি, শাহীর মোড়ে ভাড়া বাসায় সবাই কত কষ্ট করে থেকেছি কিন্তু মাকে কোনদিন কোন কাজ করতে দিইনি—কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের বোঝা তাঁর উপরে চাপাইনি। অথচ এখন তাঁকে অনেক কাজই করতে হয়। বট্‌ঠাকুরপো এখন বেশ ভালই বুঝতে পারছে সংসার আলাদা করে কি সুখে আছে! এদিকে মেজ বৌয়ের আবার পাঁচমাস চলছে তখন যে কি অবস্থা হবে কে জানে।

'বরানগরে গিয়ে মা আরামেই থাকবেন। দীপুও অনেক বছর হল বিয়ে হয়ে এ সংসারে এসেছে, মার সুবিধে অসুবিধে সে সব বোঝে। দীপু মার যথেষ্ট আদর যত্ন সেবা করবে, ভালই হবে। তারপর শেষ বয়সে আমরা ত আছিই—যখন ইচ্ছে তখনই চলে আসবেন।'

মার কথাগুলো যে কত খাঁটি সন্ধ্যের পরই তা বোঝা গেল। বড়কাকা অফিস থেকে ফিরে মা বরানগরে যাবে শুনে ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এসে বললেন—

'বৌদি, মা নাকি অবিনাশের বাসায় যাচ্ছে—এখানে আমাদের কে দেখবেনে? ওদিকে মেজ বৌয়ের আবার…।'

মা হেসে বললেন—'সে জন্য ভাববেন না, ও হেঁসেল বন্ধ হলে এ হেঁসেল খোলাই থাকবে। আমি আছি, মিতুও আছে, আমরাই আপনাদের দেখব।'

বড়কাকা পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন—

'তা হেলে কিছি অসুবিধা নাহি, আমো পেট চলিলে হেলা, আউ কণ?' বড়কাকার গলায় বহুদিনের পুরোনো অন্তরঙ্গ কথার সুর।

সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ কথা বার্ত্তা হয় রোজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে পান খেতে খেতে। বাবা খাটের উপর শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করেন আবার মা মেয়ের কথাও তাঁর কানে আসে। দীননাথ সকালে একটু পড়া শুনা করে, দশটার সময় বন্ধু মহলে গিয়ে আড্ডা দিয়ে এসে দুপুরে খেয়ে অন্য ঘরে শুয়ে ঘুমোয়, আবার বিকেলে আড্ডা দিতে বের হয়। মিতু কানাই তপুরা অধিকাংশ সময় তার কাছে থাকে।

সেদিনও দুপুরে খেয়ে উঠে শবু মার সঙ্গে পান সাজতে বসেছে, বাবা খাটে শুয়ে আছেন। ঠাকুমা এক সময় গুটি গুটি এসে মেঝেতে বসলেন। কথায় কথায় শবুর শ্বশুর কালীনাথের মারা যাবার কথা উঠল। বাবা গিরিনবাবু আফশোস করে বললেন—

'আহা বড় সজ্জন ব্যক্তি, বড় ভালমানুষ ছিলেন। এমন বিনয়ী ভদ্র ব্যবহার খুব কম লোকের দেখা যায়। একজন সত্যিকারের নির্বিরোধী নির্লোভ নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তিনি।'

শবু বলল—'দেখ ঠাকুমা, ভালমানুষ যাঁরা তাঁদের বোধ হয় বেশীদিন কাছে পাওয়া যায় না। মেজভাসুর ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ, ভাইবোনদের জন্য কত দরদ ছিল তাঁর—কিন্তু তিনি অকালে চলে গেলেন, আর মেজবৌদির ঐ অবস্থা হ'ল। আবার শাশুড়ী ঠাকরুন যাঁকে দু চক্ষে দেখতে পারতেন না, সেই মাটির মানুষ শ্বশুর মশাই তিনিও চলে গেলেন।'

ঠাকুমা বললেন—'তোর মেজ ভাসুরকে আমরা দেখিনি কিন্তু তোর কাছে শুনে বুঝেছি ছেলেটি সত্যিকারের দরদী ভালমানুষ ছিল। তোর শ্বশুর

কাশীনাথকে আমরা দেখেছি। তোর মাসী-শাশুড়ী ঠিক কথাই বলেছে—একজন ভাল মানুষ চলে গেলে মা বসুমতী কাঁদে, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে। দুঃখ করিস না, প্রায় পরিণত বয়সেই গেছে ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের মাঝখানে হরির নাম শুনতে শুনতে—এ ত সুখের যাওয়া। আমার মত পাপী তাপীর ভাগ্যে কি আছে কে জানে।' ঠাকুমার চোখে জল এসে গেল।

মা বললেন—'যাঁরা গেছেন তাঁদের জন্য শোক ত হয়ই, তাঁদের স্মৃতিও ধরে রাখতে হয়। আবার আর যারা থাকে তাদের নিয়ে সবদিক মানিয়ে চলতে হয়।'

শবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল—'কার সঙ্গে মানিয়ে চলা? কার সঙ্গে মিলে মিশে থাকা?'

শবুকে কেউ কখনো রাগতে দেখেনি, সবাই বলে শবুর শরীরে রাগ নেই। ওর এই হঠাৎ উত্তেজনায় মা ঠাকুমা হতভম্ব হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শবু লজ্জা পেয়ে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে ভাবল, তারপর একবার লক্ষ্য করে দেখল ঘরে তপু ছাড়া ছোট কেউ নেই। তপুও শঙ্খ খেলতে ডাকছে শুনে চলে গেল। এবার শবু আস্তে আস্তে বলল—

'তবে শোনো মা, ঠাকুমা তুমিও শোনো। কদিন আগে আমরা মধুপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে তোমাদের জামাইএর মুখে যা শুনেছি তাই বলছি ...।' বলে মধুপুরে দীননাথের মুখে যা যা শুনেছিল সব বলে গেল, একটা বর্ণও বাদ দিল না। তার সঙ্গে যোগ করল সেই বিশেষ বাড়ীটা তার নিজের চোখে দেখে আসার কথা, রিফিউজী কলোনীর পরিবেশের কথা আর সব শেষে দীননাথের মর্মবেদনা ও অন্তরের জালার কথা। শেষে শবু বলল—

'বল মা, আমি কার সঙ্গে মানিয়ে চলব?'

বাবা গিরিনবাবুর পক্ষে সবটা শোনা সম্ভব হয়নি, মহাভারতের মূল অংশটুকু শুনতে শুনতে শয্যাত্যাগ করে ঘরের বাইরে চলে গেছেন। মা পদ্মিনী দেবীর-ও শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে কানে আঙুল দেবার অবস্থা, লজ্জায় ঘেন্নায় তাঁর গা শিউরে উঠছে, মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। সবটা শুনে ঠাকুমাও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, পরে বললেন—

'ওরে থাম, থাম। আর যে শোনা যায় না। এমন কুরুচি এমন কু-প্রবৃত্তির কথা জীবনে শুনিনি। স্বামী বর্তমানেই এমন স্বেচ্ছাচারিতা। প্রাণনাথকে দোষ দিস না, ও কি করবে? তার একদিকে বাবা একদিকে

মা—কেলেঙ্কারীর আর বাকি কি রইল ?'

মা পদ্মিনী দেবী এবারে কেঁদে শবুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন—

'আমাদের সবচেয়ে আদরের, সব থেকে সুন্দর মেয়ে শবুর এ কেমন ঘরে বিয়ে হয়েছে ? দীপুর দিদির কাছে পরে যা জানা গেছে সেও ত সব নয়। এ যে তার থেকেও আরো জঘন্য আরো ঘেন্নার, বড় লজ্জার। শবু মা আমার, এমন মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলার কথা বলে আমি অন্যায় করেছি। অবস্থা বুঝে তুই যা ভাল মনে করবি তাই করিস—আমি কখনো বারণ করব না। শুধু এজন্য দীনুকে অশ্রদ্ধা অবহেলা করিস না—আমরা দীনুর সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়েছি—তখন তোর শ্বশুরকে দেখিনি আর শাশুড়ীর পরিচয়ও পাইনি। দীনুই তোকে রক্ষা করবে, আগলে রাখবে।'

শবুরও একমাত্র ভরসা দীননাথ।

সময় হল শবুদের ফেরার আর কানাই ও ঠাকুমার যাত্রার। রওনার দিন সকাল থেকে মা এমন কাঁদতে লাগলেন কানাইয়ের জন্য যে তার অভাবে মার পক্ষে জীবন ধারণ করাই কষ্ট হবে। কানাই যে এখন তাঁর সবেধন নীলমণি—ভাবু নেই, নন্দুর ভাল হবার আশাও দুরাশা। কাঁদছে মিতু আর তপু। নন্দুর বুঝি কোন বোধ শক্তি নেই, কানাই তাকে প্রণাম করল, মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'নন্দু, কানাই কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে'—সে একবার কানাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের মনে মাথা দোলাতে লাগল। বড়কাকা-কাকীমা ঠাকুমাকে প্রণাম করে তাঁর শরীরের দিকে নজর রাখতে বললেন। বড়কাকীমা কাঁদছেন, ঠাকুমার চোখেও জল। মা ও ছেলেকে ট্রেনে তুলে দিতে চলেছেন গিরিনবাবু তাঁর ডাক্তারখানায় যাওয়ার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে। চলেছেন মা পদ্মিনী দেবীও সঙ্গে তপু ও শঙ্খকে নিয়ে—আজ ত শুধু আদরের মেয়ে শবুই যাচ্ছে না, যাচ্ছেন তাঁর শাশুড়ী ও দুরন্ত ছেলে কানাইও। আর কান্না দেখ কানাইয়ের, ছেলেমানুষ ত বটে, মা বাবাকে ছেড়ে কতদূরে চলে যাচ্ছে। একেবারে মার আঁচল ধরে সে কাঁদছে। অত দুরন্ত ছেলে যে এত কাঁদতে পারে ভাবা যায় নি।

ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠেও সবার চোখে জল। মা কানাইকে ঠাকুমা কাকা কাকীমার বাধ্য হয়ে চলার উপদেশ দিতে দিতে কেঁদে ভাসালেন, শবু ও দীননাথকে আশীর্বাদ করলেন, শাশুড়ীকে প্রণাম করে শরীরের প্রতি যত্ন নিতে বললেন। ট্রেন ছাড়ার মুখে গিরিনবাবু ও দীননাথ ছাড়া আর সবার

চোখে জল—শবুর চোখের জল ত কন্যার বাপের বাড়ী থেকে রওনা হবার চিরন্তনী কান্না।

ছয়

মধুপুর ও মন্দির শহরে প্রায় মাসখানেক কাটিয়ে এসে শবু আবার শ্বশুরবাড়ীর জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছে।

শবু বাপের বাড়ীতে থাকতে স্থানীয় এক স্বর্ণকারকে দিয়ে সোনার নাকছাবি গড়িয়ে নাকে পরে এসেছে, সোনাটা মা-ই দিয়েছেন, কিছুতেই শবুকে সোনা কিনতে দেন নি। শবু ঠিক করেছে এখন থেকে দীননাথের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। একমাসে তার স্বাস্থ্য কিছুটা ফিরেছে সেটাকে আরও ভাল করে তুলবে সেবায় ও যত্নে। কোথাও বেরোতে গেলে হাঁচি, টিকটিকির বাধা যাতে না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। বাড়ীউলী ঠাকুমাকে দেখেছে কেউ কোথাও যেতে নিলে বলেন—যাওন নাই আহ গিয়া। শবু সেটাকে মন্ত্রের মত গ্রহণ করেছে। দীননাথ অফিস বা আর কোথাও যেতে নিলে, অজলোকের উপস্থিতিও মানে না, দীননাথের পাশে দাঁড়িয়ে ডান হাতের দুই আঙুল দিয়ে স্বামীর পিঠে মৃদু টোকা দিতে দিতে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ানোর মত বলে 'যাওন নাই আহ গিয়া'—পরপর তিনবার। যদি গুণতে ভুল হয়ে যায় আবার নতুন করে শুরু করে।

এবারে মার কাছ থেকে চোর তাড়ানোর মন্ত্র শিখে এসেছে—রাতে বিছানায় শোবার আগে বালিশে টোকা দিতে দিতে এক মন্ত্র পড়ে, আবার বালিশে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে আরেক দফা মন্ত্র পাঠ করে তিনবার হাতে তালি বাজায়। এই তালির শব্দ যতদূর থেকে শোনা যাবে তার ত্রিসীমানায় কোন চোর সে রাতে ঘেঁষতে পারবে না, এমনি সে মন্ত্রের ক্ষমতা। দীননাথ অনেকবার ঠাট্টা করে তাকে চোরের মন্ত্রটা শোনাতে বলেছে। না বাবা—এ মন্ত্র যদি আর কাউকে বলে তবে শবু আর সে মন্ত্র পড়তে পারবে না। মা শবুকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়েছে বলে নিজে আর সে মন্ত্র পড়বে না। দীননাথ বলে—যত সব কুসংস্কার। কু-সংস্কার হোক আর যাই হোক সে সব মেনে চলবে এখন থেকে। দীননাথকে সুস্থ রাখাই তার একমাত্র সাধনা।

এপ্রিলে দীননাথের পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন ফলের প্রতীক্ষা।

একবছর আই এস সি পড়ার পর সোনা জোর চেষ্টা চালিয়ে বহরমপুর পলিটেকনিকে সীট পেয়েছে। কিন্তু সেখানে তাকে হোষ্টেলে থাকতে হবে, একটা সাইকেলও তার চাই—কলেজ থেকে হোস্টেল অনেক দূর। খরচ অনেক।

ভব বলল—'আমি সোনাকে হোস্টেলে রাখার জন্য মাসে ত্রিশ টাকা করে আলাদা দেব।'

দীননাথ বলল—'শ দেড়েক টাকায় একটা দেশী সাইকেল আমি কিনে দিচ্ছি—অন্যসব খরচের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেলুড় বা বেলঘরিয়ার মত কলকাতার কাছাকাছির কোন পলিটেকনিকে ট্রান্সফার নিয়ে আসা দরকার—হোস্টেল খরচ বাঁচবে।'

সোনা বহরমপুরে চলে গেল।

অফিসের পরীক্ষায় দীননাথ পাশ করেছে। বিহার উড়িষ্যা আসাম আর কলকাতা থেকে যতজন পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মধ্যে শুধু সেই পাশ করেছে, যারা অস্থায়ীভাবে প্রোমোশন পেয়েছিল তারা নীচে নেমে যাবার অপেক্ষায় আছে। দিল্লী থেকে আরো নির্দেশ এসেছে কলকাতা অফিসের বাইরের লোককে সরিয়ে দিয়ে দীননাথকেই তার জায়গায় বসান হবে সামনের পয়লা তারিখ থেকে।

দীননাথের বিরাট জয় হয়েছে। বিনা পরীক্ষায় প্রোমোশন আর বাইরের লোক রাখার বিরুদ্ধে সে গত একবছর ধরে লড়াই চালাচ্ছিল, দুটো ব্যাপারেই সে জয়ী হয়েছে।

হঠাৎই সব উল্টে গেল। দিল্লী থেকে নির্দেশ এল ঐ পয়লা তারিখে দীননাথকে প্রোমোশন নিয়ে যেতে হবে আসামে আর বাইরের লোকটাই কলকাতা অফিসে রাজত্ব করবে। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় না, লড়াইয়ের পথ বড্ডই দুর্গম ; দীননাথের ধারণা তার স্থানীয় দুজন উপরওয়ালা কলকাঠি নেড়ে সব উল্টে দিয়েছে। সে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে।

শবুরও মন খুব খারাপ। সবার আগে মনে আসে বাড়ীর কথা, কুঁড়ে ঘর মাত্র হয়ে পড়ে আছে, লোনের কোন খবর নেই এখনও। এই অবস্থাতেই সব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। কানাইটা শবুর ভরসায় বরানগরে পড়তে এল, মেজদি অতদূরে চলে গেলে তারও মন খারাপ লাগবে। খবরটা এখনো বরানগরে জানানো হয়নি, জানালে সবাই নিশ্চয়ই খুব দুঃখিত হবে। বাড়ী-

উলী ঠাকুমা পর্য্যন্ত শুনে দুঃখ করতে লাগলেন—

'বাড়ীভাও ভালা কইয়্যা করা হইলো না, বেবাক ফেলাইয়া থুইয়া চইলা যাইবা! ব্যাভার সে বছর বছর ঘুইরা ঘুইরা অসুখ করে বিদেশে তারে দেখব কেডা? শ্রাবণী মা, তুমি ওরে একা যাইতে দিও না তুমিও সঙ্গে যাইবা।'

হ্যাঁ, দীননাথ বলেছে শবুকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। আশেপাশে আত্মীয় অনাত্মীয় যারাই শুনছে তারাই দুঃখ প্রকাশ করছে ওদের দূরে যেতে হবে বলে। শুধু মনে হয় বাড়ীর কারো মনে দুঃখ নেই, বরং কেউ কেউ যেন বেশ খুশী। ভব ত বদলির কথা শুনে থেকে বলতে আরম্ভ করেছে—

'সেজদা সেজবৌদি চলে গেলে এ বাড়ীটা ছাড়া হবে না, আমি এই ঘরে থাকব, আমার ও বাড়ীতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে।'

মা মঙ্গলা দেবীর মনে চাপা আনন্দ—ওরা বদলি হয়ে চলে গেলে সংসারের চাবি কাঠি তাঁর হাতে এসে যাবে, তার উপরে বাড়ীটা ত আছেই।

কিন্তু আবার সব ওলট পালট হয়ে গেল। পয়লা তারিখ দীননাথ অফিসে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে। রাতে খেয়ে উঠে বিছানায় শুয়ে দীননাথ সেই কথাই বলছিল, বাড়ীর আর সবাই চলে গেছে ওবাড়ীতে। দীননাথ শবুকে বলল—

'একেবারে নূতন জায়গায় যাব, সেখানে কাউকে চিনি না জানি না, সরকারী কোয়ার্টারও আমাদের বোধ হয় কোথাও নেই এক দিল্লী ছাড়া, বাসা ভাড়া সুবিধেমত পাব কিনা। তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাব, না হলে পরে আবার কবে নিতে আসব ঠিক নেই, বরং দু চারদিন কোন হোটেলে থেকে বাসা ঠিক করে নেয়া যাবে।

'হাতে সাতদিন সময় আছে, ষষ্ঠীতলায় আর অন্য কয়েকটা জায়গায় আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সেরে নিতে হবে। মনটা খুব খারাপ লাগছে—বিশেষ করে ঐ বাড়ীটার জন্য, টাকার অভাবে একটা ঘরও তোলা যায়নি, তবু ত নিজেদের বাড়ী। যাকগে, ভেবে আর কী হবে! শুয়ে পড়, রাত দশটা বাজে, কাল থেকে গোছগাছ···।'

দীননাথের কথা শেষ না হতে বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—

'লাহিড়ী বাবু আছেন, লাহিড়ী বাবু?'

দীননাথ বিরক্ত হল, একে ত মন মেজাজ ভাল নেই, এত রাতে আবার

কে ডাকাডাকি করে। অপ্রসন্ন মুখে দরজা খুলে দেখে অফিসের এক পিওন।

'সুখবর আছে,' বলে পিওন দীননাথের হাতে একখানি সরকারী বেতার বার্তা দিল।

সত্যিই সুখবর। বার্তায় লেখা আছে—দিল্লীর বড় কর্তা দীননাথের বদলির ব্যাপারে রাজী নয়—বদলি বন্ধ, পরবর্তী আদেশের জন্ম অপেক্ষা কর। পিওন চলে যেতে দীননাথ আনন্দে শবুকে জড়িয়ে ধরল, বলল—

'সত্যিই সুখবর, তাই না?'

সুখবর ত বটেই, কিন্তু শবুদের কুঁড়েঘরে যারা সাতদিন পরে ওরা বদলি হয়ে যাবে জেনে নিশ্চিন্ত সুখনিদ্রায় এখন মগ্ন রাত পোহালে তাদের কানে হয়ত এ খবর সুধা পরিবেশন করবে না।

এর পরে সাতদিন ধরে দীননাথের অফিসে নানা টানা পোড়েন, চোরা স্রোত বয়ে যাবার পর দিল্লীর শেষ আদেশ এল তার প্রোমোশন হবে কলকাতাতেই, বাইরের লোক বিদায় নেবে। দীননাথ দায়িত্ব বুঝে নিল। যে দু জন উপরওয়ালা এতদিন ধরে কলকাঠি নাড়ছিল তাদের গদি এখন টলমল করছে—তাদের বদলি আসন্ন। দীননাথ সর্বাংশেই জয়ী হয়েছে।

গত দু সপ্তাহ ধরে প্রোমোশন ও বদলির ডামাডোল শবুর কাছে যেন শাপে বর হয়ে দেখা দিল—তাকে মানুষ চিনতে সাহায্য করল। প্রথমত ওরা চলে গেলে ও এই ভাড়া ঘরটা নিয়ে থাকবে ভেবেছিল তা আর হল না। মনে মনে সে খুবই অসুখী। সে এখন রীতিমত রোজগার করে, আর সকলের সঙ্গে গরু বাছুর হাঁস ইত্যাদি নিয়ে কুঁড়ে ঘরে বাস করতে হয় সেটা তার পছন্দ নয়। প্রোমোশন হয়ে দীননাথের কাজের চাপ বেড়ে গেছে, ছুটির দিন ছাড়া সকালে বাজারে যেতে পারে না, শবুর উপর বাজারের ভার পড়েছে। সে সকালে এসে চা জলখাবার খেয়ে গল্প আড্ডা সেরে বাজারে রওনা হয়। ফিরে মাছ তরকারির থলে কোনরকমে ফেলে দিয়েই স্নান করে দশ মিনিটের মধ্যে এসে খেতে বসে। এত অল্প সময়ে মাছ তরকারি কি করে রান্না হয় তা দেখার দরকার নেই। এমনি ভাবে সে ওদেরকে জব্দ করতে চায়।

শবুকে রোজ অন্ততঃ এক দুবার নতুন বাড়ীতে যেতে হয় গরুর খাবার নিয়ে আবার কেউ অসুস্থ হলে তার পথ্য পৌঁছে দিতে। কিছু না থাকলেও শুধু বাড়ীর আকর্ষণেও যায়, কিছু গেরস্থালী কাজও সেখানে করতে হয়। ভাড়া বাড়ীতে থেকে এত লোকের রান্না, জনে জনে টাইম বেঁধে খেতে দেওয়া

ঘর দোর পরিষ্কার রাখা গোছানো সবই তাকে করতে হয়। এত করেও সে কারো মন পায় না। এত যে কাজ করে সে কিছুই না—বাড়ীর বৌ ত—করবেই, যেন দাসখৎ লিখে দেওয়া আছে। তার অবস্থা এদের চোখে শ্যামা ঝিয়ের মত—যে এখনও এ বাড়ীতে টিকে আছে। আর শ্যামা আছে বলেই বুঝি শবুও টিকতে পারছে।

তবু আর সকলের মুখ দেখে বোঝা যায়, রোজ কুঁড়ে ঘরে সেখানকার বাসিন্দাদের আলোচনা সভা বসে, সেখানে শবু ও দীননাথের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। দু একটা কথাতেই তার আভাষ পাওয়া যায়। শেফালী বলে—কাল সকালে অত সুন্দর মোচার ঘণ্ট হয়েছিল ভব খেয়ে যেতে পারে নি। ভব রাতে খেতে বসে কথা শোনায়—সকালে যা খেয়ে গেলাম সব কাঁচা অসেদ্ধ। কোনদিন শেফালী বলে—শ্যামা নতুন বাড়ীতে যায় না, সেখানে সব কাজ মাকেই করতে হয়। এ ছাড়াও শবুর আর কি কি দোষ, দীননাথ মা ভাইবোনদের প্রতি কতটা উদাসীন তারও নিশ্চয় চুলচেরা বিচার হয়। একটা উদাহরণ ত হাতেই আছে। রোজ সকালে শবু দুধের ছানা করে দীননাথের টিফিনের কৌটোতে দেয় রুটির সঙ্গে—আর সকলের বেলায় রুটির সঙ্গে শুধুই তরকারি বা চিনি। ওরা দুজনে শত অপরাধে অপরাধী।

এতদিন সবাই মুখ বুজে ছিল, কারণ একা দীননাথ সংসারটা চালাত ধার দেনা করেও। ভব চাকরি পেতেই চাকা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এ অবস্থায় মা মঙ্গলা দেবীর মনের বল অনেক বেড়ে গেছে। তাঁর প্রধান আক্রোশ দীনুর উপর—সংসারের হাল কিছুতেই সে হাতছাড়া করছে না। ভেবেছিলেন ওরা বদলি হয়ে গেলে সবটা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে যাবে তা আর হল না। তা ছাড়া মেজদা বিশ্বনাথের মত দীননাথও অনেক অতীত ইতিহাসের সাক্ষী। শেফালীও সাক্ষী, কিন্তু সে মেয়ে হয়ে মায়ের গুণগান করতে পারে না, করবেও না। আর সব দোষে দোষী শবু—কারণ সে মুখ বুজে কাজ করে, মুখেমুখে তর্ক করেনা, ঝগড়া বাধাবার সুযোগ করে দেয় না। আরও দোষ প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই সে একবার কাকা-কাকীমার বাড়ী যায় কানাই আসার পর থেকে, কখনো দীননাথের সঙ্গে নয়ত একাই।

সুতরাং নতুন বাড়ীতে কুঁড়ে ঘরের বাসিন্দাদের মতে তাদের সব কষ্টের মূলে দীননাথ আর শবু। এদের মধ্যে সোনা একটু অন্যরকম ছিল, অনেকটা বাবার মত নির্বিরোধী—কিন্তু সেত এখানে থাকে না, বহরমপুরে পড়তে গেছে।

ন্যায় আছে হাবলু, সে এ বাড়িতে আশ্রিত তাই অবস্থা বুঝে সেফ্সাইডে থেকে দুদিক বজায় রাখার চেষ্টা করে। ঝণ্টু ত একটা পরগাছা। এইসব নিয়ে বাড়ীতে বেশ একটা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে যেটা দীননাথের অফিসের সেই চোরাস্রোতের চাইতে কম জটিল নয়।

সাত

কথামত শবু প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে কানাইকে দেখতে ষষ্ঠীতলায় যায়, তাকে কানাইয়ের সম্বন্ধে সব খবর লিখে জানিয়ে নিশ্চিন্ত করে। ষষ্ঠীতলার বাসা থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটা স্কুলে কানাইকে ভর্ত্তি করা হয়েছে— সে স্কুলের হেডমাস্টার আবার কাকীমার বড় ভগ্নীপতি, যিনি এক সময় গ্রামের স্কুলে দীননাথদেরও হেডমাস্টার ছিলেন। কাকীমার দিদি জামাইবাবুরাও কাছাকাছি থাকেন। স্কুলের সেক্রেটারী কানাইলাল কাকীমাদের আত্মীয় জন, সেই সূত্রে পুটু কানাই তাঁর সম্পর্কে নাতি হয়। কথাটা কি করে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে চাউর হয়ে গেছে—কানাইকে দেখলেই ছেলেরা বলাবলি করে—দেখ দেখ কানাইলালের নাতি কানাই যাচ্ছে।

ষষ্ঠীতলার বাড়ীতে সে কথা উঠতে শ্রীলা বলে—'কে আর বলবে, কানাই নিশ্চয় বাহাদুরী দেখাতে নিজেই সবাইকে বলে বেড়িয়েছে—কানাইলাল আমার দাদু। অথচ কানাই কখনো কানাইদাদুকে চোখে দেখেনি।'

হতে পারে, ওর ত সব ব্যাপারে ওস্তাদি আছে। সেবার যেমন মেয়েদের স্কুলের প্রাচীরে লিখে রেখেছিল—শ্রীলার ভাই অসিত। স্কুলে এখন সে অসিতের চাইতে কানাই নামেই বেশী পরিচিত।

এক দুবার দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়ে কানাইয়ের পথঘাট সব চেনা হয়ে গেছে। এখন প্রায়ই ছুটির দিন সকালে সে একা একাই চলে আসে—শবুদের ভাড়া বাড়ী নতুন বাড়ী নিয়ে সকলের সঙ্গে হৈ হৈ করে কাটায়। শেফালী ভব হাবলু ঝণ্টু এমন কি কলেজের ছুটিতে সোনা এলে সে-ও কানাইয়ের বন্ধুতুল্য। শুধু মঙ্গলা দেবী থেকে সে একটু দূরেদূরে থাকে। এক দুদিন পরে এক সন্ধ্যায় শবুরা তাকে আবার ষষ্ঠীতলায় রেখে আসে।

ভাড়াবাড়ীটার লাগা একটা পুকুর আছে। প্রথমদিন মেজদির বাড়ী

বেড়াতে এসেই কানাই পাশের পুকুরটা দেখে জিজ্ঞেস করেছে—

'মেজদি ঐ পুকুরে সবাই স্নান করে নাকিরে?'

'হ্যাঁ, করে।'

শবুর জবাবের তর সয়নি, ততক্ষণে কানাই গায়ের জামাটা খুলে ঘরের বিছানায় ছুড়ে দিয়ে কোমরে গামছা বাঁধতে বাঁধতে বলেছে—

'আমিও স্নান করব তবে।'

'দাঁড়া, আমাদের সঙ্গে স্নান করবি। তুই কি সাঁতার জানিস?'

'নাঃ। আমি চললাম স্নান করতে'—বলে কানাই এগিয়ে গেল পুকুরের দিকে।

'ওরে, দাঁড়া, দাঁড়া—আমি বালতি ঘটি নিয়ে আসি'—বলে শবু বালতি ঘটি নিয়ে ছুটল তার পিছনে।

ঘাটে পৌঁছে দেখে কানাই সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে। মেজদি কাছে গিয়ে পৌঁছতেই সে একপাক ঘুরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শবু হায় হায় করে উঠল—'আরে, ও যে জলে পড়ে গেল। ও ত সাঁতার জানেনা…।'

ভব পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

একটু পরে কানাই মাঝপুকুরে ভেসে উঠে বুকের উপর নমস্কারের ভঙ্গিতে দু হাত জোড়া করে চিৎসাঁতার কাটতে লাগল। তাই দেখে শবুর ঘাম দিয়ে গায়ের জ্বর ছাড়ল যেন।

শবু পরে কানাইকে জিজ্ঞেস করল—'কানাই, তুই সাঁতার জানিস আগে বলিসনি ত। কোথায় শিখলি? পুকুরে কত জল, তোর ভয় করছিল না?'

কানাই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল—'পুকুরে কত জল আছে? সমুদ্রের মত কি? আমি এখন সমুদ্রে সাঁতার কাটি। মন্দির শহরে কান্তদের পুকুরে প্রথম সাঁতার শিখি। তারপর জেগাঘরের পুকুর চন্দনপুকুর আর সব শেষে সমুদ্রে।'

ভব এই সময় বলল—'কানাই, তুমি সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পার? তবে ত তুমি ওস্তাদ! তখন তোমার ডাইভ মারার কায়দা দেখেই বুঝেছি তুমি পাকা সাঁতারু, বৌদি শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছিল।'

কানাইয়ের এই রকম সব ওস্তাদি হাবভাব দেখে বাড়ীর সবাই আমোদ পায়। আবার ওর গায়ের কালো রং নিয়েও সবাই মজা করে। বাড়ীউলী ঠাকুমাও হেসে বলেন—

'এমন ফর্সা সুন্দর দিদির ভাইটা এমন কুচকুচে কালো!'

তখন বুঝি কানাইয়ের ফর্সা হবার ইচ্ছে হয়। সাবান মেখে পুকুরে সাঁতার কেটে স্নান করে এসে টেবিলের উপর রাখা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেজদির পাউডারের কৌটো উজাড় করে মুখে পাউডার ঘষতে থাকে। তাকে খেতে ডাকতে এসে কাণ্ড দেখে শবু মিটিমিটি হাসে। এতক্ষণ কানাই ঘষে মেজে নিজেকে প্রায় ফর্সা করে তুলেছিল, আয়নার পিছনে মেজদির ফুটফুটে মুখটি ফুটে উঠতে হতাশ হয়ে মেজদিকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বলে—

'তুই আবার এখানে এলি কেন?'

'আমার সুন্দর ভাইটাকে দেখছিলাম'—বলে শবু হাসে।

কানাইয়ের এমন একা একা হুট্‌হাট করে আসাতে আবার শবুর চিন্তাও বাড়ে। জিজ্ঞেস করে—'হ্যারে কানাই। তুই একা একা আসিস, পথ চিনতে পারিস? গাড়ীঘোড়ার পথ, ভয় করে না?'

কানাই বীরের মত বলে—'ভয় করবে কেন? ষষ্ঠীতলা থেকে পালপাড়া হেঁটে এসে বাসে করে ষ্টেশনে নেমে সোজা চাঁপাতলা—ভারি ত পথ, যে কেউ আসতে পারে।'

'আসার সময় ঠাকুমা, কাকা-কাকীমাকে বলে এসেছিস? কি বলে এসেছিস?'

'বলেছি—মেজদির বাড়ী যাচ্ছি, সেখানে আমার নেমন্তন্ন।'

যতবারই কানাই আসে শবু বারবার তাকে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করে তবে নিশ্চিন্ত হয়।

অফিসে দীননাথের কাজের চাপ বেড়েছে সেই সঙ্গে মাইনেও বেড়েছে। বহরমপুরে সোনার পড়ার খরচ চালিয়েও সংসারে অনটনের ভাবটা আর অনুভূত হয় না। বন্ধকের গয়নাগুলো আগেই ছাড়ানো হয়েছিল। বাইরে যে ছোটখাট ধার দেনা ছিল তাও সব শোধ হয়ে গেছে। এখন দীননাথের পকেটে সবসময় কিছু টাকা পয়সা থাকে।

মা পদ্মিনীদেবীর ছিল সঞ্চয়ের অভ্যাস। শবুরও অনেক দিনের বাসনা ছিল কিছু কিছু করে জমানোর। কিন্তু অভাব অনটনের জন্য তা পারেনি। এখন সে দীননাথের পকেট থেকে এক আনা দুই আনা সিকিটা সরিয়ে রাখে। একটা করে সিকি পেলেই সে সব থেকে খুশি হয়। এখন আবার টাকা পয়সার হিসেব ওলট পালট হয়ে নয়া পয়সা চালু হয়েছে, সের ছটাক

মণ এর বদলে কিলো কুইণ্টাল গ্রাম চালু হয়েছে। পয়সা নয়া-পয়সার হিসাব মিলাতে লোকে গলদঘর্ম হচ্ছে, ট্রামে বাসে দোকানে বাজারে নানা ঝামেলাও হচ্ছে। শবুর তাতে কিছু যায় আসে না—সে পয়সা আনি দু আনি সিকিই পাক আর নয়া পয়সাই পাক—তার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে চালান করে দেয়।

দীননাথের অফিস থেকে ফিরতে প্রায়ই দেরী হয়। শবু অনুযোগ করেও কোন ফল পায় না—অফিসের কাজ, কি করা যাবে? যেদিন বেশী রাত হয়, নটা বেজে যায় সে রাতে বা পরদিন সকালে শবু একটা টাকাই গোপন-ভাণ্ডারে জমা করে দেয়—বেশী রাত করে ফেরার জন্য জরিমানা। দীননাথ বুঝতে পেরে মুচকে হাসে, কিছু বলে না, বরং মজা পায়।

মাঝে মাঝে শবু মার মত তার গোপন ভাণ্ডার খুলে কত জমা হল গুণতে বসে—পনরো টাকা সাত আনা, সাতাশ টাকা এক আনা, তেতাল্লিশ টাকা বারো আনা। এমনি করে পয়সা জমিয়ে সে সাত আনি সোনা কিনে দীননাথ ও নিজের জন্য দুটো আংটি গড়িয়ে আনল ঢাকা জুয়েলারী থেকে। ওদের বিয়ের আংটি প্রথমে বন্ধক ও পরে সেখান থেকে হারিয়ে যাবার পর এতদিনে আবার আঙুলে আংটি উঠল। কুঁড়ে ঘরের বাসিন্দারা সমালোচনার ঝড় তুলবে—তুলুক। ভবর ফেল করা পরীক্ষার ফী জমা দিতে গিয়েই ত ওদের আংটি বাতাস নষ্ট হয়েছে সে কথা সবার ভুল হয়ে গেলেও শবু ভুলতে পারে না। দীননাথও খুশিমনে আঙুলে আংটি পরেছে।

পুজোর মধ্যে একদিন শবু ষষ্ঠীতলায় বেড়াতে গিয়ে ঠাকুমাকে আংটি দুটো দেখাতে ঠাকুমা খুব খুশি হলেন, বললেন—

'বেশ করেছিস, এরকম টাকা জমিয়ে সোনা কিনবি, শাড়ী জামা কিনে টাকা নষ্ট করিস না। এবার এই দেখ আমি তোর জন্য কি এনেছি।' বলে ঠাকুমা একটা নূতন বেনারসী শাড়ী শবুকে দিলেন। শ্রীলা নাচতে গিয়ে শবুর বিয়ের বেনারসীটা হারিয়ে এসেছিল ঠাকুমা মনে করে রেখেছিলেন, এখন নিজের পাশ বই থেকে টাকা তুলে এটা কিনে এনেছেন। শবুর অনেকগুলো শাড়ী আবার শেফালী হারিয়ে এসেছে—নাতনীর জন্য ঠাকুমার অনেক ভাবনা।

শবু আনন্দে গদগদ হয়ে ঠাকুমাকে কাকীমাকে প্রণাম করল। পরে ঠাকুমার গলা জড়িয়ে হেসে বলল—

'ঠাকুমা, তোমাকে যে কি বলে আশীর্বাদ করব, তুমি বাবার চেয়ে এত বড় হও।'

ঠাকুমাও নাতনীর আদরে সোহাগে চোখ দুটো পিটপিট করে—মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। শবু আবার বলল—

'জানো ঠাকুমা, আমি বই পড়ে হাত দেখা শিখেছি। দেখি তোমার হাতখানা।' ঠাকুমার বাঁ হাতখানা নিয়ে শবু অনেকক্ষণ ধরে মনযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

মেজদির এই নতুন গুণের কথায় শ্রীলা এলা কানাইরা চারপাশে ভিড় করল, ঠাকুমার পরেই নিজের হাতটা দেখাবে বলে নিজের নিজের ফ্রকে জামায় হাত ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে লাগল, কানাই সবার দেখাদেখি নিজের বাঁ হাতটা ঘষছে। সে জানেনা, ছেলেদের ডান হাত দেখা হয়—ওরই সমবয়সী এলা শুধরে দিয়ে বলল—

'এই কানাই, বাঁ হাত না, তোর ডান হাত দেখবে—ছেলেদের ডান হাত দেখে।'

ততক্ষণে শবু খুব গম্ভীরভাবে বলতে লাগল—

'শোনো ঠাকুমা, যা যা বলছি ঠিক বলছি কিনা জানাবে। তোমার তিন ছেলে, ঠিক কিনা?

'ঠিক'।

'তিন ছেলেরই বিয়ে হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কোন মেয়ে নেই।'

'না'।

'এখন তোমার আট নাতনী, ঠিক কিনা?'

আর গাম্ভীর্য রাখা যায় না, ঠাকুমা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। ঘর সুদ্ধ সবাই এমন কি কাকা কাকীমাও সে হাসিতে যোগ দিল। এলা ভেবেছিল তার ভূত ভবিষ্যৎ জেনে নেবে—ব্যাপারটা বুঝে রেগে মেজদির পিঠে দুম দুম করে দুটো কিল বসিয়ে বলল—

'জানে না কিছু, শুধু শুধু।'

দেখাদেখি ছোটগুলো পুটু নীলা বাবুলাল সবাই মেজদির পিঠে কিল বৃষ্টি করতে লাগল, ছোটমেয়ে বেলা মাত্র তিন বছরের, সেও বাদ যায় না। বাবুলালের বোধশক্তি নেই, একটা মজার ব্যাপার মনে করে মনের আনন্দে কিলোচ্ছে আর বলছে—

'জানে না, কিচ্ছু জানে না।'

যত কিল খায় শবু তত হেসে গড়িয়ে পড়ে। শেষে কাকীমা এসে বাবুকে থামাল—'ওরে ছাড় ছাড়, মেজদি মরে যাবে যে।'

সঙ্গে সঙ্গে করুণার ধারা নেমে এল—পুটু নীলা বাবু সবাই মেজদির পিঠে কোমল হাত বুলিয়ে বলতে লাগল—

'মেজদি, তোর লাগেনি ত ?'

মেজদিকে সবাই খুব ভালবাসে। শবু এখানে এলে ইচ্ছে করেই বোকার মত উল্টোপাল্টা কথা বলে, হাসায়—আর ওরাও মজা পেয়ে ভাবে মেজদিটা ভারি বোকা। তাই মেজদি বেড়াতে এলে বাড়ীতে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। আর ওদের জামাইবাবু ত আরো এককাঠি উপরে—কখনো সবার সঙ্গে ছুটোছুটি করছে ছাদের উপর উঠে, এক এক জনকে দু হাতে ঝুলিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে, সিনেমা দেখাচ্ছে, গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, বেলুড় দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘুরিয়ে আনছে, একবার ঠাকুমাকেও নিয়ে গিয়েছিল।

এখানেই শবু একেবারে স্বাভাবিক। নিজেদের বাড়ীতে ফিরে এলেই মনে হয় চারদিকে যেন একটা গুমোট আবহাওয়া। অবশ্য এবার পূজোতেও শেফালী একখানা ভাল শাড়ী তাকে কিনে দিয়েছে—শাড়ী হারানোর ক্ষতি-পূরণ হচ্ছে। দীননাথও এবার নববর্ষে ও পূজোয় দুটো শাড়ী তাকে দিয়েছে। শবুর এখন প্রাপ্তিযোগ ভালই চলছে।

আট

পাকা বাড়ী তৈরীর সাধ বুঝি আর পূর্ণ হবে না। প্রায় দু বছর আগে একখানা কুঁড়ে ঘর তুলে সেই যে দু বাড়ী নিয়ে সংসার আরম্ভ হয়েছিল এখনও তাই চলছে। দু বাড়ী নিয়ে হাঁটাহাঁটি টানাটানির বিরাম নেই। আর যেন পারা যাচ্ছে না। দু বছর ধরে রিফিউজী অফিসে ধর্ণা দিয়ে দিয়ে আজ পর্য্যন্ত এ আর ও সাহেবকে ওদের ভিটেয় পদার্পণ করাতে পারা যায়নি। মনে হচ্ছে সরকার বাহাদুর উদ্বাস্তদের নিজেদের চেষ্টায় মাথা গোঁজার ঠাঁই করার ব্যাপারে সামান্য দু চার হাজার টাকা লোন দিয়ে সাহায্য করতে আর রাজী নয়। দেশে উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধান না হতেই সরকার সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। অথচ দীননাথেরই অফিসে পশ্চিম পাকিস্তানের একজন লোক চাকরি করে, সে কেন্দ্রের কাছ থেকে তার ফেলে আসা সম্পত্তির

জন্য তিন লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ পেয়ে এখন চাকরি ছেড়ে দেবে ভাবছে। আর এই ত গত বর্ষায় এ রাজ্যের লোক খাদ্য আন্দোলন করতে গিয়ে নেতারা জেলে গেছে, সত্তর আশীজন মেয়ে পুরুষ পুলিশের লাঠির ঘায়ে মারা গেছে। দীননাথও সে ভুখা মিছিল দেখতে ও সমর্থন করতে গিয়ে অন্নের জন্য পুলিশের হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে। যে সরকার ভাত চাইলে হাতে মারছে সেকি আর বাসস্থান গড়ে দেবে ?

নিরাশ হয়ে দীননাথ রিফিউজী অফিস থেকে তার দলিলপত্তর প্ল্যান এষ্টিমেট সব ফেরৎ এনে সরকারী অফিস থেকে যে বাড়ী তৈরীর লোন পাওয়া যায় তার জন্য দরখাস্ত করেছিল। ছ মাস ধরে নানা লেখালেখির পর স্থায়ী-অস্থায়ী জামিন-জামানত এইসব ফ্যাকড়ায় দিল্লী থেকে জানিয়ে দিয়েছে সেখান থেকেও লোন পাওয়া যাবে না।

অতএব বাড়ী তৈরী করার, কুঁড়ে ঘরকে পাকা করার সব আশাই শেষ। পাকা বাড়ীর স্বপ্ন বুঝি স্বপ্নই থেকে যাবে। কোন দিকে কোন উপায় না দেখে শেষে দীননাথ শবুকে বলল—

'দু বছর ধরে লোনের জন্য চেষ্টা করেও কিছু হল না। এখন যা করার নিজেকেই করতে হবে। ভাইদের একজনের পৈতে, বা বোনের বিয়ে এই সব কারণ দেখিয়ে অফিস থেকে কিছু লোন বের করা যায়। তারপরে দরকার মত গয়না বন্ধক রেখে বাকি টাকা যোগাড় করে একটা পাকা ঘর হয়ত করা যাবে। তুমি কি বল ?'

শবু বলল—'পাকা বাড়ী হবে, ঘর হবে সে ত খুব আনন্দের কথা। আমরা সে ঘরে থাকতে পারব ত ?'

দীননাথ বলল—'নিশ্চয়ই। কুঁড়ে ঘরও থাকবে, আবার তার পাশের শোবার ঘরের ভিতের উপরে পাকা ঘর উঠবে, আমরা ভাড়া ঘর ছেড়ে দিয়ে সে ঘরে গিয়ে উঠব। রান্নার জন্য একটা জায়গা করতে হবে।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'আবার ধার দেনা করবে, শোধ দেবে কি করে ?'

দীননাথ বলল—'যেমন করে আগের ধার-দেনা শোধ দিয়েছি—সেইভাবে একটু একটু করে শোধ দেব, বন্ধকী গয়নাও ছাড়িয়ে আনব। সব শোধ হলে আবার ধার-দেনা করে আর একখানা ঘর তুলব। এমনি করে খেয়ে না খেয়ে বাড়ীটা শেষ করতে হবে, সরকারের আশায় বসে থাকলে কোন দিনই হবে না। বাড়ীর জন্য তোমাকেও অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। পারবে না ?'

শবু বলল—'তাই কর। কষ্ট হোক আর যাই হোক নিজেদের বাড়ী ত হবে।'

নিজেদের বাড়ী হবে, সেখানে সংসার পাতা হবে, এর মত সুখ আর কি আছে ?

ওভারসীয়ার ভবর সঙ্গে বসে প্ল্যান এষ্টিমেট করে দেখা গেল একখানা ঘর ভিতের উপর থেকে গেঁথে তুলতে প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ পড়বে। তাও পাকা ছাদ করা যাবে না, এসবেসটস বা টিনের চালা দিতে হবে। বর্ত্তমানে যা ভীষণ বাজার দর—মিস্ত্রির রোজ সাড়ে তিন টাকা, মজুর-আড়াই টাকা, ইট পঁয়ষট্টি টাকা হাজার, সিমেন্ট—একশ কুড়ি টাকা টন। প্রচুর খরচ।

কাজ শুরু হল। শীতকাল, মাঠঘাট শুকনো, বৃষ্টি বাদলা নেই। দীননাথ একদিকে ধার-দেনা করছে, শবুর একটা একটা করে গয়না বন্ধক পড়ছে আর ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে চলেছে।

রোজ রান্না খাওয়া সেরে দুপুরে শবু চলে আসে নতুন বাড়ীতে, একটু একটু করে বাড়ীটাকে গড়ে উঠতে দেখে মনে মনে প্রচণ্ড খুশি হয়। এক একটা ইটকে যেন মনে হয় বুকের এক একটা পাঁজর। সারির পর সারি ইট গেঁথে ঘরের দেওয়াল উঠতে থাকে, সে তার প্রতিদিনের কাজের সাক্ষী। লিন্টেল অবধি হয়ে গেলে তবে মোটামুটি একটা ঘরের আন্দাজ সে পায়। সে রাতে শবু দীননাথকে বলল—

'ঘরটা ভা—রি সুন্দর হচ্ছে, আমি এতদিন বুঝতেই পারছিলাম না কি রকম ঘর হচ্ছে, কোথায় দরজা জানালা বসছে--এখন সব বুঝতে পারছি।'

দীননাথ বলল—'প্ল্যানে ত সবই দেয়া আছে, তোমাকে আগে তা দেখিয়েছিও।'

'কি জানি বাবা, প্ল্যান দেখে আবার কেমন ঘর হচ্ছে বোঝা যায় না কি ? আমার মাথায় ঢোকে না। ঘরটা কিন্তু খুব সুন্দর হচ্ছে।'

'তোমার পছন্দ হয়েছে ?'

'খু-উ-ব'।—শবু মনের খুশি চেপে রাখতে পারে না।

সে প্ল্যান দেখেও কি রকম ঘর হচ্ছে বুঝতে পারেনি পরদিন সে কথা শুনে ভব ববলল—'বৌদি, তোমার আর প্ল্যান বুঝে কাজ নেই, তোমার মাথায় তা ঢুকবেও না। তার চাইতে সেজদার আজকাল বাঁ হাতের আমদানী কি রকম হচ্ছে তাই দিয়ে তোমার মগজ ভর্ত্তি করে রাখ। বাঁ-হাতের আমদানী না

থাকলে কি কেউ এ বাজারে মাইনের টাকায় পাকা ঘর তুলতে পারে সংসার চালিয়েও ?'

শবু বলল—'বাঁ-হাতের হিসেবটা তোমার মগজেই ভরা থাক। ঢাকা জুয়েলারীতে গিয়ে বন্ধকের হিসেবটা একবার দেখে এসো, সেখানে আমার গয়নাও দেখতে পাবে, আর ওর অফিসের খাতায় গিয়ে দেখে এস পাঁচশ টাকা খরচ করে তোমার পৈতে দেওয়া হয়ে গেছে।'

ভব চমকে ওঠার ভান করে বলল—'সে কি, তোমরা আমার পৈতেও দিয়ে দিয়েছ! আমার পৈতে হয়ে গেল অথচ আমি জানলাম না, কাকপক্ষী-তেও টের পেল না ?'

শবু বলল—'না, শুধু অফিসের খাতায় লেখা হয়ে রইল. আর ওদিকে ঘর উঠল।'

ভব বলল—'তোমরা দেখি বড়ই ধড়িবাজ।'

'হ্যাঁ ধড়িবাজ না হলে তোমাদের সংসারে বাস করা যায় না, বাড়ীও হয় না'—শবুর স্পষ্ট জবাব।

'বাঃ বেশ বলেছ' বলে ভব হেঁ হেঁ করে হাসতে লাগল।

শবুর কথাটা যে কত খাঁটি লিণ্টেলের উপরে কিছুটা গাঁথা হতেই সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। ভব সে সময় দীননাথকে বলল—

'শুধু শুধু উপরে কেন এ্যাসবেসটস দিবি, পরে আবার খুলতে লাগাতে ডবল খরচা পড়বে। এ্যাসবেসটসে যা খরচ পড়বে তার উপর আর মাত্র শ দুয়েক টাকা দিলে এখনই পাকা ছাদ হতে পারে।'

দীননাথের তখন দমবন্ধ অবস্থা। বলল—'আর দুশ টাকা কেন দুশ পয়সা খরচ করার ক্ষমতা আমার নেই। এরপরে দরজা জানালার পাল্লা আছে, ভিতরের প্লাস্টার, মেঝে করা আছে।'

ভব বলল—'ঠিক আছে, আমি না হয় ঐ টাকাটা দিচ্ছি, ঢালাই ছাদই কর।'

শবু কাছেই ছিল, বলল—'এটা কি তোমার বাঁ হাতের আমদানী ?'

'যা বল' বলে ভব মিটিমিটি হাসতে লাগল।

শেষ পর্য্যন্ত পাকা ছাদই হল। ঘরে দরজা জানলা লাগিয়ে ভিতরের প্লাষ্টার ও পাকা মেঝেও হল। তারপর ঘরের চুনকাম হয়ে গেলে সেই বসন্তকালেই দীননাথ ও শবু নিজেদের পাকা ঘরে উঠে এল—সেই সঙ্গে রান্নাও উঠে এল নতুন বাড়ীতে।

ভব বলল—'কুড়ি টাকার ঘরটা ছাড়া হবে না, আমি ঐ ঘরে থাকব।'

শেফালী বলল—'সোনা কলেজ ট্রান্সফার নিয়ে এখানে আসছে, সেও তাহলে তোর সঙ্গে সে ঘরে থাক।'

ভব বলল—'না, তা হবে না, আমি একা থাকব।

মা মঙ্গলা দেবী মন্তব্য করলেন—'তা রাখবি কেন, ওখানে যে মধু আছে। কাঁঠালের আঠা, একবার লাগলে আর ছাড়ে না।'

ভবর মতলব সবাই টের পায়। বাড়ীউলী ঠাকুমার এক নাতনী আছে, নাম হরিমতী, কালো কুচকুচে। প্রথম প্রথম শেফালী ভব সোনা সবাই আড়ালে তার নাম দিয়েছিল—রূপের কাঁঠাল। নানান কারণে পাড়ায় তার সুনাম্ বদনাম দুই-ই আছে। দু বছরের আসা যাওয়ায় ভবর চোখে সেই রূপই কাঁঠালের আঠা হয়ে লেগে গেছে। একা ঐ বাড়ীতে থাকলে হাজার সরষের তেল লাগালেও সে আঠা আর ছাড়ানো যাবে না।

শেফালী অত মুখফোঁড় হয়েও কিন্তু ভবকে কিছু বলতে পারল না। কারণ সে-ও যে সেই রিফিউজী কলোনীতে যাতায়াতের সূত্রে একজনের সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়া করে ফেলেছে। সেই বি টি রোডের ধারের বাড়ীতে থাকতে সে ছেলেটি মাঝে মাঝে আসত, শবু তাকে দেখেছে লাজুক লাজুক চোখে শেফালীর দিকে তাকাত। পরে অবশ্য শেফালী নিজে মুখেও শবুকে কিছু বলেছে।

ভব ভাবছে সে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না। কিন্তু শেফালী শবু সোনাই শুধু নয় তাদের মাতাঠাকুরানীও বিলক্ষণ জানে। জানে না শুধু দীননাথ।

সোনা ট্রান্সফার নিয়ে এসে ভর্তি হল স্থানীয় পলিটেকনিকে। সে এখন সাইকেল ছাড়াই কলেজ করছে। দীননাথের সুবিধে হয়েছে, সে সাইকেলে ষ্টেশনে গিয়ে এক দোকানে জমা রেখে অফিস যাতায়াত করতে পারছে।

কুঁড়ে ঘরের একটা অংশে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সোনা আসাতে সে ঘরে জায়গার টানাটানি হতে লাগল। ভব ভাড়া করা ঘরে থাকলেও এঘরে মা, শেফালী, সোনা, হাবলু চারজন লোক তার উপর আবার ঝণ্টু। শেষে ঝণ্টুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল তার বাপের কাছে—তাতে জায়গাও বাঁচল খরচও বাঁচল।

বাড়ীতে দেশী গাইটা আছে, তার বাছুর আছে, দুধও দিচ্ছে। ওদের

চালাটা আবার নীচু জমিতে একটু মাটি ফেলে তার উপর বাঁধা হয়েছে—দেখা যাক সামনের বর্ষায় কি হয়। হাঁসগুলোও আছে। নারকেল ও গুপারী গাছগুলো একটু একটু করে বাড়ছে, আর এক বছরেই কলতলার পাশে কলাগাছের ঝাড় গজিয়ে উঠেছে। বেড়া দিয়ে ঘেরা খাটা পায়খানা পাড়ার লোকের আপত্তি সত্বেও টিকে আছে। বাড়ীর আব্রু ও বাথরুমের প্রয়োজনে পশ্চিম সীমানা বরাবর প্রায় মাথা সমান উঁচু একটা লম্বা প্রাচীর দেওয়া হয়েছে—পরিচিত লোকেরা ঠাট্টা করে বলে, চীনের প্রাচীর। রাস্তা ঘাট এখনো হয় নি, শুধু পায়ে চলা পথ।

মাস দুয়েক হল তারা নতুন বাড়ীতে নতুন ঘরে এসেছে। বৈশাখ মাস, এখন শুক্লপক্ষ। শবু একটু একটু করে নিজেদের বাড়ীটাকে দেহ মন দিয়ে অনুভব করে, নিজেদের হাসি কান্নায় মেশানো স্বপ্নের সৌধ রচনা করে চলে। আকাশে ভরা জোছনা, পূবের বড় জানালা দিয়ে জোছনার জোয়ার এসে আছড়ে পড়ে ঘরের মধ্যে একেবারে বিছানার উপরে। চারপাশের মাঠ বাড়ী ঘর সেই জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করতে থাকে। দক্ষিণের দরজা জানালা দিয়ে হু হু করে দক্ষিণের হাওয়া ঢুকে ঘরের কাগজপত্তর ক্যালেণ্ডার সব ওলট পালট করে দিতে থাকে। এমন সুন্দর মোহময় পরিবেশে দীননাথ শবুর মনের স্বপ্নকে আরও বাড়িয়ে তুলে বলতে থাকে—

'এখানকার মাঠের অধিকাংশ জমি প্লটে প্লটে ভাগ হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে। এক এক করে সেখানে ঘর উঠবে, লোকজন আসবে। রাস্তাঘাট হবে। ধীরে ধীরে জনপদ গড়ে উঠবে, বিদ্যুৎ আসবে, জলের পাইপ বসবে। সব নাগরিক সুবিধা একটু একটু করে পাওয়া যাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে ওপার বাংলার লোক আসছে, দু এক ঘর এদেশীও আছে। আগেই এসেছিল সরকার বোস ভট্‌চায ঘোষ গুহ রায় ও বিশ্বাস বাবুরা। বছর খানেকের মধ্যে এল মালাকার, আর এক রায়, দাস, দুই চক্রবর্তী, ব্যানার্জি, দত্ত। বাড়ীর সামনের গলি দিয়ে দিনে রাতে লোক চলাচল করবে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ডেকে বলব 'বলি কে যায়?' উত্তর আসবে—'আমি মালাকার' 'আমি চক্কোত্তি' 'লাহিড়ী বাবু যে, এত রাতেও আপনি জেগে আছেন?' বলব—এই একটু চাঁদের শোভা দেখছি।'

বলতে বলতে সে পূর্ণিমার চাঁদের মত শবুর সুন্দর মুখখানা দু হাতে তুলে ধরে তার দু চোখে চোখ রাখে, দৃষ্টিতে ঘনায় স্বপ্ন। স্বপ্ন, স্বপ্ন আর স্বপ্ন—

দু জনের চোখেই নেমে আসে স্বপ্নের আবেশ। চিরকালের ঘর বাঁধার স্বপ্ন
যুগে যুগে নারী ও পুরুষ নিজেদের জন্য এমনি এক একটি ঘর বাঁধতে চেয়েছে
বেঁধেছেও। সেই হল জীবন প্রবাহ, সমাজের ধারা। এই ঘরের আকর্ষণে
প্রবাসী ঘরে ফিরে আসে। এই ঘরকে সুরক্ষিত রাখতে মানুষ পরিশ্রম
করে, যুদ্ধ করে শান্তির সপক্ষে। আবার এই ঘর তৈরী করতেই মানুষকে
করতে হয় আর এক যুদ্ধ যার নাম জীবন-যুদ্ধ।

আর শুধু ঘর থাকলেই ঘর হয় না, থাকতে হয় ঘরনী—যার হাতে
ছোঁয়ায় লাগবে লক্ষ্মীর হাতের স্পর্শ, ফুটে উঠবে লক্ষ্মীশ্রী। ভাড়া বাড়ীর বৃ
ভদ্রলোক বলতেন—বুঝলা শ্রাবণী, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। গৃহই কইয়া দি
গৃহিণীটি কেমন? কথাটা বাবা কালীনাথও বলতেন, তবে সে অনে
ক্ষোভ, অনেক আক্ষেপে। বহু বছর ঘর তিনি করেছেন কিন্তু ঘরের সু
তিনি পেয়েছেন কিনা শবুর জানা নেই। আজ তিনি নেই, থাকলে নি
কত খুশি হতেন, শবুও তাঁকে সেবা যত্ন করে ধন্য হ'ত, তৃপ্ত হ'ত। আ
মনে হচ্ছে ওরা কত সুখী, দীননাথের একার চেষ্টায় ও পরিশ্রমে নিজেদে
ভদ্রস্থ মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। মা পদ্মিনীদেবী বলেন—ছেলেরাই হ'
ঘরের লক্ষ্মী, তারা সব জুটিয়ে এনে দেয় মেয়েরা তাই দিয়ে ঘর সাজায়
আলো করে। মার কথাই ঠিক।

তবু সুখের দিনেও শবুর মনে বেদনার স্রোত বয়ে চলে—বাবা, মেজ
যাঁরা বাড়ীর স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা আজ আর নেই।



পর্ব—৪

এক

একদিকে শবু যখন স্বপ্ন দেখছে তখন অন্যদিকে একটু একটু করে মেঘ জমছে। প্রথম প্রথম বেশ চলছিল। শবু একান্তে যেমন স্বপ্ন দেখছে তেমনি বাস্তবে ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ করে চলেছে। সেই কোন ভোরে উঠে উনুনে আঁচ দেয়, সকালের চা জলখাবার যোগান দেয়, সকলের জন্য রান্না চাপায়, আমিষ নিরামিষ সবটা তাকে রান্না করতে হয়। ভব সকালের বাজার এনে দিয়েই স্নান করতে যায়, ষ্টোভ জ্বালিয়ে হাত পা পুড়িয়ে অফিস স্কুল কলেজের রান্না সারতে হয়, সবাইকে সময়মত খেতে দেয়া, এঁটো পরিষ্কার করা সবই করতে হয়। মঙ্গলাদেবী দশটা এগারোটার মধ্যে খেয়ে নেন। সোনা কোনদিন খেয়ে কলেজে যায়, আবার কাছে কলেজ হওয়াতে কখনো দুপুরে অফ্ পিরিওডে এসে খায়। সব সেরে নিজের স্নান খাওয়া সারতে রোজই বেলা দুটো আড়াইটে বেজে যায়। সকালের জলখাবারটাও সবদিন সময় মত খেতে পারে না, সে খেল কিনা সে খবরটাও কেউ নেয় না। এরপর আবার বিকেলের চা জল খাবার, রাতের রান্না খাওয়া সবই আছে। একজন মেয়েমানুষের পক্ষে মাসে ত্রিশদিন বিরামবিহীনভাবে সব কাজ করা যে কতখানি অসুবিধেজনক, বাড়ীর আর দুজন মেয়েমানুষ তাও যেন বোঝে না। এতর মধ্যে শবুর একমাত্র বিলাসিতা—বাসন মাজা, উনুন পরিষ্কার করা আর কয়লা ভাঙা এ তিনটি কাজ সে কিছুতেই পারে না। তার জন্য শ্যামা ঝি এখনও বহাল আছে।

পাকা ঘর তৈরীর কাজ যখন শুরু হল তখন মা মঙ্গলা দেবী বেশ ভাল মানুষ, ঘর তৈরী হয়ে ছেলে ছেলের বৌ সে ঘরে উঠল তখনও তিনি ভালমানুষ, ভব একা ভাড়া ঘরে থাকবে ঠিক করল তাতেও তেমন কিছু বললেন না। কিন্তু যেই সোনা এসে এখানকার কলেজে ভর্ত্তি হল আর ঘরে জায়গার অভাব বলে ঝন্টুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল, অমনি তিনি একটু একটু করে বিগড়ে যেতে লাগলেন। সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল দীনু ও শবুর উপর। দীননাথের উপর আক্রোশের কারণ, সে ত সংসারের চাবিকাঠি হাতছাড়া করেই নি তার উপর ঝন্টুটাকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে রোজগেরে ছেলে,

সংসারটাকে চালাচ্ছে, তাকে কিছু বলা যায় না—তাই সবটা আক্রোশ গিয়ে পড়েছে শবুর উপর।

দীননাথ রোগা পটকা মানুষ, ফি বছর অসুখে পড়ে সুতরাং কাঁচা ঘরে তাকে শোবার কথা বলা যায় না, ফলে শবুকেও কাঁচা ঘরে থাকতে বাধ্য করা যায় না। সেটাও শবুর দোষ। সেদিন করবী এসে একবেলা বেড়িয়ে গেল, তাকে বলে শবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে মঙ্গলাদেবী গায়ের ঝাল মেটাতে লাগলেন—

'দেখ করবী আজ ছ বছরের উপর আমরা কাঁচা ঘরে পড়ে আছি, বর্ষা জল কাদায় শীতে কত কষ্ট ভোগ করছি। এদিকে বাড়ীর বৌ যেন রাজরানী পাকাঘর ছাড়া মাটিতে তার পা পড়ে না। ভাতারের ঘর পেয়েছে, বলি ভাতারটা এল কোত্থেকে?'

করবী ইন্ধন যোগায়—'সত্যি মা, সেজদা সেজবৌদির এ অত্যন্ত অন্যায়। আমরা যদি কখনো বাড়ী করি তবে নিজেরা কাঁচা ঘরে থাকি মাটির ঘরে থাকি থাকব কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীকে আমরা মাথায় করে রাখব, পাকা ঘরে তাদের আগে নিয়ে তুলব।'

সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা দেবীর ভোল পাল্টে গেল, বললেন—'ঐ বুড়া বুড়ীকে শুধু তোরা দেখবি কেন, তোর আর সব দেওর ভাসুররা কি মরিছে? বাপ মায়ের দায়িত্ব সব ভাইয়ের সমান, খবরদার তোরা একা সব বোঝা ঘাড়ে নিবি না।'

করবী তার মার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে, 'সেজবৌদি, তোমাদের পাকা ঘর হয়েছে, পাকাঘরে বেশ ভালই আছ'—বলে বাঁকা হেসে বাড়ী চলে গেল।

একদিন বিকেলে শেফালী স্কুল থেকে শনিবার বলে তাড়াতাড়ি ফিরেছে, শবু তার একটু আগে খেয়ে উঠে শুয়েছে। শেফালী বৌদিকে বিরক্ত না করে মাকে বলল—

'মা, ঘরে জলখাবার কি আছে?'

মঙ্গলা দেবী এগারোটায় খেয়ে উঠে শোয়া-বিশ্রাম সেরে একটাতেই উঠে গেরস্থালী কাজে লেগে পড়েন। মেয়ের কথায় মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন—

'জিজ্ঞেস কর গা মদনশালিনী বৌকে, তিনটে বেজে গেছে এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।'

এসব ব্যাপারে মঙ্গলা দেবী আস্তে কথা বলেন না, কথাটা শবুরও কানে গেল। কান দুটো হঠাৎই গরম হয়ে উঠল, এমন ভাষা এমন বিশেষণ সে

খনো শোনেনি। বয়সের গুণে তার রোগা পাতলা হাড্ডি চেহারায় এখন বুঝি মান্য একটু মাংস লাগছে, তাই নিয়ে যে এমন কথা বলা যায় জানা ছিলনা। কালী দু পাতা লেখাপড়া শিখেছে, এ অবস্থায় সেও বোধ হয় লজ্জা পেল— সেই খুঁজে পেতে শুকনো রুটি নিয়ে খেতে লাগল। শবুর তক্ষুণি বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না, লজ্জায় সেও যে এখন কারো দিকে তাকাতে পারবে না।

সোনার কলেজ কাছেই, এ অঞ্চলের কিছু ছেলে তার সঙ্গে পড়ে। এ পাড়ার এক ছেলে ওপাড়ার একজন এমনি আরো দু চারজন আছে। এক একদিন কলেজ ছুটির পর সোনা তার বন্ধুদের বাড়ীতে নিয়ে আসে, বলে—

'বৌদি, একটু চা-টা হবে?'

'হ্যাঁ হবে' বলে শবু চা করতে যায়। সোনা প্রথমে বন্ধুদের নিয়ে নতুন ইঞ্জিনীয়ারীং বিদ্যায় এই পাকা ঘরখানার তৈরীর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে পাশে চক্রবর্তীদের যে নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে তাতে কি কি ত্রুটি হচ্ছে তাই নিয়ে আলোচনা করে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করে—

'এর জন্য বাড়ীর কি কোন ক্ষতি হবে?'

সোনা আর তার বন্ধুরা একবাক্যে রায় দেয়—'এ ঘর একদিন ভেঙে পড়বে—আমাদের বইয়ের লেখার সঙ্গে এর কাজ মিলছে না।'

চক্রবর্তী এবার তার বড় মিস্ত্রির দিকে তাকাতে সে একটু মুচকি হেসে বলল—'এনারা সব কলেজে পড়া ইঞ্জিনীয়ার বাবু, আমরা হলাম গিয়ে হাতের কারিগর। যদি ভাঙে তখন আমার কান ধরে নিয়ে আসবেন—আমি বিনা মজুরিতে আবার গড়ে দেব।'

শবু বাড়ীর উঠোন থেকে ডাকে—

'সোনা, অন্যের বাড়ী পরে ভেঙো, এখন তোমরা চা খাবে এস।'

সবাই এসে শবুদের পাকা ঘরে ঢোকে, বসবে আর কোথায় বিছানাতেই বসে, চা খায়, গল্প করে, গড়ায়। এক সময় সোনা বলল—

'জান বৌদি, আমি সামনের কলেজ সোস্যালে মাউথ অর্গান বাজাব, সেদিন তোমাকেও নিয়ে যাব আমাদের কলেজে।'

শবু বলল—'বেশ, নিয়ে গেলে যাব।'

সোনার এক বন্ধু বলল—'সোমনাথ, মাউথ অর্গ্যানে একটা হিন্দীগান বাজা শুনি।'

সোনা বলল—'হ্যাঁ, এখন বাজাতে পারি, সেজদা থাকলে বাজাতে পারি—হিন্দী গান শুনলে রেগে যায়।' বলে মাউথ অর্গ্যানে একটা হিন্দী গানে সুর বাজাতে লাগল।

শবু হিন্দি গানের মাথামুণ্ডু বোঝে না তবু ঠিক সুরে বাজালে শুনতে ভাল লাগে। বাজানো শেষ করে সোনা জিজ্ঞেস করল—

'বৌদি, কেমন লাগল?'

বড় সমঝদার ঠাউরেছে। ছোটবেলাকার গান বাজনার কথা মনে এলে এখনো হাসি পায়। মনে মনে হেসে বলল—'বেশ ভালই লাগল শুনতে এ বিদ্যে আবার কোথায় শিখলে?'

সোনা বলল—'হুঁ হুঁ বাবা, বহরমপুরে হোস্টেলে থাকতে খুব প্র্যাকটিস করেছি, আর কোন কাজ ছিল না ত।'

বন্ধুরা তৎক্ষণে হৈ হৈ করে উঠল—'বৌদি ভাল বলেছে, তবে সোমনাথ সোন্তালে তুই নির্ঘাত একটা প্রাইজ পাবি।'

ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে যাবার আগে চায়ের জন্য বৌদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তারা চলে গেল। এরকম তারা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার আসে, আশেপাশে যত নতুন বাড়ী হচ্ছে দেখতে যায় আর বাড়ী ভেঙে পড়বে বলে ভয় দেখিয়ে আসে, চা খায়, গল্প করে, শবুদের বিছানায় গড়াগড়ি দেয়।

এমনি এক রাতে দীননাথ ভব সোনা হাবলু খেতে বসেছে। রান্না কাঁচা ঘরে হলেও খাওয়া দাওয়া সব পাকা ঘরের মেঝেতে হয়। শবু সবাইকে খেতে দিচ্ছে, শেফালী বিছানায় বসে আছে, এদের খাওয়া হলে ওরা দুজন খাবে। একসময় শবু বলল—

'জান ভব, সোনা আর তার বন্ধুরা এই মাঠে যত বাড়ী হচ্ছে সব ভেঙে ফেলছে, কবে হয়ত তোমার কথামত তৈরী এই ঘরটাও ভেঙে ফেলবে।'

ভব বলল—'দেখ সোনা, ঐ রকম কথায় কথায় সকলের বাড়ী ভেঙে পড়বে বলিস না। প্রথম প্রথম আমারও সেরকম মনে হত, পরে প্র্যাকটিক্যাল লাইনে গিয়ে দেখছি বইয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকলেও বাড়ীগুলো কি আশ্চর্য্য কায়দায় টিকে থাকে।'

দীননাথ গম্ভীরভাবে বলল—'যাক, আমাদের ঘরটা তবে হয়ত আর ভাঙবে না।' সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

পাশের ঘর থেকে মঙ্গলা দেবীর মন্তব্য শোনা গেল—'সারাদিন কেবল হা হা হি হি করতে দাও তা হলেই হল।'

সবাই হাসি বন্ধ করে যে যার মত খেয়ে উঠে গেল। এরকম মন্তব্য শুধু
দই হল না। সোনার বন্ধুরা এসে চলে গেলে, শবুর ভাই বোনরা এলে
লে মঙ্গলা দেবীর এরকম মন্তব্য প্রায়ই শুনতে হয়—অত বড় দেওর আর
র বন্ধুদের সঙ্গে হাসাহাসি গান গল্পের ফোয়ারা ছুটছে, এত দেওর প্রীতি
ল নয়। শুনে কানে আঙুল দিতে হয়। শবু কি তাদের ডেকে আনে?
না কেন তার বন্ধুদের ডেকে এনে তার যার সামনে বসিয়ে গল্প করে না,
খাওয়ায় না সে কথা ত সোনাকেই বলতে পারেন। না, তার জন্যও দায়ী
?

দুই

শুধু এ সবই নয়, দীননাথ বাড়ীতে না থাকলে কারণে অকারণে মঙ্গলা
বীর মুখ চলতে থাকে।

'সোয়ামীর রোজগার সোয়ামীর বাড়ীর গর্বে মাটিতে পা পড়েনা। আমিও
ওয়ানের মেয়ে।'… ..

'আমার আরো তিনটে ছেলে রাজার চাকরি করে, আর একটাও দুদিন
দে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বার হবে—আমি কি কারো ভাতারের রোজগারের
য়াক্কা করি?'…

'ইস্ বড় গুমোর হয়েছে, বাড়ী হয়েছে—বাড়ী আর আমরা কখনো
খিনি। দাদারই দশ কাঠা জমির উপর বাড়ী আছে, সেখানে গেলে
মাকে মাথায় করে রাখে।'…

'পড়ে আছি এখানে কি সাধে? শেফালীটার এখনো বিয়ে দেওয়া যায় নি,
মার ত আর গয়না নাই—কে আর তার বিয়ের ব্যবস্থা করবে।……

'সোনাটার এখনো পড়া শেষ হয়নি। এসব মিটে গেলে ঝাড়া হাত পা
য়ে দাদার সংসার আগলাতে চলে যাব। দাদার অভাব কিসের, দেশে তার
বশাল জমিদারী বারোভূতে লুটে খাচ্ছে। ঝন্টুর কি খাবার অভাব? সে
কি এখানে দু মুঠো অন্নের জন্য পড়ে ছিল? তাকে তাড়াল বুদ্ধি দিয়ে দিয়ে।…

'যেদিন চলে যাব ভবা সোনাকে আলাদা করে দিয়ে যাব। তারপর যখন
বাবার অসুখে পড়ে মরতে বসবে তখন ডাক ছাড়তে হবে—কোথায় ভবা,
কোথায় সোনা, আমার সোয়ামীকে বাঁচাও।'

এতসব কথা একদিনে একভাবে বলা হয় না, দিনে দিনে ক্ষেপে ক্ষেপে শুনতে হয়। একই কথা শুনতে শুনতে শবুর কান পচে গেছে—আর সব কথার মূল হ'ল ঝণ্টুকে তাড়ানো হয়েছে যার জন্য শবুই নাকি দায়ী।

বাবা গিরিনবাবু বলেন—বেশী কথা বলতে না পারাটা, ঝগড়া না, করাটাই বুঝি শবুর কাল হয়। হয়েছেও তাই। শবু কোন কথার জবাব দেয় না, শুধু চুপ করে থাকে, কাউকে কিছু বলেও না—তাই ঝগড়াও বাধে না।

তবু বোবারও শত্রু আছে।

দুস্তর মরুভূমির মাঝে একটুখানি মরুদ্যান যেন দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন হল মামীশাশুড়ী অনিমা দেবী হঠাৎ বিপন্ন হয়ে স্বামী পুত্রদের নিয়ে কাছাকাছি বোসদের বস্তিবাড়ীতে দশটাকায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে এসে উঠেছেন বড় ননদ ও ভাগ্নে দীননাথের ভরসায়। মামা পুলিশের দারোগা, ঘোড়ার পিঠে চেপে ডিউটি সেরে ফেরার পথে উঁচু বাঁধের উপর থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে ঘাড়ে আঘাত পান। আর তা থেকেই বুদ্ধিভ্রংশ ও আংশিক পক্ষাঘাত। এক বছর ছোট ননদ—যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে স্বামী পুত্রদের নিয়ে সংসার চালান, বড় ছেলের বৌ রাণুকে পাগল বানিয়ে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় আধপেটা খেতে দিয়ে না-দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে জব্দ করেন—সেই প্রমীলা দেবীর পরামর্শে বড় বড় ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে নগদ টাকা পয়সা সব শেষ করে প্রায় সর্বস্বান্ত অবস্থায় অপয়া বদনাম নিয়ে এখানে এসে পড়েছেন। অনিমা দেবীর ভাষায়—

'এক বছর ধরে ছোড়দি আমাদের নিজেদের কাছে রেখে হাসপাতাল—প্যালিয়ামে রেখে চিকিৎসা করেও মানুষটাকে ভাল করতে পারল না। নগদ সব শেষ হয়ে যেতে আমার গয়নাগুলো নিতে চায়। আমার ত মনে হয় কোন চিকিৎসায় ফল হবে না, গয়নাগুলো গেলে স্বামী তিন ছেলেকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব, কে আমাদের দেখবে? বড় ছেলে দুলু সামনের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে ক্লাস টেনে উঠবে, চিনু আর ভুলু ত শিশু। গয়না বেচে চিকিৎসা করাতে রাজী হলাম না বলে ছোড়দি আমাকে বদনাম দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিলেন। বললেন—'এ বৌ অপয়া, পেটে শুধু ছেলেই ধরেছে, একটাও মেয়ে নেই, কথায় বলে বাঁজার মুখ দেখ ক্ষতি নেই কিন্তু মেয়ে-আঁটকুড়ির মুখ দেখাও পাপ—কয় ছেলের পরে আমার সীতু হয়ে থেকেই আমাদের অবস্থা ফিরল, দোমহলা পাকা বাড়ী করার প্ল্যান করেছিলাম

কিন্তু হতচ্ছাড়া হিন্দুস্থান পাকিস্তানের জন্য সব বানচাল হয়ে গেল।' আমি আর কোথায় যাব বড়দি-এলাম আপনার আশ্রয়ে, এখানে সৌভাগ্যে বাড়ী করেছে—তার বুদ্ধি পরামর্শে যদি সবাইকে বাঁচাতে পারি।'

অনিমা দেবী বলেন আর চোখের জল ফেলেন। প্রথম প্রথম তিনি বড় ননদের কাছে সমবেদনা পান। মঙ্গলা দেবী শোকে সমবেদনায় গায়ে গতরে খেটে সাহায্য করতে লাগলেন, কি করে কম খরচে সংসার চালাতে হয় তার বুদ্ধি পরামর্শ দিলেন। ভাই, ভাইবৌ, ভাইপোরা তাঁর আশ্রয়ে এসেছে, তিনি কি আর ফেলে দিতে পারেন? মনে মনে হয়ত তিনি গর্বিতও—ছোট বোনকে ছেড়ে তাঁর কাছে এসেছে, হোক সে ছোট বোন—দুনিয়াতে নিজের মত আপন কেউ নয়। শেফালীও মাঝে মাঝে কিছু অর্থ সাহায্য করছে।

স্বাভাবিক ভাবেই মামীমা শবুর কাছেও সহানুভূতি পান—প্রায় সমবয়সী বলে দুজনে অনেক সুখ দুঃখের কথা হয়। ফল হল বিপরীত। মঙ্গলাদেবী ভাই-বৌ ও ছেলের বৌ এর মধ্যে এত মেলামেশা সহ্য করতে পারেন না। বলতে আরম্ভ করলেন—

'মামীশাশুড়ী ভাগ্নে-বৌতে অত পিরীত কিসের? সম্বন্ধ মানা নেই, দিনরাত গুজগুজ ফুসফুস চলছে।'

প্রথম প্রথম দুজনেই একটু ঘাবড়ে যেত। শেষে দুজনে ঠিক করল—সবেতেই যখন দোষ তবে হোক দোষের, তাই বলে কি নির্দোষ কথা বার্ত্তাও বলা যাবে না? যতটা সম্ভব মঙ্গলা দেবীকে এড়িয়ে আড়ালে দুজনের মেলা-মেশা চলতে লাগল। মঙ্গলাদেবীরও চোখ কান খোলা আছে—ধীরে ধীরে তাঁর কথা বলার স্পৃহা কমে আসতে লাগল, ভাই ভাইপোদের সাহায্য করার উৎসাহে ভাটা পড়ল।

প্রায় বিদ্রোহের ভঙ্গিতেই অসম সম্পর্কীয় প্রায় সমবয়সী দুই নারী নিজের নিজের দুঃখের ডালি উজাড় করে নিয়ে বসে। যার যার বাপের বাড়ীর চিরস্মরণীয় বাল্য কৈশোরের সুখস্মৃতি রোমন্থন করে ও চোখের জল ফেলে। সম্পর্কটা যেন শাশুড়ী-ভাগ্নেবৌ থেকে দুই জা, দুই সম-ব্যথীতে নেমে আসে। মামীমা বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে, শবু পারেনা। তাই বেশীর ভাগ মামীই বক্তা—শবু শ্রোত্রী।

তিন

দুর্গতির আর শেষ নাই। কারো কারো দুর্গতি মৃত্যুর পরও শেষ হতে চায় না, গল্পের সেই মাথার খুলিটার মত ব্রাহ্মণের ঝুলি থেকে ব্রাহ্মণীর হাতে পড়ে সতীনের মাথার খুলি সন্দেহে শেষে দুর্গন্ধময় জায়গায় গতিলাভ করে। শবুর অবস্থাও প্রায় সেই রকম।

কিছুদিন যেতে বাড়ীতে সেই মাতুলের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। প্রথম প্রথম অনিয়মিত, পরে প্রত্যহ। সবাই অফিসে বেরিয়ে গেলে দুপুরে তাঁর উদয় হয়, রবিবার বা ছুটির দিন ছাড়া। যে মঙ্গলা দেবীকে কারো সঙ্গে বড় একটা হেসে কথা বলতে দেখা যায় না সেই তিনিই তখন একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানান—

'আসেন দাদা, আসেন, বসেন। চান করে আসছেন ত?'

কাঁচা ঘরের মেঝেতে আসন পেতে মঙ্গলা দেবী মাতুলকে পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে দেন। মাতুল আসনে বসে বেড়ার ফাঁক দিয়ে টুলটুল করে শবুর দেহ সৌষ্ঠব দেখতে থাকে আর গ্রাসে গ্রাসে খাবার গিলতে থাকে। ঘেন্নায় শবু ধারকাছ দিয়ে হাঁটে না, যতদূর সম্ভব নিজেকে আড়াল করে রাখে।

খেতে খেতে মাতুল মন্তব্য করে—

'বুঝলি মঙ্গলা, আজকালকার বৌ-ঝিদের লাজলজ্জার বালাই নেই—শ্বশুর ভাসুর দেখেও মাথায় ঘোমটা দেয় না। আমার বড় ছেলের বৌকে সেইজন্য স্বামীপুত্ত্বর সহ দিয়েছি তাড়িয়ে বাড়ী থেকে।'

শবুর মনে হয়, তাড়াতে হয়নি—সে বৌ হয়ত তার শ্বশুরের 'শুভ'-দৃষ্টি থেকে বাঁচতে স্বামী পুত্রদের নিয়ে সরে পড়েছে।

মঙ্গলা দেবীকে কোন ইন্ধন যোগানোর দরকার করে না, তিনি এসব কথায় সর্বদাই পঞ্চমুখ। বলেন—

'আর বলবেন না দাদা দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেলাম। ছুটির দিনে বাড়ী ভর্ত্তি লোকের মধ্যে দুপুরে সোয়ামীর পাশে না শুলে মদনশালিনী বৌ এর ঘুম হয় না। আছাড়া কাপড়ে, স্নান না করে রান্না করে—আমি বিধবা মাগী তাই বাধ্য হয়ে গিলি।'

শুনে শবু দু কানে আঙুল দেয়—একজন সম্পূর্ণ পর পুরুষের সামনে কি সব কথা!

মাতুল খেয়ে উঠে একটা বিছানায় গা এলিয়ে পান চিবোতে থাকে আর লুকিয়ে লুকিয়ে শবুকে দু চোখ দিয়ে যেন গিলে খেতে চায়। আবার সরস আলোচনা কাব্য চর্চা চলে দুজনের—

'মঙ্গলা, তোর মনে আছে ছোটবেলায় পড়া সেই কবিতা—খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে।...'

মঙ্গলাদেবী যোগান দেন—'একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে, কি জানি কি ছিল বিধাতার মনে।'

ঘেন্নায় শবুর সারা শরীর ঘিনঘিন করতে থাকে। কে খাঁচার পাখী আর কে বনের পাখী!—লাম্পট্যেরও একটা সীমা থাকে! জীবনে যে জিনিষকে সে সব চাইতে ঘৃণা করে সেই পরিবেশেই তাকে এখন দম বন্ধ অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে। তবু যদি দীননাথের মুখে এঁদের অতীত কীর্তি কাহিনীর কথা না শুনত।

এই রকম হতে হতে একদিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। সেদিন মাতুল খেয়ে উঠে কিছু সরস আলোচনা করতে লাগল—

'কত বছর ত বিয়ে হয়েছে, এখনো বৌমার দেখি ছেলেপুলে হয়নি—স্বাস্থ্য একেবারে সেই কুমারী মেয়ের মতই।'

মঙ্গলাদেবী এসব আলোচনার জন্য মুখিয়েই আছেন, বললেন—

'হবে কি—যা হবার তা বিয়ের আগেই সেরে এসেছে, আর হবে কোথেকে? পেটে আর একটা কুকুর বেড়ালের বাচ্চাও নেই। শেষে আমার ছেলেকে ধরেছে। আমি ত দেখে এসেছি দীনু যেখানে চাকরি করত সেই শহরেই ওদের বাপের বাড়ী। বুঝতেই পারছেন, প্রেম ভালবাসা আগেই হয়েছিল।'

ছি, ছি, ছিঃ! এরা নাকি ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক, জমিদার-দেওয়ানের ঘরের মানুষ! আর এদেরই মুখ দিয়ে বের হচ্ছে কি সব জঘন্য ধরনের কথাবার্ত্তা—কি কদর্য্য প্রবৃত্তি! যে শবু জীবনে কখনো বাইরের পুরুষের সঙ্গে কথাটিও বলেনি, তাকে নিয়েই কি সব সরস মন্তব্য আর মিথ্যা কলঙ্ক রচনা!

রাগে দুঃখে, ঘেন্নায় শবুর মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। আর বেশী শুনতে হলে সে পাগল হয়ে যাবে। এক ছুটে চলে গেল মামীমার বাসায়।

হঠাৎ ভর দুপুরে শবুকে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে আসতে দেখে মামীমা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

'কি হয়েছে শ্রাবণী, অমন করে ছুটে এলে কেন? চোখ মুখ অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে। বস, বস।'

শবু মামীমার কাছে কেঁদে বলল—'মামীমা, বাড়ীতে মা আর তার দাদা কি সব জঘন্য আলোচনা করছে, আমার সম্বন্ধে যা তা বলছে।'

সব কথা মামীমাকে বলে অনেক কেঁদে তার মন একটু হাল্কা হল। মামীমাও সব শুনে সমব্যথীর মত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

'ওসব কথায় কান দিও না শ্রাবণী। তোমাদের বিয়ের বছরখানেক আগে বড় জামাইবাবুর কাছেই শুনেছিলাম তোমার বাবার তরফ থেকে একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। তোমাদের সেই আগের ভাড়াবাড়ীতে জামাইবাবুকে সে কথা জিজ্ঞেসও করেছিলাম, তুমি হয়ত শুনেছ। আর তোমাকে মিথ্যে কলঙ্ক দিচ্ছে—ওদিকে নিজের পেটের মেয়ে শেফালী কি করছে, করবী বিয়ের আগে ঐ দাদার এক ছেলের সঙ্গে কি করত তাও আমি একবার দুদিনের জন্য ফায়ার ব্রিগেডের বাসায় এসে দেখেশুনে গেছি। ওদিকে ভবর মতিগতিও ভাল নয়, ভাড়াবাড়ীর নাতনীর সঙ্গে কি সব হচ্ছে।'

শবু মনের দুঃখে দীননাথের মুখে শোনা ফায়ার ব্রিগেডের বাসার মা-মাতুল কাহিনী যেমন যেমন শুনেছিল বলে গেল। মামীমা শুনে অবাক হয়ে বললেন—

'তাই নাকি? আমি কত বছর হল তোমাদের মামার সঙ্গে ঘর করছি, আগে তার এই দাদার কথা কোন দিন শুনিনি। ফায়ার ব্রিগেডের বাসায় দেখার পরে একবার জিজ্ঞেস করাতে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ও দাদার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তখন এতটা বুঝতে পারিনি। সেজভাগ্নে কি আর মার নামে মিথ্যে বলবে? শোন তবে বলি। এরা দু বোনই অন্যের কলঙ্ক রটাতে ওস্তাদ। এখানে বড়দি তোমাকে এই সব বলছেন। ওদিকে ছোড়দি—তোমার মাসীশাশুড়ী কি বলেন শুনবে? তিনি বলেন আমাদের ছোট ছেলে ভুলু নাকি তার ভাইয়ের নয়। তাই নাকি কবে কানে কানে তাঁকে সে কথা বলে রেখেছে। এ সব কথার জবাব কি দেবে বল?'

মামীমার সঙ্গে কথা বলে, কেঁদে তখনকার মত কিছুটা শান্ত হয়ে শবু বাড়ী ফিরল, ততক্ষণে মাতুল বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু না, শবুর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এবার সব কথা দীননাথকে বলা দরকার। ভেবেছিল বলবে না, শুধু সহ্য করে যাবে—মানুষটা সারাদিন খেটেখুটে হয়রান হয়ে আসে, তার মনে যেন অশান্তির আঁচ না লাগে। কিন্তু আর যে পারা যায় না। সে সব সহ্য করতে পারে শুধু পারে না বাবা মার অপমান আর নিজের নামে মিথ্যে কলঙ্ক সহ্য করতে।

অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলে শেষে সে রাতে শবু দীননাথকে মাতুলের প্রথম আগমনের দিনটি থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘটনা জানাল। অদ্ভুত তার স্মৃতিশক্তি—একটা কথা, একটা ঘটনাও সে ভোলেনা। বলতে বলতে শবু কেঁদে ভাসাল, বলল—

'আমাকে তুমি বাবা মার কাছে পাঠিয়ে দাও, এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব, আমি মরে যাব।' কান্নায় শবুর গলা বুজে এল।

দীননাথ অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করে বলল—

'আমি কালই এর একটা ব্যবস্থা করব। তুমি কেঁদো না,' বলে শবুর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আবার বলল 'আর যাতে তোমাকে এ সব কথা শুনতে না হয় তা আমি দেখছি।

'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্! যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি ততক্ষণ সবাই কি ভাল-মানুষ। মুখে 'শ্রাবণী' 'বৌমা' ডাক লেগেই আছে, কণ্ঠে যেন মধু ঝরছে। আর আমি না থাকলে তখন অন্যরূপ! আমাদের বিয়ে নিয়েও এত কেচ্ছা করছে—আর নিজে কি করেছে, এখনও করে চলেছে। দিদির কি হয়েছিল আমি জানিনা? করবী বিয়ের আগে কি করত, শেফালী ভব কি করছে?'

অনেক রাত অবধি দীননাথ রাগে ক্ষোভে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। সারারাত দুজনেই ভাল করে ঘুমোতে পারল না।

চার

পরদিন সমস্ত বাড়ীটার আবহাওয়া থমথমে। রাতের কথা বার্তার আভাস পাশের কাঁচা ঘরে নিশ্চই পৌঁচেছে।

দীননাথ কোনরকম ভনিতা না করে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল—'মা. মাতুল আবার এ বাড়ীতে আসে কেন?'

'কই না ত, ঐ মাঝেসাঝে আসে।' মঙ্গলা দেবী নিপাট ভালমানুষের মত জবাব দিলেন।

'না মাঝেসাঝে নয়, রোজ আসে, খায়, যাবার সময় আবার খাবার বেঁধে নিয়ে যায়।'

নিশ্চয় এ বৌ এর কাজ, সব কথা পুটপুট করে রাতে স্বামীর কানে ঢেলেছে। 'পাশে শোয়, কানে কানে কথা কয়, তার কথা মিথ্যা নয়'—এ শাস্তর মঙ্গলা দেবীর ভালই জানা আছে। তাঁর ভালমানুষীর মুখোস খুলে পড়ল, বললেন—

'দাদা তোমরটা খায় না।'

দীননাথ রেগে বলল—'আমার খায়না ত কি তার জমিদারী থেকে আনিয়ে খায়, না ভবর টাকায় খায়? ভবর ক্ষমতা আছে আমাকে না জানিয়ে একটা দুশ্চিরত্র লোককে এ বাড়ীতে ডেকে এনে খাওয়াবে? ফায়ার ব্রিগেডের বাসায় থাকতে শুনতাম আমরা নাকি মাতুলের টাকায় খাই। কেন? মহী আর আমি চাকরি করে টাকা দিতাম না? বড়দা মেজদা টাকা দিত না? মেজদা শেষে রেগে বলেই ছিল—যতদিন মাতুলের গুষ্ঠি একসঙ্গে খাবে এক পয়সাও দেব না। আবার সেই মাতুল? কবে আবার শুনব এ বাড়ীটাও মাতুলের টাকায় তৈরী হয়েছে।'

সবাই চুপচাপ। দীননাথ একটু থেমে বলল—

'আমি শেষ কথা বলে দিচ্ছি মাতুলদের কারো এ বাড়ীতে আসা চলবে না। দিনরাত বাড়ীর বৌদের নিয়ে রসালো আলোচনা হচ্ছে। আর যেন না হয়। যে যার নিজের চরকায় তেল দিক, অপরের চরিত্র নিয়ে কাসুন্দি ঘাঁটতে না যাওয়াই ভাল। কেউ অকারণ কোন অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না, এই আমার সাফ কথা।'

দীননাথ স্নান খাওয়া সেরে অফিসে যাবার আগে শবুকে বলে গেল—

'তুমি কোন কথার মধ্যে থেক না। অসুবিধে হলে বা খারাপ লাগলে মামীমার কাছে যেয়ো।'

বাড়ীতে থমথমে ভাবটা আরো জাঁকিয়ে বসল। ভব শেফালী শবুর সঙ্গে বিশেষ কোন কথা না বলে খেয়ে যার যার কাজে চলে গেল। সোনা ও হাবলু কলেজ ও স্কুলে গেল। এখন বাড়ীতে একদিকে মঙ্গলা দেবী আর একদিকে শবু। মঙ্গলা দেবী ঘরের মধ্যে কিছু সময় খুটখাট কি করে দুপুরের একটু আগে বাড়ী থেকে বের হলেন কিছু না খেয়ে।

কোথায় গেলেন, কখন আসবেন কিছু বলে গেলেন না। বলবেন আর

কাকে ? বাড়ীতে আছে ত এক শবু, তাকে বলার প্রয়োজন কি ? এদিকে দুপুর গড়িয়ে যায়। শবু একবার গিয়ে মামীমার বাড়ী ঘুরে এল, না, সেখানেও তিনি যান নি। একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে বেলা গড়িয়ে শবু কোন রকমে স্নান খাওয়া সেরে নিল।

বিকেলে এক এক করে বাড়ী ফিরতে লাগল হাবলু সোনা শেফালী এমন কি ভবও অন্যদিনের চাইতে বেশ তাড়াতাড়িই ফিরল। সবাই এসে শবুকে জিজ্ঞেস করতে লাগল—মা কোথায় ?

সে প্রশ্ন ত শবুরও, সেই যে দুপুরের একটু আগে কিছু না খেয়ে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন, আর তাঁর দেখা নেই। এমনি রোজই তিনি হুটহাট বাড়ীর বাইরে যান, শবুও প্রথমে সেই রকমই ভেবেছিল। এখন যে রীতিমত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রায় সন্ধ্যার মুখে মঙ্গলা দেবীর বালিশের নীচ থেকে একখানা চিরকুট পাওয়া গেল, তাঁর নিজের হাতে লেখা—'আমি চলিলাম, আমার মৃত্যুর জন্ত শ্রাবণী দায়ী।'

ভব সোনা তক্ষুণি দুদিকের দুই রেল স্টেশনের দিকে ছুটল, রেললাইন বরাবর কিছুটা দেখেও এল। হাবলু আশপাশের বাড়ীগুলোতে খুঁজে এল। না কোথাও তিনি নেই, কেউ কিছু জানে না। ভয়ে শবুর হাত পা কাঁপতে লাগল। খবর পেয়ে মামীমা আর তাঁর ছেলেরাও এসেছে। সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

শেফালী মনের দুঃখে বলতে লাগল—'আমাদের মা বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে। নদী বা পুকুরে যায়নি, মা সাঁতার জানে। নিশ্চয়ই দূরে গিয়ে কোথাও ট্রেনের নীচে…। মা আমাদের কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে মানুষ করেছে। আমরা তখন ছোট তাই সবটা বুঝিনি, জানিনা—দাদা দিদিরা ভাল জানে। এখন বৌরা এসে থেকে মাকে মানে না শ্রদ্ধা করে না—তাইতে মা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। মার মত শ্রদ্ধা আমি কাউকে করি না, মা ছাড়া কারো পায়ে আমি প্রণামও করি না তা সে দাদাই হোক আর যে-ই হোক।' কান্নার মধ্যেও কথার যথেষ্ট ঠেস দেওয়া আছে।

শবু চুপ করেই ছিল, পরে বলল—'আমাকে এসব কথা শোনাচ্ছ কেন ?'

'বলছি এইজন্ত যে মামা এসে দুটো খেয়ে গেলে কি হয়েছে ? সে সব কথা সেজদাকে না বললেও চলত।'

শবু বলল—'মাকে যখন এ সব কথা বলছিল তখন তোমরা সবাই উপস্থিত ছিলে। তখন বলতে পারলে না?'

শেফালীর চোখে শবুই অপরাধী, বলল—

'মা সেজদার কথা লিখে যায়নি, তোমার কথাই লিখেছে। মার যদি কিছু হয় তার জন্য তুমিই দায়ী হবে।'

সবাই মিলে তাকেই দায়ী করতে লেগেছে। বাধ্য হয়ে শবু বলল—

'শুধু ঐ কথাটাই জানলে। আর রোজ সারাদুপুর দুজনে মিলে আমার সম্বন্ধে যা নয় তাই বলে জঘন্য সব আলোচনা চলে তা ত শোননি, জানও না। তাও যদি তোমার মুখে তোমাদের মামার অতীতের কীর্ত্তিকলাপের কথা না শুনতাম।'

শেফালী চুপ করে গেল, অমন মাতুলের পক্ষে কোন কথা তার মত মাতৃ-ভক্তের মুখেও যোগাল না।

এবার আসরে নামল আর এক মাতৃভক্ত ভব। সে এতক্ষণ চোখ দুটো বড় বড় করে ওদের কথা শুনছিল আর দাঁতে আঙুলের নখ কাটছিল। শেফালী চুপ করে গেল দেখে এবার ভব বলল—

'আচ্ছা বৌদি, আমাকে সবাই ভাল বলে আর সেজদাকে সবাই মন্দ বলে কেন?'

ভবর গায়ের রং বোধ হয় এ বাড়ীতে সব থেকে কালো—কিন্তু কিছুকাল হল সে এতই ভালমানুষ নাম কিনেছে যে হাবলু বা অন্য ভাগ্নে ভাগ্নীদের তাকে কালো-মামা না বলে 'ভালমামা' ডাকতে শেখানো হয়েছে। এ হেন ভালমানুষ এ প্রশ্ন তুলতেই পারে।

অথচ এই ভবর পরীক্ষার ফী দিতে সদ্য-পরিণীতা বধূ শবু তার বিয়ের আংটি-বোতাম তুলে দিয়েছিল বন্ধকের ঘরে—যদিও সে পরীক্ষায় ভব পাশ করতে পারে নি। আবার এই ভবকেই ওভারসিয়ারী পড়াতে দীননাথ নিজের সামান্য পুঁজি থেকে আড়াইশ টাকা বের করে দিয়েছিল। সেই উপকারী দাদা-বৌদি এখন ভবর চোখে, আর সবার চোখে মন্দ। আশ্চর্য! না, আশ্চর্য্য হওয়াটাও ঠিক নয়—এটাই ত সংসারের নিয়ম।

আকণ্ঠ বিতৃষ্ণা ও বিরক্তিতে শবু জবাব দিল—'কে তোমাদের সেজদাকে মন্দ বলে আর কার জন্য সে মন্দ হ'ল তা আমার জানা নেই। তবে তোমার বিয়ে হোক, তারপর তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেব।'

ভব বলল—'আমি চিরকালই ভাল থাকব, আর তা সবাইকে দেখিয়ে দেব।'

শবু জবাব দিল—'দেখা যাবে। যদি ততদিন তোমরা আমাকে বেঁচে থাকতে দাও তবে নিশ্চয়ই দেখব, তোমাকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব।'

কে বলে শবু কথা বলতে পারে না! মামীমা সব কথাই শুনছিলেন কিন্তু কারও পক্ষ তিনি নিতে পারেন না, তাঁর বর্ত্তমান অবস্থায় সকলের কাছেই তিনি প্রত্যাশী। তবু মামীমার চোখমুখ বলে দিচ্ছে শবু মুখের মত জবাব দেওয়াতে তিনি খুশি।

শবু কথা বলতে পারে না, বলতও না। কিন্তু এখন বলেছে একেবারে প্রাণের দায়ে। সবাই মিলে যে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে ফাঁসি কাঠে চড়াবে বলে। যারা তার চরিত্র তুলে সতীত্ব তুলে কথা বলে তাদের দোষ নেই, আর সে কথা নিজের স্বামীকে বললে দোষ হয়! উত্তেজনায় পর পর অনেকগুলো কথা বলে তার হাত পা আরো কাঁপতে লাগল, মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিছানায় গিয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে আর মনে মনে নিজের মাকে ডাকতে লাগল।

এত সবের মধ্যে সোনা শবুকে দোষী করে একটা কথাও বলেনি।

যথারীতি বেশ রাত করে দীননাথ অফিস থেকে ফিরল। ফিরতেই শেফালী বলল—

'সেজদা, মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

দীননাথ বলল—'যাবে আর কোথায়, নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও আছে।'

ভব বলল—'না সেজদা, মা চিঠি লিখে রেখে গেছে আত্মহত্যা করবে বলে।'

'রেখে দে তোর চিঠি আর আত্মহত্যা। কি এমন কথা হয়েছে যে আত্মহত্যা করতে যাবে? কাল সকালে উঠে খোঁজ নিস—নিশ্চয় মাতুলের ঘর আলো করে বসে আছে'—নিরুদ্বিগ্ন দীননাথ তার মাকে ভাল চেনে। হাতমুখ ধুয়ে সে রাতের খাবার খেতে বসে গেল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে কাল রাতে মোটে ঘুমোতে পারেনি। মার লেখা চিঠিখানাও একবার দেখতে চাইল না।

দীননাথের হাবভাব দেখে শবুও এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

সকালে উঠে শেফালী আর সোনা রিফিউজী কলোনীতে রওনা হল মার খোঁজে। ভব দীননাথ যার যার অফিসে চলে গেল। শবুর শুধু প্রতীক্ষা—কি খবর আসে। দুপুর গড়িয়ে শেফালী সোনা ফিরল মাথা নীচু করে। দীননাথের কথাই ঠিক, মা মাতুলের বাড়ীতে আছেন।

পরে এক সময় খবর নিতে এসে মামীমাও নিশ্চিন্ত হয়ে আড়ালে শবুকে বললেন—'খুব রক্ষা পেয়ে গেলে, শ্রাবণী।'

শবু জিজ্ঞেস করল—'কেন, মামীমা?'

'ঐ যে লিখে রেখে গেছেন, শ্রাবণী দায়ী—শেষে যদি বড়দিকে না পাওয়া যেত কিম্বা কোন দুর্ঘটনা ঘটত, পুলিশ এসে তোমার হাতে হাতকড়ি লাগাত।'

মামীমার স্বামী দারোগা, এসব জ্ঞান তাঁর বেশী।

কথাটা শবুরও মনে হয়েছিল, খবরের কাগজে এ ধরনের কথা মাঝে মাঝে ছাপা হয়। এ যে ঘোর শত্রুতা! নির্দোষ মানুষকে বিপদে ফেলার ব্যবস্থা! এ ধরনের মানুষ কি না পারে?

রাতে বাড়ী ফিরে সব শুনে দীননাথ বলল—

'দেখলি ত? তোরা মাকে চিনিস না, আমি খুব ভাল চিনি। শুধু শুধু নাটক নভেল করে লোক হাসিয়ে কি লাভ হল?'

পাঁচ

মঙ্গলাদেবী ফিরে এলেন চার পাঁচদিন পরে। বিজয় গর্বে ফেরেননি তিনি, জব্দও কাউকে করতে পারেননি। তাই মনে মনে আক্রোশ তাঁর ভরাট আছে। শেফালীকে বারবার করে বলতে লাগলেন—

'কেন তোরা গিয়ে গিয়ে 'মা' 'মা'-বলে ডাকিস? আমার কি কোথাও গিয়ে দুদিন শান্তিতে থাকার উপায় আছে? এই শেফালী আর সোনা এখন আমার পায়ের বেড়ি—একটার বিয়ের কিছু করা যাচ্ছে না আর একটার পড়া শেষ হয়নি। কবে যে আমি এসব থেকে মুক্তি পাব। আমার মুক্তি নাই।'

শেফালী চুপ করে থাকে, কোন জবাব দেয় না। এ সব কথা বলা কোন জবাবের জন্য নয় শুধু শোনাবার জন্য। শবুও শোনে।

শুনতে শুনতে শবুর মনে কষ্ট হয়। আহা, এটা ত তাঁরই সংসার, শবু ত কাউকে তাড়াতে চায় নি। বাবা কালীনাথ নেই, এখন মা-ই ত একা বাবা-মার আদরে সংসারটাকে ধরে রাখবেন। শবুও একান্নবর্তী সংসারের আদর্শে মানুষ হয়েছে, হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যে মুখ বুজে একান্নবর্তী পরিবারের সংসারটির সেবা করে যাচ্ছে। নিজের সুখের দিকে তাকায় নি, কখনো স্বামীকে বলেনি আলাদা হয়ে যেতে।

বলতে ইচ্ছে করে, মা, আপনি কেন চলে যাবেন? কিন্তু বলতে পারে না। দুরন্ত অভিমান এসে কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয়। কোন বৌ ত কাছে রইল না, এক ছেলে মরে গেল, আর দু ছেলে যে যার মত আলাদা হয়ে রইল। শবু প্রাণপণে সংসারের ঘানি টেনে চলেছে। একটি মাত্র বৌ সে এখন এ বাড়ীতে, উচিৎ নয় কি তাকে মায়ের আদরে স্নেহে আপন করে নেওয়া! সে এমন কি অপরাধ করেছে? উল্টে তার চরিত্রে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে কার কি লাভ হচ্ছে? বাড়ীতে আর ত কোন অশান্তি নেই, শুধু জেদ আর জব্দ করার মনোভাব থেকেই বার বার যত অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

ধানবাদে বদলির আদেশ পেয়ে ভব ভালমানুষী দেখাবার মস্ত বড় সুযোগ পেয়ে গেল। এমন অপমান অশ্রদ্ধার মধ্যে মাকে ফেলে রাখা যায় না। মাকে নিজের কাছে রাখবে। সে একে মাতৃভক্ত তায় আবার ভালছেলে—বিদেশে ঘরদোর আগলানো, রান্না খাওয়ার কথাটা উহ্য। মঙ্গলা দেবীও এক কথায় যেতে রাজী।

মঙ্গলা দেবী চলে গেলে গরুর দেখাশোনা করবে কে? তিনি বললেন—'যার গরু তাকেই দিয়ে যাব। এ গরু বাছুর দাদার টাকায় কেনা, দাদার বাড়ীতে পৌছে দেব।' এবং সত্যিই এক বিকেলে তিনি হাবলুর সহোযো গরুবাছুর দুটোকে টানতে টানতে রওনা দিলেন। গরু কেনার ঘটনা ত মাত্র বছর তিন চার আগের ব্যাপার। বাবার পাকিস্তান থেকে আনা টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল।...থাক সে কথা...।

আশ্চর্য্য! পরদিন সকালে একটু বেলা হতে একটা বাছুর এসে বেড়ার পাশে বাঁ্যা বাঁ্যা করে ডাকতে লাগল। ওমা, এ ত ওদেরই গরুর বাছুরটা। শবু সোনা ছুটে গিয়ে তাকে বাড়ীর ভিতর এনে গলা জড়িয়ে আদর করে চুমু খেতে লাগল। আহা, কত দূর থেকে কত কষ্টে পথ চিনে বাড়ীর টানে এসেছে। অবলা জীব—নিমকহারামী জানেনা, নিজের বাড়ীতে এসে মনের আনন্দে নাচানাচি করছে। মা গরুটা আর কি করবে, তার গলায় যে নিষেধের দড়ি বাঁধা তাই আসতে পারে নি। এদের মায়ার টান অসীম।

তবু ঐ টুকু বাছুর, মা ছাড়া থাকবে কি করে! শেষে হাবলুকে স্কুল কামাই করিয়ে আবার তাকে মার কাছে পাঠানো হল। সে কি যেতে চায়? যতক্ষণ ছিল ডাকাডাকি নাচানাচি করে সবাইকে অস্থির করে তুলেছিল। আবার খেতে দিলেও কিছু খেতে পারছিল না, সে যে এখনও মায়ের দুধ ছাড়েনি।

ধানবাদে কোয়ার্টার ঠিক করে কদিন পরে ভব এল মাকে নিয়ে যেতে। মঙ্গলা দেবী তাঁর জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বলে চললেন—

'এই ত ভব আমাকে আদর করে নিয়ে যাচ্ছে, সে আমাকে মাথায় করে রাখবে। বছর খানেক পরে সোনাও পাশ করে বের হবে, চাকরি পাবে। শেফালীও একদিন বিয়ে হয়ে চলে যাবে। তখন আর কোন দায় থাকবে না কারো। আমি থাকতে বাড়ীটা যেটুকু করে রেখে গেলাম এরপরে আর একটা ইটও গাঁথা হবে না।'

তবু যাত্রাকালে শবু মাকে প্রণাম করে বলল—'বিদেশে যাচ্ছেন, সাবধানে থাকবেন। কেমন থাকেন খবরাখবর দেবেন।'

মঙ্গলা দেবী বললেন—'তোমরাও সাবধানে থেকো, দীনুর শরীরের যত্ন নিও। শেফালী সোনা হাবলু রইল, ওদেরকে দেখো।'

কাছে থাকতে যত অশান্তি হয়েছে, দূরে থাকলে বুঝি সম্পর্ক ভাল থাকে।

মঙ্গলা দেবী চলে গেছেন। মাসখানেক পরে শেফালীও স্কুল হোস্টেলে চলে গেল। সেখানে তার এক টীচার বন্ধু শুভাও ঐ হোস্টেলে থাকবে, কারণ যে মামাবাড়ীতে সে থাকত সেই মামার সঙ্গে তার বনছে না। শেফালীর রাগ দেখান শবুকে জব্দ করা হল আবার বন্ধুপ্রীতি দেখানোও হল।

শেফালী হোস্টেলে যাবে শুনে ক্ষোভে দীননাথ বলেছিল—'যার যেখানে খুশি যাক, আমি কিছু বলব না। ভবর না হয় বদলির ব্যাপার। শেফালীর কাঁচড়াপাড়ায় যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।'

শবুরও মন খারাপ লাগে। গরু বাছুর দুটো আগেই নিয়ে গেছে পরে মা আর ভব চলে গেল—সব শেষে শেফালীও গেল। বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বাড়ীতে এখন মাত্র চারজন লোক, আর কয়েকটা হাঁস। তবে মামীমার সঙ্গ খুবই পাওয়া যায়, শত কাজের মধ্যেও তিনি রোজ দু তিন ঘণ্টা এসে শবুর সঙ্গে গল্প করে যান। পাড়ায়ও অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়েছে, তার মধ্যে বেশী ঘনিষ্ঠতা হারানীদিও রুমার মার সঙ্গে।

মামীমার মেজো ছেলে চিনু খুবই দুরন্ত প্রকৃতির, পড়াশুনায় দিকে মন নেই। বড় ছেলে দুলুর সামনে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা, ভুলু নেহাৎই শিশু। মামা বাড়ীতেই থাকেন, বেশী হাঁটা চলা করতে পারেন না, মাঝে মাঝে আড়ষ্ট জিভ দিয়ে যে দু চারটা কথা বলেন মামীমা ছাড়া আর কেউ তা বুঝতে পারে না। দশটাকা ভাড়ায় বোসেদের বস্তির একখানা ঘরে এই

নিয়ে মামীমার সংসার অতি কষ্টে চলছে। মামার ইনভ্যালিড্‌ পেনসন গ্র্যাচুইটি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের পাওনা আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মামীমা দীননাথের সাহায্যে।

চিনু ভুলু গরু বাছুর দুটো চলে যাওয়াতে বুঝি সব থেকে বেশী মনমরা—কারণ বাছুরটাই ছিল ওদের খেলার সাথী। হঠাৎ একদিন চিনু কোত্থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এল। নেহাৎই একটা দেশী কুকুরের বাচ্চা, মাত্র কয়েকমাস বয়স, মিশকালো গায়ের লোমগুলো, শুধু কপালে একটা সাদা তিলক। কুৎকুতে চোখ দুটো নিয়ে এমন করে তাকাচ্ছে যে দেখলে মায়া লাগে। সোনা আদর করে কুকুরের বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল, বলল—

'কি সুন্দর গাঠুম গুঠুম চেহারা, না বৌদি? আমি এর নাম দিলাম 'গাঁঠু'। এর জন্য একটা বকলস আর চেন কেনা দরকার।'

চিনু বলল—'ওটা বড় হলে চোর তাড়াতে পারবে।'

'থাক না কুকুরটা। একটা শিকলও কিনে দিও, আমাদের পিটারের গলায়ও শিকল দেওয়া হত।' বলে শবু দীননাথের দিকে তাকাল।

দীননাথ বলল—'ঘোড়া হলে চাবুক লাগে, কুকুর হলে শিকল—তা সে কুকুর দেশী বিলিতি যাই হোক।'

গাঁঠু সংসারের একজন হয়ে গেল, কদিন পরে তার একটা শিকলও এল।

অনেকদিন হল ষষ্ঠীতলায় যাওয়া হয়নি, ঠাকুমা কাকা কাকীমা কানাই কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। মাঝখানে যা সব ঘটে গেল তাতে শবুর মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, একবার যাওয়া দরকার। না, সব কথা ঠাকুমা কাকীমাকে সে বলবে না যতই আপন হোন তাঁরা—এ সব কথা শুধু মাকেই বলবে। তবু একবার সেখানে যাওয়া দরকার একটা সাময়িক পরিবর্ত্তনের জন্য।

যে সময় শবু ষষ্ঠীতলায় যাবে ভাবছিল সে সময় কানাই এক বিকেলে এসে হাজির হল সঙ্গে বড়কাকা হৈম ও তাঁর ছেলে শঙ্খ। অনেকদিন পরে বড়কাকাকে দেখে শবু খুশি হল। প্রণাম করে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল—

'বড়কাকা তোমাদের সব খবর ভাল ত? বাবা মা কেমন আছে, নন্দু কেমন আছে, মিতু তপু কেমন আছে? কাকীমার এক ছেলে হয়েছে খবর পেয়েছি, কেমন দেখতে হয়েছে?'

বড়কাকা এক এক করে সব কুশলাদি জানিয়ে শেষে বললেন—

'আসছিলাম একটা সরকারী কাজে, ভাবলাম, যাই শবুরা বাড়ী করেছে

দেখে আসি, তা বেশ ভালই বাড়ী হয়েছে।'

শবু ততক্ষণে হাবলুকে দিয়ে দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে চা করে আগে বড়কাকাকে খেতে দিল। কাকা সঙ্গে সঙ্গে খেতে আরম্ভ করে বললেন—

'ওদিকে শঙ্খটা কি করতেছে, সে খেলো কিনা।'

শবু বলল—'ওদেরকেও দিচ্ছি, তুমি খাও।'

কানাই, শঙ্খর হাতে মিষ্টির প্লেট দিতে শঙ্খ বলল—

'বাবা, এগুলো দু আনা আলা না চার আনা আলা রসগোল্লা?'

বড়কাকা মুখ ভেংচে বললেন—'হুঁঃ, খাব্যার দিছে, খা। দু আনাবালা না চার আনাবালা দিয়্যা তোর দরকার কি?'

শবু হেসে বলল—'বড়কাকা, তুমি ঠিক আগের মতই আছ আমরা ছোট-বেলায় যেমন দেখেছি।'

কাকা 'হুঁ' বলে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কোথায় যেন তাঁর মনের সুর কেটে গেছে, আগের মত হাসিখুশি আর নেই। অবশ্য বয়সও বেড়েছে।

কানাই কাকার সঙ্গে ফিরে যাবার আগে বলল—'মেজদি, ঠাকুমা কাকীমা তোকে যেতে বলেছে, অনেকদিন আমাদের বাড়ী যাসনি। অফিস থেকে জামাইবাবু এলে তাকেও যেতে বলিস, কাকীমা বলে দিয়েছে।'

শবু বলল—'হ্যাঁ, শিগগীরই যাব। কাকা, শঙ্খ—তোমরা আবার এসো।'



পর্ব—৫

এক

মা মঙ্গলাদেবী রাগ দেখিয়ে, রোজগেরে ছেলেদের এক এক করে দূরে সরিয়ে নেবেন ঘোষণা করে চলে গেছেন। বলে গেছেন আমি থাকতে বাড়ীটা যেটুকু হয়েছে তারপর আর একটা ইটও গাঁথা হবে না। শেফালীও মার পথ অনুসরণ করে বন্ধুর সঙ্গে হোস্টেলে উঠেছে। তারপর এক দেড় বছর কেটে গেছে।

খুব বেশীদিন ত নয়। এরই মধ্যে বাড়ীর কুঁড়ে ঘরের জায়গায় পাকা ছাদ দেয়া বেশ বড়সড় পাকা রান্নাঘর উঠেছে, সে ঘরে দুটো চৌকি পেতে সোনা ও হাবলু থাকে, রান্না দু ঘরের মাঝের বারান্দায়। খাটা পায়খানাও পাকা হয়েছে। হবু ওভারসীয়ার সোনা সব দেখাশোনা করেছে আর দীননাথ একা ধারদেনা করে ও শবুর গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা যুগিয়েছে।

সব কাজ হয়ে গেলে শবু সোনাকে বলেছে—'সামনের বছর তোমার কলেজের পরীক্ষা কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় তুমি ভাল করে পাশ করতে পারনি। পায়খানাটা অন্য ঘরগুলো থেকে উঁচু হয়ে গেছে।'

সত্যিই তাই। অনভিজ্ঞতার ফলে হিসেবের ভুলে সেটা একফুট মত বেশী উঁচু হয়ে গেছে। সোনা মাথা চুলকে বলেছে—'তা ঠিক। কিন্তু বর্ষায় ঘর ডুবলেও ওটা ডুববে না, কত সুবিধে বল?'

শুধু পাকা ঘরই হয়নি, বাড়ীতে ইলেকট্রিকও এসেছে। সোনা তার আয়রণের ছেঁকা খাওয়া বিস্তের পুরোনো রেডিওটাকে ঝেড়েঝুড়ে ঘণ্টা-খানেকের চেষ্টায় চালু করে মেজদা বিশ্বনাথের স্মৃতিটিকে সরব করে তুলেছে।

তারও আগে বাড়ী উঠেছে বড়দা হৃদিনাথের। সে কলকাতার ভাড়া বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অফিস থেকে লোন নিয়ে সোদপুরের দিকে বাড়ী করে সেখানে উঠে গেছে সপরিবারে। শেষদিকে টাকায় টান পড়াতে কাজ আটকে গেছিল, মামীমা অনিমাদেবী নিজের গয়না বিক্রি করে সাড়ে সাতশ টাকা দিলে তবে সে কাজ শেষ হল।

মামীমা তাঁর ভাগ্নেদের মুখে শুনে নিজে থেকেই টাকা দিলেন, বললেন—

'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কিবা ভয়? গয়না বিক্রি করেই স্বামী ছেলেদের খাওয়াচ্ছি, না হয় কিছু বেশী করে বিক্রি করলাম। বড় ভাগ্নে পরে শোধ করে দিলেই হবে।'

মামীমার সাহস ও উদারতা দেখে শবু আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। বাড়ীতে এক পয়সা রোজগার নেই, থাকেন দশটাকা ভাড়ায় বোসদের বস্তির একটা ঘরে, স্বামী ও তিন ছেলে নিয়ে তাঁর সংসার চলছে শুধু গয়না বিক্রি করে। মামার পেনসন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কিছুরই ব্যবস্থা হয় নি। মামীমার সত্যিই তুলনা হয়না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই দুরবস্থার মধ্যেও মামীমা অনিমা দেবী একখানা বাড়ী করেছেন।

দীননাথ তার অফিসের বড় দায়িত্ব ও কাজের চাপ সামলে, পাড়ার পূজা কমিটি, উন্নয়ন কমিটি, নাগরিক সমিতি, সমবায় সমিতির ব্যস্ততার মধ্যেও লেখালেখি করে মামার পেনসন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এর ব্যবস্থা করতে পেরেছে স্থানীয় মহকুমা ট্রেজারী থেকে। একসঙ্গে কিছু টাকা হাতে পেয়েই মামীমা প্রথম সুযোগে কাঠা দুই জমি কিনে পাকা ভিতের উপর টালিছাওয়া কুঁড়ে ঘর তুলে স্বামী ছেলেদের নিয়ে সেখানে উঠেছেন।

মনে অসীম তৃপ্তি নিয়ে মামীমা বলেন—'এই হল আমার স্বামীর ভিটে। কিন্তু সব কিছুর মূলে আছে সেজভাগ্নে। সেজভাগ্নের বুদ্ধি পরামর্শ ও সাহায্য না হলে পেনসন থেকে আরম্ভ করে জমি বাড়ী করা স্বামী ছেলেদের নিয়ে সংসার চালানো কোনটাই হত না।'

মামীমা বড় অল্পেই তুষ্ট হন। খুশী শবুও। পাঁচ সাতটা প্লট দূরে মামীমাদের ঘর উঠেছে—অবাধে সেখানে সে যাতায়াত করে। কুকুর গাঁট্টুও দু বাড়ী নিয়ে রাজত্ব করছে।

শুধু নিজেদের কাঁচা ঘরই পাকা হয়নি, শবু একা হাতে দীননাথ সোনা হাবলুসহ চারজনের সংসার চালাচ্ছে। অমাবস্যার লক্ষ্মীপুজো, পৌষপার্বণ, সরস্বতীপুজো পার দিয়েছে, অক্ষয় তৃতীয়াতে কাসুন্দীও তৈরী করেছে। বীণা বৌদি, করবী ছেলে মেয়েদের নিয়ে সে সব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে—ষষ্ঠীতলা থেকে কানাই শ্রীদা আর সব ভাইবোনরাও আসা যাওয়া করে। শ্যামা ঝিও বহাল আছে।

এমনি করে কেটে গেছে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তের একটি ঋতু

চক্র। মঙ্গলা দেবী গেছেন এক বর্ষার শেষদিকে। দেড়টি বছর গিয়ে আবার এসেছে বসন্তকাল।

মাঠের মধ্যে দুখানা পাকা ঘরের ছোট বাড়ীটাকে দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। নারকেল শুপারী পেয়ারা কলা ও একটি বকফুলের গাছ বাড়ীর সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উঠোনের মাঝখানে একটা কুলগাছও বেড়ে উঠছে।

মনের সুখে ও তৃপ্তিতে শবু তার শ্বশুরের পায়ের ধুলোয় ধন্য নিজেদের বাড়ীতে বাস করে আর ভাবে যদি মা পদ্মিনী দেবীকে এ বাড়ীর একখানি ছবি দেখাতে পারত তবে মা কতইনা খুশী হত।

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। শবু ভাবছিল বাড়ীটার ছবি দেখে মা বাবা কত খুশি হবে। এদিকে মা পদ্মিনী দেবী স্বয়ং এসে হাজির, সঙ্গে তপু।

ফাল্গুন মাস—বসন্তকাল। মা এসেছেন ছোট মামার (বাবা কাকাদের ভাষায় ছোট রায়মশাই) ছোট মেয়ে শীলার বিয়েতে। খুব গরিবী মতে বিয়ে হচ্ছে শীলার এক মেসোর সাহায্যে তাঁর সন্তোষপুরের বাড়ীতে। দুই মামা এখন পাকিস্তানে আছেন—বড়মামা নাটোরের এক স্কুলে মাস্টারী করেন, ছোটমামা তাঁরই আশ্রয়ে থেকে সংসারের দেখাশোনা করেন। আজও তাঁদের হিন্দুস্থানে পা রাখার কোন ব্যবস্থা হয়নি। শবুর মনে পড়ে যায় জিয়াগঞ্জে শুভদা দাদার বিয়েতে গিয়ে বাবা হিন্দুস্থানে একটা বাড়ী করার পরামর্শ দিলে বড় মামার সেই গোঁফের ফাঁকে হাসির কথা।

আগেই চিঠি পেয়ে দীননাথ খুব ভোরে হাওড়ায় গিয়ে মা ও তপুকে নিয়ে এসেছে। শবু মাকে প্রণাম করে আনন্দে জড়িয়ে ধরল।

বলল—'মাগো, তুমি আমাদের বাড়ী আসবে ভাবতেই পারিনি।'

মা আদর করে চুমু খেয়ে বললেন—'বরানগরে না উঠে এখানে এলাম কেন জানিস? দীনুকে সঙ্গে করে কোথায় সেই সন্তোষপুর সেখানে যাতায়াত করতে হবে। এ সব কাজের কথা ঠাকুরপোকে বলা যায় না। তোদের বাড়ী ত দেখবই।'

শবু খুশি হয়ে বলল—'বেশ করেছ মা। আগে তুমি আমাদের বাড়ী দেখ মা, কেমন হয়েছে বল।'

মা বললেন—'তাইত দেখছিরে, কি সুন্দর ছোটখাট খোলা মেলা বাড়ীটা হয়েছে। আবার কত গাছ লাগিয়েছিস। আমার খুব ভাল লাগছে। এই

বাড়ীতেই তোরা সুখে শান্তিতে বাস কর তাহলেই আমাদের আনন্দ।'

এ ভিটেতে শ্বশুর মশাই কালীনাথ বাস করে গেছেন, মা পদ্মিনীদেবীর-ও পায়ের ধুলো পড়ল এখানে—এ ভিটে এখন শবুর কাছে স্বর্গেরও বাড়া।

তপু বলল—'মেজদি, তোদের দেখছি পাকা বাড়ী, লাইটও আছে। তবে যে বলেছিলি পাড়াগাঁ?'

দশ বছরের বালিকা তপু কল্পনার গ্রামের সঙ্গে বাড়ীর মিল খুঁজে পাচ্ছে না। শবু বলল—

'এটা এখন শহর আবার পাড়াগাঁ-ও। রাতে শুনতে পাবি ঐ দূরের বাঁশ ঝাড় থেকে শেয়াল ডাকছে। জানো মা, একবার রাতে রেডিওতে কপালকুণ্ডলা নাটক হচ্ছে, রেডিওতে শেয়ালের ডাকের নকল আওয়াজ শুনে বাচ্চা কুকুর গাঁঠুটা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। আমরা সবাই হেসে উঠতে লজ্জা পেয়ে খাটের নীচে লুকোলো। আর একটা লাল কুকুরের বাচ্চাও কিছুদিন এসে জুটেছিল। কিন্তু গাঁঠু নিজে সব ঘরে ঢুকলেও সেটাকে কিছুতেই ঘরে উঠতে দিত না। একদিন সকাল থেকে সেই লাল বাচ্চাটাকে আর দেখতে পাইনা। সবাই বলছে—নিশ্চয়ই শেয়ালে ধরে নিয়ে গেছে।'

তপু অবাক হয়ে বলল—'তবে যে শুনি কুকুরকে শেয়াল ভয় পায়?'

'সে বড় কুকুরকে। শেয়াল মানুষের বাচ্চাকেও সুযোগ পেলে নিয়ে যায়। এই হাবলুর মাকেও নাকি ছোটবেলায় শেয়ালে নিয়ে যাচ্ছিল। আর একটা জিনিষ দেখ মা, দুই ঘরের মাঝখানে এই সরু বারান্দায় রান্না হয়। আর নতুন ঘর করার পরই ঠিক উপরের ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখী বাসা বেঁধেছে—এখন খড়কুটো ফেলে সব সময় নোংরা করছে।'

মা বললেন—'চড়ুই পাখী থাকা শুভ লক্ষণ। ওদের বাসা ভাঙিস না, খাবারগুলো মীট সেফে তুলে রাখিস, তা হলেই হল।'

বাড়ীতে নতুন মানুষ দেখে গাঁঠু আনন্দে লেজ নাড়ছে আর সবাইকে শুঁকছে। সোনা হাবলুও যাদের খাতির যত্নে লেগে গেল।

মা এসেছে আর কানাই ষষ্ঠীতলায় থাকবে? সে বিকেলেই এল, মা যতদিন আছে সেও ততদিন এখানে থাকবে। মামীমাদের সঙ্গেও মা দেখা করলেন—দুবাড়ী নিয়ে জোর আসা যাওয়া চলতে লাগল।

মাকে প্রথম দিন সন্তোষপুরে নিয়ে গিয়ে দেখা করিয়ে আনতে শবু ও দীননাথেরও সেখানে বিয়ের নেমন্তন্ন হল। মামারা কেউ আসতে পারবেনা, সেই মেসোই সব কিছু করছেন। যাতায়াতের পথে একটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে

ঘেরা মস্ত গেটওয়ালা জায়গা দেখিয়ে বলল দীননাথ—

'এই দেখ টিবি হস্‌পিটাল, এখানেই আমি তিনমাস ছিলাম।'

সেই প্রথম শবু যাদবপুর টিবি হাসপাতাল দেখল।

মা শুধু বিয়ে বাড়ী নিয়ে ব্যস্ত রইলেন না, একদিন বরানগরেও গিয়ে থেকে এলেন। তপুর উপরি পাওনা হল দীননাথের সঙ্গে একদিন বিড়লা তারামণ্ডলের অনুষ্ঠান দেখা, হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়ে ঘুরে আসা। শবু এখনও এ সব দেখেনি, শিয়ালদা লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন এখনো চালু হয় নি।

শেফালী কায়দা করে স্কুল হোস্টেলে চলে গেলেও সেজদাকে দিয়ে রিফিউজী কলোনীতে তার সেই পছন্দের ছেলের অভিভাবকদের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তার জন্য প্রাথমিক যোগাযোগ করাতে শবুকে তাগিদ দিতে ভোলে নি।

এক ছুটির দিনে দীননাথ সেখানে ঘুরে এল, সঙ্গে ছিল তপু। বেচারী নাকালের একশেষ। ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনের দেরী দেখে একটা ষ্টেশন রেল লাইনের পাশ ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছিল। আর একদিন সন্তোষপুর থেকে কজন মামতুতো বোন তপুকে তাদের সোনারপুরের বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে গেছিল—ট্রেনের টিকিট কাটার সময় তপুর রুমালে বাঁধা বাঘমার্কা আধুলিটা চেয়ে নিয়েছিল, পরে আর ফেরৎ দেয়নি। তপু সেই আট আনার দুঃখ কোনদিন ভুলতে পারবে না।

মা তপুকে নিয়ে ফিরে চললেন। হাওড়া ষ্টেশনে উঠিয়ে দিতে গেল শবু দীননাথ কানাই আর ছোটকাকা। বিদায় কালে শবু মাকে বলল—

'দেখ মা, শুধু পাকা বাড়ীই হয়নি, নাক ফোঁড়ান আর নাকছাবি নেবার পর থেকে তোমার জামাইয়ের কোন অসুখ হয়নি। মনে হয়—অফিসে অশান্তি সংসারে অভাব অনটন দুশ্চিন্তা এই সবের জন্যই এত অসুখ হয়েছে। এখন প্রোমোশন পেয়ে শান্তিতে আছে, স্বাস্থ্যও ভাল আছে।'

মা বললেন—'ষাট, ষাট। দুজনে সুস্থ শরীরে সুখে নিজেদের বাড়ীতে ঘরকন্না কর, এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী আছে?'

মা চলে গেছেন। সাতদিনের হাসিগল্পের ফাঁকে শবু মাকে মঙ্গলাদেবী ও মাতুলের দুর্ব্যবহার ও আত্মহত্যার নাটকের কথাও বলেছে। শুনে পদ্মিনীদেবী যেন অবাক হতেও ভুলে গেছেন। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন—এমন মানুষের সঙ্গে তুই কি করে ঘর করবি ভেবে আমি কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না।

দুই

শেফালী দূরে সরে গেলেও নিশ্চিন্তে থাকতে পারল না। তাই আবার ফিরে এল। তার বিয়ের জন্য মা মঙ্গলা দেবী কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। অতএব সেজদা সেজবৌদিই তার একমাত্র ভরসা। তাই ফিরে আসা।

সে একা এল না, সঙ্গে তার শিক্ষিকা বন্ধু শুভঙ্করী ও তার বিধবা মা। অজুহাত অবশ্য একটা আছেই, স্কুল হোস্টেল নাকি উঠে যাচ্ছে ছাত্রীর অভাবে। ওদিকে স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে স্থানীয় স্কুল কমিটির প্রচণ্ড বিরোধ কোর্ট কাছারী পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে। শুভঙ্করীর মামা আবার সেই কমিটির এক বড় পাণ্ডা। সুতরাং আদর্শগত কারণেই সে তার মামার সংসারে ফিরে যাবে না বলে পণ করেছে। ঠিক করেছে সে তার বিধবা মাকে নিয়ে চাঁপাতলাতেই বাসা ভাড়া করে থাকবে।

বাড়ীর প্রায় সামনাসামনি একখানা ঘর ভাড়া পাওয়া গেছে। শুভা তার মাকে নিয়ে শেফালীর সঙ্গে চলে এল। যে ঘরে সোনা আর হাবলু থাকে সেটা শেফালীকে নিয়ে তিনজনের পক্ষে আঁটোসাটো হয়। ঠিক হয়েছে শেফালী শুভাদের ঘরেই থাকবে ও দুই বন্ধু শবুদের হেঁসেলে খাবে, শুভা অনেকটা পেয়িং গেস্ট। শুভার মা নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ মহিলা, মেয়ের জন্মকালেই বিধবা হয়েছেন। স্বভাবতই কিছু আচার বিচার মেনে চলেন। তিনি ভাড়া বাড়ীতে তাঁর আলাদা রান্না করে নেবেন।

শুভা এসে দুদিনেই শবুর সঙ্গে খুব জমিয়ে নিল, প্রথমে আপনি থেকে 'তুমি' শেষে একেবারে 'তুই' তে নেমে এল। শবু অতটা নামতে পারে না, 'তুমি'তেই থেমে আছে। বৈশাখে কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হবে শুনে শুভা শবুকে বলল—

'এই বৌদি, বলনা তোর বরকে সবাই মিলে একটা রাত ওখানে গিয়ে বড় কয়েকজন ওস্তাদের গান শুনে আসব। কত বড় বড় সব ওস্তাদ আসবেন।'

শুভা মাস্টারীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় এম এ দেবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে আবার তানপুরা বাজিয়ে তবলচি রেখে রীতিমত উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা করে।

শবুরও সম্মেলনে যাবার ইচ্ছে, যদিও নিজে উচ্চাঙ্গ সংগীতের কিছু বোঝে না। কিন্তু কাগজে লিখেছে একদিন সেই আসরে সুনন্দা পট্টনায়ক খেয়াল

গাইবে—সে এখন নামকরা গায়িকা। শুভার কাছে নিজের দর বাড়াতে শবু বলল—

'আমারও খুব ইচ্ছে, সুনন্দা আমার ক্লাশফ্রেণ্ড ছিল, এ নিশ্চয়ই সেই সুনন্দা, একবার সামনাসামনি দেখলে নিশ্চিন্ত হতে পারি আর তোমাকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারি।'

শবু গান বাজনার ব্যাপারে শুভাকে টেক্কা দিয়ে যাবে, হতেই পারে না। শুভা বলল—

'তোর উচ্চাঙ্গ সংগীতের জ্ঞান আমার জানা হয়ে গেছে। সেদিন সকালে মালবিকাদির খেয়াল হচ্ছিল রেডিওতে—টোড়ী রাগে, আমি আমাদের ঘরে বসেই মন দিয়ে শুনছিলাম—হঠাৎ আলাপের মাঝখানেই পুট করে দিলি রেডিওটা বন্ধ করে। আমার অধঃপতন হয়েছে তোদের মত বেরসিকের সঙ্গে বাস করছি।'

শবু ভালমানুষের মত বলল—'কি করে জানব বল? এ বাড়ীতে একজনই ও সব গান শোনে, সে অফিস রওনা হয়ে গেল আমিও বন্ধ করে দিলাম।'

শুভা মুখ ভেঙচে বলল—'বন্ধ করে দিলাম! তোদের বংশে এ সব জিনিষ কেউ বোঝে?'

শবু বলল—'অমন করে বোলো না শুভঙ্করী। আমার বড়কাকার গানের কথা এখনও সবাই বলে, খেয়াল ধ্রুপদ চর্চা করত, বাবা কাকারাও গাইয়ে বাজিয়ে ছিল। এদের পিসীর নাতনী অরু—অরুন্ধতী রেডিওতে গান গায়—খেয়াল ঠুংরি।'

শেফালী সায় দিল—'বৌদি ঠিকই বলেছে।'

শুভা দমবার পাত্রী নয়, বলল—'রাখ তোর অরুর কথা। সে নিশ্চয়ই মালবিকা দি, মীরাদির মত গায়না।' শুভা তানপুরা হাতে ধরেই ভেবেছে সে সব বড় আর্টিষ্টদের অতি নিকট জন, প্রায় সম পর্য্যায়ে উঠে গেছে।

শবু তাকে রাগানোর জন্য বলল—'শুধু কি তাই? এই যে কুকুর গাঁঠু, সেও একজন গানের সমঝদার। চক্কোত্তির ছেলে হারমোনিয়ম বাজিয়ে বেসুরো গলায় আওয়াজ বের করলেই সে ঘেউ ঘেউ করে তাকে থামিয়ে দেয়। আবার দেখ তোমার তবলচি এলে এখানে চা খাইয়ে যখন ও বাড়ী যাও তখন গাঁঠু মাথা নীচু করে তোমাদের সঙ্গে যায়, দেড় দু ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে তোমাদের রেওয়াজ শোনে, মাথা দোলায়, আবার তোমাদের সঙ্গে ফিরে আসে। কেমন শেফালী, আমি ঠিক বলিনি?'

শেফালী মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল—ঠিক।

শুভা রেগে বলল—'মাথা দোলায় না তোর মুণ্ডু করে। অমনি করে মশা তাড়ায়।'

শবু নির্বিকারভাবে বলল—'ঐ একই কথা। ভাবছি সামনের বছর গাঁঠুকে বেনারস ঘরানায় পরীক্ষা দিতে পাঠাব।'

শুভা শবুর পিঠে দু চার কিল বসিয়ে বলল—

'অতই যদি, তবে বলনা তোর বরকে একদিন নিয়ে যেতে।'

শবু বলল—'আমার বর যে রাত জাগতে নারাজ।'

শুভা সুযোগ পেয়ে গেল, বলল—'তা পারবে কেন? শুধু তোকে নিয়েই রাত জাগবে। তোর 'ব' কে 'ভ' তে ধরুক।'

এ সব ওদের সাঙ্কেতিক ভাষা—বরকে বলবে 'ব' গাধাকে বলবে 'গ'। 'ভ' বললে কি বোঝাবে ভূত না ভল্লুক? যা ইচ্ছে বুঝে নাও।

শবুর প্রাইভেট লাইফে খোঁচা দিয়েছে, সেও আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলল—'গাঁঠু কি শুধু গানেরই সমঝদার, লেখাপড়ায়ও কিছু কম যায় না, বি এ পাশ করেছে।'

এবারে শুভা শবুকে বাগে পেয়েছে, কুকুরের বিদ্যার বহর যাচাই করা যাবে ভেবে বলল—'তাই নাকি? এরপর সে কি করবে?'

শবু অম্লানবদনে বলল—'এবারে সে প্রাইভেটে বাংলায় এম এ দেবে।'

আর সহ্য করা যায় না, আবার দুমদুম করে শবুর পিঠে কিল বসিয়ে শুভা বলল—

'তুই একটা মুখ্য, আই এ পরীক্ষাটাও না দিয়ে বিয়ে করে বসলি, আর তোর কুকুর বাংলায় এম এ দেবে? কেন, আমি পড়ছি বলে? তোর মুখও দেখব না' বলে নিজেদের বাড়ী রওনা হল হন্ হন্ করে।

শবু হাসতে হাসতে ডেকে বলল—'রান্না হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি এসো না হলে ট্রেন 'ফ' হয়ে যাবে আর মামারা আর একনম্বর মামলা ঠুকে দেবে।'

দুজনের এমনি নকল লড়াই চলে প্রায় প্রতিদিনই। শেফালী মাঝে মাঝে থামাতে চায়, বলে—

'শুভঙ্করী এবারে তুই ক্ষান্ত দে। বৌদি কম কথা বলে বটে তাই বলে মনে করিস না তার বুদ্ধিও কম।'

শুভা মানতে রাজী নয়, বলল—'এরা দুটি বর বৌ একেবারেই সায়া

কলকাতার ওঁচা মাল।'

শবু সঙ্গে সঙ্গে বলল—'শুভঙ্করী, তুমি কোথাকার থাস্তামাল—কাঁচড়াপাড়ার? কাঁঠালপাড়ার মানুষ হলেও না হয় কথা ছিল। সাহিত্য সম্রাটের নামে এর-এতে তরে যেতে পারতে।'

শুভা বলল—'তুই আর কথা বলিস না। সেদিন তোরা দুই 'ব' তে মিলে নববর্ষের শাড়ী কিনে নিয়ে এলি—আহা, কি তোদের পছন্দ। আবার দামেও ঠকে এসেছে একগাদা। অমন শাড়ী আমাদের স্কুলের জমাদারনীও পরে না।'

শবু বলল—'তুমি আর তোমার জমাদারনীর পছন্দ বোধ হয় এক। ওটা যে শান্তিনিকেতনী ডিজাইনের শাড়ী। ভাল কথা, সেদিন যে গান ফাংশন নিয়ে অত কথা বললে, নিজেও একজন বড় গাইয়ে। তুমি কোনদিন কলকাতার কোন ফাংশনে গান গেয়েছ? এবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতী হলে ওদের অফিস থেকে বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয় করবে। আমার 'ব' নায়ক অবিনাশের পার্ট নিয়েছে, যেদিন হবে গিয়ে দেখে এসো।'

শুভা হেসে গড়িয়ে পড়ল,—'আহা, কি আমার নায়ক রে—নায়িকাই নেই তার আবার নায়ক।'

শবু দুঃখিত হবার ভাব দেখিয়ে বলল—'কি আর করা যাবে, রবিঠাকুর এ ·াটক যে স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত করে রচনা করেছেন, নায়িকাকে রেখেছেন নেপথ্যে। তবু বল, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর হলে ষ্টেজে নামা কি চাট্টি-খানি কথা? তুমি পারবে?'

শুভাও হাল ছাড়ল না, বলল—'নিজের 'ব' এর গর্বে নিজেই মোহিত হ'। আমার পেরেও কাজ নেই, ষ্টেজে নেচেও কাজ নেই। আমি দেখিস একদিন রেডিওতে গান গাইব।'

কদিন পরেই শুভা শবুর কাছে মোক্ষম জবাব পেয়ে গেল। শনিবারের বিকেলে শেফালী ও শুভা স্কুল থেকে ফিরেছে, শবু ঘুম থেকে উঠে চা করে তিনজনে ঘরে বসে মৌজ করে চা খাচ্ছে। শুভঙ্করী বোধ হয় সেদিন ক্লাশের মেয়েদের কড়া শাসন করে এসেছে, সেই গর্বে গল্প ফেঁদে বলল—

'আমাকে সবাই ভয় পায়, আর তোকে?'

শবু বলল—'ভয় করার কি আছে, ভয় করতেই বা যাবে কেন?'

শুভা বীরের মত ভাব করে বলল—'আছে, আছে। পার্সোন্যালিটি থাকা লাগে, এমনিতে হয় না।'

তা হবে। শবু ত আর একশ' দুশ ছাত্রী চরায় না, তাকে দেখে কে আর ভয় পাবে ?

এমন সময় বাড়ীর প্রাচীরের ভিতর ধুপ করে একটা বল পড়ার শব্দ হল। শবু বলল—

'শুভঙ্করী, আমার সঙ্গে একটু বাইরে এস ত ?'

'কেন ?'

'আহা, এসোই না একটু' বলে প্রায় জোর করেই বাইরে টেনে নিয়ে এল।

চার পাঁচটা ছোট ছেলে বাড়ীর বেড়ার গেট খুলে ভেতরে ঢুকছিল, হঠাৎ শবুকে বাইরে আসতে দেখে সবাই একসঙ্গে স্ট্যাচু হয়ে গেল।

শবু শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল—'কি হয়েছে ?'

সামনের ছেলেটি মাথা নীচু করে জবাব দিল—'বল পড়েছে।'

'যাও নিয়ে এস' বলতে সামনের ছেলেটি গুটিগুটি গিয়ে বল কুড়িয়ে নিয়ে এল, সঙ্গের ছেলেরা গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। বল নিয়ে সবাই চলে গেলে শবু শুভাকে বলল—

'দেখলে ত ? ওরা আমার ছাত্র বা ছাত্রী নয়, আমি কাউকে বকিওনি।'

শুভা রেগে বলল—'তুই একটা কম নোস্ বুঝলি। ওরা কি তোকে দেখে ভয় পায়, তোর চেহারা দেখে ভয় পায়, যদি টিপে মেরে ফেলিস।'

শবু অজ্ঞতার ভান করে বলল—'শুভঙ্করী, তুমি পার্সোন্যালিটি না কি যেন বলেছিলে। তার মানে কি ?'

আবার শেফালী এগিয়ে এল, বলল—

'শুভঙ্করী, এবারে তুই ক্ষান্ত দে। বৌদির সঙ্গে বুদ্ধিতে তুই পারবি না।'

সেই থেকে শবু আর শুভার কথার লড়াই বন্ধ হল। শবু শেফালী শুভঙ্করী—তিন 'শ' এ এখন খুব মিল, যেন তিন সখী। শবু—শেফালীর তিক্ততার ভাবও কেটে যাচ্ছে। বোঝাই যায় না ওরা ননদ আর ভাজ। আসলে শাশুড়ী বৌ আর ননদে মিলে হয় ত্রহ স্পর্শ, অঘটন ঘটে—তা সে যার কারণেই হোক। ত্রহ স্পর্শ কেটে গেলে আর কোন বিপদ নেই।

বাড়ীতে নেই কোন অশান্তি, কিছু ধার দেনা থাকলেও দীননাথ তা ঢেকে রেখে সংসার চালায়। সারাদিন বাড়িতে হাসি গান গল্প লেগে আছে, সোনা হাবলুও আছে। মামীমা, তাঁর ছেলেরা আছে, প্রতিবেশিনীরা আছে, করবীরা মাঝে মাঝে আসে, ষষ্ঠীতলায় ঠাকুমা কাকা কাকীমারা আছেন

সেখানে যাতায়াত আছে। সোদপুরে বড়জা বীণার কাছেও যায়, তারাও আসে। সবাই সুখে শান্তিতে আছে।

আর আছেন শুভার মা। শবুর ঘরকন্না করা বড়ি দেয়া কাসুন্দি তৈরী করা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেন—

'এ মেয়ে আজকালকার মেয়েদের মত নয়, ঘর কন্নার সব কাজ শিখেছে—সংসারের সব নিয়ম কানুন বজায় রেখেছে। এমনটি বৌ আজকাল বড় একটা চোখে পড়েনা।'

শবু বলে—'মাসীমা, ঘরের লোক যদি একবার মুখ ফুটে সে কথা বলে তবেই সব কষ্ট সার্থক মনে হয়। সেখানে ত শুধু বদনামই শুনি।'

মাসীমা বলেন—'সে কি কথা বলছ মা। শুনেছি আগে তোমাদের মাত্র একটা কুঁড়ে ঘর ছিল, এখন দু দুখানি পাকা ঘর হয়েছে—ঘরে লক্ষীমন্ত বৌ না থাকলে কি হতে পারত?'

মাসীমা মাঝে মাঝে তাঁর মৈমনসিং ঘরানার নিরামিষ তরকারী খেতে দেন। ঝালের হাত একটু বেশী তবু শবুর মুখে অমৃতের স্বাদ লাগে, দুঃখ করে বলে—

'মাসীমা, বিয়ে হয়ে এসে থেকে শুধু রাঁধছি আর সবাইকে খাওয়াচ্ছি, অপরের হাতের রান্না যেন অমৃত লাগে। এখানে একটা দিনও নিজে রান্না না করে খেয়েছি কিনা মনে পড়ে না।'

শেফালী সব শোনে, কোন প্রতিবাদ করে না। কারণ—গরজ বড় বালাই। তার সব নজর এখন রিফিউজী কলোনীর সেই ছেলেটির দিকে।

সোনার নজর কি শুভার দিকে? শবু ঠিক বুঝতে পারে না।

মাসীমাকে শবুর বেশ ভাল লাগে তাঁর নরম ও অদ্ভুত সরল স্বভাবের জন্য। খুব অল্পবয়সে একমাত্র মেয়ে শুভাকে কোলে করে বিধবা হয়েছিলেন। অনেক কষ্টে মেয়েকে বড় করে তুলেছেন। মেয়ে এখন মায়ের ভার নিয়েছে। বামুনের ঘরের বিধবা মাসীমা কারো সাতে পাঁচে থাকেন না, নিজের রান্না আর আচার বিচার নিয়ে থাকেন। অবসর সময়ে একা একাই ঘরে বসে তাস খেলেন। রং মেলানোর খেলা—তাঁর প্রতিপক্ষ 'কানা' এক অদৃশ্য ব্যক্তি। নিজেই দুপক্ষের হাত খেলেন এবং তিনিই জেতেন। যদি কখনো দেখা যায় অপরপক্ষ জিতে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে সব তাস মিশিয়ে ফেলে—'কানায় জিতব ক্যান, বাঁটনের ভুল হইছে'—বলে আবার নতুন করে তাস বাঁটতে থাকেন। অবশেষে 'কানা' কে হারিয়ে মনের আনন্দে খিলখিল করে হাসেন শিশুর মত।

তিন

পয়লা বৈশাখে শবুর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হল। দুদিনের জন্য বর্ধমানের গ্রামে বেড়িয়ে এল। দীননাথের অফিস-বন্ধু সুবীর চ্যাটার্জী আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। শুধু দীননাথ শবু নয় সঙ্গে কানাই শ্রীলাকেও তারা নিয়ে গেছিল। বর্ধমান থেকে বি এণ্ড কে রেলের খুপরি খুপরি গাড়িতে চেপে কর্জনার চটিতে নেমে গরুর গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা। কথা ছিল সুবীর গ্রাম থেকে গরুর গাড়ী পাঠাবে। গাড়ীর হদিস না পেয়ে বাসে করে ভাতারে পৌঁছে খোঁজ করে সুবীরের দাদা, স্থানীয় ডাক্তার অধীর বাবুর বাসায় উঠতে হল। সেখানে বসে ওরা যখন নববর্ষের হালখাতায় রসগোল্লা খাচ্ছে তখন সুবীর উপস্থিত হল ট্যাক্সি করে হন্তদন্ত হয়ে। আবার কর্জনার চটি ট্যাক্সিতে তারপর চার পাঁচ মাইল গ্রামের পথে গরুর গাড়ীতে যাওয়া।

কত নাম-না-জানা গ্রামের মধ্য দিয়ে, দীঘির পাড় ধরে, বাবলাবনের ধার দিয়ে, প্রায় শুকনো একটা নদী যাত্রীসহ গাড়ী পার করিয়ে এক রকম হাড়-গোড় ভাঙা অবস্থায় গ্রামে পৌঁছল ভরদুপুরে। গ্রামের নাম বাসনা—ব্রাহ্মণ-প্রধান খুব ছোট একটি গ্রাম। সেখানে সুবীরের মা, এক বিয়ে হওয়া দিদি আর বৌ মালার আদর আপ্যায়ন, ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখা। কানাইয়ের বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমগাছে উঠে কাঁচা কাঁচা আম পাড়া আর বড় দীঘিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটা। শ্রীলা শুধু আম কুড়িয়েই খুশি।

পরদিন দুপুরে স্নান খাওয়া সেরে আবার গরুর গাড়ীতে ওঠার আগে সুবীর বলেছিল—'আবার আসবেন বৌদি।'

শবু হেসে বলেছিল—'দ্বিতীয়বার গরুর গাড়ী চড়ার পর বাকি হাড়গোড় গুলো যদি আস্ত থাকে ত দেখা যাবে।'

সুবীর বলেছে—'বিষে বিষে বিষক্ষয় হবে। তা ছাড়া এখানে বাবা একজন রিটায়ার্ড ডাক্তার, ভাতারে দাদাও ডাক্তার, বিনি খরচায় চিকিচ্ছের ব্যবস্থা হবে।'

সুবীরের বৌ মালা বলেছিল—'দিদি, আপনারা এই গ্রামে একটা ঘর করে নিন ভাই, তাহলে বেশ ভাল হয়।'

এখানকার গ্রামে সবই মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের চালা ছাওয়া

ঘর অনেকগুলো আবার দোতলা। গরমের দিনে ঘর খুব ঠাণ্ডা। গ্রামে হাটবাজার নেই, পথ ঘাট নেই। বাসিন্দা সবাই খাঁটি এদেশীয়—যাকে বলে খাস ঘটি। তার মধ্যে এক ঘর শবুরা এলে সবাই কি চোখে দেখবে? শবুর সভয় জবাব ছিল—

'না ভাই, সবাই ডাকবে বাঙাল দিদি বলে।'

গ্রাম দেখার দুটো বিশেষ ঘটনা শবুর মনে গেঁথে আছে। সুবীর বাবুর বাবা নিজের মনে বাইরের একখানা ঘরে কিছু ওষুধ পত্রের শিশি বোতল সাজিয়ে গ্রামের কয়েকজন রোগী নিয়ে দিন কাটান, বেশী কথাবার্তা বলেন না অথচ অসামাজিকও নন। দেখে শবুর বারবার নিজের বাবা ও তাঁর ডাক্তার-খানার কথা মনে পড়েছে।

আর একটা হল একেবারেই মেয়েলী ব্যাপার। এদের বাড়ীতে বাথরুম কুয়ো এমন কি একটা ইটের গাঁথা খাটা পায়খানাও আছে। কিন্তু মালা আর তার মেয়ে মণিকা শবু ও শ্রীলাকে গাছ পালায় ঘেরা তাবুলীর পুকুরে টেনে নিয়ে গেছিল। সেখানে গ্রামের বৌ-ঝিরা প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারছে, ছোটখাট ব্যাপার হাঁটুজলে দাঁড়িয়েই সেরে নিচ্ছে। আবার সেই পুকুরের জলেই মুখ ধুচ্ছে স্নান করছে। মালার ননদের ছোট ছেলেটা সঙ্গে ছিল, ভীষণ দুষ্টু, যতবার তাকে মাথা ডুবিয়ে স্নান করতে বলছে—'ডুব দাও, ওয়ান-টু-থ্রী' ততবারই একমুখ জল নিয়ে 'পুৎ' করে সামনে ছিটোচ্ছে, কিছুতে মাথা ডোবাবে না।

শবু শ্রীলা পুকুরের পাড় থেকে সব ক্রিয়া কাণ্ড দেখে শুকনো পায়ে বাড়ী ফিরেছে—হোক সে পুকুরে ছেলেদের যাওয়া বারণ, তাই বলে সকলের সামনে…! মা গো—ভাবতেই সারা শরীর শিরশির করে ওঠে! তার চাইতে বাড়ীর আধঘেরা বাথরুম অনেক ভাল।

একদিন গ্রাম বাসের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা নিয়ে শবুরা ফিরে এসেছে, সঙ্গে শ্রীলা আর কানাই।

সেই কানাই বড়দিনের ছুটির মধ্যে টেস্টে এলাউ হয়ে শবুকে এসে বলল—

'মেজদি, পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমি তোদের এখানে থাকব। বাবুটার বুদ্ধি নেই (বাবু বলে 'ভুব্বি' নেই) সারাদিন হৈ চৈ করে আমাকে পড়তে দেয় না। তুই কাকীমাকে বল, আমি বলতে পারি না, কাকীমার চোখের দিকে তাকালে আমার মাথা গুলিয়ে যায়—অথচ কাকীমা আমাকে বকে না মারে না।'

মাঝখানে বর্ষা গেছে শরৎ গেছে। মামীমার বড় ছেলে দুলু নিমপুর হাইস্কুল থেকে ইংরেজী সহ তিনটে পেপারে লেটার নিয়ে পাশ করেছে। দুলুটা সত্যি খুব ভাল ছেলে—কি দুরবস্থার মধ্যে থেকে এমন রেজাল্ট করেছে। কিন্তু অভাবের জন্য তাকে আর পড়ান গেল না, বয়স ষোলরও দু বছর কম বলে সরকারী চাকরি পাবে না। শেষে তার এক মামার সাহায্যে এক কণ্ট্রাক্টরের অধীনে টাইম কীপারের কাজ পেয়েছে—মাসে একশ টাকা করে পাবে। সেই সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড টাইপও শিখছে। শেফালী মাসে মাসে ১৫।২০ টাকা সাহায্য করে।

বর্ষার শেষদিকে মামীমা কঠিন অসুখে পড়েছিলেন, দীননাথ এ্যাম্বুলেন্স ডেকে জলকাদা ভেঙে তাঁকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করল—শবু প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে মামীমা মামা ও ছেলেদের দেখাশোনা করল, খাওয়াল। মামীমা সুস্থ হয়ে বলতে লাগলেন—

'সেজ ভাগ্নে ও শ্রাবণী যা করল তা ভোলার নয়।'

মামীমা বড় অল্পেই তুষ্ট।

এখন কানাইয়ের কথায় শবু চিন্তায় পড়ে গেল—কি করে কথাটা কাকীমাকে বলবে, যদি কিছু মনে করেন। শেষে শবু গিয়ে কাকীমাকে বলল, তবে একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে যাতে কাকীমার মনে আঘাত না লাগে—

'কাকীমা, কানাইএর ত সামনেই পরীক্ষা। আমাদের বাড়ীতে দু দুটো মাষ্টারনী থাকে, দুলুটাও খুব ভালভাবে গতবারে পাশ করেছে। কানাই যদি আমাদের বাড়ীতে থাকে ওদের কাছে অনেক সাহায্য পাবে।'

কাকীমা খুবই বুদ্ধিমতী, নিজে থেকেই বললেন—

'আমিও ভাবছিলাম কানাই তোদের ওখানে এ তিনমাস থেকে পরীক্ষা দিক। বাবুটা অবুঝ, পুটু নীলা বেলা সব ছেলেমানুষ, ওকে ভাল করে পড়তে দেয় না।'

শবু ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করল—'ঠাকুমা, তোমার কি মত বল?'

ঠাকুমা চোখ দুটো পিট পিট করে বললেন—

'তোদের মতেই আমার মত। বোনরা ত ভাইয়ের মঙ্গলই চায়।'

কানাই মেজদির বাড়ী থাকবে শুনে এরা পুটু বাবু নীলা বেলা সবাই দুঃখিত হল। ছোটকাকা শুনে বললেন—

'অত দুঃখ করছিস কেন, ওকে ত রোজ কোচিং ক্লাশ করতে ষষ্ঠীতলায় আসতে হবে।'

ভাই বোনেরা একসঙ্গে কানাইকে জড়িয়ে ধরে বলল—

'কানাইদা, রোজ আসবি ত?'

'হ্যাঁ আসব'—কানাই প্রতিশ্রুতি দিল। সেও সবাইকে ভালবাসে, নেহাৎ সামনে পরীক্ষা, তাই যাওয়া।

দু বাড়ী থেকে মন্দির শহরে বাবা মার কাছে চিঠি চলে গেল—কানাই পড়াশুনার সুবিধের জন্য তিনমাস মেজদির কাছে থাকবে।

এ বাড়ীতে পড়তে এসে কানাই কি বিপদেই না পড়েছে। রোজ সকালে রাতে দীননাথ রেডিও বাজায়—তাও আবার বেশীর ভাগ খেয়াল ঠুংরী, একবার ধরলে আধঘন্টার আগে থামে না। শুভা তার একজন উৎসাহী শ্রোতা। অবস্থা দেখে কানাই বলল—

'মেজদি, এখানে পড়তে এসে আমার পড়া মাথায় উঠল।'

শবু দীননাথকে বলল—'শুনছো, তোমার রেডিও বাজানো একটু কমাও, কানাই মন দিয়ে পড়তে পারছে না।'

দীননাথ বলল—'সেক্সপীয়ার বলেছে যে গান ভালবাসে না সে মানুষ খুন করতে পারে। পড়ুয়া ছেলে হলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পড়ার ক্ষতি হয় না। দেখছিস না কানাই, তুলু কি অবস্থার মধ্যেও ভাল রেজাল্ট করল।'

কানাই এক লাফে গিয়ে জামাইবাবুর সঙ্গে কুস্তি লড়তে লাগল। কে কাকে কি বলবে! যথারীতি হেরে গিয়ে কানাই বলল—

'আপনার নব্বই বছর বয়স হোক তখন দেখব কে পারে।'

কথাটা একদিন চিনু বলেছিল। তুলুর সঙ্গে মারামারি করে হেরে গিয়ে বলেছিল—তোর নব্বই বছর বয়স হোক তখন তোকে দেখে নেব। আশি নব্বই বছরের দুই বৃদ্ধ মারামারি করছে কল্পনায় সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করে।

এই সময় সোনা ওভারসীয়ারী পাশ করে প্রায় চারমাস বসে থেকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রেলের একটা চাকরি যোগাড় করেছে। সেও ওভারসীয়ারের উপযুক্ত কাজ নয়, প্রায় টাইম কীপার—আর এজন্য তাকে যেতে হবে বহুদূরে গণ্ডগ্রামে। চাকরির বাজার খুব খারাপ, তব পাশ করে পরের দিনই তাদের ব্যাচের সকলে চাকরি পেয়েছিল—আর সোনা পাশ করে টাইম কীপার তাও চারমাস বসে থাকার পর।

যাবার সময় সোনা বলে গেল—

'সেজদা, আমি মাইনে পেয়ে আগে মামীমার কাছে বড়দার দেনা সাড়ে

সাতশ টাকা মাসে মাসে শোধ করব।'

দীননাথ বলল—'সে শোধ হলেও এখানে টাকা পাঠানোর দরকার নেই বিদেশে তোকে টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে ঐ কটা টাকা মাইনের।'

মুখখানা করুণ করে সোনা বলল—'যাই বৌদি, অজানা দেশে কেমন থাকি কে জানে।'

সোনা চলে গেলে শবুর খুব মন খারাপ লাগছে। শুভার চোখেও বেদনার ছায়া কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ নেই।

শীত শেষ হয়ে আসছে এমন সময় শেফালীর হল জল বসন্ত। সোনা চলে গেলে ছোট ঘরটার এক বিছানায় শোয় শেফালী অন্যটায় কানাই আর হাবলু এক সঙ্গে। ঘরে পক্সের রুগী, কানাইয়ের সামনে পরীক্ষা।

শবু দীননাথকে বলল—'এখন থেকে তুমি আর কানাই এ ঘরে চৌকিতে শোবে—আমি মেঝেতে শোব।'

দীননাথ বলল—'কানাইয়ের একবার পক্স হয়ে গেছে, আমারও। বরং ভয় হাবলুটার জন্য। এখন শীত আছে, মেঝেতে শুলে তোমার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে।'

শবুর কোনদিন কোন অসুখ করেনি, স্বাস্থ্যও এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। বাসনা গ্রামে বেড়াতে যাবার সময় ষ্টেশনে ওজন নিয়েছিল—শবু পঞ্চান্ন কেজি, দীননাথ ষাট। তাছাড়া ভাইয়ের জন্য যদি এটুকু না করল তবে কার জন্য করবে? বলল—

'আমার কিছু হবে না আমি মেঝেতেই শোব।'

শেষে ঠিক হল কানাই দীননাথ এক বিছানায় শোবে, হাবলু থাকবে শুভাদের ঘরে।

তবু সে ভয়ের ভান করে শুভাকে বলল—'শুভঙ্করী, তোমার বন্ধুর পক্স হয়েছে তুমি তার সেবা করবে, আমি ও ঘরে ঢুকব না।'

শুভা বলল—'ভয় করলে আগে হয়, তোরও হবে—ভাবিস না।'

শবু বলল—'আমার হবে না, তোমারই হবে।'

দুজনের কথাই ফলল, আগে শুভার হল, পরে শবুরও হ'ল। ঐ সময় রেডিওতে 'নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে···'গানটা প্রায়ই শোনা যেত। শুভার পক্স হয়ে থেকে শবুকে বলতে লাগল—

'ঐ শোন কি বলছে, হবেই হবে—তোর হল বলে।'

এবং সত্যি সত্যিই শবুর গায়ে বসন্তের গুটি বের হল, আর সে গিয়ে শেফালীদের ঘরে আশ্রয় নিল। ততদিনে শেফালী সেরে উঠেছে—এক ঘরে দুই বিছানায় শবু আর শুভা। শবু ঠাট্টা করে বলল—

'শুভঙ্করী, তুমি আমাকে ছোঁবে না, তোমার পক্স হয়েছে।'

ছোঁয়াচের ভয়ে আর নানান জনের নানা পরামর্শ শুনে শেফালীর বসন্ত হয়ে থেকে বাড়ীতে মাছ মাংস ডিম আসা বন্ধ হয়ে গেছিল—নিরামিষ খেতে খেতে সবার মুখ পচে গেছে। শেষে পাড়ার এক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর এসে অভয় দেওয়াতে মাছ মাংস আনা শুরু হল—সকলে মুখ বদলে বাঁচল।

হাসি ঠাট্টা যাই করুক, রোগের জ্বালা যন্ত্রণা ত আছেই। শুভা ভাল হয়ে বাইরে যেতে আরম্ভ করলে শবু একা ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদে, দীননাথ তার দেখাশোনা করতে এলে কেঁদে বলতে লাগল—

'ওগো শুনছো, আমি বোধ হয় আর বাঁচব না। আমার কোনদিন কোন অসুখ হয়নি, এখন কেন হল? প্রায় প্রত্যেকবারেই টিকা নি তবু কেন বসন্ত হল?...বাবা কি সুন্দর ওষুধ দেয়, এক পুরিয়া ওষুধ খেলে আর কোন অসুখ হয় না। আমি এবার নিশ্চয় মরে যাব...।'

দীননাথ কত বোঝাল—'এই ত শেফালী শুভঙ্করী ভাল হয়ে উঠল তুমিও ভাল হবে, টিকা দিয়ে এই বসন্ত আটকানো যায় না, আমি না হয় এ কয়দিন তোমার ঘরে শুই...।'

শবুর মন তাতে প্রবোধ মানে না, আবার এই অসুখের মধ্যে দীননাথ তার কাছে আসবে বা এক ঘরে থাকবে তাও সে প্রাণে ধরে হতে দিতে পারে না। যেমন করে হোক দীননাথ আর কানাইকে ছোঁয়াচের হাত থেকে দূরে রাখতে হবে। শবুর কি ভাগ্য, জীবনে প্রথম অসুখ করল অথচ স্বামীকে সে কাছে পেতে পারে না; মা-বাবাও অনেক দূরে।

কানাই বুঝি জীবনে প্রথম শবুকে ধমক দিল, বলল--

'মেজদি, তুই একটা আউপাথালি, বুঝলি। আমারও পক্স হয়েছিল, আমি কাঁদি নি।'

শবু বলল—'কাঁদিস নি আবার, কাকীমার কাছে শুনেছি তুই সারাদিন মা মা বলে কাঁদতিস, আমিও এক দুদিন পরে গিয়ে গিয়ে তোকে দেখে এসেছি। আমার যে কেবল বাবা মার কথা মনে আসছে।'

কানাই মুখখানা করুণ করে বলল—'অসুখের সময় বাবা মার কথাই বেশী করে মনে পড়ে, না রে মেজদি?'

দুই ভাই বোন এ ব্যাপারে একমত, বলতে গেলে পৃথিবীর সব ভাই বোনই।

কদিন পরে শবু সেরে উঠল। আশ্চর্য্যভাবে বেঁচে গেল হাবলুটা, ওর কিছুই হল না। দীননাথ কানাইয়ের একবার করে হয়ে গেছে, তাই ততটা ভয় ছিল না।

এসেছে আর একটা সাধারণ নির্বাচন। চারদিকে জোর মিটিং মিছিল বক্তৃতা চলছে।

একদল বলছে—আমরা দেশের স্বাধীনতা এনেছি, দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছি, দেশে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, সাঁওতালডি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, কল্যাণী উপনগরী ও ইউনিভার্সিটি, লবণহ্রদ উন্নয়ন প্রকল্প, জমিদারী বিলোপ আইন—সব আমাদের কীর্তি। আবার ইলেকট্রিক ট্রেনও হয়েছে, হচ্ছে।

শবু একবার দীননাথের সঙ্গে উল্টাডিঙ্গিতে গিয়ে লবণ হ্রদ উন্নয়নের কাজ দেখে এসেছে। গঙ্গার পলি মেশানো জল পাম্পের সাহায্যে এনে জলা জায়গায় ফেলছে—মুহূর্ত্তের মধ্যে বিঘেটাক জায়গা কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু হয়ে যাচ্ছে। আবার পাইপের নল তার উপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে বসাচ্ছে। কত সহজে জলা জমি ডাঙা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে ভরাট করা জমিতে কয়েকটা পাকা বাড়ীও করে দেখানো হয়েছে—বাড়ী বসে যাবে না। তবু লোকের মনে সংশয়।

অন্য পক্ষ বলছে—সমাজ সরকার সবই চলমান, কিছু কাজ ত হবেই. কিন্তু যা কাজ হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। গরিব আরো গরিব হচ্ছে, বেকার বাড়ছে, পড়াশুনার সুযোগ কমছে, রিফিউজীদের দুর্দশার একশেষ—তাদের ভিড়ে শিয়ালদা ষ্টেশনে পা ফেলার জায়গা নেই। জমিদারী উচ্ছেদ আইনের ফাঁকে অধিকাংশ জমি বেনামী হয়ে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের দ্বারা কিছু হবে না, চাই প্রকৃত সমাজতন্ত্র।

রিফিউজীদের ব্যাপারে শবুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এরা রিফিউজী হয়েও বাড়ী তৈরীর জন্য এক পয়সা সাহায্য পেল না। ধার দেনা করে গয়না বন্ধক দিয়ে তবে যা কিছু হয়েছে। তাছাড়া খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে. দীননাথের আনা কিছু বই পত্র পড়ে তার অনেক জ্ঞান বেড়েছে।

এবারে ওদের ভোটার লিষ্টে নাম উঠেছে—শবু জীবনে প্রথম ভোট দিয়ে

জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করেছে। কাকে ভোট দিয়েছে? সে কথা বলা যাবে না—এটা গোপনীয় ব্যাপার।

শুব থাকলে বলত—কাকে আর দেবে, নিশ্চয়ই ভাসুর ঠাকুরের দলকে ভোট দিয়েছে।

রেডিও খবরের কাগজে ভোটের ফল শুনে, দেখে দীননাথ আবার মুষড়ে পড়ল। মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশটা আসনে জিতে কিছু করা যাবে না। পাড়ার ছাত্র যুব নেতা বোধন বোস ও অন্যান্যদের সঙ্গে শুকনো মুখে আলোচনা করে চীন কিউবা ভিয়েৎনামের কথা আলোচনা হয়। দীননাথের দুঃখে শবুও সমব্যথী।

পণ্ডিতজী ও ডঃ রায় স্ব স্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত। বিকল্প সরকারের ডাককে প্রতিপক্ষ বিকলাঙ্গ বলে উপহাস করছে। হতাশ হয়ে দীননাথ নিজের মনে বলতে লাগল—

'এভাবে বোধ হয় কিছু হবে না। সেবারে কেরালায় অত ভাল ফল হল কিন্তু টিকতে দিলনা অন্যায় করে। যে রকম একটু একটু করে এগোচ্ছে তাতে এখানেই দশ বছর লেগে যাবে, সারা দেশে হয়ত একশ বছর।'

মাঝখান থেকে ভোটের ডামাডোলে কানাইয়ের আরও কিছুটা পড়ার ক্ষতি হল।

চার

কানাইয়ের পরীক্ষা শুরু হতে ওদিকে শেফালীর বিয়েরও ঠিক হয়ে গেল রিফিউজী কলোনীর সেই ছেলেটার সঙ্গে। বিয়ে হবে বৈশাখের প্রথম দিকে।

জানা শোনা পছন্দ করে বিয়ে হতে চলেছে তবু অত সহজে সব কিছু ঠিক করা যায় নি। প্রায় এক বছর আগে দীননাথ তপুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা বলে এসেছিল। তারপর মাস ছয় দু পক্ষই চুপচাপ। পরে আবার শেফালীর চাপে পড়ে শবু দীননাথকে নড়েচড়ে বসতে বলল। শবুর কথামত সে এক ছুটির দিনে বড়দা হৃদিনাথকে সঙ্গে করে ছেলের বাড়ীতে গেল। ফিরে এসে দীননাথ মাথায় হাত দিয়ে বসল, বলল—

'জানাশোনা করে বিয়ে অথচ ছেলের দাদা যে ফর্দ ধরিয়েছে তাতে ও দিকের দায় মেটাতেই হাজার ছ সাত লেগে যাবে। এ আবার কি রকম

জানা শোনার বিয়ে? আমাদের বিয়ের বেলায় ত আমি এক পয়সারও কিছু চাইনি—অথচ জানাশোনাও ছিল না। ছ সাতশ টাকার যোগাড় নেই, ছ সাত হাজার আসবে কোত্থেকে?'

কথাটা শুনে শুভাও রেগে গেল, বলতে লাগল—

'বুঝলি শেফালী. তোর সেই কাঞ্চনটা ভীষণ চালু আছে, আমি দেখেছি ত—মিনমিন করে কথা বলে। এখন কাজের বেলায় বাবা মা দাদাদের সামনে রেখে বেশ একটা মোচড় দিচ্ছে।'

শেফালীর প্রাণে লাগে। বলল—'না রে শুভঙ্করী, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।'

শবু এ সব ব্যাপার বোঝে না। সে সেই বিটি রোডের বাসায় থাকতে কাঞ্চনকে দেখেছে আসতে যেতে, তার দাদাকেও দেখেছে। অথচ দীননাথ বলে সে নাকি ওদেরকে আগে দেখেনি, বিয়ের কথা বলতে গিয়ে ছেলের দাদার সঙ্গে 'আপনি'—'আজ্ঞে' করে কথা বলে এসেছে। দীননাথের বড় ভুলো মন—চেনা লোককেও কিছুদিন পরে চিনতে পারে না। শবুর মনে আছে কাঞ্চনের দাদা অঞ্জন এসে এসে দাদা বলে ডাকত, বয়সেও দু চার বছরের ছোট। শেফালী আর কাঞ্চনই বুঝি এক বয়সী হবে।

ভুল বোঝাবুঝির কথায় শুভা ঝেঁঝে উঠল। বলল—'ও সব বললে হবে না, দিস্তে দিস্তে প্রেমপত্র লেখা, এখানে সেখানে দেখা সাক্ষাৎ করার সময় মনে ছিল না? পাঁচ বছর দেখা শোনার পর এখন বাপের সুপুত্তুর সাজছে? যদি একটা পয়সাও না নিয়ে বিয়ে করতে রাজী থাকে ভাল, না হলে তুই যদি আর ওমুখো হোস তবে তোর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। মেয়ে আমাদের ফেলনা নয়—রীতিমত চাকরি করে।'

শবু টিপ্পনি কাটল—'তোমার রাস্তাটাও পরিষ্কার রাখছ নাকি শুভঙ্করী?'

শুভার মেজাজ তখন তুঙ্গে, বলেছিল—'তোকে এর মধ্যে কথা বলতে কে ডেকেছে? তুই এ সবের কিছু বুঝিস?'

না, শবু বোঝে না, বুঝেও দরকার নেই।

তারপরে ব্যাপারটা আরো ছ'মাস চাপা পড়েছিল। এর মধ্যে কি হল শবু জানে না। এখন ছ মাস পরে সেই ছেলের বাড়ী থেকেই খবর পাঠিয়েছে তাদের কোন দাবি দাওয়া নেই শুধু খানকতক প্রণামী, পঁচিশজন বরযাত্রীর আদর আপ্যায়ন আর বিয়ের আনুসঙ্গিক কিছু খরচ করলেই হবে।

না, এর কমে বিয়ে হয়না. রাজী না হবার কোন কারণ নেই। অতএব

বৈশাখের প্রথম দিকেই শেফালীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। কানাই একটা হুজুগ পেয়ে মা-বাবাকে চিঠি লিখে দিল—পরীক্ষার পরে একেবারে শেফালীদির বিয়ে সেরে বাড়ী ফিরবে, জামাইবাবু একা মানুষ, তাকে সাহায্য করতে হবে। বাবা গিরিনবাবুও জবাবে লিখলেন—কানাই বিয়ে পার করেই আসে যেন, সে না থাকলে নাকি শেফালীদির বিয়ে হবে না। বিয়ের জন্য আলাদা করে দুশ টাকা পাঠালেন।

বিয়ের কথা ঠিক হতেই প্রথমে আসে গয়নার কথা। এদিকে নতুন গোল্ড কণ্ট্রোল এ্যাক্টের কল্যাণে সোনার বাজারে আগুন লেগেছে। বাইশ ক্যারেটের গয়না তৈরী চলবে না, চৌদ্দ ক্যারেটের গড়তে হবে। কেউ চৌদ্দ ক্যারেটের সোনা কিনতে চায় না, অনেক স্যাকরার রুজি রোজগার একেবারে বন্ধ, তাদের কতজন নাইট্রিক এসিড খেয়ে প্রাণ দিল। খোলা বাজারে বাইশ ক্যারেটের দেখা নেই, গোপন বাজারে ভরি প্রতি দুশ আড়াইশ তিনশ যেমন যেমন সুবিধেমত দরে লেনদেন হচ্ছে।

গয়নার চিন্তায় শেফালী শবুকে বলল—

'বৌদি, আমার নিজস্ব কিছু টাকা জমানো আছে আর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে টাকা উঠিয়ে মোট হাজার খানেক টাকা আমি দিতে পারব। কিন্তু সোনা কোথায় পাব আর গড়াবই বা কাকে দিয়ে?'

শবু বলল—'তোমার মেজদার অফিসে এক কর্মকার বন্ধু আছে, তার বাবা কাকারা স্যাকরার কাজ করে। সে নাকি দুশ আড়াইশ ভরি দরে বাইশ ক্যারেটের গয়না গড়িয়ে দেওয়াতে পারে গোপনে।'

দীননাথ শবুর মারফৎ শেফালীর টাকার অঙ্ক শুনে বলল—

'ঐ হাজার বারোশ টাকা দিয়ে ভরি পাঁচেকের মত অন্যসব গয়না গড়িয়ে আনব শুধু হার ছাড়া। তোমার বিয়ের হারটা ভেঙে একটা নতুন হার গড়াতে দেব তাহলে হারের জন্য আর আলাদা করে সোনা কিনতে হবেনা, সোনার যা দাম।'

শবুর চোখে জল আসে, তার নিজের পছন্দ করা অত সাধের অত সুন্দর শঙ্খ ডিজাইনের বিয়ের হারটা দিয়ে দিতে হবে! এত সুন্দর হারটাকে ভেঙে ফেলবে! বলল—

'গোটা হারটাই দেবে যখন তখন ভাঙবে কেন। তাতে কিছু সোনাও নষ্ট হবে, মজুরীও লাগবে। দেবে যদি এইটাই দিয়ে দাও।' শবুর কণ্ঠে

একটু অভিমানের সুর বাজে। হাজার হোক মেয়েমানুষ ত, আর বিয়ের গয়না বলে কথা।

দীননাথ বলল—'তবে তাই দিও। তুমি ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জমিয়ে একটা সোনার চেন গলায় পরেছ ঐটা পরেই বিয়ে পার দাও। পরে বছর খানেকের মধ্যে নতুন হার তোমাকে গড়িয়ে দেব।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'ভাগ্যিস আমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জমিয়ে চেনটা গড়িয়েছিলাম, না-হলে শেফালীর বিয়েতে আমাকে খালি গলাতেই থাকতে হ'ত।'

দীননাথ শবুকে আদর করে বলল—'ঘরেতে আছেন নেইকো ভাঁড়ারে একথা শুনিবে কেবা?'

একটু আদরেই শবু জল হয়ে যায়।

এদিকে সমস্যা দেখা দিয়েছে—বিয়ে বাড়ীর হাল ধরবে কে? স্বভাবতই মা মঙ্গলা দেবী। তাঁর কাছে চিঠিতে সব খবর চলে গেছে, কিন্তু তাঁর আসার কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পেয়ে দিদি জবা স্বামী পুত্র কন্যাদের নিয়ে এসেছে, করবীও আসা যাওয়া করছে, ওদিকে বড়জা বীণাও। হাতের কাছে মামীমা, শুভার মা আছেন। এতগুলো মেয়ে মানুষ, কিন্তু কারো নিজের বিয়ে ছাড়া মেয়ে বিয়ে দেবার অভিজ্ঞতা নেই। শবুর কথা না বলাই ভাল, সে ত কিছুই জানে না। বিয়ের একদিন আগে সোনাও এল তার সব মালপত্র নিয়ে—তার নাকি বদলি হয়েছে মেদিনীপুরে। তবু মঙ্গলা দেবীর দেখা নেই। দিশেহারা হয়ে করবীর শাশুড়ীকে নিয়ে আসা হল। তিনি করিৎকর্মা মানুষ—বাড়ীর সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

অবশেষে মঙ্গলা দেবী এলেন।

বিয়ের দিন সকাল থেকে বাড়ী সরগরম। মেজ ননদাই শিয়ালদা থেকে মাছ ও কাঁচা বাজার নিয়ে এসেছে, বড় ননদাই রান্নার ঠাকুরদের কাজ দেখা শোনা করছে, বড় ভাসুর হৃদিনাথ বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত সম্প্রদানের দায়িত্বও তার, সোনা কানাই হাবলু তুলু চিনু কদিন ধরে প্রচণ্ড খেটে চলেছে আজ তাদের হাঁফ ছাড়ার অবসর নেই, গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে ছেলের বাড়ী থেকে লোক এসে গেছে। বেলা প্রায় দশটা। সব আয়োজন সম্পূর্ণ শুধু খাটা খাটনি ও বিয়ের অনুষ্ঠান টুকু বাকি। এমন সময় ভবর সঙ্গে এসে উপস্থিত

হলেন মঙ্গলা দেবী। করবীর শাশুড়ী তাঁকে সরব অভ্যর্থনা জানালেন—

'এই যে বিয়ে বাড়ীর কুটুম, আসুন, একেবারে বিয়ের আসরে এলেই হত!'

করবীর শ্বশুরও এসেছেন, তিনি ঠাট্টা করে বললেন—'আমি এখনও কিছু খাইনি, বলেন ত বিয়ের লগ্ন পর্য্যন্ত উপোস করতে রাজী আছি।'

বেয়াই বেয়ানের গ্রাম্য রসিকতা। মঙ্গলা দেবী কারো কথাকেই বিশেষ আমল দিলেন না। কোন রকমে একটা অজুহাত দিলেন—

'ভবার ছুটি পেতে দেরী হল, তাই।'

শেফালী অভিমানে কেঁদেই ফেলল, মেয়ের বিয়েতে মা এলেন শেষ মুহূর্ত্তে। বলল—

'ভব না হয় পরে আসত, আপনি কয়েকদিন আগে এলেন না কেন?'

'ভবা না এলে কি করে আসি' বলে তিনি কাজে লেগে পড়লেন, তিনি কাজের মানুষ। এর আগে যে একা একাই কত জায়গায় যাওয়া আসা করেছেন সে কথা কেউ তুলল না। মঙ্গলা দেবী হৃদিনাথ দীননাথ ভব সোনা জবা করবী বীণা শবু সবাইকে হুকুম ফরমায়েশ করে ব্যস্ত করে তুললেন। সবাই এখন তাঁর আজ্ঞাবহ। কিন্তু সব কাজের অর্থনৈতিক দায়িত্ব দীননাথের আর সব কিছুর চাবি কাঠি শবুর হাতে। কোন কিছু আনতে হলে সবাই যাচ্ছে দীননাথের কাছে, কোনটা কোথায় আছে জানতে হলে আসছে শবুর কাছে।

দুপুর নাগাদ সব নিকট আত্মীয় স্বজন এসে গেছে। এসেছেন এ বাড়ীর ছোট কাকীমা, এক খুড়তুতো বোন ফুলির মা, ফুলির বর ও দুই ছেলে, গ্রাম সম্পর্কের মাসী পিসীর ছেলে মেয়েরা, এক পিসতুতো ভগ্নীপতি বিভাস ভাদুড়ী ও গ্রাম সম্পর্কের কাকা সৃষ্টিধর বাকচী। বিভাস আর সৃষ্টিধর এক বয়সী হিসেবে হৃদিনাথের বিশেষ বন্ধু, সম্পর্ক যাই হোক না কেন। নিজেদের পিসী বা তাঁর ছেলেরা কেউ আসেনি শুধু জামাই বিভাস ছাড়া। ছোটমাসীও অনুপস্থিত। আর আসে নাই দুঃখিনী মেজবৌ রেখা। খবর ঠিকই পাঠানো হয়েছে চিঠিতে, কিন্তু তাকে নিয়ে আসার জন্য দীননাথ কোন আলাদা উদ্যোগ নেয় নি। যদি সে অতীত ভুলে থাকতে পারে, নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ যদি এসে থাকে—কাজ কি সেখানে আবার খুঁচিয়ে ঘা করার। তাছাড়া তাকে আনতে পাঠাবার মত লোকও হাতের কাছে ছিল না—সোনা ভব ত এল একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে। মহী গৌহাটিতে বদলি হয়ে গেছে, সে তিনশ টাকা পাঠিয়েছে।

আর এল শেফালীদের স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস নমিতা দি, অন্য শিক্ষিকারা, দু জন শিক্ষকও। এদের প্রায় সবাইকেই শবু চেনে, কয়েকবার আসা যাওয়া করেছে। শুভা ও শিক্ষিকার দল শেফালীকে সাজানোর দায়িত্ব নিল, জোড় এয়ো হয়েছে বড় বৌ বীণা ও মেজ ননদ করবী। রাতে দীননাথের অফিসের পনরো বিশ জন বন্ধু আসবে যাদের অনেককে শবু আগে দেখেছে। এছাড়া প্রতিবেশিনীরা ত আছেই। মেয়ে মহলের আদর আপ্যায়নের ভার শবুরই।

সব থেকে বেশী আনন্দ হল একটু বেলা পড়তে যখন ছোটকাকা অবিনাশ বাবু ও ছোটকাকীমা ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসে গেলেন। শবু তাদের কোথায় বসাবে বুঝতে পারে না—এত আনন্দ হচ্ছে। আরো তাজ্জব ব্যাপার ছোটকাকা এসেই হঠাৎ বলে উঠলেন—'আরে বিভাস, তুই ?'

বিভাস বলল—'আরে অবিনাশ, তুই ?'

কাকা জিজ্ঞেস করলেন—'তোর এখানে কিরকম সম্পর্ক ?'

বিভাস বলল—'আমার শালা ভগ্নীপতি সম্পর্ক—তুই এ বাড়ীর কে ?'

ছোটকাকা বললেন—'তবে আমাকে প্রণাম কর, আমি দীননাথের খুড় শ্বশুর, শ্রাবণী আমার ভাইঝি।'

বিভাস বলল—'এরই মধ্যে শ্বশুর ভাসুর হয়ে বসে আছিস ? নে সিগারেট খা।' শ্বশুর জামাইতে হাসি ঠাট্টা শুরু হয়ে গেল।

শবু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল—'কাকা, তোমরা দুজনে কেমন করে চেনা হলে, আগেত কখনো শুনিনি দেখি নি ?'

কাকা বললেন—'তোরা দেখবি কোথেকে ? কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

অবিনাশ বাবু হৃদিনাথেরও পরিচিত, বন্ধু-জামাই বিভাসকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করাতে এসে সেও তাজ্জব।

এছাড়া দীননাথ পাড়ার প্রায় সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে—চক্কোত্তী, মালাকার, রায়, কর্মকার, মুখুজ্জে, সরকার, বোস, ভট্টাচার্য্য—যাদের কাছাকাছি বাড়ি তাদের বাড়ীশুদ্ধ সবার নিমন্ত্রণ। সোনা ও ভবর কিছু বন্ধু বান্ধবও আছে।

বিয়ে বাসি বিয়ে মিটে গেল। বাড়ীতে মাত্র দুখানা ঘর, কিছু আত্মীয় স্বজন রাতে ছিল, তাদের জন্য শবু আর দীননাথ এ বাড়ী সে বাড়ী বলে কারো বাড়ীতে একখানা ঘর, কারো বা শুধু একটা বিছানা যোগাড় করে সবার

শোবার বন্দোবস্ত করল। শবুদের শোবার ঘরে বাসর সাজানো হয়েছিল—রাতে শবু আর দীননাথকে বাড়ী ছেড়ে রায় গিন্নীর একখানা ঘরে গিয়ে শুতে হল।

বরকনের বিদায় লগ্ন ঘনিয়ে এল। ভাড়া করা ট্যাক্সি এসে গেছে। মাঙ্গলিক আচার বিধি পালন করে শেফালী তার বরের সঙ্গে রওনা হবে। যাবার সময় তার চোখে জল, মা, মামীমা, শুভার মা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করে শেফালী শবুকে প্রণাম করতে এসে এক বিশেষ কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে তাকাল তার মুখের দিকে। তখন কারো মনে রইলনা, এই শেফালীই একদিন বলেছিল—মা ছাড়া আমি কাউকে প্রণাম করিনা। অনাদিকাল থেকে মেয়েদের বাপের বাড়ী ছেড়ে চিরকালের জন্য পরের ঘর করতে যাবার যে বেদনা, যে বেদনা বুকে নিয়ে শবু একদিন স্নেহশীল বাবা-মার আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছিল, সেই বেদনার পরশ লাগে শবুর মনেও। নিকট আত্মীয়-বিচ্ছেদের অশ্রুধারা নেমে আসে তার চোখে। ভালই হোক মন্দই হোক গত এক বছরের সুখ দুঃখের স্মৃতিতে চোখে জল আসে—তারা তিন 'শ' শেফালী—শ্রাবণী—শুভঙ্করীতে মিলে একটি বছর বেশ আনন্দে ছিল। সব থেকে বেশী কাঁদে বুঝি শেফালীর অভিন্ন আত্মা বান্ধবী শুভা—শুভঙ্করী, স্কুলে তাদের যোগাযোগ হয়ত ঠিকই থাকবে, তবু আজ বুঝি সে নিজেকে বড়ই একা বোধ করছে।

পাঁচ

শেফালীর বিয়ে খুব সুষ্ঠুভাবে নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে। কোথাও কোন ত্রুটি বা অব্যবস্থা হয়নি। একেবারে হয়নি যে তা নয়।

বিয়ের দিন দুপুরে বর আনার ভাড়া গাড়ীটা পাড়ায় ঢুকতে গিয়ে উঁচু নীচু রাস্তায় পেট্রোল ট্যাঙ্কে চোট লেগে ফুটো হয়ে গেল। জামাই বিভাসের পরামর্শে সাবান লাগিয়ে ফুটো বন্ধ করে গাড়ীর মালিক গাড়ী নিয়ে বাড়ী চলে গেল। তখন উপায়? দীননাথের কথামত স্বস্তিকাকা এক ডজন রসগোল্লা মুখে পুরে এক ঘটি জল খেয়ে ছুটল সোদপুর থেকে গাড়ী যোগাড় করে বর আনতে। যাবার সময় গামছাটাকে মাথায় জড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে গেল—

'যাই দেখি, মোটর গাড়ী না পেলে গরুর গাড়ীতে করে বর নিয়ে আসব হেট্‌ হেট্‌ চল্‌ চল্‌ করতে করতে।'

বাসি বিয়ের দিন আর একটা ঘটনায় আবার সৃষ্টিকাকাই জড়িয়ে পড়ল। দুপুরে খাবার পরে সৃষ্টিকাকা রাস্তার ধারে সিগারেট টানছিল। পাশে ফেলে দেয়া এঁটো পাতা নিয়ে পাড়ার কুকুরগুলো কামড়া-কামড়ি লাগিয়েছে। গাঁঠুর তখন আর খাবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যেহেতু তার মালিকের বাড়ীতে বিয়ে অতএব সব কর্তৃত্ব তারই। অসভ্য কুকুরের দলকে শায়েস্তা করতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হবার সময় একটা কুকুর ছিটকে সৃষ্টিকাকার গায়ের উপর পড়ে তার নতুন পাঞ্জাবীটা ছিঁড়ে ফর্দাফাই করে দিল। সৃষ্টি কাকা সবাইকে ছেঁড়া জামা দেখিয়ে কান্নার ভান করে বলতে লাগল—

'দেখ দেখ দীনুর কুকুরে আমার কি হাল করেছে।'

সুখে হোক আর দুঃখে হোক সৃষ্টিকাকার সৃষ্টিছাড়া হাসিতে কোন ছেদ নেই। সৃষ্টিকাকা খুব মজার লোক—সবাইকে খুব হাসাতে পারে।

তা এরকম দু একটা ঘটনা বিয়ের মত বৃহৎ ব্যাপারে হয়েই থাকে। সেজন্য ভাবলে চলে না।

এদিকে দীননাথের আর্থিক অবস্থা কাহিল। বাসি বিয়ের পরদিন সন্ধ্যায় কানাইকে হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে রাতে শবুকে মুখে মুখে হিসেব দিয়ে বলল—

'বড়দা বাড়ী করে ধার দেনায় ডুবে আছে, তার কাছে কিছু নিইনি। মহী ভব সোনার পাঁচ ছ'শ টাকা প্যাণ্ডেল লাইট কাঁচা বাজারে খরচ হয়েছে। সব মিলিয়ে আমার হাজার দুই টাকা খরচ হয়ে গেছে যার কিছু ধার দেনা করে নগদে দিয়েছি, মুখের কথায় যে বাকিটা আছে তার জন্য আবার কিছু গয়না বন্ধক দিতে হবে। তোমার হারটা ত গেছে, বিয়ের মধ্যে বলে অন্যগুলোতে হাত দিইনি এবার দিতে হবে। নিজের বিয়ের পাঁচশ টাকা ধার শোধ দিতে আমার তিন বছর লেগেছিল, এবার কবছর লাগে দেখি।'

সেদিন দুপুরেই শবু অবস্থাটা কিছু টের পেয়েছিল। মানি অর্ডারের পিওন এসেছিল—ডাক্তার দাদা বিয়ে উপলক্ষে পঁচিশ টাকা পাঠিয়েছেন, নিজে আসতে পারবে না বলে আনুষ্ঠানিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। টাকাটা হাতে নিয়ে বাড়ীভর্ত্তি আত্মীয় কুটুম্বের সামনে দীননাথ বলে উঠেছিল—

'বিয়ের বাজারের বাড়তি চাল ডাল তরকারি দিয়ে আজকের দিনটা

চলছে, কালকের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এই টাকা দিয়ে আর দুতিন দিন চালাবার ব্যবস্থা হল।'

সে ত ছিল দৈনিক হাট বাজারের সমস্যা। তার আড়ালে যে হাজার দু হাজারের ঋণের বোঝা আছে তা তখন জানতে পারেনি। যাক, বিয়েটা যে ভালয় ভালয় মিটে গেছে সেই ভাগ্য। ঠাকুমার দেওয়া বেনারসীটা শেফালীর বিয়েতেই শবু প্রথম পরল—এমন সুযোগ ত সচরাচর ঘটে না।

মঙ্গলা দেবী সপ্তাহখানেক থাকবেন বলে এসেছেন। তাই বাসি বিয়ের পরও করবীরা আছে। দিদি জবারা ত অনেক দূর থেকে এসেছে, তাদের আরো কিছুদিন থেকে যাবার বাসনা। এ ছাড়াও তার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। মঙ্গলা দেবী দুই মেয়ে নাতিনাতনীদের নিয়ে আনন্দে গল্প গুজব করে কাটাচ্ছেন, ধানবাদে ভব তাঁকে কি আরামে রেখেছে তারই ফিরিস্তি শোনাচ্ছেন। সুযোগ বুঝে জবা বলল—

'মা, হাবলু ত দীনুর এখানে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে। মহী গৌহাটিতে বদলি হয়ে গেছে, কারো কোনো খোঁজ খবরও রাখে না। আপনি আর ভব একখানে আছেন, ভব অফিস করে আর আপনারও বয়েস হচ্ছে। হাতের কাছে একজন থাকা দরকার, হাট বাজার করে দেবে দরকারে ফাই ফরমায়েশ খাটবে। তাই বলি আমার আর এক ছেলেকে আপনার কাছে রাখেন।'

মঙ্গলা দেবী পুত্র গর্বে স্ফীত হয়ে বললেন—

'ওখানে কি কাজের লোকের অভাব? ভবার অফিসের আর্দালি চাপরাশী থেকে আরম্ভ করে কণ্ট্রাক্টরের লোকজন আমাদের সব কাজ করে দেয়। নেহাৎ বিধবা মানুষ তাই রান্নাটা নিজেই করি, না হলে একেবারে রাণীর হালে আছি। ভবা আমার ইঞ্জিনীয়ার ছেলে, এদের মত বাঁধা অফিস চাকরি করে না। সোনাও ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বেরিয়েছে, নীচের পদ থেকে প্রমোশন পেয়ে মেদিনীপুরে যাচ্ছে ক'দিন পরে। তোর ছেলের জন্য ভাবনা কি? তবে ওটা খোট্টাদের দেশ সেখানে ভাল ইস্কুল আছে কিনা জানিনা। ভবার আবার বদলির কথা হচ্ছে—দেখা যাক কোথায় দেয়, ভাল জায়গা হলে সেখানে তোর এক ছেলেকে রেখে মানুষ করে দেব। সোনা একটু স্থায়ী হয়ে নিক তখন তাকেও বলব করবীর এক ছেলেকে কাছে রেখে মানুষ করে দেবে। আমি যাকে যা হুকুম করব সে তাই করবে। লেখাপড়া শিখিয়ে

সবাইকে মানুষ করেছি, আমার কথা শুনতে সব বাধ্য। বৌরা এসে ঝগড়া দেয়। কিন্তু ভবা সোনা আমার তেমন ছেলে নয়—এখন যেমন আছে বিয়ের পরেও তেমনি থাকবে।'

প্রতিটি কথায় ঠেস দেওয়া আছে। তা দিক, হাবলু যে এখানে থেকে লেখাপড়া করছে, শবু যে তাকে তাড়ায় নি সে কথা ত কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বিয়ের মধ্যে বড় বৌ বীণা তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসে তিন দিন থেকে গেল, মঙ্গলা দেবী যেন তাদের চিনতেই পারলেন না। আর শবু ত একটা মানুষই নয়। এত বড় একটা বিয়ের অনুষ্ঠান দীননাথ আর শবুতে মিলে পার দিল তারা গেল বানের জলে ভেসে. আর শেষ মুহূর্তে বিয়ের আসরে উপস্থিত হয়ে তিনি সবাইকে কৃতার্থ করেছেন, তাঁর কৃতিত্বই যেন বেশী।

এই সবের ফাঁকে এক সময় শবু আড়ালে ভবকে জিজ্ঞেস করল—'এই যে মাতৃভক্ত ভাল ছেলে, মার কথামত বিয়ে করতে রাজী হলে না কেন? আমরা এদিকে মেয়ে দেখে দেখে হয়রান।'

বছরখানেক আগে ধানবাদ থেকে মা মঙ্গলা দেবীর চিঠি পেয়ে দীননাথ ও শবু ভবর বিয়ের জন্ম দু তিন জায়গায় মেয়ে দেখতে গেছিল। একবার করবী আর সোনা সঙ্গে ছিল। শেষে মঙ্গলা দেবীই আবার চিঠি লিখে জানিয়েছেন—ভব এখন বিয়ে করবে না।

স্বভাবমত দীননাথ যে মেয়ে দেখে তাকেই পছন্দ করে বসে আর কি কাউকে অপছন্দ করে তার মনে দুঃখ দিতে পারে না। শেষে মার চিঠি পেয়ে —'আমাকে শুধু শুধু অপদস্থ করাল, আমি আর কারো বিয়ের ব্যাপারে নেই'—বলে জানিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছে। কথাটা সেই সূত্রে।

'রেখে দাও ওসব কথা। বিয়ে কর বললেই কি বিয়ে করা যায় নাকি, একি ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে?' বলে ভব মিটিমিটি হাসতে লাগল। পরে আবার বলল—'বেল পাকলে কার যেন আশা থাকে না—জান ত?'

শবু পাল্টা জবাব দিল—'ডুবে ডুবে জল খেলে কোন্ ঠাকুর যেন তা জানতে পারে না—সে ঠাকুরের নাম জান?'

সোনা কাছাকাছি ছিল, বলল—'দেখ দাদা, তোর কপালে রূপের কাঁঠালই আছে। আমি তাকে কোনদিন বৌদি বলতে পারব না।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'—ভব মন্তব্য করল।

শবু যোগান দিল—'হ্যাঁ, তুমি ভাল করে নিজের গোঁফে তেল লাগাও।'

সকলের কথাই হেঁয়ালিতে ভরা।

একদিকে এই সব কথাবার্তা হচ্ছে, আর একদিকে পাড়ায় শবুর জয়গান চলছে। মামীমা বা শুভার মা হলেন কাছের লোক—তাঁরা ত বলছেনই। অপরে পাড়া-প্রতিবেশিনীরাও যে বলছে। তাদের কাছে কিছু গোপন থাকে না, মেয়েমানুষের চোখ যেন জহরীর চোখ। বিশেষ করে শবুর গলার হার যে বিয়ের কনের গলায় উঠেছে সেটা কারো নজর এড়ায় নি। জনে জনে এসে মঙ্গলা দেবীর সামনেই তারা শবুর গুণগান করছে—

'দীনুবাবু বোনের বিয়ের সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল, কোন কিছুতে ত্রুটি রাখেনি।'…'এই মাঠের মধ্যে প্রথম একটা বিয়ে হল যার কথা আমাদের চিরকাল মনে থাকবে।' ‥'ননদের বিয়েতে দীনুবাবুর বৌ যা করল তার তুলনা হয়না।' 'আজকালকার দিনে কোন ভাজ যে ননদের বিয়েতে এমন নিঃস্বার্থভাবে সব করে ভাবা যায় না।'…

শবু এমন কিছু করেনি যার জন্য এত প্রশংসা সে পেতে পারে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে এই ত স্বাভাবিক। পুরোনো রীতি নীতি প্রায় হারিয়ে গেছে, তাই একটু সৎদৃষ্টান্ত দেখে সবাই উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে। শবু বিব্রত বোধ করে। হারটা ভেঙে গড়াতে দিলেই বুঝি ভাল করত।

কিন্তু মঙ্গলা দেবীর অসহ্য বোধ হয়। পাড়ার লোক বাড়ী বয়ে এসে তাঁর সামনেই বৌ এর প্রশংসা করে যায়! আবার পাড়ায় তাঁর প্রায় সমবয়সী চক্কোত্তি গিন্নী এক সময় বলে গেল—

'দিদি, মেয়ের বিয়েতে এত দেরী করে এলেন! এদিকে বৌমা একা একা কি বিপদেই পড়েছিল, মাথার ওপর কেউ নেই। শেষে আপনার মেজ মেয়ের শাশুড়ীকে ডেকে এনে কিছুটা সামাল দিল। মেয়ের বিয়ের যোগাড় ত সামান্য ব্যাপার নয়।' চক্কোত্তি গিন্নী আবার একটু মুখফোঁড় আছে।

অসহ্য! অসহ্য!! অসহ্য!!! মঙ্গলা দেবী আর পরের কথা সহ্য করতে পারছেন না। যে বৌকে হেনস্তা করবেন বলে তিনি দূরে গিয়ে আছেন, মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সবাই এসে তারই গুণগান করছে। এর চাইতে জীবন্ত নরকভোগ আর কি হতে পারে! মঙ্গলা দেবীর মুখ থমথমে হয়ে উঠতে লাগল, সকলের সঙ্গে হাসি গল্প কমে এল। এই জন্যই এখানে থাকাকালে তিনি কোন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কোন রকম দহরম মহরম করেন নি—কারণ তাদের কাজই হল পরের সংসারে কাঠি দেয়া।

করবী আবার মাকে অসম্মান থেকে বাঁচাতে ভবর উপরে চড়াও হল, বলল—

'ভব, তোর কি একটা আক্কেল নেই, মা না এলে বিয়ের যোগাড় হবে না জেনেও তুই ছুটি নিতে দেরী করলি? এখন পাড়ার লোকে এসে এসে মাকে কথা শুনিয়ে যাচ্ছে।'

ভব নিজের পিঠ বাঁচাতে বলে ফেলল—

'ছুটি ত সময় মতই পাওয়া গেছিল, মা-ই ত আজ অমাবস্যা, কাল প্রতিপদ, পরশু ত্র্যহস্পর্শ, তরশু পূবে যাত্রা নাস্তি করে করে দেরী করল।'

মঙ্গলা দেবী ফুঁসে উঠলেন—'ওরে আমার সত্যিবাদীর ব্যাটা যুধিষ্ঠীর রে। দীর্ঘসূত্রীর ব্যাটা দীর্ঘসূত্রী—নিজেদের লেজ মলতেই দিন কেটে যায়, এখন আমার জন্য দেরী হল? খালি লেখাপড়া শিখলেই হয়না—মাথায় এতটুকু বুদ্ধি নেই, আশী বছরেও বুদ্ধি হবেনা। নামেও ভবা কাজেও ভ্যাবাকান্ত।'

ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে দেখে ভব মুখ চুন করে সরে পড়ার ফিকির খুঁজতে লাগল।

মঙ্গলা দেবীর পুরো আক্রোশটা এখন ভবর উপর পড়ল, বললেন—

'পালাচ্ছিস কোথায়? এখানে এসে তুই কার পেছনে ঘুর ঘুর করিস আমি জানি না মনে করিস? তোর প্রেম করা আমি বার করছি। নে আমার সব জিনিষ পত্তর গোছা, আজ দুপুরের পরেই আমরা ধানবাদ রওনা হব, সেখানে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

বড় মেয়ে জবা অতটা ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে না পেরে বলতে যাচ্ছিল—'মা, ভবর ত আরো তিন চারদিন ছুটি…'

মঙ্গলা দেবী তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন—

'তা দিয়ে তোর দরকার কি? তোর আর এক ছেলের ব্যবস্থা আমি করব তাহলেই ত হল? যে কদিন থাকতে আসছিস থেকে মানে মানে যেতে পারিস কিনা তাই দেখ তুই।'

আর একদণ্ডও এখানে থাকা নিরাপদ নয় মঙ্গলা দেবীর পক্ষে, যে রকম সব বেফাঁস কথার বহর চলছে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আরো কিছু ফাঁস হয়ে পড়বে। বিয়ের খবর দিয়ে চিঠি গেল, কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন কেউ গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে সেধে নিয়ে আসবে, না হলেও কাকুতি মিনতি করে একখানা চিঠি আসবে—আপনি না এলে আমরা দায়-উদ্ধার হতে পারছি না। তারই জন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা। সে ত হলই না, এখন ঘরে পরে সবাই তাঁকে উপহাস করছে, কথা শোনাচ্ছে। ছেলে মেয়ে ত নয়, যেন এক একটা পেটের শত্তুর!

অতএব মঙ্গলা দেবী আচমকাই ভবকে নিয়ে ধানবাদ রওনা হয়ে গেলেন। তদিনের জায়গায় তিনি চতুর্থ দিনেই চলে গেলেন। মামীমা খবর পেয়ে টতে ছুটতে এসে দেখা করলেন। ঘরভর্তি মেয়ে জামাই নাতি নাতনীরা ড়ে রইল, বরকনের দ্বিরাগমনের কোন দায় নেই, সামনে জামাই ষষ্ঠী আছে ার কি হবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই – তিনি চলে গেলেন। যাবার আগে শবু লবস্ত্র হয়ে তার শাশুড়ীকে প্রণাম করল।

প্রতিবেশিনী রুমার মা শবুকে জিজ্ঞেস করল—

'দিদি, আপনার শাশুড়ী চলে গেলেন? কদিন থাকবেন শুনেছিলাম।'

শবু বলল—'আমিও ত তাই শুনেছিলাম। বলে গেলেন, ওখানে তাঁর নেক কাজ পড়ে আছে।'

মন্দির শহর থেকে মা পদ্মিনী দেবীর চিঠি এল পরদিন—কানাই নিরাপদে পৌঁচেছে।

ছয়

যে মঙ্গলা দেবী বো এর আর মুখদর্শন করবেন না মনোভাব নিয়ে হঠাৎই লে গেলেন তিনি আবার কোন খবর না দিয়ে শীতকালে হঠাৎ এসে উপস্থিত লেন—সঙ্গে ভব। মাঝখানে প্রায় নয়টা মাস কেটে গেছে।

শেফালীর বিয়ের পরে বাড়ীটা আরো ফাঁকা হয়ে গেছে, হাবলুকে নিয়ে াত্র তিনজন মানুষ। শেফালী না থাকাতে শুভা তার মার রান্নাই াচ্ছে তবে রোজ বিকেলে শবুর সঙ্গে চা খাওয়া গল্প করাটা আছে। মাসীমা- মাঝে মাঝে রান্নাকরা তরকারি শবুকে খেতে দেন। বন্ধুর বিয়ে হয়ে াওয়াতে শুভঙ্করী একটু মনমরা। শবু বোঝে—তার বিয়ের পর হীরারও ই অবস্থা। সোনাও আবার নতুন চাকরির জায়গা মেদিনীপুরে চলে গেছে।

এমন সময় মা পদ্মিনী দেবীর কাছ থেকে চিঠি এসেছে—নন্দু কানাইয়ের পতে, তোমরা আসার সময় একটা বড় প্রেসার কুকার কিনে আনবে।

হাবলুকে মামীমা বা মাসীমাদের কাছে খেতে বলে হাবলু আর গাঁটুর সনায় বাড়ীটা রেখে যাওয়া ঠিক হয়েছে।

হ্যাঁ, গাঁটুর উপর এখন ভরসা করা যায়। সে আছে বলেই দীননাথ না

ফেরা পর্য্যন্ত অনেক রাত অবধি ঘরের দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়লে নিশ্চিন্ত। এ নিয়ে ভব এক সময় ঠাট্টা করেছে—

'ফাঁকা মাঠের মধ্যে ঘরে নিয়ন লাইট জেলে দরজা খোলা রেখে এক সুন্দরী বৌ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে সেই বাড়ী যাব বললেই ষ্টেশনের রিক্সাওয়ালাকে আর কিছু বলতে হয় না। ঠিক পৌঁছে দেয়।'

শবুও জবাব দিয়েছে—'সেটা সম্ভব হয়েছে গাঁঠু আছে বলে। কুকুর যে-মানুষের মত নিমকহারাম তো নয়।'

শুনে ভব দেঁতো হাসি হেসেছে।

খোঁজ খবর করে জানা গেল ষষ্ঠীতলা থেকে ঠাকুমা কাকীমা ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাবেন পৈতেতে—কাকার অফিস আছে, শ্রীলা বাড়ীতে থাকবে বাবার দেখাশোনার জন্য। সুতরাং সাতদিনের ছুটি নিয়ে একটা আ টাকায় কেনা প্রেসার কুকার সঙ্গে করে ঠাকুমাদের সঙ্গে দীননাথ ও শবু মদি শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

নন্দুর অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি, পীরের মাদুলিতেও কোন কাজ হ নি। এই ছেলের কি করে পৈতে হবে, উঠতে বললে উঠে দাঁড়ায়, বসে বললে বসে কিন্তু তাকে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করাবে কে? ভাবতে গিয়ে মা কেঁ আকুল হন, কাঁদেন ঠাকুমা কাকীমা, কাঁদে শবুও।

কলকাতা থেকে দিদি কিন্নুরা আসতে পারেনি, জামাইবাবু অসুস্থ। ব কাকা বদলি হয়ে সপরিবারে এখন বালেশ্বরে আছেন—পৈতেতে শুধু তিনি এসেছেন, বড় কাকীমা ও ছেলেরা আসেনি।

পৈতে কোন রকমে হল। নন্দুর রোগা ফর্সা চেহারায় অল্প অল্প গোঁ দাড়ির রেখা দেখা যায়—পৈতের সময় সব কামিয়ে ন্যাড়া মাথায় যখন তা ব্রহ্মচারীর পোষাক পরান হল—ঠিক যেন মনে হচ্ছিল সেই কোন বিস্ যুগের তপঃক্লিষ্ট গৌরবর্ণ এক ঋষি বালক আশ্রমে হোমের বেদীর সামনে দাঁ ও ভিক্ষার ঝুলি হাতে দাঁড়িয়েছে, এখনই হয়ত মা বাবার কাছে ভিক্ষা চাই 'ভবতী ভিক্ষাং দেহি' 'ভবান ভিক্ষাং দেহি।' বাবা গিরিনবাবু অভিভূতে মত বললেন—

'এইটাই উপনয়নের ঠিক বয়স—বয়ঃ সন্ধিক্ষণ।'

দেখে সবার চোখ জুড়োয়, আবার চোখে আসে জল। ওকে দিয়ে কোন আচার অনুষ্ঠান পালন করানো যাবে না—এযে শুধুই নিয়ম রক্ষা

নাইয়ের বয়সটা আরো উপযুক্ত কিন্তু তাকে নন্দুর মত অত সুন্দর দেখতে াগছে না।

মা, ঠাকুমা, কাকীমা ও শবু চারজনে চারটে সোনার আংটিসহ ব্রতভিক্ষা দল। বড় কাকা গোটাকয় রূপোর টাকা ব্রহ্মচারীদের হাতে দিয়ে বললেন—

'শঙ্খভাক্ যদি আনলামনে তাহলে তার গলায়ও একটা সুতো ঝুলায় লামনে।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'তা আনলেন না কেন? আনলে বেশ ভাল হত ঠাকুরপো।'

হেমবাবু মুখে একটা ভঙ্গি করে বললেন—'আমার কথা কেউ শুনতেছে!'

ঠাকুমা বললেন—'বাবুলাল আর পুটু এসেছে, ওদেরকেও এই সঙ্গে পৈতে দিয়ে দিলে হ'ত।'

পদ্মিনী দেবী বললেন—'হ্যাঁরে দীপু, ওদেরকেও দিয়ে দেয়া যেত।'

দীপ্তি দেবী বললেন—'সে রকম ত ভাবা হয়নি। তাছাড়া কলকাতায় ছেলেদের দাদু, কতগুলো মামা মাসী আছে সেখানেই হবে।'

কানাই এখন তিনদিনের মত গৃহবন্দী। কিছু করার নেই, শুধু এর তার সঙ্গে গল্প করা ছাড়া। সে এতদিন জামাইবাবুর সঙ্গে কুস্তি লড়লেও বেশ সমীহ করে চলত। কিন্তু কিছুদিন সে কলকাতায় বাস করেছে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাও দিয়ে এসেছে। অতএব 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে'—বাপেরই 'পজিশন' থাকে না, জামাইবাবু কোন্ ছার। কোন কাজ না থাকাতে সে মা, মেজদিকে ডেকে ডেকে জামাইবাবুর নানান বিশ্লেষণ করতে লাগল। বলল—

'দেখ মা, জামাইবাবুর হাত পায়ের আঙুলগুলো কেমন বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা। দেখলে মনে হয় কেউ বুঝি সেগুলোকে মুঠিতে ধরে ধরে একটা করে হাতুড়ির ঘা মেরেছে। ও আঙুল দিয়ে কোন শিল্পকাজ হবে না, শিল্পীদের হাতের আঙুলগুলো হয় চাঁপার কলির মত—যেমন মেজদির।'

কানাইয়ের কথা শুনে সবাই দীননাথের দিকে তাকিয়ে বর্ণনার মিল খুঁজে পেয়ে হেসে ওঠে—দীননাথও বোকার মত হাসছে।

আবার কানাই বলল—'জামাইবাবু খেতে বসে কি তাড়াতাড়ি ভাত মাখবে কিন্তু যতবার মাখে মুখে গ্রাস তোলে তার থেকে অনেক কমবার। কেবল মাখছে ত মাখছেই।'

মেজদির বাড়ীতে এক নাগাড়ে তিন চারমাস থেকে সে সব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে। কানাই বলে চলল—

'বুঝলে মা, শেফালীদির বিয়ে হল। আর জামাইবাবু কি করল? ধু
পাঞ্জাবী পরে ফুলবাবু সেজে গেটের কাছে একটা চেয়ারে বসে কেবল হু
চালাল—এই কানাই, পুরুত ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয়—ছুলু, ডেকরেটার
বল আরো বিশটা চেয়ার দিতে—হাবলু, যা, দোকান থেকে দই নিয়ে আ
বসে বসে শুধু হুকুম চালাল, একটা কাজও করেনি।'

মা পদ্মিনী দেবী বললেন—'তা ঠিকই করেছে। দীনুর মাথায় এত ব
একটা দায়িত্ব, সে যদি চারদিকে ছোটাছুটি করে তবে সব দিক সামলাবে কে
'সে' ত বলছিল, দীনু আর শবু এই বয়সে যা করল, ভাই বোনদের পড়া
বাড়ী করল, বোনের বিয়ে দিল 'সে' তার পঞ্চাশ বছর বয়সে এত কাজ কর
পারে নি।'

শবু বলল—'জানো মা, শেফালীর বিয়েতে আমার বিয়ের হারটা ত আ
গেছে তার উপর এখনও দেড় হাজার টাকার ধার দেনা আছে।'

মা বললেন—'এজন্য ভাবিস না, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কানাই ততক্ষণে একখানা কাগজের উপর একটা ছবি এঁকে সবাই
দেখাতে লাগল। দেখে সহজেই বোঝা যায় সে দীননাথের ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছে
দেখে সবাই হাসতে লাগল। মা বললেন—

'ছবিটাত দীনুর মতই লাগছে, কিন্তু হাতে ওটা আবার কি?'

কানাই বলল—'ওটা হল ঝাণ্ডা—ভোটের সময় জামাইবাবুকে ত দেখলা
পার্টি পার্টি করে একেবারে পাগল।'

শবু এখন রাজনীতির কিছু কিছু বোঝে। সে বলল—

'পেটের দায়েই হোক আর কলকাতার জল হাওয়ার গুণেই হো
সবাইকেই রাজনীতি বুঝতে হয়। তুইও হয়ত একদিন বুঝবি।'

ব্যঙ্গচিত্র দেখে বোঝা যায় কানাইয়ের আঁকার হাত বেশ ভাল।
ছাড়া ঘরের চুনকাম করা দেওয়ালে দেওয়ালে পেন্সিলে আঁকা অসংখ্য স্কেচ-
মা বাবা দাদা দিদি এমন কি তপুর আর নিজেরও। সকলেরই মাথা থে
কাঁধ বা বুক অবধি। তাই দেখে দীননাথ বলল—

'কানাইয়ের ভাল আঁকার হাত, ম্যাট্রিক পাশ করলে ওকে আর্ট কলে
ভর্তি করে দিন।'

শবু বলল—'হ্যাঁ মা, তাই কর না? কানাই বেশ একজন বড় শিল্পী হবে

মা বললেন—'আমরাও সে কথা বলাবলি করি। কিন্তু 'সে' যে বলে
আঁকা শিখে পেটের ভাত যোগাড় হয় না।'

কানাই হতাশভাবে বলল—'বুঝলি মেজদি, আমার কিছুই করা হবে না। ওল্ড ফাদার হয়ত আমাকে তার ডাক্তারখানাতে ভর্ত্তি করে নেবে।'

প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে—কানাই এখন সকলকেই সমালোচনা করছে।

সাতদিনে মার কাছে অনেক দিনের জমানো কথা বিশেষ করে শেফালীর বিয়েতে শাশুড়ী ঠাকরুনের হঠাৎ আসা আর যাওয়ার কথা বলে শবু ফিরে এসেছে স্বামী দীননাথের সঙ্গে।

কাকীমাদের সঙ্গে ঠাকুমাও ফিরেছেন ঐ একই দিনে—যদিও কানাই আর কলকাতায় পড়তে আসবেনা। কাকীমা একা ছ'টি ছেলে মেয়েকে সামলাতে পারেন না তাই ঠাকুমার আবার বরানগরে আসা।

কথাটা হয়ত একদিক থেকে ঠিকই। তবু শবুর মনে হয় মা ও ঠাকুমার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মান-অভিমানের পালা চলছে। মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনা, পাছে একজনের কাছে শুনে অপরের প্রতি অন্য ধারণা হয়। সে যে মা ঠাকুমা দুজনকেই সমান ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

এর একটা কারণই তার মনে হয়। হেঁসেল আলাদা করে নিয়ে থেকে বড়কাকীমা ঠাকুমার কানে মন্ত্র দিয়ে দিয়ে কান ভারি করেছে। ঠাকুমারও বয়স প্রায় আশী—এই বয়সেই বুঝি লোকের ভীমরতি হয়। ভুল বোঝাবুঝি হতে কতক্ষণ!

ফলে মার মনও ভেঙে গেছে। সেই কোন প্রায় বালিকা বয়সে বিয়ে হয়ে এসে শাশুড়ী কর্ত্তামার হাতে গড়েপিটে মানুষ হয়েছেন এক কালে। পরে ছোট কাকীমা এসেও সেই ছাঁচে গড়ে উঠেছেন। শবু দেখেছে—কর্ত্তামা, ঠাকুমা, মা, কাকীমাকে নিয়ে একটা সুখী সংসার, আদর্শ শাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক। দাদু থাকতে যেমন ছিল, পরের দুর্দিনেও তা বজায় ছিল।

বড় কাকীমা এসে থেকেই যত গণ্ডগোল। বড় কাকাও এখন আর তেমন সন্তুষ্ট নন, শশুর পৈতের কথাতেই বোঝা গেছে।

পৈতে থেকে ফিরে মাসদুই যেতে ঘটে গেছে এক বড় দুর্ঘটনা।

বর্ষার শুরুতে ডাঃ বিধান রায় মারা গেছেন, এখন চলছে সেনরাজা।

আর এই বর্ষার মধ্যেই হারিয়ে গেছেন দুলুদের বাবা—শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য্য।

খুব সকাল বেলা মামীমা এসেছিলেন খোঁজ করতে—

'শ্রাবণী, তোমাদের মামা কি এখানে এসেছেন?'

না। কি করে আসবেন? চারদিকে জল কাদা, মামা ভাল করে হাঁটতে

পারেন না। গত বছর মামীমার অসুখের সময় চিনু তাঁকে দুবেলা হাত ধরে খাওয়াতে নিয়ে আসত, নিয়ে যেত। একা একা বাড়ী চিনে আসবেনই বা কি করে—তেমন বোধশক্তিও যে তাঁর নেই।

'তবে বুঝি আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। অন্যদিনের মত ভোরে উঠে ঘরের কাজ কাম করছিলাম, মানুষটা ঘরেই ছিল, মাঝে মাঝে বারান্দায় পায়চারি করছিল। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হতে দেখি মানুষটা নেই।' মামীমা কেঁদে আকুল হলেন।

মামীমার দুঃখের শেষ নেই বুঝি। সবে দুলু নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ভাল শার্টহ্যাণ্ড শিখে একটা ভাল চাকরিতে ঢুকেছে। ভাবছিলেন এতদিনে বুঝি ভগবান একটু মুখ তুলে চাইলেন। এমন সময় হারালেন তাঁর স্বামীকে—দুলুরা হারাল তাদের বাবাকে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল, থানার এক আত্মীয় অফিসারকে ডেকে সব বলে তার সাহায্যে পুলিশ দিয়েও খোঁজ খবর করা হল এমন কি মামার আগের কাজের জায়গা—কাঁথিতেও। আশপাশের খানা ডোবা ঝিলের উপরও নজর রাখা হল।

সব বৃথা। কোন হদিসই পাওয়া গেল না। এ অবস্থায় মামার পেনসনের কথা কে চিন্তা করবে—নিরুদ্দিষ্টের জন্য বারো বছর অপেক্ষা করার শাস্ত্রীয় নিয়মের কথা স্মরণ করা ছাড়া আর উপায় নাই।

কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়?

একটা আশঙ্কার কথা সকলের মনে হয়। দেশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে মামাদের বেশ বড়সড় সম্পত্তি আছে। আজকাল অনেকে ফেলে আসা সম্পত্তি এক্সচেঞ্জ করে এপারে মোটামুটি বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে। মামা হারিয়ে যাবার কিছুদিন পরে মামীমা দেশের একজন বিশ্বস্ত মুসলমান প্রজার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন, লিখেছে—আপনার স্বামী শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য্যের এক দিদি প্রমীলা দেবী এক পত্রে জানিয়েছে যে তার ভাই শুভ্রাংশু মৃত, তার কোন ওয়ারিশ নেই, অতএব তার সম্পত্তির একমাত্র দাবিদার এখন শুধু ঐ দিদি—সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা তাকে না জানিয়ে যেন করা না হয়।

মামা হারিয়ে যাবার পিছনে সেই ছোটমাসীদের কোন হাত নেই ত? লোক লাগিয়ে ভোরের অন্ধকারে মামাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে গুম করে রাখেনি ত? মেরেও ফেলতে পারে। না হলে প্রজার কাছে শুভ্রাংশু মৃত এমন কথা লিখে চিঠি যায় কি করে?

আরও একটা ব্যাপার আছে। শুভ্রাংশুর বড় ভাই অরুণাংশু, এদের বড় মামা, তাদের বাবা বেঁচে থাকতেই বেশ কিছু টাকা পয়সা দেওয়ান বাপের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে বিলেতে পাড়ি দিয়েছিল। উদ্দেশ্য—সেখান থেকে কেউ-কেটা হয়ে ফিরবে। কিন্তু সে আর ফেরেনি। পরে তার সম্বন্ধে নানা গুজব শোনা যেত—কখনো শোনা যেত সেখানে সে মেম বিয়ে করে সুখে আছে—কখনও বা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে মারা গেছে। বছর দশেক আগে কলকাতার এক কাগজে খবর বেরিয়েছিল—জনৈক অরুণাংশু ভট্টাচার্য্য নামে এক ভারতীয় লণ্ডনে সাধুবাবা সেজে লোক ঠকাবার দায়ে কারারুদ্ধ হয়েছে। আর কোন খবর জানা নেই।

মাত্র বছরখানেক আগে লণ্ডনের এক এটর্নির কাছ থেকে শুভ্রাংশু ও প্রমীলাদেবীর কাছে এক সঙ্গে চিঠি এসেছিল—অরুণাংশু সম্ভ মারা গেছে, মৃত ব্যক্তির উইল অনুযায়ী তার সব সম্পত্তির (দায় দেনা বাদে) মালিক এখন শুভ্রাংশু ও প্রমীলাদেবী।

চিঠি পেয়ে গরিব মানুষ অনিমাদেবী হাত গুটিয়ে বসে থেকেছেন দীননাথের পরামর্শে—কে এখন দিল্লী-লণ্ডন এমব্যাসী-এটর্নি করতে যাচ্ছে, কী সম্পত্তি আছে তাও জানা নেই। ওদিকে প্রমীলাদেবী নাকি এক ছেলেকে গোপনে লণ্ডনে পাঠিয়ে জোর খোঁজ খবর শুরু করেছিলেন। এতদিনে হয়ত তার একটা ফয়শালা হয়ে এসেছে আর প্রমীলাদেবী একাই সে সম্পত্তিটাও গ্রাস করতে চাইছেন।

অসম্ভব কিছু নয়। এক সময় মঙ্গলা দেবী নিজের ছেলেরবৌ শবুর হাতে হাতকড়ি পরাবার ব্যবস্থা করছিলেন। তাঁরই দোর্দণ্ডপ্রতাপ বোন হয়ত অসুস্থ ভাইকে গুম বা খুন করে সব সম্পত্তি হাতাবার মতলব করেছেন। অতএব মামা হারিয়ে যাবার পিছনে তাঁর হাত থাকা বিচিত্র নয়। যিনি নিজে হাতে মুসলমান প্রজাকে চিঠি লিখতে পারেন তাঁর জীবিত ভাই মৃত—তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে সত্য নির্ধারণ করতে আর কারো উৎসাহ হল না।

এমনি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এবারের পুজোটা চলে গেছে।

কিন্তু আরো বড় সঙ্কট দেখা দিয়েছ দেশের জাতীয় জীবনে। দেশ স্বাধীন হয়ে থেকে দেশে কোন বড় যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না এক কাশ্মীর আর হায়দ্রাবাদ নিয়ে গণ্ডগোল ছাড়া। তার উপর বান্দুং সম্মেলন, পঞ্চশীলের আবহাওয়ায় কেউ যুদ্ধের কথা ভাবে নি।

এমন সময় বন্ধু রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে দেশে যুদ্ধ লেগে গেল। চীন আক্রমণকারী—তারা একদিকে ম্যাকমেহন লাইন না মেনে ভারতে ঢুকে পড়েছে, ওদিকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তেও আক্রমণ করে জমি দখল করছে। ভারতের জওয়ানরা বাহাদুরের মত লড়াই করে তাদের আটকে রাখার চেষ্টা করছে, প্রাণপণ যুদ্ধ চলেছে। কেউ কেউ বলছে—এটা যুদ্ধ নয়, সীমান্ত সংঘর্ষ। ওদিকে সমাজতন্ত্রের দেশ রাশিয়া আর এক সমাজতান্ত্রিক দেশ ভাই চীনের সঙ্গে বন্ধু দেশ ভারতের সংঘর্ষে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' এর অকাল সমাধি ঘটেছে। দেশে এমার্জেন্সী চালু হয়েছে।

কদিন পরেই বম্‌ডিলা নামে একটা পাহাড়ী শহরের পতন ঘটেছে—সেখানকার লোক সব দলে দলে সমতলের দিকে পালিয়ে আসছে। অনেকের ধারণা ছিল আসাম সহ সারা পূর্ব ভারত বুঝি চীনের মুঠিতে চলে যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও সেখানকার লোকদের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। চীনারা কিছুদিন বম্‌ডিলায় থেকে নিজেদের দাবিমত সীমান্ত রেখায় ফিরে গেল। উত্তর পশ্চিম সীমান্তেও এক সময় গোলাগুলি বন্ধ হল। চীনের সঙ্গে ভারতের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল।

যারা এটাকে যুদ্ধ, চীনকে আক্রমণকারী না বলে সীমান্ত সংঘর্ষ বলেছে সেই সব চীন সমর্থকদের খুঁজে খুঁজে জেলে বন্দী করা হয়েছে। দেশ ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বরখাস্ত, শান্তির দেশ ভারতে নতুন করে সেনা বাহিনীকে আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতা ও আত্মমর্য্যাদা সবার উর্ধে।

তারই মধ্যে আর একটা বিবাহ বার্ষিকী চলে গেছে। বিয়ের পর দেখতে দেখতে নয়টা বছর কেটে গেল। নয় বছরে না-হোক করেও ভজনখানেক বড় সঙ্কট বা ঝামেলা বয়ে গেছে শবুদের জীবনে। বদলি, জোড়া সংসার ভেঙে যাওয়া, মেজদা বিশ্বনাথের মৃত্যু, দীননাথের অসুখের পর অসুখ, জমি কেনা, বাড়ী তৈরী করা, বাবা কালীনাথের মৃত্যু, দীননাথের পরীক্ষা প্রোমোশন বদলির লড়াই, ভাইদের লেখাপড়া, মা মঙ্গলা দেবীর দুর্ব্যবহার ও অশান্তি, কাঁচা ঘর পাকা করা আর সব শেষে শেফালীর বিয়ে। এত সবের মাঝে শবুরা নিজেদের দিকে তাকাবার অবসর খুব কমই পেয়েছে।

অবসর পাক আর না পাক একটা প্রশ্ন এত দিনে বেশ বড় হয়ে দেখা

দিয়েছে। সেটা হল তাদের বিবাহিত জীবন এত বছরেও পূর্ণতা পেল না। যে কোন নারীর মত শবুর মাতৃত্বের সাধ এখনও অপূর্ণ। মন্দির শহরে বিয়ের পর যখন সংসার পেতেছিল তখন পাশের ঘরের ভাড়াটে চাটুয্যে গিন্নী বলেছিলেন—বছর পাঁচ হেসে খেলে কাটাক, তারপর যেন ছেলেপুলের কথা ভাবে।

হেসে খেলে হোক আর দুঃখ সঙ্কটের মধ্যে হোক এক এক করে ন'টা বছর কেটে গেল। এখন সকলের প্রশ্ন, ছেলেপুলে হচ্ছে না কেন? মঙ্গলা দেবীও সেই সুযোগ নিয়ে কথা শুনিয়েছেন—হবে কি, বৌমা বিয়ের আগেই সে সব পাট সেরে এসেছে, পেটে একটা কুকুর বেড়ালের বাচ্চাও আর নেই। করবীর ছেলে মেয়েদের আদর করতে করতে বলতেন—এ যেন চাঁদের হাট, আর এখানে বাঁজা বেটার বৌ নিয়ে সংসার করা। বড়বৌ বীণার যে চারটি ছেলেমেয়ে আছে তারা এলে ত তিনি তাদের সঙ্গে কুকুর বেড়ালের মত ব্যবহার করেন, আর শবুর পেটের বেড়াল ছানার জন্য যেন তিনি কোল পেতে বসে আছেন।

সে সব কথা বাদ দিলেও শবুর মনের ত একটা বাসনা আছে, তাদের জীবনের একটা চাহিদা আছে। সংসারের কাজ কর্ম যতক্ষণ আছে ভাল। এতদিন বাড়ীতে বেশ কিছু লোকজন ছিল—তাতেও অনেকটা অন্যমনস্ক থাকত। এখন বাড়ীতে ওরা শুধু তিন জন। দীননাথ সারাদিন ও এক-প্রহর রাত অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। হাবলু স্কুলে যায়, নিজের মত পড়াশুনা করে। সারা দুপুর ফাঁকা বাড়ীতে উদাস অলসভাবে শবুর দিন আর কাটতে চায় না, প্রহরগুলো পীড়াদায়কভাবে দীর্ঘ মনে হয়। গল্পের বই পড়ে, প্রতি-বেশিনীদের সঙ্গে গল্প করেও সময় যেন কাটতে চায় না। তারা কেউ মুখের উপর সে প্রশ্ন শুধায় না, যদি প্রশ্ন করে সেই ভয়ে লজ্জায় সে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায়। স্বামী দীননাথের কাছেও মুখ ফুটে সেকথা বলতে পারে না, বিয়ের এত বছর পরেও এত তার লজ্জা।

দীননাথই একদিন শবুর সে লজ্জা ভাঙাল। বলল—

'দেখ, একটা কথা অনেকদিন হল ভাবছি। এবারে আমাদের ঘরে যে একটা নতুন মানুষ না এলে ভাল লাগে না, ভাল দেখায়ও না। কিছু একটা করা দরকার।'

শবু দীননাথের বুকে মুখ লুকিয়ে বলল—

'আমিও তাই ভাবি, লজ্জায় তোমাকে কিছু বলতে পারি না।'

দীননাথ বলল—'লজ্জা ত আমারও। কিন্তু আর লজ্জা করে বসে থাকলে চলে না। চল আমরা দুজনে হাসপাতালে যাই, ডাক্তার দেখাই, স্পেশ্যালিস্টের মতামতও দরকারে নিতে হবে।'

শবু বলল—'তাই চল, আমারও আর ভাল লাগে না।'

হাসপাতাল থেকে কয়েক রকম পরীক্ষা করল। দুজনেই সুস্থ স্বাভাবিক। এর মধ্যে হরমোন ঘটিত কিছু ব্যাপার আছে। আরো আগে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। দেরী হলেও এখনো সময় আছে, নিরাশ হবার কিছু নেই। তবে বিশেষজ্ঞের মত হল, সময় লাগবে। ছ সাত মাস চিকিৎসা চলবে তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যাবে। এখন প্রতিমাসে একবার করে গিয়ে ডাক্তারের মতামত নিয়ে আসতে হবে।

চিকিৎসা চলছে। শবুর মনে আশা, এতদিনে বুঝি তার মাতৃত্বের সাধ পূর্ণ হবে, পাবে প্রাণের স্পর্শ যে প্রাণ ঘুমিয়ে আছে তার দেহে মনে।

আর এমনি সময়ে আগে থেকে কোন খবর না দিয়ে মা মঙ্গলা দেবী এলেন।



পর্ব-৬

এক

ভবর সঙ্গে মাকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে দীননাথ জিজ্ঞেস করল—

'কি ব্যাপার, হঠাৎ কোন খবর না দিয়েই···।'

মঙ্গলা দেবী তাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন—

'নিজেদের বাড়ীতে আসব তার আবার খবর দেওয়ার কি আছে।'

'তা বটে, তা বটে' দীননাথ আমতা আমতা করল। মা যে কখন কাকে আপন ভাবেন আর কাকে পর মনে করেন ছেলে হয়ে দীননাথও তা ঠিক বুঝতে পারে না।

মঙ্গলা দেবী বললেন—'শেফালীর বিয়ে ত দিলি। এবারে ছোট ভাই ছুটোর গলায় একগাছা করে সুতো ঝুলিয়ে দে।'

দীননাথ বলল—'ওদের পৈতে দেওয়া ত হয়ে গেছে। পৈতে দেবার নাম করে অফিস থেকে লোন নিয়ে দু দফায় বাড়ীর কাজ করেছি।'

'তা বেশ করেছিস, এখন আসল পৈতে দেবার ব্যবস্থা কর। সেই জন্যই আমার আসা।'

'এত বেশী বয়সে আর ঘটা করে পৈতে দিয়ে কি হবে, কালিঘাটে গিয়ে সেরে আসুক। এখনকার দিনে পৈতে কেউ রাখেও না আর আমার হাতে টাকা পয়সাও নেই, শেফালীর বিয়ের সব ধারদেনা এখনো শোধ হয়নি।'

মঙ্গলা দেবী কোন আমল না দেবার ভঙ্গিতে বললেন—'টাকার কোন অভাব নেই, ভবা সোনা আমার মুঠো ভরে ভরে টাকা দেয়—সেই টাকাতেই হবে। আর বামুনের ছেলের জাতকর্ম না হলে কে কবে কখন বিয়ে করতে চাইবে তখন গলার সুতোর জন্য টান পড়বে। আজকাল ত অনেকে জাত না মেনেই বিয়ে করছে, তখন গলার পৈতে আর পদবীতে পরিচয় থাকবে—বামুনের ছেলে। পৈতেটা দিতেই হবে। আমি সোনাকে ছুটি নিয়ে আসতে লিখে দিয়েছি, সে কালই এসে পড়বে।'

পৈতের যোগাড় যন্তর শুরু হয়ে গেল। সোদপুর যাদবপুর ও শেফালীদের কাছে খবর চলে গেল। নামেই দীননাথের উপর ভরসা আসলে সব কিছু

মঙ্গলা দেবীই করবেন। তাঁর ছোট ভাইটা হারিয়ে গেছে সে খবর তিনি আগেই পেয়েছেন, ভাই-বৌকে ডেকে বললেন—

'অনি, অংশুর (শুভ্রাংশু) ত কোন খবর নেই। কি আর করা যাবে তোদের বিপদের কথা ভেবে আমার রাতে ঘুম হয় না। এক কাজ কর, পর পর দুটো পৈতের দিন আছে, এরা ঘর থেকে বের হলে ঐ সরঞ্জাম দিয়েই দুলু টিমু আর ভুলুর গলায় পৈতে ঝুলিয়ে দে—খরচ পত্তর সব আমার। এই সুযোগে দিয়ে দি—না হলে বাবা শ্রীশ ভট্টচার্যের নাতিরা হয়ত চিরকাল অব্রাহ্মণই থেকে যাবে। কত বড় দেওয়ানের বংশধর এরা!'

দেওয়ান দুহিতা বড় ননদের কথার উপর কথা বলার ক্ষমতা অনিমা দেবীর নেই, পৈতে দিয়ে দিতে চাইছে বলারই বা কি আছে? সে দিকেও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

মঙ্গলা দেবী এবার শবুকে বললেন—

'বৌমা, তোমার উপর ভরসা করেই এত সব আয়োজন করছি। তুমি এক ননদের বিয়ে দিয়েছ—এবার বুড়্যা দেওর দুটোর মাথা মুড়াবার ব্যবস্থা করে আমার দায়-উদ্ধার করে দাও।'

শবু একেবারে মোহিত। এত ভালমানুষ শাশুড়ী ঠাকরুন কোনদিন দেখেছে কিনা মনে পড়ে না।

মঙ্গলা দেবী আরও বললেন—'মাস খানেকের মধ্যে ভবর বদলি হচ্ছে, এবারে বোধ হয় কাটিহারে দেবে। সেটাও খোট্টার দেশ তবু সেখানে নাকি অনেক বাঙালী আছে। কাটিহার যাবার সময় এবার আর এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাব, লেখাপড়া শিখায়ে মানুষ করে দেব।'

শবু ভবকে আড়ালে বলল—'তোমার মাথা মুড়োবার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হল, মাথায় ঘোল ঢালার ব্যবস্থাও কি আমি করব?'

ভব হাত জোড় করার ভাব করে বলল—'ওটা না হয় তুমি না-ই করলে, বাড়ীর আর এক বৌ-এর জন্য সেটা তোলা থাক।'

'সে কাজটা কবে হচ্ছে? তুমি ত গভীর জলের মাছ।'

'আসল গভীর জলের মাছ তুমি দেখোই নি'—বলে শবু ইঙ্গিতটা ধরতে পারার আগেই ভব বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, বোধ হয় কোন গভীর জলাশয়ের উদ্দেশ্যে।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হল শেফালী আসাতে। সে এলেই শুভঙ্করী আসে।

শুভঙ্করী যতক্ষণ ছিল ততক্ষণও কিছু জানা যায় নি। সে নিজের ঘরে চলে যেতে শেফালী আর ভব শবুদের ঘরে বসে চুপি চুপি আলোচনা শুরু করল।

ভব বলল—'দিদি, সোনার ব্যাপার তুই কিছু জানিস ?'

শেফালী বলল—'সবই জানি।'

শবু সোনা আর শুভার ব্যাপারটা এককালে কিছুটা আঁচ করেছিল, তাই উৎসাহিত বোধ করল। বলল—'আমিও কিছু কিছু জানি।'

ভব বলল—'তুমি কিছুই জানো না। এ সব জিনিষ বোঝা তোমার মত বোকার কম্ম নয় বৌদি।'

শেফালী পরিষ্কার করল—'জানো বৌদি, সোনা মেদিনীপুরে গিয়েই একটা কায়স্থ মেয়ের খপ্পরে পড়েছে। মনে হয় ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এদিকে আমি লজ্জায় শুভঙ্করীকে মুখ দেখাতে পারি না—পাছে সে কিছু বুঝতে পারে, মনে দুঃখ পায়। এ সব ছেলেকে বেত পেটা করলেও কিছু হবে না, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নিলে তবে ঠিক হয়।'

এতসব ব্যাপার অথচ শবু কিছুই জানে না। তবে কেন সে শুভার মত অত ভাল খাঁটি মেয়ের মনে আশা জাগাল ? শবু আজ পর্য্যন্ত সোনার কোন দোষ দেখে নি, কিন্তু এ যদি সত্যি হয় তবে সে কোনদিনই তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। আগের মত শুভা যখন রোজ বিকেলে শবুর কাছে চা খেতে গল্প করতে আসবে শবু তখন কোন মুখে তার সঙ্গে হেসে কথা বলবে ? বেচারী শুভা, সে হয়ত এখনও মনে মনে আশার জাল বুনে চলেছে !

পরদিন সোনা আসতে তিন ভাইবোনে চাপা তর্কাতর্কি, মন কষাকষি চলতে লাগল। শেফালী বলল—

'দেখ সোনা, তোর এই কাজ ভব আমি কেউ সমর্থন করি না।' বাড়ীতে সব থেকে ছোট বলে এরা তিনজন প্রায় সমবয়সীর মত মেলামেশা করে।

সোনা বলল—'রূপের কাঁঠালের ব্যাপারটা কি আমরা সমর্থন করেছিলাম ? জানিস, পাড়ায় ওর কিছু বদনাম আছে ?'

ভব বলল—'আছে নয়, ছিল। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি সব মিথ্যা—পাড়ার ছেলেদের 'জেলাসী।'

সোনা বলল—'তা তো তুই বলবিই।'

শেফালী মাঝখানে বলল—'সে আর যাই হোক, ব্রাহ্মণ। মা নিশ্চয়ই তোর ব্যাপারটা মেনে নেবে না।'

মঙ্গলা দেবীর বয়স হলে কি হবে কান খুব সজাগ। পাশের ঘর থেকে বলে উঠলেন—

'কি মা মা করছিস? জাত ধুয়ে কি জল খাব? তোরা সব চুপ করে থাক—সাত কান করার দরকার নাই।'

মার ধমক খেয়ে তিন ভাই বোন চুপ করলেও শবুর মন চুপ করে না। বদনামের কথা সেও শুনেছে মেয়েটার এক প্রতিবেশিনী আত্মীয়ার মুখে, মেয়ের হাবভাবও কিছু দেখেছে সেবাড়ীতে ভাড়া থাকা কালে। আর মঙ্গলা দেবীর জাতের প্রতি উদারতা? শুনেছে, মহী এককালে ঐ পথে পা বাড়িয়েছিল, মঙ্গলা দেবী ও আর সকলের আপত্তিতে সেই যে পিছিয়ে এসেছিল, বিয়ের ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত সে পিছিয়েই আছে। তবে শেফালী একটা খাঁটি কথা বলেছে। ভব আর সে যা করছে—করেছে, জাত বেছেই। তারটি ত আবার খাঁটি বারেন্দ্রসন্তান।

কিন্তু বিয়ের আগে এত প্রেমের ছড়াছড়ি দেখেও মঙ্গলাদেবী নীরব। করবীও নাকি এককালে কম যায় নি। আর দীননাথের মুখেই শুনেছে দিদি জবার ব্যাপার ডাক্তার বস্তি পর্য্যন্ত গড়িয়েছিল। নিজের ছেলে মেয়েরা যেখানে এমন তখন তাঁর কোন কথাই বলা উচিৎ নয়। অথচ শবুর কাল্পনিক প্রেমের রটনায় ও চরিত্রে কলঙ্ক দিতে তিনিই সব থেকে সরব। তাঁর নিজের কথা…।

দুই বুড়ো ছেলের পৈতে খুব ধুমধাম করে হল—দুদিন পরে তুলু চিনু ভুলুরও। ব্রহ্মচারী বেশে নন্দুকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল তব সোনাকে সেরকম মেটেই না, তবু সোনাটা মন্দের ভাল।

সব চাইতে ভাল দেখাচ্ছিল চিনুকে তার কচি মিষ্টি মুখে ব্রহ্মচারী বেশে। ভুলুর ত ভাল করে কথাই ফোটেনি, সবে ক্লাশ সিক্সে পড়ে। খুব বেঁচে গেল হাবলু—তার বাবা জ্যাঠারা আগেই তার সে কাজ সেরে রেখেছিল।

সাতদিন পরে মঙ্গলা দেবী ফিরে চললেন। 'চল ভবা,' বলতেই ভব তাঁকে নিয়ে রওনা হল। প্রায় বিয়ে বাড়ীর মতই ধুমধাম করে লোকজন খাইয়ে তিনি সবাইকে প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিয়ে দিলেন, কয়েক মাস আগে মেয়ের বিয়েতে ছেলে ছেলের বৌ যা করেছে বুড়ো ছেলেদের পৈতে দিতে তার চেয়ে কিছু কম করলেন না তিনি, উপরন্তু ভাইপোদেরও পৈতে দিয়ে দিলেন। এমন অবলীলা কর্তৃত্ব, এমন স্বেচ্ছা চলা ফেরা, এমন হুকুমের গোলাম দুই ছেলে

আছে—এখন তাঁর মেজাজই আলাদা। দেখুক সব একচোখো প্রতিবেশীরা তিনিও কর্ত্তব্যে কিছু কম যান না।

মনে হয় ছেলেদের মতিগতি মঙ্গলা দেবী ভালই জানেন। সেই জন্য তিনি বুড়ো ছেলেদের পৈতে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন—যে যেখানেই বিয়ে করুক, ছেলের গলায় পৈতে থাকলে তাদের আর অব্রাহ্মণ বলবে কে? শুভঙ্করীর ব্যাপারটাও নিশ্চয় তাঁর জানা। তবু তিনি এমন অসামাজিক কাণ্ডে সম্মতি দিচ্ছেন কেন? শুভা ত শেফালীরও বন্ধু। কিন্তু শেফালীর বিয়েতে এসে তিনি যাদের কাছে কথা শুনেছিলেন, দীননাথ ও শবুর প্রশংসা শুনে গিয়েছিলেন শুভার মা যে তাদেরই একজন। যে এদের প্রশংসা করে তার মেয়েকে ছেলের বৌ করতে তিনি মোটেই ব্যগ্র নন। জাতবিচারে তাই এত উদারতা।

দীননাথ এত সব ব্যাপার কিছুই জানত না। সবাই চলে গেলে শবু দীননাথকে বলল—'জানো, সোনা মেদিনীপুরে গিয়ে এক কায়স্থ মেয়ের সঙ্গে মেলা মেশা করছে।'

দীননাথ গম্ভীর হয়ে বলল—'ও সব বিয়ে শাদী যেন আবার এ বাড়ীতে না হয়।'

এমন ভাবে বলল যেন শবুই বিয়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। এমন ব্যাপার শবুও দেখেনি, না বাপের বাড়ীতে না শ্বশুর বাড়ীতে।

আরো একটা কাণ্ড ঘটল পৈতের মধ্যে যা শবুর মোটে ভাল লাগেনি। মা পদ্মিনী দেবী বলেছিলেন—চড়ুই এর বাসা ভাঙতে নেই, অমঙ্গল হয়। সেজন্য চড়ুইগুলো যত অসুবিধেই করুক সে কোন দিন তাদের তাড়াবার কথা বলেনি। মাঘ মাস প্রায় শেষ হয়ে ফাল্গুনের মুখে পৈতে হল। এ সময় চড়ুইগুলো আবার খড়কুটো সংগ্রহে মেতে ওঠে। সবাই বলতে লাগল—ভেন্টিলেটারের ফুটো বন্ধ করে দাও তাহলেই ওদের উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে।

শবুর কথা কেউ শুনল না। ওটা নাকি কুসংস্কার। রান্নার জায়গাটাত পরিষ্কার রাখতে হবে। শেষে সকলের কথামত দীননাথই একখানা আধলা ইট ভেন্টিলেটরের গর্তে বসিয়ে দিয়ে চড়ুইদের আসা যাওয়া বন্ধ করল।

একটা অজানা আশঙ্কা শবুর মনে বাসা বেঁধে আছে সেই থেকে। এমন একটা কাজ করা হল, তাও আবার দীননাথের হাত দিয়ে—কোন অমঙ্গল হবে না ত?

আর এমন অমঙ্গলসূচক ঘটনা ঘটল মা মঙ্গলা দেবীর আগমন ও উপনয়ন উপলক্ষ করেই। মঙ্গলা দেবীর উৎসব অনুষ্ঠান আর শবুর অমঙ্গল কি এক সূত্রে গাঁথা? মঙ্গলা দেবীর আসা যাওয়াও যেন ধুমকেতুর মত। হঠাৎ আসে, লেজের ঝাপটা দিয়ে চলে যায়। লোকে বলে ধুমকেতুর আবির্ভাব অমঙ্গল ডেকে আনে। এখানেও কোন অমঙ্গল ঘ'তে যাচ্ছে নাকি?

দুই

বহুদিনের চেষ্টা ও খোঁজাখুঁজির পর এত দিনে মিতুর বিয়ে ঠিক হয়েছে। বাবা গিরিনবাবু টাকা ও বিয়ের বাজারের ফর্দ পাঠিয়েছেন দীননাথের কাছে। দুই জামাইয়ের মধ্যে দীননাথই বেশী আসা যাওয়া করে, একেবারে বাড়ীতে ছেলের মত—বড় জামাই সুশীল আবার প্রায়ই অসুস্থ থাকে। বিয়ের দিন পড়েছে শবুর জন্মদিনের খুব কাছাকাছি।

মাঝখানে গেছে বসন্ত, গেছে গ্রীষ্ম—এসেছে বর্ষা কাল। ভব বদলি হয়ে মাকে নিয়ে কাটিহার চলে গেছে। বড়দা হৃদিনাথ শেফালীর বিয়ের পর পরই নাগাপাহাড়ে বদলি হয়ে গিয়ে সেখানকার জল হাওয়ায় মরমর হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিল ছমাসের মধ্যে। পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে মোটামুটি ভাল হয়ে উঠেছিল। এবারে তাকে বদলি করে দিয়েছে দিল্লীতে—এক মেয়েকে সঙ্গে করে হৃদিনাথ দিল্লী চলে গেছে। বীণা আবার সোদপুরের বাড়ীতে একা তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে, তাদের লেখাপড়ার জন্য—ভরসা তার পাড়ার ছেলেরা।

একটা মানুষকে কতবার বদলি করতে পারে? শবু এই ন'বছরে তার ভাসুরকে ছ সাতবার বদলি হতে দেখল। ছেলে মেয়েদের ঠিকমত লেখাপড়া হবে কি করে? তার উপর এই ত সবে অত সাধ করে বাড়ী তৈরী করল। দীননাথেরও বদলির চাকরি কিন্তু একবারের বেশী সে ঝামেলা পোহাতে হয়নি—হলে যে শবু কি করত। এখন তাদের বেশ সাজানো গোছানো ছোট্ট একখানা বাড়ী হয়েছে। এ অবস্থায় যদি তাদের বদলি করে দেয়—সে হয়ত নিজের বাড়ী ফেলে যেতেই পারবে না।

ষষ্ঠীতলা থেকে শুধু ঠাকুমা আর শ্রীলা যাবে। বিয়েটা তেমন ভাল হচ্ছে না, দোজবরে বিয়ে। তাই কাকা কাকীমা সবাই যেতে বিশেষ উৎসা

পাচ্ছেন না। সম্ভব হলে কাকা একটা সরকারী ট্যুর নিয়ে বিয়ের দিন হাজির হবেন।

বাড়ীটা হাবলু, মামীমা ও শুভঙ্করীদের হেফাজতে ও গাঁঠুর ভরসায় রেখে বিয়ের সওদাপত্র নিয়ে শবু ও দীননাথ হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হল ট্যাক্সিতে। পথে ঠাকুমা ও শ্রীলাকে গাড়ীতে তুলে নিয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করলে দীননাথ বলল—

'পরপর খুব ছুটি নেয়া হল, অফিস থেকে ছুটি দিতেই চাইছে না।'

শবু শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল—'কেন, কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দীননাথ বলল—'গণ্ডগোল আবার কি? নিজের পাওনা ছুটি যখন খুশি নেব। শালীর বিয়ে বলে কথা, কি বলিস শ্রীলা?'

শ্রীলা কিছু না ভেবেই বলল—'নিশ্চয়ই।'

'কি ব্যাপার, এত চটপট জবাব দিলি যে, তোর বিয়েও খুব শিগগীরই মনে হচ্ছে যেন'—দীননাথ কৌশলে কথা বের করার চেষ্টা করল। 'আগে থেকে নোটিশ না দিলে ছুটি নিতে পারব না কিন্তু।'

শ্রীলা গম্ভীর হয়ে বলল—'আমার বিয়েতে আপনাকে আসতে হবে না।'

ঠাকুমা বললেন—'শ্রীলা জন্মেছিল মিতু আর নন্দুর মাঝখানে। খুঁতো মেয়ে বলে মিতুর বিয়ে এতদিনে হচ্ছে। এটাকেও আর ঘরে রাখা যায়না। অবিনাশ আর ছোটবৌমাকে বলি, তারা কেউ গ্রাহ্য করেনা। কি যে আজকাল সব বুড়ী বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না দিয়ে বি. এ. এম. এ পড়ানো ফাশন হয়েছে বুঝিনা।'

খড়্গপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ ওরা সোনাকে দেখতে পেল। সোনা জিজ্ঞেস করল—'কি বৌদি, তোমরা কোথায় চললে?'

শবু বলল—'যাচ্ছি মিতুর বিয়েতে, পরশু বিয়ে।'

মিতু এ বাড়ীতে সবার পরিচিত, কানে অপারেশনের পর কয়েক মাস এখানে ছিল। সোনা খুশি হয়ে বলল—

'তাই নাকি? আমি তবে কালকের ট্রেনে ঐ বিয়েতে যাচ্ছি—পাশ, পিটিও কতই পাওনা আছে: আমার নেমন্তন্ন আছে ত?'

ঠাকুমা বললেন—'আসবে বৈকি বাবা, আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করছি।'

শবু হেসে বলল—'নেমন্তন্ন হল ত? এসো কিন্তু।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। সোনার এই সরলতা ও ছেলেমানুষী ভাব শবুর খুব ভাল লাগে—বাবা কালীনাথের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এমন সুন্দর ছেলেটার

কেন যে মতিভ্রম হল! ঠাকুমাকে ভাল করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর কান বাঁচিয়ে শবু শ্রীলাকে বলল—

'জানিস শ্রীলা, সোনা নাকি একটা কায়স্থ মেয়ের প্রেমে পড়েছে।'

'তাই বুঝি?' বলে শ্রীলা যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কিছু পরে বলল—'দেখ মেজদি, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর সবাই আমাদের প্রণাম করে তাইনা? আমরা ব্রাহ্মণ—মৈত্র, মিত্র নই।'

'সে ত একশোবার' বলে শবু শোবার ব্যবস্থা করে নিল। শ্রীলার হঠাৎ উচ্ছ্বাসের কারণ কিছু বুঝতে পারল না। শ্রীলাকে শুতে বললেও রাজী হল না, সে নাকি বসে বসে সব ষ্টেশন দেখতে দেখতে যাবে রাতের এই অন্ধকারে। দীননাথ শুভক্ষণে থ্রি টায়ারের আপার বার্থে নাক ডাকাচ্ছে।

বিয়েতে ধুমধাম বিশেষ হচ্ছে না। দোজবর হলেও বরের বয়স খুব বেশী নয়—মিতুরও ত প্রায় পঁচিশ বছর বয়স হল। ঠাকুমা বললেন—

'বাড়ীর বড় জামাই রাঢ়ী, নতুন জামাই যদিও বারেন্দ্র কিন্তু কাপ নয়—শ্রোত্রীয়। শবুর বিয়েটাই ভাল হয়েছে—জামাই বারেন্দ্র এবং কাপ দুইই।'

মা বললেন—'যাই হোক, ছেলেটা ভালই মনে হয়। মেয়ে একটু খুঁতো, কানে কিছু কম শোনে। সব জেনে যে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে সেই ঢের।'

খুঁতো মেয়ে বলে বাবা মা তার বিয়েতে যথাসাধ্য দিয়েছেন, কোন কার্পণ্য করেন নি। ঠাকুমাও তাঁর একটা ভারী দেখে গয়না দিয়েছেন। বড়কাকীমা বিয়েতে এসেছেন কিন্তু ঠাকুমার ভারী গয়না দেওয়া আটকাতে পারেননি, খুঁতো নাতনীটার প্রতি তাঁর একটা কর্তব্য আছে। শবু এক জোড়া কানের দুল দিয়েছে।

কথামত ছোটকাকা এসেছেন, সোনাও এসেছে। বড়কাকা আগেই সদলে এসেছেন। বাড়ীতে ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। সোনা আর কানাই হৈ চৈ করে বাড়ীটা মাতিয়ে তুলল।

শবু এক সময় লক্ষ্য করল সোনা আর শ্রীলা যেন নিজেদের মধ্যে বেশী গল্প করছে, তপু শঙ্খকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রে স্নানও করে এল। আগে শ্রীলা অনেকবার চাঁপাতলার বাড়ীতে গেছে—কিন্তু ওদের কখনো এভাবে গল্প করতে দেখেনি। একি নতুন পরিবেশ পেয়ে প্রায় সমবয়সী দুই তরুণ তরুণীর সাময়িক উচ্ছলতা? কিন্তু সোনা নাকি কোন একটা মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে রেখেছে। শ্রীলাও সেকথা জানে। হঠাৎ

দুজনের বেশী মেলামেশা শুরু হয়ে গেল কেন সে ঠিক বুঝতে পারে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটতে চলেছে।

ট্রেনে আসতে ঠাকুমা ঠিক কথাই বলেছিলেন, এতদিন শ্রীলার বিয়ের চেষ্টা করা উচিৎ ছিল। দিদি কিন্তুর বয়স কুড়ি পেরোতে মা তার বিয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন। শবুর বেলায় ত আঠারোতে পা দিতেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। মিতুটা খুঁতো বলে এত দেরী হল সেজন্য মার গত পাঁচ বছর চোখে ঘুম ছিল না। শ্রীলা তার থেকে মাত্র বছর দু তিনের ছোট। শ্রীলা বেশ বুদ্ধিমতী লেখাপড়া জানা মেয়ে, তার উপযুক্ত পাত্র যোগাড় করাও সহজ নয়। যেমন তেমন পাত্র হলে ত চলবে না, মানাবেও না।

যাত্রাকালে মিতু কাঁদল যেমন আর সব মেয়ে কাঁদে—তবু দেখে বোঝা যায় এ বিয়েতে সে খুব খুশি। বরং এতদিন বিয়ে হচ্ছে না বলে বাড়ীতে প্রচণ্ড অশান্তি করত। খুশি মা বাবাও—এতদিনে তাঁরা অরক্ষণীয়া মেয়েটাকে পাত্রস্থ করতে পেরেছেন।

বরকনে রওনা হয়ে গেল—যাবে আসানসোল, সেখানেই জামাই এর সামান্য চাকরি। একই ট্রেনে রওনা হয়ে গেল সোনা আর ছোটকাকা নিজের নিজের জায়গায়। বড়কাকারা গেল পরের দিন।

এখন মা বাবার জীবনে নন্দুই বড় সমস্যা, তার অবস্থার কোন উন্নতিই হচ্ছে না। এবার একবার শেষ চেষ্টা করা হবে। কটকে নাকি এরকম রোগীর বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। নন্দুকে সেখানকার হাসপাতালেই পাঠান হবে ঠিক হয়েছে। বাবা মার মনে কষ্ট হবে—কি করা যাবে। মায়া করলে ত আর রোগ সারবে না। বাড়ীতে একটা বিয়ে গেল নন্দু হয়ত বুঝতেই পারল না। মা. শবু কতবার তাকে ডেকে বলেছে—নন্দু, ছোড়দির আজ বিয়ে। সে মুখে 'হুঁ হুঁ' বলা ছাড়া কিছুই করল না।

বিয়ের ভিড় মিটে যেতে শবু এবার কানাই আর তপুর দিকে মন দিল। এক বছরের উপর হল কানাই কলেজে পড়ছে, এখন সে সেকেণ্ড ইয়ার আর্টসের ছাত্র—পড়ে সেই কলেজটাতেই যেখানে শবুরা পড়েছিল। কলেজের ক্রিকেট খেলায় সে একজন ভাল বোলার—আবার নাটকও করে। ওর এখন সর্ব-সময়ের কলেজ বন্ধু হয়েছে তুলসী মহান্তি।

একদিন মা বললেন—'জানিস শবু, ওর তুলসী বন্ধুটা যেমন ন্যাওটা, তেমনি হ্যাংলা। কানাইয়ের সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারেনা, রাতে প্রায়ই এখানে থেকে

যায়। এখন বাড়ীতে অনেক জায়গা, উপরে নীচে চারখানা ঘর আর আমরা মাত্র পাঁচজন মানুষ। রাতে যখন কানাইকে খেতে ডাকি—তুলসীও এসে ওর সঙ্গে কোন কোনদিন খেতে বসে যায়। কানাই খেতে বসে ডাকে—তুলসী, খাইবু কিরে? তুলসী বলে—খাইবি, যিবি? কানাই এর মুখে 'আ' শব্দটা বের না হতেই এসে সঙ্গে বসে যায়। আলাদা করে খেতে দিলে খাবে না, কানাইয়ের সঙ্গে এক পাতে খাবে। মাঝখান থেকে কানাইয়ের খাওয়া পণ্ড হয়—আমাদের ত সব আলাদা করে মেখে খাওয়া অভ্যাস, ওরা আবার একবার এ বাটিতে একবার ওবাটিতে হাত ডুবিয়ে খায়।'

কানাই বলল—'তা হোক, তুলসীটা বেশ উপকারী, ভাল হকি খেলে আবার ওর হাতের হকিষ্টিক দেখে শহরের নাম করা গুণ্ডারাও কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। তুলসী বলেছে আমরা থার্ড ইয়ারে উঠলে সে আমাকে ড্রামা সেক্রেটারীর জন্ম ভোটে দাঁড় করাবে। বলেছে—তু নিশ্চয় জিতিবু, সব দায়িত্ব মোর। মনে হয় জিতে যাব—আর জিতলে একটা রেকর্ড হবে, এই কলেজ হয়ে থেকে কোন বাঙালী ছেলে কোন পোস্টে জেতেনি।'

শবুর মনে পড়ে যায় তাদের আমলে ভোটে দ্বিবেদী, মহান্তি, পট্টনায়ক, মহাপাত্র এই সব ছেলেরাই ভোটে দাঁড়াত আর শবুরা চোখ বুজে তাদের ভোট দিয়েছে যদিও এখনকার চাইতে তখন বাঙালী ছাত্রছাত্রী বেশী ছিল।

মা আবার বললেন—'দেখ শবু, তোদের বাবা কাকাদের দেখেছি বেশীর ভাগ বাঙালী বন্ধু। আর কানাইয়ের দেখবি যত সব ওড়িয়া বন্ধু!'

কানাই বলল—'আচ্ছা মেজদি, আমার কি দোষ বল? সেকালে বাবাদের বন্ধু ছিল ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জনের ছেলেরা আমারও তাই। তখন তাদের কেউ কেউ বাঙালী ছিল—এ আমলে বাঙালী প্রায় নেই-ই।'

তপু বলল—'মা, লাইটের গল্পটা বল।'

শবু জানতে চাইল—'লাইটের আবার কি গল্প মা?'

মা বললেন—'শুনবি সে মজার কথা? বাড়ীতে ইলেট্রিক লাইট হয়েছে, কানাই একা নীচে বট্‌ঠাকুরপোর ঘরে শোয়। ওর ভয় ডর কিছু নেই, বলে তুলসী আমার বন্ধু, কার সাহস আছে আমার কাছে ঘেঁষবে। রাতে খেয়ে উঠে মশারী টাঙিয়ে লাইট জেলে শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, সারারাত ঘরে লাইট জলতে থাকে। 'সে' রাতে উঠে নীচের ঘরে অত রাত অবধি আলো জলতে দেখে নীচে গিয়ে আলো নিভিয়ে আসে—ঘরের

দরজাটাও বন্ধ করে শোয় না। পরদিন সকালে কানাইকে বলে—ঘুমোবার আগে লাইটটা নিভিয়ে দিস।

'কিছুতেই কিছু হয় না। তিন চারদিন দেখে এক রাতে 'সে' বলল—কানাই সারারাত লাইট জ্বালিয়ে শুতে পারে, আমরা পারিনা ? সারা বাড়ির আলো জ্বালিয়ে ত শোয়া হল, কিন্তু চোখে আলো লেগে 'সে'ও ঘুমোতে পারে না আমরাও পারিনা। পরদিন কানাইকে সে কথা বলতে বলল—ঠিক আছে। রাতে কানাই বাল্বটা খুলে রেখে লণ্ঠন ব্যবহার করতে লাগল। ক রাত এই রকম চলার পর 'সে' বলল—কানাই, বাল্বটা লাগিয়ে নিস। মিটে গেল বাপ বেটার মান অভিমান।'

ঠাকুমা বললেন—'ছোটবেলায় গিরিনেরও শুয়ে শুয়ে বই না পড়লে ঘুম আসত না। বিয়ের পরে সে অভ্যেস ছেড়েছে।'

কানাই বলল—'তবেই দেখ মা, আমারই নাকি সব দোষের। দেখ মেজদি, তোকে একটা দুঃখের কথা বলি। মাঝে মাঝে আমরা বন্ধুরা মিলে সাইকেলে করে সাক্ষীগোপাল বা সুয়া নদীর দিকে বেড়াতে যাই। সবাই গিয়ে সাইকেল স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করায় আর আমি খুঁজি কোথায় গাছ আছে যাতে সাইকেল ঠেস দিয়ে দাঁড় করাতে পারি। সেই পুরোনো ঠাকুর্দার আমলের সাইকেল, তার না আছে স্ট্যাণ্ড, ঠেললে চলতে চায়না। বাকে বলি একটা নতুন সাইকেল কিনে দাও না হলে 'প্রেষ্টিজ' থাকে না। ওল্ড দাদার কি বলে জানিস ? বলে—প্রেষ্টিজ কিসের, এটা বি এস এ সাইকেল, তোর বন্ধুদের এমন সাইকেল আছে ? আমার বাবা এককালে এই সাইকেল ব্যবহার করেছে, পরে আমরা চড়েছি। ব্যস, আর কি, আমি এখনো বাবার বাবার (দাদুর) স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছি।'

ঠাকুমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—'মানুষটাকেই দেখলি না তার স্মৃতির দাম তোদের কাছে আর কতটুকু !'

এ ত গেল কানাই এর কথা। আর তপু ? সে এখন শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ যেন, কলায় কলায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফুলের মত ফুটে উঠছে। এখন সে পূর্ণ কিশোরী, একটু আধটু সাজতে ভালবাসে, পাড়ার সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। গুনগুন করে গান গায়, বয়সের গুণে মনটাও ভীষণ কোমল। একদিন রাতে খেয়ে উঠে তপু সবার পাতকুড়োনী একটা পাত্রে নিয়ে বাড়ীর খিড়কীদুয়োর খুলতে খুলতে বলল—

'মা একটু দাঁড়াবে এস ত।'

'এই ত শবু যাচ্ছে' বলে মা শবুকে ইশারা করে বললেন—'ওর একটা পোষ্য আছে, যা দেখে আয়।'

শবু এগিয়ে গেল। দেখল, একটা হাড় জিরজিরে বছর খানেকের বাচ্চা কুকুর তপুর দেয়া খাবারগুলো খুব ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে খাচ্ছে আর তপু এক-হাতে খাবারের বাসন অন্য হাতে দরজার হুড়কোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

শবু বলল—'খাবার দেয়া ত হয়ে গেছে, চলে আয়।'

তপু বলল—'নারে মেজদি, অন্য একটা কুকুর আছে ওর খাবার খেয়ে যায়, তাই পাহারা দিচ্ছি। এটা ভীষণ দুর্বল কিনা।'

'বেছে বেছে এমন একটা রোগা কুকুরকে খাওয়াতে লেগেছিস কেন?' শবু জানতে চাইল।

'ওকে যে কেউ খেতে দেয় না আমি খেতে না দিলে মরে যাবে।'

গলির মধ্যে জায়গাটা আবছা অন্ধকার। 'দেখি তোর কুকুরের চেহারাটা' বলে শবু দুপা এগিয়ে যেতে কুকুরটা ভয়ে দশ পা পিছিয়ে গেল। শবু তাই দেখে পিছিয়ে এল কিন্তু কুকুরটা আর এগোয় না।

তপু ডাকল—'এই কুকুর, আয় আয়।'

তবু কুকুরটার ভয় ভাঙে না। শবু বলল—'তোর কুকুর দেখছি লজ্জাবতী লতা। কুকুর বলে ডাকছিস—সব কুকুরই ত কুকুর, ওর একটা নাম রাখিস নি?'

'কি হবে মেজদি নাম রেখে কবে হয়ত মরেই যাবে।'

ততক্ষণে কুকুরটা আবার এসে ভয়ে ভয়ে খেতে আরম্ভ করেছে।

শবু বলল—'অন্ধকারে বুঝতেও পারলাম না ওটা মদ্দা না মাদী।'

তপু লাজুকভাবে বলল—'মাদী। মদ্দাগুলো ভীষণ অসভ্য হয়।'

বোঝা যায় তপু এখন প্রায় বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁচেছে। আজকালকার হিসেবে তপুর বিয়ের জন্য এখনই বাবা মার কোন চিন্তা নেই. এখনও অনেক দেরী।

সাতদিন বাপের বাড়ীতে কাটিয়ে এবার শবুদের ফেরার পালা, ঠাকুমা আর শ্রীলাও সঙ্গে যাবে। কানাই আর তপু ষ্টেশনে যাবে সবাইকে উঠিয়ে দিতে। বাবা মাকে প্রণাম করে নন্দুকে আদর করে রওনা হবার মুখে শবু বলল—

'আসি মাগো, আবার কবে দেখা হবে। সামনের পুজোয় এখানে আসার কথা, দেখা যাক কি হয়। নন্দুর জন্য, বাবার জন্য সব সময় ভাবনা হয়, মন খারাপ লাগে' বলে কাঁদতে লাগল।

মার চোখেও জল এসে গেল। বললেন—

'আমাদের জন্য ভেবে মন খারাপ করিস না। দীননাথের শরীরের যত্ন নিস। কদিন পরেই তোর জন্মদিন, সামনের বছরটা খুব সাবধানে থাকিস, বাইরে বেশী ঘোরাঘুরি করিস না।'

মনে উৎকণ্ঠা নিয়ে শবু জিজ্ঞেস করল—'একথা বলছ কেন মা?'

মা বললেন—'এমনি বললাম, মায়ের মন ত—কত কথাই মনে হয়।'

শবু মার গলা জড়িয়ে বলল—'ঠিক আছে মা, সাবধানেই চলাফেরা করব।'

পদ্মিনী দেবী তাঁর শাশুড়ীকে প্রণাম করে বললেন—'মা, শ্রীলার বিয়ের একটা ব্যবস্থা হলেই বিয়ে সেরে এখানে চলে আসবেন, আমাদের বড় একা একা লাগে।'

ঠাকুমার চোখে জল এসে গেল। মনে হয় মান অভিমানের পালা শেষ হতে চলেছে।

বাবা মাকে পিছন ফিরে দেখতে দেখতে শবুরা রওনা হল। কানাই তপু ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিল।

ট্রেন চলতে আরম্ভ করলে শবু ঠাকুমাকে আদর করে বলল—

'ঠাকুমা, শ্রীলার বিয়ে হলে আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেব।'

মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে ঠাকুমা বললেন—

'শ্রীলার বিয়ে কবে হয় দেখ।'

তিন

বিয়ে থেকে ফিরে দীননাথ আবার আফিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শবু তার ঘর সংসারের কাজে। মাসে একবার করে হাসপাতালে যাওয়া আছে; বাড়ীতে হাবলু, পাড়ায় মামীমারা, শুভঙ্করীরা আর প্রতিবেশিনীরা আছে সবার সঙ্গে মিলে মিশে দিন কাটছে। শেফালীর বিয়ের ধার দেনা শোধ হয়ে শবুর গলায় নতুন হারও একটা উঠেছে। মাঝে মাঝে প্রতিবেশিনী রমার মার সঙ্গে গিয়ে ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে আসে। এ ছাড়া বই

আনা হয় লাইব্রেরী থেকে, রেডিওটাও পল্লীমঙ্গল আসরের যাত্রা, গোবিন্দ কাশীনাথের ঝগড়া, শুক্রবারের নাটক নিয়ে কম আকর্ষণের নয়।

বেশ নিশ্চিন্তেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুদিন হল মনে হচ্ছে দীননাথের অফিসে একটা ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে। দীননাথ নিজে থেকে কিছু বলেনি। কিন্তু যে মানুষ সকাল নটা সাড়ে নটার আগে অফিসে বেরোয় না, ফেরে রাত আটটার পরে সেই মানুষ আটটায় যাচ্ছে ফিরছে সাড়ে ছটায়। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

পনরোই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস গেল। তার তিনদিন পর সন্ধ্যার আগ দিয়ে দীননাথ বাড়ী ফিরল একেবারে ঝোড়ো কাকের মত। অসহায় ভঙ্গীতে বলল—

'আমাকে শিলং এ বদলি করে দিয়েছে।'

বিনা মেঘে বজ্রপাত! ভয়ে শবুর বুক কাঁপছে, হঠাৎ বদলি হল কেন? অফিসে কি খুব একটা গণ্ডগোল হয়েছে?

কিছু জানা গেলনা। দীননাথ আবার বলল—

'সাতদিন পরে যেতে হবে। এখন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। কালই আমি একবার দিল্লী যাচ্ছি, দেখি কোন সুবিচার পাওয়া যায় কিনা।'

পরদিন দীননাথ দিল্লী চলে গেল।

বেদনায় শবুর বুকের ভিতরটা টনটন করছে—এই সাজানো বাড়ী ফেলে, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে হবে কোন এক অজানা দেশে। অদ্ভুত সাদৃশ্য! প্রথম স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে সরকার তাদের দাদুর বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করেছিল—আর স্বাধীনতার ২৫ তম বার্ষিকীর এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারী আদেশে তাদের নিজেদের এত কষ্টের তৈরী বাড়ী ফেলে রেখে ঘরছাড়া হতে হবে। কাউকে কিছু বলতেও পারছে না, বলতে বারণ করে গেছে।

মনের মধ্যে একটা কথা বারবার ডাক দিচ্ছে। মাত্র কমাস আগে চড়ুইয়ের বাসা ভেঙে তাদের ঘরছাড়া করা হয়েছিল। এটা কি তারই ফল? মানুষটা খুব হুজুগে নাচতে পারে, তখন ভাল মন্দ বিবেচনাও করে না। আর এর মূলে আছেন মঙ্গলা দেবী, কারণ তিনিই পৈতের হুজুগ নিয়ে এসেছিলেন। ছমাসের মধ্যে এসে গেল ঘোর অমঙ্গল সংবাদ। শবু দীননাথের জীবনে বুঝি ঘরে থেকে নিশ্চিন্তে মুখের গ্রাস তোলার দিন শেষ হয়ে গেল মঙ্গলা দেবীর এক উৎসবের ধাক্কায়। সেই জন্যই কি তিনি এসেছিলেন?

রাতে শবু ঘরের বিছানায় বসে শুভা ও তুলুর সঙ্গে গল্প করছে। গাঁঠু অভ্যাসমত চৌকির পাশে মেঝেতে শুয়ে আছে। তুঘরের মাঝের বারান্দায় স্টোভে ভাত বসানো আছে। হঠাৎ ভাতের কথা মনে হতে ধড়মড় করে নামতে গিয়ে শবু গাঁঠুর গায়ের উপর পা দিয়ে ফেলল। গাঁঠুও গ্যাক্ করে পায়ে একটা কামড় বসিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে লাজুকভাবে সবার দিকে তাকাতে লাগল।

তুলু বলল—'কিরে গাঁঠু, মালিককেই কামড় দিলি? কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায়...'

গাঁঠু অপরাধীর মত চোখ তুটো পিটপিট করছে। পাশের ঘর থেকে পড়া ফেলে হাবলু লাঠি হাতে গাঁঠুকে মারতে তেড়ে আসছে দেখে শবু বলল—

'থাক, মারতে হবে না। ছোটবেলায় পিটার আমাদের কত কামড়ে আঁচড়ে দিয়েছে।'

শুভঙ্করী বলল—'না বৌদি, কুকুরে কামড়ানো খুব ভয়ের ব্যাপার। দেখি, রক্ত বেরিয়েছে না কি?'

দেখা গেল তুটো দাঁত বাঁ পায়ের গোড়ালীর কাছে সামান্য একটু বসেছে, একটু একটু রক্তও পড়ছে। শবু চুনের খুঁটি থেকে চুন নিয়ে লাগিয়ে দিতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তুলু শুনল না, জোর করে ডাক্তারখানায় নিয়ে চলল তক্ষুণি। ডাক্তার দেখে বলল—

'কুকুরে কামড়ানোর চিকিৎসা ত আমরা করি না। মেডিক্যাল কলেজে সে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।'

তুলু বলল—'বৌদি, আপনি কাল চিন্থর সঙ্গে হাসপাতালে যাবেন। চিন্থই ত কুকুরটাকে বাড়ীতে এনেছিল।'

কুকুরটাও আর কামড়াবার সময় পেলনা। একদিকে মাথায় তুর্যোগ, আর একদিকে কুকুরে কামড়ানো।

হাসপাতালে বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করল—

'কি হয়েছে?'

'কুকুরে কামড়েছে?'

'কদিন হল কামড়েছে?'

'কাল রাতে।'

'বাড়ীর কুকুর, না রাস্তার কুকুর?

'বাড়ীর কুকুর।'

'কুড়িদিন কুকুরটাকে নজরে নজরে রাখবেন। যদি মরে যায় বা পাগল হয়ে যায় বা পালিয়ে যায় চলে আসবেন, ইঞ্জেকশন নিতে হবে।'

. বলেই পরের রোগীকে সেই একই রকম প্রশ্ন করতে লাগল, কুকুরে কোথায় কামড়েছে তা একবার তাকিয়েও দেখল না। ঘরের আর এক পাশে কিছু লোকের পেটে ইঞ্জেকশন দেয়া চলছে। আউটডোরের টিকিটখানা হাতে করে শবু চিনুর সঙ্গে বাড়ী ফিরল।

দীননাথ দিল্লী থেকে ফিরল আরও দুদিন পরে সকালে। শবুকে কুকুরে কামড়েছে শুনে বলল—

'আমাকে কামড়াল পাগলা কুকুরে আর তোমাকে কামড়াল বাড়ীর কুকুরে। তা এক দিক থেকে সুবিধেই হল, কুকুর দেখিয়ে কিছুদিন ছুটি নিয়ে ঘরে বসে থাকা যাবে। শালারা বলে কিনা দুদিনের মধ্যে জয়েন করতে হবে, গায়ের জোর আর কি! ওখানে যেতেই তিনদিন লাগে। একমাসের আগে আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

ডাকযোগে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে দীননাথ সে রাতে সব কথা শবুকে বলল। সেও সব জানার জন্য উদগ্রীব, মনযোগ দিয়ে সব শুনতে লাগল।

দীননাথ বলল—'বছর খানেক হল এ অফিসে নতুন এক উপরওয়ালা এসেছে, নাম অনঙ্গ ভুষণ চোপদার—সংক্ষেপে এ. বি. সি। লোকটা নিজে উপরওয়ালাদের সব সময় তেল দিচ্ছে—চায় তাকেও সবাই তেল দিক। তাই আড়ালে সবাই চোপদারের নাম দিয়েছে—চাটুকার। এক নম্বরের হারামী আর খচ্চর!

'মিতুর বিয়েতে পাঁচ দিনের ছুটিতে গিয়ে সাতদিন করলাম কেন তার কৈফিয়ত দাও। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। বলল—ওতে চলবে না, সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট চাই। আমার জবাব—আমি নিজে থেকে সি. এস এর কাছে যাব কেন আর অফিস না লিখলে সি. এস্ আমাকে দেখবে কেন? কিছু করতে পারল না।

কিছুদিন আগে অফিসের কো-অপারেটিভের ইলেকশনে সবাই আমাকে চাইল, এ বি সির ইচ্ছাকে বেশীর ভাগই আমল দেয় নি।

'দু দুটো ব্যাপারে হেরে গিয়ে সে ভিতরে ভিতরে ভীষণ প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠল। নিজের ক্ষমতার জোরে আমার ক্ষমতা ও দায়িত্ব খর্ব করতে লাগল—আর সেই নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল।

'সুযোগ মিলে গেল অন্যদিক থেকে। অফিসের একজনকে সন্ধ্যে ছটার সময় ডেকে না পেয়ে পরদিন তার কৈফিয়ত তলব করল। লোকটার নাম কপিল—তুমি তাকে আগে দেখেছ, শেফালীর বিয়েতেও সে এসেছিল। কপিল জবাব দিল—আমি দশটায় আসি সাড়ে পাঁচটায় যাই, অতএব কোন দোষ করিনি। এ বি সি বলল—এখানে আমরা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সময় দিয়ে থাকি অতএব সবাইকে ছটা পর্য্যন্ত থাকতে হবে, এমার্জেন্সী চলছে। কপিল জবাব দিল আমি দশটায় আসব সাড়ে পাঁচটাতেই যাব, আর সেইটাই আইনসম্মত। এ বি সি মানতে রাজী হল না।

'শুরু হয়ে গেল প্রতিরোধ। সবাই এসে আমাকে ধরল—লাহিড়ীবাবু, আমরা আপনাকে কোঅপারেটিভে নেতা করেছি, আপনি এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে আমাদের পথ দেখান। বললাম—সবাই যদি একসঙ্গে লড়তে পার, ভয় ভীতি এমন কি বদলির বিপদেও যদি বিচলিত না হও তবে আইনের পথে চলতে পার, আমি সঙ্গে আছি। আমার পক্ষে সাড়ে দশটায় আসাতেই সুবিধে।

'সেটা বেশীর ভাগের ক্ষেত্রেই সুবিধেজনক। তবু আত্মসম্মানের নামে জেদের বশে সবাই একযোগে বলল—না, আমরা কারো অনুগ্রহ চাই না, আমরা আইনের পথে চলব, কোন হুমকি বা বিপদের ভয়ে আমরা পিছিয়ে আসব না। শুরু হয়ে গেল আইনের লড়াই।

'পনরো দিন ধরে লড়াই চলতে লাগল। চাটুকার রাগে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেল। আজ একে চার্জসীট, কাল ওকে সাসপেণ্ড, পরশু তাকে পদাবনতির ভয় দেখাচ্ছে। সারা ভারতে আমাদের অফিস ছড়িয়ে আছে কোথাও এমন লড়াই হয়নি। কিন্তু দিনদশেক পর থেকেই একজন একজন করে পিছু হটতে লাগল। আসে সব ঠিক দশটাতে—কিন্তু 'আমার আজ একটু কাজ আছে' বলে সাড়ে পাঁচটার পরও থেকে যেতে লাগল। পনরোই আগষ্টের মধ্যে প্রায় অর্ধেক দলছুট হয়ে গেছে।

'চাটুকার সুযোগ বুঝে আমাকে বদলি করার জন্য দিল্লীতে টেলিগ্রাম পাঠাল। আগেও আমার বদলির জন্য লিখেছিল, দিল্লী তা শোনে নি। কিন্তু এবারে দিল্লী না করতে পারল না, আমার অপরাধ যে গুরুতর, উপরওয়ালাকে অমান্য করার জন্য উস্কানি দেওয়া। তিনদিন পরেই বেতারে আমার বদলির অর্ডার এল। আমি অর্ডারটা আসার আগের মুহূর্তেও জানতাম না চাটুকার এতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছে। বদলির অর্ডার পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চার্জ হ্যাণ্ডওভার করে অফিস থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছি—চাটুকারের সঙ্গে

দেখাও করিনি, তার হাতে পায়েও ধরিনি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, অফিসের কেউ আমাকে সহানুভূতি জানাতেও এগিয়ে আসে নি।

'আচ্ছা তুমিই বল, আমার দোষটা কোথায়?'

শবু এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

'তুমি কোন অপরাধ করনি। কিন্তু তোমাকে বোকা পেয়ে সবাই মিলে উপরে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

নিজের বোকামি বুঝতে পারেনা বোকা বুদ্ধিমানেরা। দীননাথও তার বোকামি মেনে নিতে রাজী নয়, বলল—

'ভয় পেয়ে সবাই পিছু হটতে পারে কিন্তু আমাকে ইচ্ছে করে বিপদে ফেলে কার কি স্বার্থ সিদ্ধি হবে? সুবীর চিন্তাহরণ কপিল আমার সাহায্যে প্রোমোশন পেয়েছে, দেবেশ শৈলেশ নিজেদের অক্ষমতার জন্য প্রোমোশন পায়নি। বংশীর চাকরি বাঁচাতে গিয়ে এককালে আমাকে কত নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। গোপেন আমার কতকালের বন্ধু, অলোককে আমিই চাকরি দিয়েছি। সকলেই কম বেশী আমার দ্বারা উপকৃত। তারা ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে বেইমানী করেছে বলতে চাও?'

শবু অফিসের প্রায় সবাইকেই দেখেছে সেই 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকের সময় আর শেফালীর বিয়েতে—দু একজনের সঙ্গে মৌখিক আলাপও আছে। সেই সূত্রে ওদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণাও আছে। বলল—

'কপিল দেবেশ আর শৈলেশবাবুদের আমার প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে নি—ওদের মধ্যে কুটিলতা আছে আমার মনে হয়েছে। সুবীর চিন্তাহরণ বংশী এরা সব ছা পোষা ভালমানুষ। কিন্তু তোমার মুখেই শুনেছি তুমি কলকাতায় বদলি হয়ে আসাতে দেবেশের প্রোমোশনের সুযোগ নষ্ট হয়েছিল। ঐ যে শৈলেশ আর সেই বাকচী যাদের শালীর সঙ্গে ভবর বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল তারা নিরাশ হয়েছে। অলোকের বোনের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, পরে সে বোন মারাও গেছে। এরা সবাই মিলে তোমার শত্রুতা করতে পারে না কি? কপিল হয়েছে শিখণ্ডী। তুমি বড় সরল।'

অফিসের বড় মেজো না হলেও সেজকর্তার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেও দীননাথ এই সব জটিল ব্যাপার তলিয়ে বুঝতে পারে না। শবুর কথায় সে চোখ দুটো বড় বড় করে ভাবতে লাগল, কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছে।

বদলির অর্ডার পাবার সাতদিন পরে আজ মূল চক্রান্ত বুঝতে পেরে দীননাথ

ক্ষোভে হতাশায় মুষড়ে পড়ল। অসহায়ের মত বলতে লাগল—

'আমি কোন অন্যায় কাজ ত করিনি, অফিসের নিয়ম কানুনও ভাঙিনি। তবু চাটুকারের একতরফা রিপোর্টই বহাল থাকবে! দিল্লীর উপরওয়ালা আমার কথা শুনে বলল—আমরা স্থানীয় উপরওয়ালার রিপোর্টই মানব, আপনার কথা যত ন্যায্যই হোক। শেষে ডাক্তারের চিকিৎসার কারণ দেখিয়ে এখনই যাতে বদলি না করা হয় বলে একটা দরখাস্ত তার টেবিলে ফেলে রেখে শূন্যহাতে ফিরে এলাম। দিল্লীতে বড়দাও বলল—এদের উপরের ঠাটবাট সব ঠিকই আছে, কিন্তু কোন সুবিচার পাওয়া যায় না, না হলে আমাকেও এই অসুস্থ অবস্থায় বার বার বদলি করে?

'আর এ সবের মূল চক্রী বোধ হয় অলোক। সে এমনি করে আমার উপর প্রতিশোধ নিল।...না, আমাকে বাধা দিওনা। এতদিন তোমাকে যে কথা বলিনি আজ তাই বলছি, শোন। আগে ওদের গ্রামে আমি একড়বার গেছি, তখন আমার বয়স কুড়ি একুশ। অলোকের বোন সীমার সঙ্গে জানা-শোনা সেই সময়। পরে ওরা রিফিউজী হয়ে কৃষ্ণনগরে আসে। আমি কলকাতা থেকে দু চারবার কৃষ্ণনগরেও গেছি, পূর্বপরিচয় একটু একটু করে পূর্বরাগে পরিণত হচ্ছিল। এক সন্ধ্যায় সীমা ও তার ছোট বোনকে নিয়ে চূর্নি নদীর ধারে বেড়াতে গেছিলাম। সেখানে একদল প্রায় আমার বয়সী ছেলে আমাদের ঘিরে ধরল। তাদের দলের পাণ্ডা আমাদের নৈতিক অপরাধ শোধরাতে মেয়ের গার্জেনদের কাছে ধরে নিয়ে গেল। সেখানে সবার মান বাঁচাতে বললাম—আমি ওকে বিয়ে করব। সেই থেকে দুবাড়ীর সবাই জানত সীমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

'প্রায় বছরখানেক পরে ওদের বাড়ীতে গিয়ে দেখি সেখানে যেন প্রেমের কুঞ্জবন বসে গেছে। নীতি-বাগীশ দলের পাণ্ডাটির সেখানে অবারিত দ্বার—আর সীমা সে কুঞ্জের মক্ষিরাণী। আমি প্রতিবাদ জানিয়ে চলে এলাম, আর কখনো ওমুখো হইনি।

'আমার কি দোষ বল? আমি সৎ ভাবেই বিয়ের কথা বলেছিলাম, ওরা তার কী মূল্য দিল? এতদিনে অলোক তার প্রতিশোধ নিল বোধ হয়।

'এতদিন এসব কথা তোমার কাছে গোপন করে আমি অন্যায় করেছি। একটা অপরাধবোধ এতদিন আমার মাথায় বোঝার মত চেপে বসেছিল। আজ সব কথা বলে বোঝা থেকে হাল্কা হলাম। সব শুনে তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর আমার কিছু বলার নেই। যদি করুণা কর, ক্ষমা কর তবে সেই

হবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

'সেবার জুন মাসে আমি তোমাকে ঘোর অসম্মানের মধ্যে টেনে নামিয়েছিলাম—তোমার আপত্তি শুনিনি। মা আর মাতুলে মিলে বিনা দোষে তোমাকে বারবার যে অপমান করেছে তা থেকে তোমাকে বাঁচাই নি। তুমি দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেঁদেছ, আর আমি থেকেছি নির্বিকার। কেঁদে বলেছ—আমার দুঃখে তুমি কাঁদনা, নির্বিকার থাক, আমার মরে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে তুমি আমার অভাবে কাঁদ কি না। আজ সব দিক থেকেই রিক্ত পরাজিত হয়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে কিন্তু আমার চোখে জল আসে কই ?'

একসঙ্গে অনেক কথা বলে দীননাথ থামল। তাকে বড় অসহায়, কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত লাগছে। শবু এতক্ষণ নীরবে সব কথা শুনছিল। দীননাথ চুপ করলে এবার শবুর মন সরব হয়ে উঠল। এতদিন সে দীননাথের সীমার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিলই শুনেছিল, তার পিছনে যে একটা প্রেমের কাহিনী আছে তা জানত না। সে মেয়েটি পরে মারা গেছে বলে অবশ্য শুনেছে দীননাথের কাছেই। তাই তাকে নিয়ে শবুর কোন মাথাব্যথা ছিল না। বিয়ে হয়ে এসে থেকে সে এবাড়ীতে জবা, করবী, মহী, শেফালী, ভব, সোনার প্রেমের কথা শুনে ও দেখে আসছে, শাশুড়ী ঠাকরুনের কথাও শুনেছে ও দেখেছে। ভেবেছিল বাকিরা বোধ হয় অন্য রকম। বড় ভাসুর গুরুজন, তার কথা সে জানে না। কিন্তু দীননাথও দেখা যাচ্ছে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। একমাত্র মেজোভাসুর বিশ্বনাথই ছিল সব দিক থেকে খাঁটি।

তবু ঘৃণা করার কথায় তার মন করুণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। স্বামীকে ঘৃণা অশ্রদ্ধা করার শিক্ষা সে পায়নি, তা সে যত অন্যায়ই করুক। এতবছর একসঙ্গে ঘর করছে, তাদের ভালবাসায়, সুসম্পর্কে ত কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। এই মানুষটাকে ঘিরেই তার সংসার, তার ভবিষ্যৎ। সেই মানুষ আত্মগ্লানিতে জলে পুড়ে এমনভাবে ছটফট করছে দেখে সে স্থির থাকতে পারে না। স্বামীকে যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কোমল স্বরে বলল—

'তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি কাঁদবে কেন ? তুমি যেমন লোকের উপকার করেছ তেমনি অন্যায়ের কাছেও মাথা নোয়াও নি। তুমি আমার বীরের মত 'ব' আমার আদরের 'ব'। বদলি করেছে ত কি হয়েছে ? আমরা দুটি প্রাণী হাত ধরে চলে যাব নতুন জায়গায়, শুরু করব নতুন জীবন। এ কলকাতা আমার কোন দিনই ভাল লাগে না। তার উপরে আছে নানা দুর্ব্যবহার

আর অপমানের স্মৃতি। একমাত্র টান এই বাড়ীটা—শুধু এরই জন্য সব দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা সয়ে মুখ বুজে পড়ে আছি। বাড়ীটাকে মনে হয় যেন আমাদের অস্থি-মজ্জা রক্ত-মাংস। দূরে গিয়ে আমরা সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব, শুধু বাড়ীটার টানে আমরা মাঝে মাঝে এখানে আসব।'

শবু আজ নীলকণ্ঠ। সংসারের সব জ্বালা যন্ত্রণা অপমান দুর্ব্যবহার, দীননাথের অতীত ইতিহাস সব কিছু কণ্ঠে ধারণ করে সে আজ নীলকণ্ঠ। তার উপর আছে নারী হৃদয়ের অপূর্ণতার শূন্যতা। অদ্ভুত স্মৃতি শক্তি তাকে কিছু ভুলতে দেয় না। তিল তিল করে সে বুঝি জ্বলে পুড়ে মরবে। নিজের মনের অশান্তি অতৃপ্তি, স্বামীর মনের দুঃখের বোঝা সব নিজের মাথায় বয়ে বেড়াবে সারাজীবন, যা একমুহূর্ত তাকে শান্তি পেতে দেবে না। একটাই আশা—যদি দূরে গিয়ে সব কিছু ভুলে থাকা যায়, যদি মুক্তি পাওয়া যায় দেহে ও মনে।

চার

মুক্তি চাইলেই কি এক কথায় মনকে মুক্ত করা যায়? এত কষ্টের বাড়ী ঘর ফেলে যেতে হবে সে কোন দূরে পাহাড়ের রাজ্যে। সেখানে কোন চেনাজানা মানুষ নেই। এখানে ক'বছরে একটা পরিচিত পরিবেশ গড়ে উঠেছে। নিকটতম প্রতিবেশিনী কুমার মা, হারাণীদি, রায় গিন্নী, চক্কোত্তি গিন্নী, মনোহর বাবুর বৌ-ও বোন, বাঙালবৌ,—সবাই অনেক বছরের পরিচিত সুখ দুঃখের সাথী। কতদিনের জন্য সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে।

এখন আর বদলির কথা কাউকে জানাতে বাধা নেই, যেতে ত হবেই।

শুনে সব থেকে পুরোনো প্রতিবেশিনীরা দুঃখ করে বলতে লাগল—'এত সাধের তৈরী বাড়ীটা ফেলে রেখে যাবেন? পাঁচ ছ বছর আগে মাঠের মধ্যে প্রথম বাড়ী করে এসে আপনাকে দেখতাম—একটা ফুটফুটে বৌ লালপাড় শাড়ী পরে হাতে ফ্যানের বালতি নিয়ে খালি পায়ে ভাড়া বাড়ী থেকে কুঁড়ে ঘরটাতে আসা যাওয়া করত। সেই থেকে আলাপ, পরিচয়, মেলামেশা। আপনি চলে গেলে আমাদেরও খুব খারাপ লাগবে।'

শুভার মা—মাসীমা, শুনে বললেন—

'শ্রাবণী মাগো, তোমাদের ভরসাতে এখানে থাকা, সেই তোমরাই বাড়ী-

ঘর ফেলে চলে যাচ্ছ, আমরা আর কার ভরসায় এখানে থাকব ?'

শুভা বলল—'বৌদি, শেফালীর পরিচয়ে এখানে আসা, সে বিয়ে হয়ে চলে গেল, সেজদা ছিলেন গার্জেনএর মত তিনিও থাকবেন না। আমরা তবে আবার মামাদের বাড়ীর কাছাকাছিই চলে যাব। হাজার হোক নিজের মামা ত।'

সঙ্কট যেমন শুভঙ্করীদের তেমনি বিপদ মামীমারও। মামীমা বললেন—

'সেজভাগ্নের ভরসাতে অসুস্থ স্বামী আর তিন নাবালক ছেলেকে নিয়ে এখানে ঘর বাঁধলাম। স্বামী হল নিরুদ্দেশ, তার পেনসনও বন্ধ। তুলু যা হোক একটা ভাল চাকরি পেয়েছে। কিন্তু তোমরা গেলে আমরা অভিভাবক কোথায় পাব, কার কাছে এসে সুখ দুঃখের কথা বলব, সেবারের মত অসুখ করলে কে আমাদের দেখবে ? তোমরাই বা নিজেদের সন্তানতুল্য বাড়ীটা ফেলে যাবে কি করে ?'

মামীমা কাঁদছেন নিজের দুঃখে, শবুদের দুঃখে। শবু কাঁদছে সকলের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের বিষণ্নতায়।

এমন কি শ্যামা ঝিও শুনে বলল—

'বৌদি, তোমরা চলে গেলে আমরাও আর এখানে থাকব না। মেয়েটাকে নিয়ে নবদ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেব।'

কিছুদিন আগে মা সাবধান করে দিয়েছিলেন—শবু, সামনে তোর জন্ম মাস, একটা বছর খুব সাবধানে থাকবি। মা যে বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন সে কি এই, না এর চাইতেও ভয়ঙ্কর কিছু ? শ্রাবণ গিয়ে ভাদ্র পড়েছে। বিপদের শুরু হল কি ?

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শবু মাকে চিঠি লিখল—মাগো, একমাসের মধ্যে আমরা বাড়ী ছেড়ে বহুদূরে শিলংএর পাহাড়ে চলে যাব। তোমাদের জামাইকে অন্যায়ভাবে বদলি করে দিয়েছে। একে এত সাধের বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে তার উপর অফিসের অন্যায় জুলুমে তোমার জামাই পাগলের মত হয়ে গেছে, দিনরাত জপ করছে—চাকরি ছেড়ে দেব, চাকরি ছেড়ে দেব। বলছে—স্কুল মাস্টারী করব, ট্যুইশনি করব তবু আর একদিনও এ চাকরিতে থাকার ইচ্ছে নেই। আমি কিছু কূল কিনারা পাচ্ছিনা। না হয় দূরেই গেলাম কিন্তু বাড়ীটার কি হবে ? মাগো, এতদিন তোমাদের থেকে দূরে ছিলাম বটে কিন্তু দরকারে এক রাতের মধ্যেই তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছানো যেত, তোমরাও আসতে। এখন যে চারদিন লাগবে আসতে বা

যেতে। কবে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে জানিনা, সামনের পুজোতে তোমাদের কাছে যাবার কথা ছিল সে ত হবেই না। সবার বড় চিন্তা মনের এই অবস্থায় মানুষটাকে সামলাব কি করে? বাবাকে সব কথা জানিও। বিদেশে বিপদ আপদের আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছে…।

চিঠি লেখা শেষ করে অভ্যাসমত শবু দীননাথকে পড়তে দিল। পড়ে সে বলল—'ঠিকই আছে, তবে আমার কথা অতটা না লিখলেই পারতে।'

'আহা, নিজে দিনরাত ঐ সব কথা জপ করতে পার আর আমি লিখলেই দোষ?' শবুর কণ্ঠে অনুযোগ ফুটে উঠল।

দীননাথ মা মঙ্গলা দেবীকেও বদলির খবর দিয়ে চিঠি দিল।

কদিনের মধ্যে অফিস থেকে দুজন লোক এল ভর দুপুরে। দীননাথ বলল একজন ঠাকুর অন্যজন দেবতা। কি জানি কেমন ধারা নাম—তবে শেফালীর বিয়েতে শবু তাদেরকে দেখেছে।

তারা দীননাথের প্রতি অন্যায় হয়েছে বলে মুখে খুব সহানুভূতি জানিয়ে অফিসের কিছু কাজ বুঝে নিল। দীননাথও অফিসের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে কাজ বুঝিয়ে চা খাইয়ে দুজনকে বিদায় করল। তারা চলে গেলে সে বলল—

'সব শালা হারামীর বাচ্চা! যেমন চাটুকার তেমন তার চেলারা!'

একদিন চেৎলায় গেল দুজনে দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে যাবার আগে দেখা করতে। দিদি কিছু শুনে বলল—

'নিজেদের বাড়ী ফেলে রেখে কি করে যাবি শবু? এই স্তাখ না, আমাদের ইন্সটলমেণ্টে একটা জমি কেনা ঠিক হয়েছে আর সেই থেকে একটা খনার বচনের বই কিনেছি কখন কি গাছ লাগাতে হয় জানতে। আর তোরা সাজানো বাড়ী ফেলে যাচ্ছিস!'

সুশীল বলল—'ইস্ শবু, তোমরা চলে যাচ্ছো—ভাবছিলুম একদিন গিয়ে তোমাদের বাড়ীটা দেখে আসবো।'

অভিমানের সুরে শবু বলল—'এতদিন গেলেন না, এখন ত আমরা চলেই যাচ্ছি। আর গিয়ে কি হবে?'

সোদপুরে বড় বৌদি বীণার সঙ্গে দেখা করতে গেলে বীণা সব শুনে বলল—

'তোমাদেরও বদলি হল! আমার ও সব এখন গা-সহা হয়ে গেছে—

তোমার ভাসুরকে ত কমবার বদলি করল না ? কম জায়গায় ঘুরলাম না। এখন বাড়ীটা হয়েছে বলে এখানেই আছি। তা শ্রাবণী আমি বেশ ভালই আছি। তোমার ভাসুর টাকা পাঠাচ্ছে, ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করছে, পাড়ার ছেলেরা আমাদের দেখছে আর আমরা সপ্তাহে দুটো তিনটে করে সিনেমা দেখছি। বেশ আনন্দেই আছি।'

বলতে বলতে হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বড় বৌদি সুখেও হাসে দুঃখেও হাসে।

শেষে একটা কাজের কথা বলল—'ওদিককার জল খুব খারাপ—আমি ত কিছুদিন নাগাল্যাণ্ডে থেকে এসেছি, তাই জানি। কারো পেটে সহ্য হয় না। সব সময় জল ফুটিয়ে খাবে।'

সব শেষে ষষ্ঠীতলায়। বাড়ীর দরজাতেই বাবুলালের সাদর আমন্ত্রণ—

'মেজদি এসেছিস, খাব্‌বি ত ?'

যতবার শবুরা আসে বাবুলালের এক অনুরোধ 'মেজদি, খাব্‌বিত ?' 'মেজদি আজকে থেকে যা।' প্রত্যেকবারই শবুকে বলতে হয় থাকব—আবার যথাসময়ে চলে আসতে হয়। অবোধ ভাইটা অল্পেতেই খুশি হয়। এবারে আর শবু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না, বলল—

'না ভাই, থাকতে পারব না, আমরা যে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি।'

বাবুলাল সে কথা বোঝেনা। কথাটা কানে যেতে ছোটকাকা অবিনাশ বাবু জিজ্ঞেস করলেন—

'দূরে চলে যাচ্ছিস মানে ? কোথায় যাচ্ছিস ?'

দীননাথ বলল—'আমাকে শিলং এ বদলি করেছে, শিগগীরই যেতে হবে।'

ছোটকাকা বললেন—'আসামের রাজধানী শিলং বেশ সুন্দর জায়গা। আমাদের অফিস থেকেও মাঝে মাঝে আসাম সফরে যেতে হয়—শিবসাগর, ডিব্রুগড়। এই মাসেই আমার একবার যাবার কথা ছিল, কিন্তু যাবনা বলে দিয়েছি। আমার বদলে অন্যলোক যাবে।'

ঠাকুমা শুনেই বললেন—'নতুন বাড়ী করলি, বাড়ী ফেলে রেখে যাবি ? বাড়ীটার কি হবে ? নিজেদের বাড়ী ছেড়ে যাওয়া যে কত কষ্ট !'

ঠাকুমার দরদী কথায় শবুর চোখে জল নেমে এল। কাকা ঠাকুমাকে ধমক দিলেন—

'দিলে ত মেয়েটাকে কাঁদিয়ে ? বদলির চাকরি, কি করবে ? আমি সেই জন্য আসামের গল্প করছিলাম যাতে ওর মন খারাপ না লাগে। জানিস

শবু, পাঁচুদা এখন গৌহাটির কাছে আলুকবাড়ীতে থাকে রেলে কাজ করে, গিয়ে দেখা করিস।'

কাকীমা আদর করে শবুকে কাছে টেনে নিলেন সেই পাঁচ বছরের ছোট্ট শবুর মত, বললেন—

'আহা, কান্নার আর দোষ কি? কথাটা শুনে আমারই কান্না পাচ্ছে। মেয়েটা কত বছরের জন্য বাইরে যাচ্ছে।'

ঠাকুমা চোখ দুটো পিট পিট করে বললেন—

'বদলির চাকরি মানতেই হয়, তাই বলে এত দূরে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে!'

খবর শুনে শ্রীলা এলা পুটু নীলা বেলা সবাই দুঃখিত হয়ে শবুকে ঘিরে বসল। কোন বোধ নেই বাবুলালের—সে দীননাথকে বলতে লাগল -

'জামাবাবু, গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে চলুন। ওরা আমাকে বেড়াতে নিয়ে যায় না—আমার বুদ্ধি নাই তো।'

শবুরা এলেই ওদের বেড়াতে যাওয়া হয়, সিনেমা সার্কাসও দেখা হয়—শবুদেরও এখানে জামাইষষ্ঠী ও নানা পালপার্বণে নেমন্তন্ন বাঁধা। তাই শবুদের আগমনেই এ বাড়ীতে একটা আনন্দের কলরব জেগে ওঠে—এবার গঙ্গার ধার, কিম্বা নৌকোয় পার হয়ে বেলুড়ে নয়ত বাসে করে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হবে। শ্রীলা থেকে বেলা পর্যন্ত সবাই খুশি হয়ে ওঠে।

কিন্তু সব থেকে খুশি হয় বুঝি বাবুলাল, তার মাথায় বুদ্ধি নেই বলে কেউ তাকে বেড়াতে নিয়ে যায় না, শুধু মেজদি জামাইবাবু এলে তার সে সুযোগ ঘটে। রিক্সায় উঠে বা নৌকোয় বসে বা বাসে চড়ে বাবুলালের অবোধ মনের সব আনন্দ প্রকাশ পায় দেহের কাঁপুনিতে—হেসে আনন্দে চারদিক তাকিয়ে দেখে আর বারে বারে খুশিতে কেঁপে ওঠে। একটা অতিরিক্ত স্নেহ মমতায় শবুর মন ভরে ওঠে বাবুলালের জন্য—সে যে ভাবুলালের জুড়ি ছিল, আর নন্দু-ও যে আজ প্রায় ওরই মত অবোধ!

আজ সেই হাসি আনন্দ, কলরব আর তেমন জমল না। এক সময় বিষণ্ণ মনে শবুরা ঠাকুমা কাকা কাকীমাকে প্রণাম করে বাড়ী রওনা হল—ঠাকুমা কাকীমা 'দুর্গা দুর্গা' উচ্চারণ করলেন।

শ্রীলা বলল—'মেজদি, তোরা রওনা হবার দিন আমরা তোদের সঙ্গে শিয়ালদা ষ্টেশন পর্যন্ত যাব।'

'আসিস।'

পাঁচ

মা পদ্মিনী দেবীকে লেখা চিঠির উত্তর এসেছে। খুব তাড়াতাড়িই উত্তর দিয়েছেন। মা লিখেছেন—

মা শবু, তোর চিঠিতে সব জেনে আমি কেঁদে বাঁচিনা। 'সে'-ও খুব মর্মাহত। 'সে' তোদের বাড়ীটার দ্বিতীয় ছবি দেখেছিল—আমি ত নিজে দেখে এসেছি, থেকেও এসেছি। 'সে' দুঃখ করে বলছিল—কি সুন্দর ছোট্ট-খাট্ট ছবির মত বাড়ীটা করেছিল শবুরা কত সাধ করে, সেটা ফেলে রেখে অত দূর দেশে যেতে হবে! আমার আরো দুঃখ, কত দূরে চলে যাবি, এক ডাকে আসা যাওয়া করা যাবেনা।

—দীনুকে বলবি, ধীর স্থির ভাবে সব দিক ভেবে চিন্তে যেন যা করার করে। হঠাৎ রাগের মাথায় কাজ ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। কত লোকই ত নিজেদের বাড়ী ঘর ছেড়ে বিদেশে চাকরি করে। এ চাকরি ছেড়ে যে চাকরিই করুক সেও ত পরের চাকরি—অন্যায় অবিচার সেখানেও হতে পারে। তাই বলি, এত বছরের চাকরি এক কথায় ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সে ত লেখাপড়া জানা, বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে, এ সব কথা যেন একটু ভেবে দেখে।

—দূরে, বিদেশে যাবি খুব সাবধানে থাকবি। বিপদ আপদ যাই আসুক মা ষষ্ঠীর কাছে প্রার্থনা করি তোদের দুজনকে যেন নিরাপদে রাখেন, আবার তোরা মায়ের কোলে ফিরে আসিস। আমাদেরও বয়স হচ্ছে, কে আগে আর কে পরে যাবে তার ঠিক নেই। যদি আগে যাই, নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করব ঠিকই, কিন্তু নন্দুর কথা মনে হলে সে যাওয়াতেও শান্তি পাব না।

—কানাই তপু তোদের অতদূরে যাবার কথা শুনে দুঃখে মনমরা। এখন বললেই আর এক কথায় মেজদির কাছে যাওয়া যাবে না। পথে ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করিস। আমাদের আশীর্ব্বাদ রইল। রওনা হবার আগে, আবার পৌঁছেই, চিঠি দিস···।

চিঠি পড়ে আর শবু কাঁদে। এখন থেকে দূর বিদেশে মার চিঠি, মার হাতের লেখা হবে একমাত্র পাথেয়, অমূল্য সম্পদ। তার আশ্চর্য্য লাগে, মা সেই কোন ছোট বেলায় অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে এসেছিল—গ্রামের মানুষ, বেশী লেখা

পড়ার সুযোগ পায় নি। তবু মার হাতের লেখা অক্ষরগুলো কি সুন্দর, গোটা গোটা, স্পষ্ট—দেখলে মনে হয় যেন স্বয়ং মা চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শবু ত কিছু লেখাপড়া করেছে, তবু হাতের লেখার দিক থেকে সে মার কাছে চিরশিশু।

অনেক সময় মা নিজে হাতে চিঠি লিখতে পারে না—সাধারণত কানাই বা তপুকে দিয়ে লেখায়। দিদি কিম্বা বোন মিতুকেও মা ওদের দিয়ে চিঠি লেখায়। কিন্তু শবু মাকে বলেছে—মাগো, তোমার হাতের লেখা একটা অক্ষরও যদি চিঠিতে না থাকে তবে সে চিঠি তোমার চিঠি বলেই মনে হয় না, আমাকে তুমি সব সময় নিজে হাতে চিঠি লিখবে—তবে বুঝব তুমি ভাল আছ, তবেই আমার ভাল লাগবে।

আদুরে মেয়ের আব্দার মা কিছুতে ফেলতে পারেন না, আর সবার বেলায় যেমন তেমন শবুর বেলায় নিজে হাতে কলম ধরবেই শত কাজ শত অসুবিধে থাকলেও। মাকে কাগজ কলম নিয়ে বসতে দেখলেই কানাই মাকে রাগায়—

'মা, কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, নিশ্চয়ই তোমার আদরের মেজো মেয়েকে?'

মা-ও ছেলেমানুষের মত ঝগড়া করেন—'বেশ ত।'

কানাই আবার বলে—'আমিও ত এত বছর বরানগরে ছিলাম, আমাকে তুমি নিজে হাতে কখানা চিঠি লিখেছ? সব ত ছোড়দিকে দিয়ে লিখিয়েছ।'

মা জবাব দেন—'তুই ত আর পরের ঘর করতে যাস নি—সে তুই বুঝবি না।'

কানাই তর্ক তোলে—'বুঝে কাজ নেই। বড়দি ছোড়দিও ত পরের ঘর করে, তাদের বেলায়?'

কানাই বলে বলে হার মেনেছে, মাতে আর মেজদিতে এমন একটা সম্পর্ক, তার মধ্যে আর কেউ নাক গলাতে পারবে না। সব তর্ক ভেসে যায়—মা ও শবুর স্নেহের কাছে সব কিছু হার মানে।

দীননাথকে চিঠিটা পড়তে দিয়ে পড়া শেষ হলে শবু জিজ্ঞেস করল—

'মা চাকরি ছাড়ার কথায় কি লিখেছে, দেখেছ? কি করবে?'

'ভেবে দেখি।'

যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। টিকিট কাটা হয়েছে—সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এক শুক্রবারে শিয়ালদা থেকে ওদের ট্রেন ছাড়বে—দার্জিলিং মেল। বদলিতে যাচ্ছে তাই প্রথম শ্রেণীর টিকিট একটা কুপেতে লোয়ার আর আপার বার্থ।

শবু জিজ্ঞেস করল—'তোমাকে নাকি দুদিনের মধ্যে যেতে বলেছিল আর যাচ্ছ একমাস পরে কিছু হবে না ত ?'

দীননাথ বলল—'আমি ত লাগেজ নই যে পার্শেল করে দিল আর চলে গেলাম। আমি মানুষ। দেখি শালারা কতদূর কি করতে পারে।'

আজকাল দীননাথের মুখে সব সময় ঐ সব ভাষা—অফিসের সবাই তার বৈবাহিক সম্পর্কের ছোট ভাই কিম্বা শুকরছানাতুল্য।

এবারে চিঠি এল কাটিহার থেকে। মা মঙ্গলা দেবী লিখেছেন—

সরকারি চাকরিতে বদলি আছেই। এতে ভাবনার কি আছে ? হৃদি মহী ভবা সোনা সবাই ত বারবার বদলি হচ্ছে—কেউ কি এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে আছে ? বাড়ীর জন্য ভাবনা কি ? তবে আমরা আছি কি করতে ? জবার ছেলে ভোলাকে এখানে এনেছিলাম ইস্কুলে ভর্ত্তিও করা হয়েছে কিন্তু খোট্টাদের দেশে লেখাপড়ার যা হাল দেখছি তাতে এখানে না পড়ানোই ভাল ঠিক করেছি ভোলাকে চাঁপাতলার কোন স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করে দেব। এখানে সব ব্যবস্থা করে যেতে আমার মাসখানেক সময় লাগ্‌ব। হাবলু ত ওখানে আছে সামনের বছর ওর পরীক্ষা সে কিছুদিন বাড়ীটা দেখে শুনে রাখুক তারপরে আমরা গিয়ে পড়ছি। ভবাকে বলেছি এবার চেষ্টা চরিত্র করে কলকাতায় বদলি নিতে…।

দীননাথ চিঠি পড়ে বলল—'মা আসবে, আবার সেই মাতুল পরিবেশ তৈরী হবে। কি ভেবেছিলাম আর কি হতে যাচ্ছে। তবু একদিক থেকে ভাল যে ভাড়াটে বসাতে হচ্ছে না। বাড়ীটাত আর খালি ফেলে রাখা যায় না। আবার যখন বদলি হয়ে আসব তখন নিশ্চিন্তে বাড়ীতে ঢুকতে পারব, বাস করতে পারব।'

শবুর মনে দুশ্চিন্তা সেইখানেই। একদিন তারা ফিরে আসবে নিশ্চয়ই তখন কি আবার শান্তিতে এখানে বাস করতে পারবে ? যে মানুষ নিজে থেকে শাপ শাপান্ত করে এ বাড়ীতে থাকবে না প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলে গেল সেই মানুষ কি অত সহজে শবুকে নিশ্চিন্তে তিষ্ঠোতে দেবে। যদি তাই হ'ত তবে দেরী না করে তারা যাবার আগেই চলে আসত। একমাস দেরী করে আসা মানে শবুরা থাকতে তিনি আসবেন না—একই আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের সহাবস্থান দেখা যায় না।

মঙ্গলা দেবীর চিঠির ছত্রে ছত্রে যেন ফুটে উঠেছে এক চাপা আনন্দ। ছেলেকে দূরে বদলি করে দিয়েছে তার জন্য কোন দুঃখ বা সমবেদনা নেই।

ওদিকে ভবকে বদলি করিয়ে আনার জন্ম প্রচণ্ড আগ্রহ। এখন ত খুব ভাল-মানুষী দেখাচ্ছেন, পরে যে তিনি কি রূপ ধরবেন তা কে জানে। দীননাথের বোকামি আর ভালমানুষীর জন্ম আজ তাদেরকে ঘরছাড়া হতে হচ্ছে—কত কাল যে এ দুর্ভোগ চলবে জানা নেই—আর শবুকেও সেই সঙ্গে নাকানি চুবানি খেতে হবে। এই বোকামির মাশুল হিসেবে আরও কত খেসারত দিতে হবে তা শুধু ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মঙ্গলা দেবীর ধূমকেতুর মত আসা যাওয়া ও চড়ুইয়ের বাসা ভাঙার কথা। তিনি এসেছিলেন গত শীতের শেষে আর এখন সবে শরতের শুরু। মাত্র ছমাস—তার মধ্যেই শবুদের ঘরছাড়া হতে হচ্ছে।

এর পাশে মা পদ্মিনী দেবীর চিঠিখানি যেন স্নেহ সমবেদনার ঝর্ণাধারা। কত আকুলতা কত শুভেচ্ছায় ভরা। দুই মায়ের ব্যবহারে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য!

বাক্স গোছাতে বসে শবু পড়ে গেছে বিপদে। মাত্র খান বারো শাড়ী তার সম্বল। তার মধ্যে দুখানা ত বাসি বিয়ে ও ফুলশয্যার, একটা ঠাকুমার দেওয়া বেনারসী—এসব শুধু বাক্সেই থাকে। দুখানা পরার শাড়ী এখন প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। বাকি সাত খানার মধ্যে তিনখানা বাড়িতে পরার। মাত্র চারখানা শাড়ী নিয়ে বিদেশে কি করে চলবে? সেগুলো তেমন কিছু ভালও নয়। শুনেছে ওখানে নাকি খুব শীত কিন্তু তেমন গরম পোষাকও তাদের নেই। দীননাথের একটা হাত কাটা সোয়েটার ও মাফলার আর শবুর একটা হাফহাতা উলের ব্লাউজ ও একটা স্কার্ফ। নাই একটা শাল বা কম্বল একটির বেশী দুটি লেপও নেই। শবু দীননাথকে বলল—

'শুনছো, ওখানে নাকি খুব শীত। আমাদের কি হবে?'

দীননাথ বলল—'আগে যাই ত, তারপরে কি লাগে দেখেশুনে কিনে নিলেই হবে। আগে থেকে কি করে বুঝব কি লাগে আর কি না লাগে। বেশী মালপত্রও নেব না, অনেক দূরের পথ।'

ফার্নিচার কিছু যাবে না। বিরাট দুটো বাক্সে কাপড় জামা, বাসন পত্তর কিছু আর রান্নার স্টোভ। লেপ তোষক বালিশ চাদর নিয়ে বিশাল একখানা বেডিং। একটা হোল্ড-অলও নেই, আর থাকলেও অতবড় বিছানা তাতে ধরত না। বিয়ের শতরঞ্চীটা বাইরে চাকরি করতে যাবার সময় ভব না সোনা কে যেন নিয়ে গেছে। খুঁজে পেতে একটা পুরোনো শতরঞ্চী পাওয়া গেছে,

তাই দিয়ে জড়িয়ে কোন রকমে বিছানাটা বাঁধা হবে। আর হ্যাঁ, মেজদা বিশ্বনাথের হাতের তৈরী রেডিওটা, যেটা মাত্র কমাস আগে প্রায় একশ টাকা দিয়ে সারিয়ে এনেছিল, সেটা সঙ্গে যাবে। ওটাই হবে বিদেশে ওদের সব সময়ের সঙ্গী, কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র। সব প্রস্তুতি শেষ। দিল্লী থেকে দয়া করে দীননাথের দরখাস্তের জবাবও এসে গেছে, বদলি বহাল।

বিদায়ী শুক্রবারের সকাল। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা নয়, এ যেন রাম সীতার বনবাস। সাজানো বাড়ীঘর ফেলে রেখে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা। শুভঙ্করী আজ স্কুলে যাবে না, সকাল সকাল শবুদের জন্য রান্না করে দেবে। সকাল দশটার মধ্যে দীননাথ আর শবু খেয়ে দেয়ে প্রস্তুত। ষষ্ঠীতলা থেকে শ্রীলা ও এলা এসেছে শিয়ালদা পর্যন্ত সঙ্গ দিতে। এসেছেন মামীমা সঙ্গে তাঁর তিন ছেলে। পাশে আছেন মাসীমা—শুভঙ্করীর মা। হাবলু গেছে রিক্সা ডাকতে। শ্যামা শেষদিনের মত বাসন মেজে ধুয়ে মুছে ঘর দোর পরিষ্কার করছে।

হারাণীদি, চক্কোত্তিগিন্নী, রায় গিন্নী, রুমার মা, বিনোদবাবু ও মনোহর বাবুর স্ত্রীরা এসে এসে চোখের জলে বিদায় জানিয়ে গেল। তিনখানা রিক্সা এসেছে, সবাই ধরাধরি করে তাতে মালপত্র উঠাচ্ছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা।

যাবার আগে শবু শেষবারের মত বাড়ীটাকে দেখতে লাগল। শোবার ঘরের মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, দু ঘরের চৌকাঠে প্রণাম জানাল। কলতলাকেও একটা প্রণাম করল। নারকেল ও সুপুরী গাছগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর করল। এর মধ্যেই বেশ কিছু গাছের সুপরী সে খেয়েছে, বড় নারকেল গাছটায় হয়ত পরের বর্ষায় ফল ধরবে। একটা ভাল লাগা আমের আঁঠি লাগান হয়েছিল তা থেকে গাছ বেরিয়ে একটু একটু করে বড় হচ্ছে। সব শেষে শবু বাস্তুভিটের উদ্দেশ্যে উঠোনের মাঝখানে প্রণাম করল—এটা যে তার শ্বশুরের ভিটে। মনে পড়ছে ঠাকুমার হাত ধরে দাদুর তৈরী পুরোনো বাড়ী ছেড়ে চলে আসার কথা। সে যাওয়া আর এ যাওয়া এক নয়—তবু ত নিজেদের বাড়ী ছেড়ে যাওয়া—বেদনায় বুকের ভিতরটা টন টন করছে, দু চোখে নেমেছে অশ্রুধারা।

আর আছে অবলা জীব গাঁঠু, অনেক দিনের সঙ্গী। শবু চিনুকে বলল—
'চিনু, গাঁঠুকে তুমি নিয়ে এসেছিলে, তুমিই ওর খোঁজ খবর কোরো।'

'আসি মামীমা' 'আসি মাসীমা' বলে প্রণাম করতে করতে আবার শবু চোখের জলে ভাসতে লাগল। বেদনায় ও চোখের জলে তাঁদের মুখে কথা যোগালো না কিছুক্ষণ। তুলু চিনু ভুলু হাবলু ও সব শেষে শুভা শবুকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। শুভাও কাঁদছে। কাঁদছে শ্যামা। দীননাথ ধরা গলায় কোন রকমে মামীমাকে শুধু বলল—

'মামীমা, বাড়ীটা রইল, দেখবেন।'

'দেখব ভাগ্নে, আপনারা পৌঁছে চিঠি দেবেন।'

চারজনে তিনটে রিক্সায় মালপত্র সহ উঠে বসল। মামীমা, মাসীমা, চক্কোত্তি গিন্নী, দুর্গা নাম স্মরণ করলেন—রিক্সা চলতে আরম্ভ করল। অবুঝ গাঁঠু সবার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে অনুচ্চস্বরে বুঝি একবার কেঁদে উঠল—তারপর মাটি শুঁকতে শুঁকতে রিক্সার পিছন পিছন চলতে লাগল, কিন্তু সে আর কতদূর যাবে তার সীমানা ত বেশীদূর নয়।

যতদূর দেখা যায় দীননাথ আর শবু রিক্সা থেকে ফিরে ফিরে নিজেদের বাড়ীটাকে দেখতে লাগল—বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ীর গেটের সামনে তখন দাঁড়িয়ে আছেন মামীমা, মাসীমা, শুভঙ্করী, তুলু, চিনু ভুলু শ্যামা আর হাবলু—গাঁঠু কিছুটা দূর এসে একখানে দাঁড়িয়ে পড়ে করুণ চোখে শবুদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ীটা চোখের আড়াল হয়ে যেতে শবুর মনে হচ্ছে বুকটা বুঝি ভেঙে গেল। পাড়ার দীননাথের বন্ধুরা ততক্ষণে যে যার অফিসে চলে গেছে, শুধু মোড়ের মাথায় মুদিখানার মালিক লক্ষ্মীকান্ত ওদের মালপত্তর নিয়ে যেতে দেখে দরদী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—

'লাহিড়ীবাবু চললেন ?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

এক সময় ভগ্নবুকে শিয়ালদায় এসে ওরা নির্দিষ্ট কূপেতে উঠে বসল। বাইরে দরজায় কাগজের লেবেল আঁটা—মিঃ ডি লাহিড়ী, মিসেস এস্ লাহিড়ী। ষ্টেশনে শেফালী ও কাঞ্চনও উপস্থিত শবুদেরকে বিদায় জানাতে।

কাঞ্চন বলল—'সেজদা—সেজবৌদি, আপনারা বাড়ীর জন্য চিন্তা করবেন না, আমরা ত কাছাকাছি রইলাম।'

বিদায় কালে কাঁদল শ্রীলা এলা শেফালী—আর শ্রাবণীর চোখে ত শ্রাবণের ধারা বয়ে চলেছে। দীননাথের চোখে জল নেই, তাকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। বোঝা গেল যখন সে বলল—

'কাঞ্চন শেফালী শ্রীলা এলা—তোরা এবার নীচে যা, গাড়ী ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।'

কথা ত নয় যেন কান্নার নামান্তর, শেষ দিকটায় তার গলার স্বর বুজে এল।

সিটি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। বিদায় চাঁপাতলা—বিদায় কলকাতা—বিদায় বাংলাদেশ। জীবনে এই প্রথম শবুরা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশে উঠেছে কিন্তু তার জন্য মনে এতটুকু আনন্দ জাগছে না। একটা কুপেতে তারা দুজন একা। মনে হচ্ছে আজ থেকে বুঝি শুরু হল তাদের ভেসে বেড়াবার পালা—এখন যেমন তারা ট্রেনের কামরায় ভেসে চলেছে গতির পাখায় ভর করে। দীননাথ বলেছে প্রথমে গাড়ী দাঁড়াবে দক্ষিণেশ্বরে তারপর বর্দ্ধমানে আর বোলপুরে। এই টুকু পর্য্যন্ত শবুর চেনা জানার গণ্ডী। তারপরে গাড়ি পাড়ি দেবে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যেখানে শবু বা দীননাথ কেউ কোনদিন যায়নি।

শুরু হল ভেসে চলা—কত দিনের জন্য জানা নেই। সামনে কি ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদ আপদ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তাও অজানা।



দ্বিতীয় অধ্যায়

পর্ব—১

এক

মাঝখানে কেটে গেছে বারো বছর—একটি যুগ।

রামায়ণে আছে চতুর্দশ বৎসর বনবাসের কথা। মহাভারতে আছে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। বনবাসে যাবার কথা রাম বা পঞ্চপাণ্ডবের কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে সীতা ও দ্রৌপদী তাদের স্বামীদের ছেড়ে রাজবাড়ীর সুখভোগ করেনি। শবুও গত বারো বছর তার স্বামীর সঙ্গে শিলং ও পাটনায় বনবাসে কাটিয়েছে, ছায়ার মত সঙ্গে থেকেছে।

দীননাথ উপরওয়ালার কোপে পড়ে বাইরে বদলি হয়ে গিয়েছিল। কত দিন বাইরে থাকতে হবে এ সব ব্যাপারে তার সময় নির্দিষ্ট থাকেনা। কিন্তু এক এক করে যখন বারোটা বছর তাকে বাইরে বাইরে থাকতে হল তখন মরীয়া হয়ে দীননাথ বলল—

'রামায়ণ মহাভারতেও বারো চোদ্দ বছরের বেশী বনবাসের বিধান দেখা যায় না, সেই রামায়ণ মহাভারতের দেশে আমার বদলির, যা কিনা বনবাসেরই নামান্তর, কোন সময়সীমা আছে কিনা তা বোঝাই যাচ্ছে না। এত বড় অন্যায় ও অসম্মান মুখ বুজে সহ্য করা যায় না। পয়লা জানুয়ারী থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে বসব, কলকাতা ছাড়া আর কোথাও কাজে জয়েন করব না, যা থাকে কপালে।'

অতএব দৃঢ়সঙ্কল্প দীননাথের সঙ্গে শবুও বারো বছর পরে ফিরবে চাঁপা-তলায় নিজেদের বাড়ীতে। যদি বিশ্বাস করা যায়, ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য করে, তবে এই জোর করে দেশে ফিরে যাবার কথায় তার আন্তরিক সায় নেই—নিজে থেকে যা হয় সেই ভাল না হলে হয়ত বিপরীত ফল হতে পারে। তবু মনের গভীরে নিজেদের বাড়ীর টান, আপন গৃহকোণের মোহ—সে আকর্ষণও কিছু কম নয়। তাই শবুও দেশে ফিরতে চলেছে দ্বিধা-বিভক্ত মন নিয়ে।

শবুর মনে হয় এটা বুঝি তার জীবনের তৃতীয় অধ্যায় গেল। বারো বছর কেটে গেছে প্রবাসে—দীননাথের ভাষায় বনবাসে। দীননাথ গেছে অফিসে

তিন মাসের ছুটিতে যাবার আগে চার্জ বুঝিয়ে দিতে। সেই অবসরে শেষবারের মত পাটনা ছাড়ার আগে শবু তার মনের দিকে ফিরে চাইছে—এক যুগের প্রবাসকালে সে কি পেল আর কি কি হারাল।

দুই

প্রথমেই মনে পড়ে সেই মারাত্মক ট্রেন এক্সিডেন্টের কথা।

মিতুর বিয়ে শেষে মন্দির শহরে বাপের বাড়ী থেকে রওনা হবার মুখে মা পদ্মিনী দেবী শবুকে বলেছিলেন—ক'দিন পরেই তোর জন্মদিন, সামনের বছরটা খুব সাবধানে থাকিস, বাইরে বেশী ঘোরা ফেরা করিস না, জল আর আগুন থেকে দূরে থাকিস।

মা একথা কেন বলেছিলেন? চৌদ্দ বছর বয়সের সময় একবার শবুর শাড়ীতে অসাবধানে আগুন লেগে গিয়ে অল্পের জন্য অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছিল। মা ঠাকুমা বলেছিলেন—একটা ফাঁড়া কেটে গেল। গত জন্মদিনে শবু আটাশ বছরে পড়েছে। মার আশঙ্কা—এই বছরটিতে শবুর আর একটি ফাঁড়া লুকিয়ে আছে।

কিন্তু মানুষ ত সব কাজ তার নিজের ইচ্ছেয় করেনা, অনেকটা ভাগ্যের হাতে সে ক্রীড়নকমাত্র। সেই ভাগ্যই শবুকে তার আটাশতম জন্মদিনের প্রায় দুমাস পরে টেনে নিয়ে গেল শিলঙে। জল থেকে দূরে থাকবে? বর্ষার ভরা গঙ্গার বিশাল বিস্তৃত বুকের উপর দিয়ে ফরাক্কা থেকে খেজুরিয়াঘাট ষ্টীমারে পার হতে হল যাত্রাপথের প্রথম সন্ধ্যায়। না, সেখানে কিছু হয়নি।

শিলঙে পৌঁছে দেখল সেখানে সব কাঠের ঘর কাঠের মেঝে তার উপর কাঠের উনুন জ্বেলে ঘরে ঘরে রান্না করছে, লোহার আংটি বা ফায়ার প্লেসে দিনরাত আগুন জ্বলে। যেখানে কাঠ আর আগুনের এমন গলাগলি অবস্থান সেখানে আগুন থেকে দূরে থাকা যায় কি করে? সেদিক থেকেও কিছু ঘটেনি।

ঘটনাটা ঘটল মাঝপথে।

নিজেদের তৈরী ছোট্টবাড়ীখানা ফেলে দূর বিদেশে যাওয়ার দুঃখ পথচলায় নানা বৈচিত্রে ও আকর্ষণে একটু একটু করে কমে আসছিল। পথে দুবার

ট্রেন বদল করতে হয়েছে খেজুরিয়াঘাটে ও নিউ জলপাইগুড়িতে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী বলে সব ট্রেনেই তাদের জন্ম কুপের বন্দোবস্ত। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার, যেখানেই নতুন ট্রেনে উঠতে যাচ্ছে সেখানেই দরজার সামনে মিঃ ডি লাহিড়ী ও মিসেস এস্ লাহিড়ী লেখা কাগজ সাঁটা রয়েছে আগে থেকেই। শবুর মনে হচ্ছিল তাদের নাম ছুটো যেন আগে আগে ছুটছে।

শিলিগুড়ি থেকেই সারি সারি পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। দীননাথ বলেছিল—ঐ যে সব পাহাড় দেখছ সব হল হিমালয় পর্বতমালার অংশ, এখানে ধাপে ধাপে নেমে এসে সমতলের সঙ্গে মিশে গেছে—লোকে বলে আকাশ পরিষ্কার থাকলে জলপাইগুড়ি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া দেখা যায়।

কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া দেখা যায়নি। না যাক, পর্বত শ্রেষ্ঠ হিমালয়ের একটা অংশ ত দেখা গেছে। শবুরা জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের পর্বত দেখছে—রাঁচীতে যা দেখেছে তা শুধু পাহাড়, পর্বত নয়। এই পর্বতমালাতেই নাকি দেবাদিদেব মহাদেবের বাস, আর পর্বত দুহিতা পর্বতীই হল মহাদেবের স্ত্রী উমা গৌরী, শিবানী, ভবানী, শর্বাণী। শবু দুই হাত জোড় করে হর-গৌরীর উদ্দেশ্যে তার অন্তরের প্রণাম জানিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছিল তরাইয়ের বনাঞ্চল, মাঝে মাঝে চা বাগান, সেখানে ছবিতে দেখা কর্মরতা মেয়েদের মত চা পাতা তুলতে দেখেছে কিছু মেয়েকে। কুচবিহার পার হয়ে ট্রেন চলেছে আসামের মধ্য দিয়ে। এ দিককার গাছপালা মনে হচ্ছিল খুব ঘন সবুজ। আসামের জঙ্গলের কথা বইতে পড়েছে, সে জঙ্গলে নাকি দলে দলে হাতি ঘুরে বেড়ায় এইটুকু মাত্র আসাম সম্বন্ধে ধারণা ছিল।

নিউজলপাইগুড়ি থেকে শুরু হয়েছে মীটারগেজ লাইন। এ গাড়ীতে ফার্স্ট ক্লাশে এক কেবিন থেকে পাশের কেবিনে যেতে করিডোর নেই, দরজা খুলে নীচে নেমে অন্য দরজা দিয়ে পাশের কেবিনে যেতে হয়। ট্রেনটা মাঝে মাঝে ঢিমে গতিতে চলছিল, যদিও এক্সপ্রেস্ গাড়ী। কখনো কখনো পথের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। ট্রেনে অন্য কম্পার্টমেণ্টগুলোতে বেশ কিছু মিলিটারীও ছিল, কোন ষ্টেশনে ট্রেন থামলে তাদেরকে প্ল্যাটফরমে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। এরা সব দেশী মিলিটারী—ছোটবেলায় শবুর দেখা সেই সব লালমুখো বা নিগ্রো নয়।

দুপুরে বঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে খাবার খেয়ে দুজনেরই ঘুম পেয়ে গেছিল। চব্বিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে পথ চলায় থকলে মনে হচ্ছিল তাড়াতাড়ি গৌহাটি এসে বাঁচা যায়। কিন্তু রাত দশটার আগে নাকি সেখানে পৌঁছাবেনা।

এক ঘুম দিয়ে উঠে চলন্ত গাড়ী থেকে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে বিকেল গিয়ে সন্ধ্যে নেমে এল। দীননাথ বেড ল্যাম্প জেলে একপাশের জানালায় হেলান দিয়ে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। শবু অন্য পাশের জানালা দিয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে তখন আর বিশেষ কিছু দেখতে না পেয়ে নিজের মনে ভেবে চলেছিল। এ সময় ট্রেনটাও বেশ জোরেই চলছিল।

ভাবছিল সমুদ্রের ধারের সেই মন্দির শহরের কথা, যেখানে কেটেছে তার শৈশব কৈশোর আর যৌবনের প্রথম অংশ। সমুদ্রতীরের সমতলের বাসিন্দা সে চলেছে পাহাড়ের দেশে—অচেনা জগতে। কতদূরে রয়ে গেছে বাবা মা ভাই বোনেরা। কানাই তপু এখন পড়াশুনা করছে—তাদের জন্য এখনই কোন চিন্তা নাই। মিতুর বিয়ে হয়ে গেছে—বাবা মা সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত। কিন্তু নন্দুর জন্য বুঝি মা বাবার জীবনে শান্তি নেই। কি যে রোগ হল তার কোন ডাক্তারেও ধরতে পারছে না—চিকিৎসাও তাই কোন কাজে আসছে না। তাগা তাবিজ মাদুলি সব বিফল। বাবার স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল। কিন্তু নন্দুর চিন্তায় মার শরীর ভেঙে পড়ছে। চলছে কত বার-ব্রত-উপোস। এরই মধ্যে মার মাথার চুল অর্ধেক পেকে গেছে। তার উপর শবুরা এতদূরে বদলি হয়ে যাচ্ছে বলেও মার মনে ভাবনা; এ বছরটা নাকি তাকে সাবধানে থাকতে······

এমনি সময় ভীষণ কি যেন একটা ঘটল। গাড়ীটা ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেল, বারবার কম্পার্টমেণ্টটা দুলে উঠল। কিছু দূরে কামান দাগার মত প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল। কম্পার্টমেণ্টের আলো নিভে গেল। অন্ধকারে মেঝেতে কি সব ধুপধাপ করে ছিটকে পড়ল। আশেপাশে চট্‌পট্‌ ফট্‌ফট্‌ দুমদাম সব আওয়াজ শোনা গেল। কয়েকবার বিষম ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রেনটা মনে হল দাঁড়িয়ে পড়েছে। পর মুহূর্তে একসঙ্গে বহুলোকের ভয়ার্ত চীৎকার কান্নাকাটি সোরগোল উঠল সামনে পিছনের সবগুলো কামরা থেকে।

এ সবই ঘটে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে। অন্ধকার কামরার ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শবু হাতড়ে আধা-শোয়া দীননাথের পা দুটো ধরে নাড়া দিতে সে উঁ হুঁ উঁ হুঁ উঁ হুঁ করে কেমন একরকম আওয়াজ করতে লাগল। শবু আরো জোরে জোরে পা ধরে নাড়া দিয়ে ডাকতে লাগল—

'এই, এই শুনছো, শুনছো—কি ভীষণ সব আওয়াজ হচ্ছে কান্নাকাটি হচ্ছে!'

দীননাথ এবার হঠাৎ বীরপুরুষের মত উঠে বসে শবুর একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল—

'খুব সাবধান, পাগলা হাতিতে বোধ হয় লাইন আটকে দিয়েছে, হাতির দল হয়ত শুঁড় দিয়ে পিটিয়ে গাড়ীর দরজা জানালা ভাঙছে, ধাক্কা মেরে কামরাগুলো উল্টে দিচ্ছে। চুপচাপ মাথা নীচু করে অন্ধকারে বসে থাক—না হলে হাতিগুলো দেখতে পেলে শুঁড় দিয়ে টেনে তুলে মাটিতে আছাড় মারবে।'

আসাম মানেই আসামের জঙ্গল আর জংলী হাতির দল—তাই সবার প্রথমে হাতির কথাই তার মনে পড়েছিল।

হঠাৎ একদল লোক পাশ দিয়ে চীৎকার করতে করতে গেল—

'এ্যাক্সিডেণ্ট, এ্যাক্সিডেণ্ট—ট্রেনে ট্রেনে কলিশন...

দীননাথ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল—

'যাক বাবা, বেঁচে গেছি আমরা, এতক্ষণ যখন এ্যাক্সিডেণ্টে মরিনি তখন আর মরছিনা।' পরক্ষণেই আবার শবুকে সাবধান করে দিল 'এই সময় আশপাশের লোকালয় থেকে লোকজন সাহায্য করতে আসে, আবার কেউ কেউ লুটপাটের ফিকিরেও থাকে, খুব সাবধান।' পাগলা হাতির ভূত মাথা থেকে নামতেই তার মাথায় লুঠেরার ভয় ভর করেছে।

মা-ও ত শবুকে পুরো বছরটাই সাবধানে থাকতে বলেছিলেন—শেষরক্ষা হল কি? তবু মনে হচ্ছিল এযাত্রা তারা দুজনেই বেঁচে গেছে মা ষষ্ঠীর কৃপায় ও মার প্রার্থনায়।

কণ্ডাক্টার গার্ডের গলার আওয়াজ শোনা গেল—

'মিঃ ও মিসেস লাহিড়ী, আপনারা কোথায়।'

দীননাথ একটু রসিকতা করে জবাব দিয়েছিল—

'এই যে, হেথায়।'

'কোন আঘাত টাঘাত লাগেনি ত?'

'এখনও বুঝতে পারছি না।'

কণ্ডাক্টর গার্ডসাহেব কামরার দরজা খুলতে না পেরে পা দানিতে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ভিতরে টর্চের আলো ফেলতে ভিতরের যে দৃশ্য দেখা গেল তাতে সবার চক্ষুস্থির।

ছাদ থেকে সিলিং ফ্যানটা মেঝেতে ছিটকে পড়েছে, বাঙ্কের উপর মাথা বিশাল বেডিংটাও ধরাশায়ী। দীননাথ যে জানালার দিকে মাথা দিয়ে শুয়েছিল তার দুপাশের দেওয়াল চেপ্টে খুব কাছাকাছি এসে গেছে, জানালার পাশের দরজাটা ল্যাভেটরীর মধ্যে ঢুকে গেছে—কামরাটা প্রায় ত্রিভুজাকার

নিয়েছে, জানালাটাও যদি ঢুকত তবে দীননাথের মাথাটা পিষে···। কি কারণে যে দুপাশের দেওয়াল পুরো সেঁটে এসে তাদেরকে চেপ্টে দেয়নি ভেবে আশ্চর্য্য লাগছিল।

ঐ জানালার পাশে মেঝেতে রাখা শবুর বিয়ের বাক্সটা টেনে সরাতে গিয়ে দেখা গেল সেটা দু দেওয়ালের চাপে আটকে গেছে, মাঝখানে কিছুটা টোল খেয়ে গেছে। দীননাথ ও কণ্ডাক্টরে মিলে বাক্সটাকে অনেক কষ্টে বের করল।

কণ্ডাক্টর বলল—'এই বাক্সটাই আপনাদের দু দেওয়ালের মাঝে স্যাণ্ডুইচ হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে—বড় পয়মন্ত বাক্স এটা। খুব রক্ষা পেয়ে গেছেন।'

আনন্দে বেদনায় শবুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল—এটা যে তাদের বিয়ের বাক্স, মা পদ্মিনী দেবী নিজের হাতে এ বাক্স সাজিয়ে দিয়েছিলেন শবুর বিয়ের সময়। তাদের বিয়েটা নিশ্চয়ই মঙ্গলের হয়েছিল—শুধু শবুর নয়, দীননাথেরও একটা ফাঁড়া কেটে গেছে ঐ বাক্সের কল্যাণে।

একটা কথা শবুর হঠাৎই মনে পড়ে। তার জন্ম যদিও রবিবারে, কিন্তু এক একটা শুক্রবার যেন তার জীবনে বিশেষ অর্থবহ হয়ে দেখা দিয়েছে। তার বিয়ে হয়েছে শুক্রবারে, একবছর পর প্রথম বদলি হয়ে কলকাতা রওনা দিয়েছিল আর এক শুক্রবারে—এবারে বদলি হয়ে প্রথম শিলংয়ে রওনা হয়েছে সেও শুক্রবার। মেজদা বিশ্বনাথ ও বাবা কালীনাথের মৃত্যুও শুক্রবারে: শবুর জীবনে শুক্রবারের যেন এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

শবু উল্টোদিকে যে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল তার ভিতরের দেওয়াল ভেঙে গিয়ে পাশের কামরায় যাবার করিডোর তৈরী হয়েছিল কণ্ডাক্টার দরজা খুলতে না পেরে সেই পথ দিয়েই কামরায় ঢুকেছিল। টর্চের আলোর সাহায্যে দীননাথ ও কণ্ডাক্টর এক এক করে মালপত্র সেই পথে টানা-টানি করে নামাল। এবার শবুকে নীচে নামতে হবে।

কণ্ডাক্টার বলল—'নেমে আসুন মিসেস্ লাহিড়ী, আমার হাত ধরে।' শবু একটু ইতস্তত করছে দেখে বলল 'আঃ, এখন বিপদের সময়, এ সময় কি লজ্জা করলে চলে?'

নীচে নেমে আবছা অন্ধকারে চাঁদের অল্প আলোয় ও ঘন ঘন বহু লোকের টর্চের আলোতে শবু তখন অবস্থাটা দেখতে পেয়েছিল। যে কামরার ভিতর দিয়ে তাদের লাফিয়ে নামতে হয়েছে সেটাও ফার্স্ট ক্লাশ—তার ছাদ ও একদিকের দেওয়াল ভেঙে নীচে পড়ে আছে। এখন সেটাকে একটা ভাঙা ওয়াগনের

মত দেখাচ্ছে—তার যাত্রীদের কি হয়েছে কে জানে। তার আগের তিনটে বগি বিশাল বিশাল হাতির মত এপাশ ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে—তার নীচে কতজন চাপা পড়ে আছে ক্রেন দিয়ে টেনে না তোলা পর্য্যন্ত জানা যাবে না। সব আগে ইঞ্জিনটা একটা দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের ইঞ্জিনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে তখনও সোঁ সোঁ আওয়াজ করছে। সামনে একটা ছোট্ট ষ্টেশন।

আশপাশের গ্রাম থেকে বহুলোক ছুটে এসে দূরে দাঁড়িয়ে কলরব করছে। তাদের ভাষা বোঝা যাচ্ছিল না তেমন, কয়েকটা শব্দ 'ইমান' 'কিমান' 'মানু বিলাক' 'মোটা মানু' 'মাইকি মানু' বারবার শোনা যাচ্ছিল। আকাশে ছিল শুক্লাষষ্ঠীর অস্পষ্ট চাঁদের আলো, রাত প্রায় আটটা।

দীননাথের কথাই বোধ হয় ঠিক। লুটপাটের ভয়ে বা অন্য কারণে হোক ট্রেনের মিলিটারীরা চারপাশ ঘিরে রেখেছে বাইরের লোকজনকে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না। ওদেরও কিছু লোক ঘায়েল হয়েছে তবু বাকি সবাই কর্ত্তব্যে অটল। মিলিটারীদের ভরসায় শবুকে বাক্সের উপর বসিয়ে রেখে দীননাথ সব ঘুরে দেখতে গেল।

শবু সেখানে বসে বসেই দেখেছিল দুজন লোককে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেতে—একজনের একটা হাত কাঁধের কাছ থেকে সামান্য একটু চামড়ার সঙ্গে ঝুলছে, আর একজনের একটা পা হাঁটু পর্য্যন্ত প্রায় আলাদা হয়ে গেছে।

একসময় তিনজন ভদ্রলোক কাছে এসে শবুকে জিজ্ঞেস করল—

'আপনারা ত ঐ কুপেতে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা ঐ ভাঙা ওয়াগনের মত কামরায় ছিলাম—যাচ্ছিলাম শিবসাগর অফিসের কাজে তার মধ্যে এই বিপত্তি। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। আপনাদের কিছু হয়নি ত?'

'না।'

উত্তর শুনে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে 'আশ্চর্য্য!' বলে একটা ছোট্ট মন্তব্য করে ভদ্রলোক তিনজন অন্যত্র চলে গেল। শবুর মনে হয়েছিল তারা হয়ত ছোটকাকার অফিসের লোক হবে। ছোটকাকা যদি ঐ দলে থাকত তবে এই বিপদের মধ্যে সে মনে বল পেত। পরে কাকার কাছে শুনেছিল—হ্যাঁ, ওরা তাঁর অফিসের লোক ছিল এবং ওদের মুখে শবুদের বর্ণনা শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে শবুদের কোন ক্ষতি হয়নি—সে ভদ্রলোক তিনজন নাকি আর সামনে না এগিয়ে সোজা কলকাতায় ফিরে গেছিল।

দীননাথ ফিরেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তার হাতে ধরা ঠোঙায় খানকতক তেলেভাজা লুচি ও সামান্য তরকারি। বলেছে—

'ষ্টেশনের বাইরে একটু গ্রামের মধ্যে একটা মাত্র দোকান। অনেক কাড়াকাড়ি করে পাঁচ টাকায় কটা লুচি আর তরকারি যোগাড় করেছি। এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় কতক্ষণ থাকতে হবে ঠিক নেই—এটুকু খেয়ে রাত কাটাতে হবে। ওদিকে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে দেখলাম কয়েকজন লোককে শুইয়ে রেখেছে—তার মধ্যে কজন চিরনিদ্রায় শায়িত আর কজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বুঝলাম না।'

না, রেল কোম্পানী তাদেরকে একেবারে উপেক্ষা করেনি। কিছুক্ষণ পরেই রব উঠেছিল—'রিলিফ ট্রেন এসেছে, রিলিফ ট্রেন এসেছে।' তারা যাত্রীদের প্রত্যেকের হাতে একমুঠো করে ক্ষুদে ক্ষুদে কুচো নিমকি আকারের ডজন খানেক লিলি বিস্কুট ধরিয়ে দিয়ে গেছিল। রোগী ও শিশুদের এক মগ করে গোলা দুধ দিয়েছিল। দীননাথ ঠাট্টা করে বলেছিল—

'চিন্তা কোরোনা, রিলিফের খিচুড়ী বোধ হয় এখনো উনুন থেকে নামেনি তাই আপাততঃ পিত্তি পড়া বন্ধ করতে এই ব্যবস্থা। আমরা আবার ফার্স্ট ক্লাশের যাত্রী, চাইকি আমাদের পোলাও মাংসও খাওয়াতে পারে।'

রাত বারোটা নাগাদ একটা সাটল্ ইঞ্জিন এসে লাগতে কণ্ডাক্টার গার্ড এসে জিজ্ঞেস করেছিল—

'আপনারা রিলিফ পেয়েছেন ত?'

হ্যাঁ, এমন রিলিফের কথা চিরদিন মনে থাকবে। জবাবে দীননাথ বলেছিল—

'আমাদের যাত্রাবিরতি কতক্ষণে শেষ হবে জানতে পারলে সত্যিকারের রিলিফ পেতাম।'

কণ্ডাক্টার—'সেই কথাই বলতে এসেছি। ইঞ্জিন লেগে গেছে, ফার্স্ট ক্লাশ কামরাগুলো আর চলবার মত অবস্থায় নেই। পিছন দিকের নীচু ক্লাশের কামরাগুলোর একটাতে আপনারা মালপত্র নিয়ে উঠে পড়ুন, আমি কুলি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঐ সচল কামরাগুলোতেই সবাইকে গৌহাটি পৌঁছে দেয়া হবে।'

'ইঞ্জিন পাওয়া গেল আর দু একটা ফার্স্ট ক্লাশ বা অন্য কোচ পাওয়া গেল না?'

'ট্রেনের কোচ কি পথের ধারে যেখানে সেখানে পড়ে পাওয়া যায়? কত-ক্ষণের চেষ্টায় একটা ইঞ্জিন যোগাড় হয়েছে। যান, আর দেরী করবেন না।'

'আর টিকিটের দামের ব্যাপারটা?'

উত্তর দেয়া অনাবশ্যক বোধে একটা মুখভঙ্গী করে কণ্ডাক্টর কুলির খোঁজে চলে 'গছিল—ভাবটা এই যেন, জ্যান্ত অবস্থায় তাদের গৌহাটি পৌঁছবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে শুধু সেই জন্যই রেল বাহাদুর ও পরম করুণাময়কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ।

অল্প কয়টা কামরায় সবাই গাদাগাদি করে উঠলে ট্রেনটা পিছু হটে একটা মাঝারী ষ্টেশন দিফুতে পৌঁছে পিছনের ইঞ্জিন সামনে এনে চলতে আরম্ভ করেছিল। সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ইঞ্জিন দুটো ও পড়ে থাকা অন্য কামরাগুলোর পাশ কাটিয়ে সারা রাত জেগে বসে ভোরে পৌঁচেছিল রঙ্গিয়া ষ্টেশনে। সেখানে দুজন লোক, বোধ হয় স্থানীয় কোন খবরের কাগজের রিপোর্টার, দুর্ঘটনার বিবরণ জানতে চেয়েছিল। আর তখনই শবুর মনে পড়ে গিয়েছিল বাবার ডিস্‌পেন্সারীতে যে খবরের কাগজ রাখা হয় তাতে এই এ্যাক্সিডেন্টের খবর পড়ে বাবা-মা কতই না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন। শবু দীননাথকে বলেছিল—

'শিলংএ পৌঁছেই বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিও।'

'দেব।'

তিন

প্রায় দেড় বছর পরে জানুয়ারীতে তিনমাসের ছুটিতে কলকাতা গিয়ে আরো দু মাস পরে ঠাকুমাকে সঙ্গে করে শবু যখন মন্দির শহরে পৌঁচেছিল তখনও মা পদ্মিনী দেবী এই এ্যাক্সিডেন্টের কথা বলে কত ব্যাকুল হয়ে উঠে-ছিলেন।

রিক্সা গিয়ে বাড়ীর দোরগোড়াতে থামতে দোতলার জানালা থেকে দেখতে পেয়ে কানাই চিৎকার করে বলে উঠেছিল—

'মা, মা, ঐ দেখ তোমার পেল্লাদ মার্কা মেয়ে শবু সশরীরে এসে গেছে।'

ডাক শুনে নীচের রান্নাঘর থেকে মা ছুটে এসে শবুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। এর আগে প্রত্যেকটা চিঠিতে মা শবুর দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁর আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন।

আগে থেকে খবর দেওয়া ছিল। শবু ঠাকুমাকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে তাঁকে যত্ন করে রিক্সা থেকে নামিয়ে প্রণাম করে মা কেঁদে ঠাকুমাকে বলেছিলেন—

'মা, আপনাকে আর বরানগরে যেতে দেব না।'

ঠাকুমার এতদিনের নিরুদ্ধ অভিমান গলে জল হয়ে দু চোখ বেয়ে নেমে এসেছিল। বড় কাকীমারা তখন বড়কাকার কর্মস্থল বালেশ্বরে থাকতেন তাই মা ঠাকুমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী কেউ ছিল না। এই দুই নারী তাঁদের জীবনের দীর্ঘতম কাল স্নেহে মায়া মমতায় ভালবাসায় শ্রদ্ধায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে লতার মত বাস করেছেন এই মন্দির শহরে। আবার তাঁরা পরস্পরকে একান্তভাবে ফিরে পেয়ে আনন্দে অশ্রুতে বিগলিত হয়েছিলেন।

শবুও তার প্রতিশ্রুতি মত ঠাকুমাকে তাঁর স্বামীর শহরে ফিরিয়ে এনে দিয়ে নিজে ধন্য হয়েছিল। শিলং থেকে কলকাতায় এসেই সে মাকে চিঠিতে লিখেছিল—মাগো, শ্রীলার বিয়ে হয়ে গেছে, এবার যাবার সময় ঠাকুমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। মা জানিয়েছিলেন—অবশ্যই নিয়ে আসবি, মা না থাকাতে বড় একা একা মনে হয়, কিছু ভাল লাগেনা। মান অভিমান মিটাতে চাই একটা যোগসূত্র। শবু সেই যোগাযোগ ঘটিয়ে মা ও ঠাকুমা উভয়ের কাছ থেকে পেয়েছিল প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস আবেগ কমে এলে শবু মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—

'আচ্ছা মা, কানাই আমাকে পেল্লাদ মার্কা বলল কেন?'

মা হেসে কেঁদে বলেছেন—'সে কথা আর বলিস কেন। তোদের নিরাপদে পৌঁছা সংবাদ টেলিগ্রামে যখন এল তখন থেকেই কানাইয়ের মুখে ঐ কথা। বলে—মা, তোমার মেজো মেয়ে আগুনে পোড়েনি, অতবড় ট্রেন এ্যাক্সিডেন্ট হল তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। এ মেয়ে তোমার পেল্লাদ মার্কা না হয়ে যায় না।'

শবু কানাইকে জিজ্ঞেস করেছে—'হ্যাঁরে কানাই, সত্যিই যদি আমার কিছু হ'ত তোর কি মনে দুঃখ হত না?'

প্রশ্ন শুনে কানাই আদর করে মেজদিকে জড়িয়ে ধরে বলেছে—'ধাঃ, তাই কি হয় নাকি? আমি মাকে রাগানোর জন্য ওকথা বলি। সেই কবে ছোটবেলায় তোর শাড়ীর আঁচলে আগুন ধরে গেছিল সেই থেকে মার সব সময় ভয় এই বুঝি শবুর কিছু হল। বুঝলি, মেজদি, মা যে কেন তোর জন্য এত চিন্তা করে বুঝিনা।'

ঠাকুমা মার হয়ে জবাব দিয়েছেন—'সে কথা তোরা বুঝবি কি করে, জানবিই বা কি? বোঝে তোর মা, বুঝি আমি আর জানে তোর বাপ কাকারা। মা ষষ্ঠীর কাছে মানত করে তবে তোর মা ওর আয়ু ভিক্ষা পেয়েছে, তাই পদে পদেই ওর জন্য আমাদের ভাবনা।'

আরো কয়েক বছর পরে মন্দির শহরে বাপের বাড়ী এসে শবুর টাইফয়েড হয়েছিল দীননাথ তখন পাটনায় অফিস নিয়ে ব্যস্ত। বাবা মাকে বলেছিলেন

'শবু তোমাকে দু দুবার মরণের মুখ থেকে ভাল করে তুলেছে সেবায় যত্নে—এখন অসুখের সময় তুমি ভাল করে ওর সেবা যত্ন কর।'

মা সেবার প্রাণপণ সেবায় যত্নে শবুকে ভাল করে তুলেছিলেন। শবু সেরে উঠলে কানাই আবার পেল্লাদের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে মা বলেছিলেন—

'আমি কাছে থাকতে শবুকে আমি যেতে দেব না। আরো কয়েক বছর পরে ওর বুঝি আর একটা ফাঁড়া আছে। আমি বেঁচে থাকলে সে বছরটা ওকে আমার বুকে করে আগলে রাখব। কিন্তু আমার শরীরের যা অবস্থা আমি নিজে কতদিন বাঁচব জানিনা। আমি যদি না থাকি কানাই, তোরা তোদের মেজদিকে দেখিস।'

শুনে শবু কেঁদে বলেছিল—'মাগো, আমি কাছে থাকতে তোমাকেও আমি কিছুতে যেতে দেব না।'

শবুতে আর মাতে এমন একটা একাত্মভাব যে দুজনে কাছে থাকলে স্বয়ং যমেরও বুঝি সাধ্য নেই কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এই এ্যাক্সিডেন্টের আর একটা দিকও ছিল। ভব অবশ্য কাটিহার থেকে শিলঙে টেলিফোন করে দীননাথের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে সব খবর জেনে নিয়েছিল। কিন্তু দেড় বছর পরে শবুরা প্রথম চাঁপাতলার বাড়ীতে এলে মা মঙ্গলা দেবী ছেলের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে এতটুকু ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নি—শবু ত একেবারেই পর; উপরন্তু সেই রাতেই তিনি দীননাথকে বলেছিলেন—

'দীনু, তোরা ত তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিস। এই বাড়ীটার জন্য আমি কোথাও যেতে পারিনা - বাড়ীটা যেন একটা বন্ধন। আমি এই সুযোগে একমাস একমাস করে সোনা ও ভবার কাছে থেকে আসি। ভবা এসে আমাকে মেদিনীপুর থেকে কাটিহারে নিয়ে যাবে।'

এবং সেইমত পরদিনই তিনি একা মেদিনীপুর চলে গেছিলেন। দীননাথ

বাড়ীতে বাকি দুখানা ঘর একটা ভাঁড়ার ঘর ছাদের সিঁড়ি এই সব করাবে বলেই তিনমাস ছুটি নিয়ে এসেছিল। বাড়ী তৈরীর সব ঝক্কি ঝামেলা ছেলে আর ছেলের বৌ এর ঘাড়ে পড়ে রইল, তিনি গেলেন বেড়াতে। এ বাড়ী নাকি তাঁর কাছে এক বন্ধন।

ঠিক এক মাসের মাথায় মেদিনীপুরে যাবার পথে মাতৃভক্ত ভব এসেছিল ক'দিনের জন্য—বাড়ীতে তখন জোর কদমে মিস্ত্রি মজুরের কাজ চলছে। মঙ্গলা দেবী থাকলে বাড়ীতে একটা ঝিও রাখেন না। শুধু ঝি কেন, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর নাতি হাবলুকে চোর বদনাম দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছেন। এখন আছে হাবলুর ছোট এক ভাই ভোলা, স্থানীয় স্কুলে পড়ে; শবু এসে একটা ঠিকে ঝি রেখেছে।

এই অবস্থায় একদিন সকালে রিক্সা থেকে নেমেই ভব এসে শবুর কাছে হাত পাতল

'বৌদি শিগগীর দশটা টাকা দাও ত।'

'আমার কাছে দশটাকা নেই'—শবুর সাফ জবাব।

'তবে পাঁচ টাকা দাও।'

'পাঁচ টাকাও নেই।'

'তবে কি আছে বল।'

'মেরে কেটে দু টাকা বার করতে পারি।'

'তাই দাও, রিক্সাভাড়াটা দিয়ে আসি। বাপরে, দুটো টাকার জন্য দশ টাকা থেকে টক্কর আরম্ভ করতে হয়।'

'যা দরকার তাই চাইলেই পার। দুটো টাকা পকেটে করেও আসতে পার না?'

'দু টাকা কেন, পকেটে দুশ টাকা আছে—চেকে। এখানে দেখছি বাড়ী তৈরীর জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে—আর দু টাকা বের করতে এত ঝকমারি।'

'চেক দেখিয়ে আর কতদিন চালাবে? দুপুরে বাড়ীতে খাবে ত?'

'খেতেও পারি না-ও পারি।'

'কদিন থাকবে ত?'

'থাকতেও পারি না-ও পারি।'

বাবা কালীনাথ বেঁচে থাকতে এই রকম ভাষায় কথা বলতেন। ছেলেরা যখন সেই ভাবে কথা বলে মনে হয় বাবা বুঝি কথা বলছেন।

হাসি ঠাট্টার কথার পর ভব জিজ্ঞেস করেছিল—

'আচ্ছা বৌদি, এ্যাক্সিডেন্টের সময় তোমরা কি করছিলে ?'

'তোমার সেজদা শুয়ে শুয়ে একটা পত্রিকা দেখছিল আর আমি পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সন্ধ্যারাতের শোভা দেখছিলাম।'

'এ্যাক্সিডেন্ট হতেই তোমরা কি করলে ?'

'কি আর করব ? তোমার দাদা মুখে পত্রিকা চাপা দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়ে গোঙাতে লাগল—আর আমি 'ভবা বাঁচাও, সোনা বাঁচাও' বলে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলাম। শেষে ভবা সোনা এসে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করল।' শবু ভাল মানুষের মত মুখ করে জবাব দিয়েছিল।

ভব দেঁতো হাসি হেসে বলেছিল—'বা, বেশ বলেছ। খুব যে মুখ ফুটেছে দেখছি।'

'এগার বছর হল ঘর করছি, এখনও ফুটবে না! কথা তোমরা বলিয়ে ছাড়ছ।'—মনের বিতৃষ্ণা শবু মুখ ফুটে প্রকাশ করে ফেলেছিল।

তিনমাস ধরে মিস্ত্রি মজুর লাগিয়ে দুখানা ঘর ভাঁড়ার ঘর ছাদে ওঠার সিঁড়ি করে ঘরের দরজা জানালা লাগাতে ছ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে পাঁচশো টাকা ধার করতে হয়েছিল। ঠাকুমা মন্দির শহরে যাবার আগে শবু টাকার কথা বলতে ঠাকুমা খুশী মনে তাঁর পাশ বই থেকে টাকা তুলে দিয়েছিলেন। দীননাথ অবশ্য কথামত শিলং থেকে মাসে একশ টাকা করে পাঠিয়ে পাঁচ মাসে সবটা শোধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু দরকারের সময় ভাইরা কেউ একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য করেনি; মেজোননদাই ঘর হচ্ছে দেখে আগেই ভাগ বাঁটোয়ারা করতে লেগেছিল—বাড়ীর মেজো জামাই কোন ঘরে থাকবে? মেজোননদ করবী আভাস দিতে ভোলেনি—মামাবাড়ীতে ভাগ্নেদের অবাধ অধিকার। অথচ টাকার অভাবে দীননাথ যখন ঐ কটা টাকার জন্য মেজো ভগ্নীপতির কাছে হাত পেতেছিল তখন হাতে টাকা থাকলেও সে এক কথায় না করে দিয়েছিল।

শবুর মুখে কথা ফুটেছে কি সাধে? দেখে শুনে শবুর হাড় পিত্তি জলে গেছে।

ঘরের প্লাষ্টার হল না, মেঝে হল না, চুনকামের ত কথাই নেই। সেই অবস্থাতেই ছুটি ফুরোতে শবুদের আবার শিলং চলে যেতে হয়েছিল। ছাদের সিঁড়ি হতে শবু বাড়ী হবার পরে সেই প্রথম ছাদে উঠে চারদিকের পরিবেশ

দেখে মুগ্ধ হয়েছিল—আশপাশে কিছু বাড়ী, পূবে অনেকদূর পর্য্যন্ত খোলা মাঠ তার একপাশে মামীমাদের চালাঘর, পশ্চিমে বহুদূরে রেললাইন দিয়ে বুঝি ট্রেন যেতে আসতে দেখা যায়। বাড়ীতে ফলন্ত নারকেল সুপুরী কুল ও পেয়ারার গাছ।

মনে গভীর তৃপ্তি ও আশা নিয়ে শবু শিলং-এ ফিরে গেছিল—একদিন ত তারা এখানে স্থায়ীভাবে চলে আসবেই, তখন নিশ্চিন্তে শান্তিতে এ বাড়ীতে বাস করতে পারবে।

পরে একটু একটু করে বাড়ীটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হয়েছে।

বারো বছর পরে শবুরা সেই বাড়ীতেই আজ ফিরে যাবে একটা ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে।

চার

শিলং এ বদলির প্রথম বছরেই চরম বিপর্য্যয় ঘটে গেছে শবুর জীবনে। আর একটা দুর্ঘটনা।

ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল বাড়ীতেই একদিন বিকেলের চায়ের আসরে। শিলং শীতের দেশ—সেখানে লোকে আলাদা করে জল খুব কমই খায়, কথায় কথায় শুধু গরম চা খায়। দীননাথ চা খায়না, কিন্তু শবুর জন্ম চা পান এমন কি জর্দা কিমামেরও ব্যবস্থা আছে। বলে—বিয়ের আগে শাশুড়ী ঠাকরুনের কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাঁর মেয়েকে রোজ চা খাওয়াতেই হবে। এখন পানজর্দা জুটেছে ফাউ হিসেবে।

এখানে লোকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খায়, হাঁড়িতে সব সময় জল ফুটছেই আর গুঁড়ো চা-ও ঘরে মজুত। শবু কিন্তু সকালে বিকেলে মাত্র দুবারই চা খায়, দীননাথ সকালে এক কাপ হরলিকস খায়। শবু কম চা খায় বলে বাজার থেকে শুধু ভাল চা আসে। বিকেল দুটো তিনটের সময় তাদের ঘরে প্রায় নিত্য অতিথি আসে—কলকাতার গুপ্ত গিন্নী, মুখার্জীবাবুর মা, ভদ্রের স্ত্রী দীপিকা দেবী, বাড়ীউলী লক্ষ্মীবালা কাকভী, অফিসের হরেন করের স্ত্রী, দাস ঘোষ চক্রবর্ত্তী মেধীর বৌরা। এদের মধ্যে তার বেশী ভাল লাগে গুপ্ত গিন্নী, দীপিকাদি, লক্ষ্মীবালা আর হরেন করের স্ত্রী অর্চনাকে।

সেদিন দীপিকাদি এসেছিল বহুদূর উমপ্লিং থেকে—সেখানেই তারা বাড়ী

করেছে, তার স্বামী খুব শিগগীরই রিটায়ার করবে। চা খেতে খেতে সেই সব কথাই হচ্ছিল শবুতে আর দীপিকাতে।

দীপিকা বলছিল—'ভাই শ্রাবণী, উনি ত কমাস পরে রিটায়ার করবেন। বড় ছেলেটা বি এ পাশ করে বসে আছে, এ জি অফিসে একটা চাকরির জন্ত পরীক্ষা দিয়েছে কবে চাকরি পাবে জানিনা। মেজোটা সামনের বছর স্কুল ফাইন্যাল দেবে। তখন লাহিড়ী বাবুকে বলে অফিসে একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। লোকে আমাকে বলে—সতীনের ছেলেদের জন্ত তোমার কেন অত চিন্তা, নিজের ছেলে মেয়ে দুটোকে ভাল করে মানুষ কর। ছেলে দুটো আমাকে নিজের মায়ের মত দেখে আমিও তাদের আপন করেই নিয়েছি। পরের কথায় কান দেব কেন?'

এ জন্তই ভদ্রমহিলাকে শবুর খুব ভাল লাগে। কথায় কথায় সে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা বলুন ত এখানকার কর, সরকার, দাস, ধর, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য্য অধিকাংশ বাঙালীই সিলেট জেলার লোক—তাদের কথায় অদ্ভুত সিলেটী টান। 'কিতা' 'কিতা' ছাড়া কথা বলে না—আবার কেউ কেউ গর্ব করে বলে—'আমরা কলকাত্তাইয়া ভাষায় মাত্‌তাম না।' আপনি সিলেটী হয়েও ত বেশ পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেন।'

দীপিকা বলল—'আমি ছোট বেলায় দিল্লীতে মা বাবার কাছে ছিলাম, সেখানেই মানুষ হয়েছি। সেখানকার বাঙালীদের গণ্ডি অনেক বড়।'

শবু বলল—'প্রথমে এসে আমরা ওঁর অফিসের অতনুবাবুর বাড়ীতে উঠেছিলাম বাসা না পেয়ে, দু মাস ছিলামও সেখানে। অতনু বাবুর মেজো বৌদিকে দেখতাম কলকাত্তাইয়া ভাষার উপর চটা, আবার শিলং ছাড়া অন্ত কোন জায়গা তাদের পছন্দ নয়। বলত—কিতা মশা কিতা মাছি কিতা ধুলা কিতা গরম।'

দীপিকা বলল—'এটা ঠিকই. এখানে ও সবের উপদ্রব নেই।'

'তা নেই ঠিক। কিন্তু এখানে একটু হাত পা ছড়িয়ে ওঠা বসা করার উপায় নেই, সব সময় লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাক, এত ঠাণ্ডা। আর ওদের বাড়ীতে দেখতাম বাজারে এত সস্তা দেড় টাকা দু টাকা কিলো তাজা রুইমাছ থাকতে কেবল শুটকি মাছ এনে খায়। আমার ত গন্ধে গা গুলোত' বলতে বলতে সত্যিই যেন তার গা গুলিয়ে উঠে বমি আসছিল।

দীপিকা বলতে লেগেছিল—'প্রথম প্রথম আমারো অসুবিধে লাগত এখন অভ্যাস…।'

সে ততক্ষণে বাথরুমে ছুটেছে, কয়েক ঝলক বমি করে হাতে মুখে জল দিয়ে আসছে।

দীপিকা কিছুক্ষণ তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায় সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। দীপিকা জিজ্ঞেস করল—'আগেও কি তোমার শুটকি মাছের কথায় এমন বমি হয়েছে?'

'না।'

'মাথা ঘোরে? খেতে অরুচি বোধ হয়?' প্রশ্ন করে ও উত্তর শুনে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে শবুকে পর্যবেক্ষণ করে ও আরো কিছু প্রশ্ন করে নিশ্চিন্ত হয়ে দীপিকা বলেছিল—

'ভাই শ্রাবণী, তুমি এবারে মা হতে চলেছ।'

শবুরও কিছুদিন ধরে যেন অন্যরকম লাগছিল। ঠিক বুঝতে না পেরে কাউকে কিছু বলেনি। আগে থেকে বলে শেষটায় যদি অন্য কিছু হয় তখন আরো লজ্জার ব্যাপার হবে। শাশুড়ী ঠাকরুন মঙ্গলা দেবী ত বলেই রেখেছেন পেটে কুকুর বেড়ালের ছানাও নেই। ছ সাত মাস ধরে কলকাতায় দুজনে কত চিকিৎসা করিয়েছিল, এত দিনে বুঝি তার ফল পাওয়া যাবে। এখানে এসেও ত সাতটা মাস কেটে গেছে।

দীপিকাদির কথায় সে লজ্জায় আরক্ত হয়ে আঁচলে মুখ ঢেকেছিল, কান্না পাচ্ছিল। দীপিকা অনেক আশ্বাস দিয়ে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এক সময় চলে গেছিল।

রাতে শুয়ে শুয়ে গোপন কথা বলার মত ফিসফিস করে শবু দীপিকাদির অনুমানের কথা দীননাথকে বলেছিল। শুনে আনন্দে দীননাথ তাকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করেছে। অনেক রাত অবধি দুজনে বহুদিনের এক প্রত্যাশা পূরণের কল্পনায় বিভোর হয়েছে।

শবু যেন ভিতর থেকে একটা অঙ্কুরের আভাস পেত। চোখে ঘনিয়ে আসত স্বপ্ন—একজন আসছে, সে আসবে, তার তৃষিত বুকে করবে রসধারা সিঞ্চন। নারীত্বের বিলম্বিত কিন্তু চরম সার্থকতা আসবে তার জীবনে। মা পদ্মিনী দেবীর চোখ জুড়োবে সন্তান কোলে শবুকে দেখে, বাবার মন খুশিতে ভরে উঠবে মেয়ের পূর্ণতায়।

দীননাথ এক সময় বলেছে—'যদি মেয়ে হয় আমি তার নদীর নামে নাম রাখব।'

'না, না—নদীর নাম নয়' স্বামীর বাহুতে মাথা রেখে শবু আদুরে গলায় বলেছিল—'নদী আর মাসের নামে নাম রাখলে চিরজীবন দুঃখ পায়।' কিন্তু যদি ছেলে হয় আমি তার নাম পছন্দ করব।'

দুজনের চোখেই স্বপ্ন নেমে এসেছিল। নিঃসঙ্গ জীবনে আসবে আনন্দ, আসবে ব্যস্ততা। ছোট্ট শিশুকে ঘিরে গড়ে উঠবে তাদের জীবনের মরুদ্যান।

পরদিন দুপুরে স্নানের আগে উপরে বাড়ীউলীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে লক্ষ্মীবালা বলেছিল—

'মাহীক আজি কিমান পারা লাগিয়াছে। কি হৈছে কহকচুন।'

বাড়ীওয়ালারা অসমীয়া, ছেলে মেয়েরা শবুকে ডাকে মাহী (মাসী) বলে, দীননাথকে বলে মহা। তাইতে তাদের মা-বাবাও তাদের বলে মহা আর মাহী। এখানে অসমীয়া ও সিলেটের বাঙালীদের অহী নকুল সম্পর্ক। কিন্তু কলকাতার বাঙালীদের প্রতি কারো কোন বিদ্বেষ নেই। তবু এই বাড়ী ভাড়া পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। অফিসের অসমীয়া ছেলেরাও 'লাহিড়ীবাবু ভারি ভাল্ মানুহ' বলে সার্টিফিকেট দিলেও হয়নি। এরজন্য বাড়ীউলীর সামনে রীতিমত ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে—যাচাই করে নিয়েছে শবুকে যদি সিলেটী হয় তবে সিলেটী কথা নিশ্চয়ই একবার বের হয়ে পড়বে। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে ৭৫ টাকায় দুখানা ঘর ভাড়া দিয়েছে। পরে অবশ্য মুখ রক্ষা করতে লক্ষ্মীবালা বলেছে—

'ময় আপনাক চাহি (দেখে) ভাল্ পালু তেনেকৈ ভাড়া দিই আছে। মহা মাহী ভারি ভাল্ মানুহ। ময় আপোনাক কিমান মরম করে, গম পালে ন হয়?' (বুঝতে পারলে, নাকি?')

শবুরও লক্ষ্মীবালাকে খুব ভাল লেগেছে—বড় সরল ও সাদাসিধে মানুষটি। দুজনের মুখের ভাষা আলাদা তবু একের অপরের কথা বুঝতে অসুবিধা হ'ত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে গল্প করত।

সেদিন লক্ষ্মীবালার কথা শুনে শবু দীপিকার অনুমানের কথা জানিয়েছিল। দীপিকার নাম শুনে প্রথমে লক্ষ্মীবালার মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল কিন্তু অনুমানের কথা শুনে আনন্দে উদ্বেল হয়ে নিজের বোনের মত জড়িয়ে ধরে বলেছিল—

'প্রথম ছোয়ালী হবা আগতে মোর ইমান হৈছিল। এটিয়া চিন্টা নাই, মাহী এটিয়া মা হব।'

লক্ষ্মীবালার প্রথম মেয়েটা বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে, কলেজ পড়ে। শিলংএ

থাকতে শবুরা সে মেয়ের বিয়ে হতেও দেখেছে। লক্ষ্মীবালার গ্রামে থাকতে অনেক কম বয়সে বিয়ে হয় কাকতীবাবুর সঙ্গে।

বিকেলে এসেছিল গুপ্ত গিন্নী। রোজ বিকেলে সে সেজেগুজে বেড়াতে বের হবেই দু বছরের ছেলেটার হাত ধরে। সব সময়ই সে ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগিয়ে থাকে। গুপ্তগিন্নী ঘরে ঢুকেই বলল—

'চল ভাই দিদি, মুখার্জী সাহেবদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি।'

গুপ্তরা সবাইকে সাহেব বলতে ভালবাসে, দীননাথকেও বলে লাহিড়ী সাহেব। গুপ্তর ছেলেটা বলল—

'মাছী, বিক্কু দাও।'

খোকার হাতে বিস্কুট দিতে দিতে শবু বলল—

'আজ আমাদের বাজারে যাবার কথা আছে। তার চাইতে বস চা খাও, গল্প কর।'

চা ও গল্পের ফাঁকে শবু একসময় নিজের কথা বলল। গুপ্ত গিন্নীর বাবা ডাক্তার, ব্যারাকপুরের দিকে এক হাসপাতালে আছেন। গুপ্ত গিন্নী বলল—

'খুব সুখবর। তবে শুধু অনুমানের উপর বসে থেকো না ভাই, এখানকার হাসপাতালে গিয়ে চেক্-আপ করিয়ে নিও। ডাক্তারদের কথামত চলা দরকার এ সময়।'

মেয়েদের পেটে নাকি কথা থাকে না। গুপ্ত গিন্নী চা খাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল বেড়াতে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। যদিও শবু তাকে বারণ করে দিয়েছে ঢাক না পেটাতে তবু সে যা গল্পবাজ না বললেই বোধ হয় ভাল হ'ত। তবে বাঁচোয়া এই যে গুপ্তগিন্নীর বন্ধুমহল আলাদা—গুপ্তসাহেবের অফিসের লোকদের বাড়ীতে, শবুর সেখানে যাতায়াত নেই।

গুপ্ত গিন্নীর কথামত হাসপাতালে গিয়ে চেক আপ করানোও হয়েছে—সেখানেও অনুমানের সমর্থন পাওয়া গেছে। মাসে একবার করে যেতে বলেছে।

তখন চলেছে বৈশাখ মাস। শীতের দেশ শিলংএ যেন বসন্ত নেমেছে। আনন্দ শুধু প্রকৃতিতে নয় শবুর মনেও। মা পদ্মিনী দেবীকে একটা চিঠি লিখে জানাতে হবে। তার আগে দীননাথ বলছিল—

'রেল এ্যাক্সিডেন্টের ক্ষতিপূরণের মামলায় একবার গৌহাটি যেতে হবে। সেই সঙ্গে কামরূপ কামাখ্যার মন্দিরও দেখে আসা যাবে। চল দুজনেই যাই।'

শবু বলল—'বেশ ভাল হবে, ঐ সঙ্গে পাঁচুকাকার সঙ্গেও দেখা করে আসা যাবে। আমার কাছে ঠিকানা আছে মালিগাঁও রেল কোয়ার্টারের। পরে মাকে সব লিখে জানাব।'

দীননাথ বলল—'শুনেছি ঋালুকবাড়ি মালিগাঁও সব কাছাকাছি জায়গা, তিন কাজই সেরে আসা যাবে।'

শবুর মনে আরো একটা আকাঙ্ক্ষা। বড়বৌদি বীণার তিন মেয়ের পর এক ছেলে পার্থ জন্মেছিল নেপালে থাকতে, সেখানে পশুপতিনাথ নাকি খুব জাগ্রত দেবতা। কামাখ্যাও ত খুব জাগ্রত দেবী, সেখানে শবু তার পূজা দিয়ে আসবে দেবীর আশীর্বাদ কামনা করে।

গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্রের ধারেই একটা অফিসে বিচারক বসেছেন রেল এ্যাক্সিডেন্টে ক্ষতিপূরণের মামলার নিষ্পত্তি করতে। সেখানে কিছু মৃত ও গুরুতর আহত ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজনরাও এসেছে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে দীননাথ তার ক্ষতির ফিরিস্তি দিল—সুটকেশ ভেঙেছে, বাক্স ডুবেছে গেছে, সচল রেডিও অচল হয়ে গেছে, কাপ ডিশ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, মানি ব্যাগ হারিয়েছে, নতুন এক জোড়া স্যাণ্ডেল হারিয়েছে।

'কোন আঘাত টাঘাত লেগেছে? ডাক্তার দেখাতে হয়েছে? ছুটি নিতে হয়েছে?' প্রশ্ন।

'না শারীরিক আঘাত তেমন কিছু নয় সামান্য কেটে বা ছড়ে যাওয়া ছাড়া। তবে মানসিক আঘাত নিশ্চয়ই লেগেছে, রাতে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখি।' অম্লান বদনে দীননাথ জানিয়েছিল।

'অনেকে ত জেগে জেগেও দুঃস্বপ্ন দেখে রাতে বা দিনে।' মাননীয় বিচারকের সহাস্য মন্তব্য। পরে বললেন—'আপনি বারোশ টাকায় দাবি জানিয়েছেন আমার ত মনে হয় তিন চারশ টাকাই যথেষ্ট।'

'হুজুরের যা বিবেচনা হয়।'

পরে যা হয় বিবেচনা করে পাঠিয়ে দেয়া হবে শুনে শবুরা অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। পথে শবু জিজ্ঞেস করে—

'তুমি অত লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বারোশ টাকা চেয়েছ, সে রকম ত কিছু হয়নি।'

'এটা আমাদের অফিসের উকিলের পরামর্শ, বেশী করে না চাইলে কিছুই পাওয়া যাবে না। আর আমাদের ভোগান্তি ত কিছু কম হয় নি? ওরা

বারোটা করে লিলি বিস্কুট ধরাতে পারে, আমরা বারোশ টাকা দাবি করতে পারি না ?'

শবুর ধারণা বিচারকের অনুমানই সত্যের কাছাকাছি।

কিছুটা পথ রিক্সায় গিয়ে শেয়ার ট্যাক্সিতে ওরা কামাখ্যা পাহাড়ে উঠেছিল, পাণ্ডাঠাকুরের নির্দেশমত শবু বাহান্ন পীঠের এক পীঠ দেবী কামাখ্যার পূজা দিয়েছিল ভক্তিভরে, পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ীতে মন্দির থেকে আনা প্রসাদও খেয়েছিল খুব তৃপ্তি করে। পাণ্ডাঠাকুরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিল। শুনল প্রতি বছর অম্বুবাচীতে এখানে বিরাট মেলা বসে।

সেখান থেকে মালিগাঁওতে গিয়ে পাঁচু কাকার বাড়ীতে উঠেছিল। কাকা বৌ ছেলে মেয়ে ও এক শালীকে নিয়ে বেশ সুখেই থাকেন।

পাঁচুকাকা বললেন—'কিরে শবু, ছোটবেলায় পড়ার সময় তোদের কত বকাবকি মারধোর করেছি মনে আছে? এখন তোরা সব কত বড় হয়ে গেছিস।'

শবু কিছুই ভোলে না। বলেছিল—

'কাকা, তুমি আমাকে কোনদিন মারো নি, মিতুকে মাঝে মাঝে মারতে ঠাকুমাও সেজন্য তোমাকে বকত।' বহু বছরের পুরোনো শৈশব স্মৃতি আজও শবুর মনে জ্বলজ্বল করে।

রাতটা কাকার কোয়ার্টারে কাটিয়ে, কাকা কাকীমাদের শিলং এ বেড়াতে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে তারা ফিরে গিয়েছিল। সেই দূর শিলং এর পাহাড়ে কোন আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত লোকের দেখা মেলে না। কিছুকাল পরে পাঁচুকাকা তার শালীকে একটা ইন্টারভিউ দেওয়াতে শিলংএ গিয়ে একদিন থেকে কথা রেখেছিলেন। কিন্তু তার অনেক আগেই শবুর জীবনে ঘটে গেছে সেই দুর্ঘটনা।

পাঁচ

গৌহাটিতে গিয়েছিল মাসের শেষ দিকে। কদিন পরেই মাস পয়লায় মাইনে পেয়ে শবু আর দীননাথ চলেছে মাসের বাজার করতে। এখানে হাট বাজার বসে রাতে। বাজারে মেয়ে দোকানীই বেশী। হেঁটেই যাতায়াত সর্বত্র—শুধু জি এস রোড দিয়ে বাস চলে আর কোন যানবাহন নেই। যারে

লিশ বাজার। ওক্‌ল্যাণ্ডে ওদের বাসা আর রাস্তার ওপারেই দীননাথের ফিস। এখানে মেয়ে পুরুষ সবাই বিকেলে কোথাও না কোথাও হেঁটে ড়িয়ে আসে—গা গরম হয় শরীর ভাল থাকে। শবুর পক্ষে একটু হাঁটা-টিও দরকার—ওকল্যাণ্ড থেকে পুলিশ বাজার সামান্যই দূর।

একটা নতুন অনুভূতি একটু একটু করে শবুর দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে। ী জীবনের পরম কাম্য, বিবাহিত জীবনের চরম সার্থকতা পায়ে পায়ে িয়ে আসছে। দেহের মধ্যে একটা নতুন প্রাণের অস্তিত্ব সে অনুভব চ্ছ। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনেও সে প্রস্তুত হচ্ছে এক নতুনকে বরণ রে নেবার জন্য। মাকে চিঠি লিখতে হবে। মেয়েরা সবার আগে মাকেই খবর জানায়। মা জানতে পারে মেয়ের 'শরীর খারাপ' হয়েছে। এ থার একটিই অর্থ মানব সমাজে প্রচলিত।

চড়াই উৎরাই পাহাড়ী পথ ভেঙে পায়ে পায়ে দুজনে পুলিশ বাজারের াঝে পৌঁছে ষ্টল থেকে সেদিনের বাংলা খবরের কাগজ নিল। পরে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে গিয়ে ফর্দমত জিনিষ পত্র ওজন করাতে লাগল।

একসময় শবু দীননাথকে বলল—'পানের দোকান থেকে একটা সাজা পান ে দেবে?'

তুমি ত বাড়ী থেকে পান খেয়েই বের হলে।'

দোকানে সব কি সুন্দর মশলাপাতি জর্দা কিমাম দিয়ে পান সেজে দেয়. ার খুব খেতে ইচ্ছে করছে' আদুরে গলায় শবু আবদার জানিয়েছিল।

চল তবে পানের দোকানে, ততক্ষণ এখানে জিনিষ পত্র ওজন হতে থাক' দীননাথ শবুকে নিয়ে সামনের একটা পানের দোকানে গিয়ে পান সাজতে ল।

দোকানীও বেশ ভাল করে পান সেজে দিয়েছে। পান মুখে নিয়ে শবু ার সঙ্গে লক্ষ্মীভাণ্ডারে ফিরেছে। সেখান থেকে দুই ব্যাগ ভর্তি করে আবার তাকে নিয়ে দুজনে বেরিয়ে ঢুকল উল্টোদিকের একটা কাপড়ের দোকানে। তখনই শবুর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল।

দোকানী কাপড়ের বাণ্ডিল নামিয়েছে। শবু দীননাথকে বলল—

'আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, চল বাড়ী যাই।'

দীননাথ বলল—'শরীর খারাপ লাগছে? এই ত. এক্ষুণি হয়ে যাবে, তুমি ণ এই টুলটায় বস।'

শবু বাধ্য মেয়ের মত টুলে বসল। তার মনে হচ্ছে মাথাটা ভীষণ ঘুরছে.

সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলছে। টুলের উপর থেকে এখনই গড়িয়ে পড়ে যাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। এক্ষুণি শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

'আর বসতে পারছি না, আমি চললাম' বলে শবু টুল থেকে উঠে টলতে টলতে দোকানের খদ্দেরদের ভিড়ে ধাক্কা খেতে খেতে দরজার দিকে এগোল চৌকাঠ পার হয়ে পা বাড়াতেই নীচু ফুটপাথে ঠিকমত পা রাখতে না পেরে মাথা ঘুরে আছাড় খেয়ে পড়ল, দুচোখে অন্ধকার দেখল।

জ্ঞান ফিরে দেখল সে কোন এক ডাক্তারখানার টেবিলে শুয়ে আছে পাশে দীননাথ আর একজন ডাক্তারবাবু। শবু উঠে বসতে চাইলে ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন --

'না, না, উঠবেন না, আগে এই শরবৎটুকু খেয়ে নিন।' কম্পাউণ্ডারবাবু এসে শরবৎ খাওয়াতে থাকলে ডাক্তার আবার দীননাথকে বলল—'লক্ষণ দেখে ত মনে হচ্ছে প্রেগ্‌নেন্সী আছে।'

দীননাথ মাথা নেড়ে সায় দিল, হ্যাঁ।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন --

'এ অবস্থায় পড়ে যাওয়া খুব খারাপ। আপনার কোথাও কোন আঘাত লেগেছে কি?' শবু কিছু বলতে পারল না দেখে বললেন 'এমনি এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আমি এখন একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছি, পারেন ত একটা গাড়ী করে বাড়ীতে নিয়ে যান। পেটে যদি ব্যথা হয় বা কোন অস্বস্তি বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। বা হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।'

দীননাথ ফোন করে অফিসের গাড়ীটা আনালো। দীননাথের সাহায্যে শবু গাড়ীতে উঠতে উঠতে এক নজরে বুঝতে পারল ডাক্তারখানাটা কাপড়ের দোকানের খুব কাছেই। তখনও তার পড়ে যাবার জের হিসেবে জমে যাওয়া ভিড় নানা জটলায় ভাগ হয়ে আছে। কেউ বলছে—'কিতা পান খাওয়াইছে বা, কোয়াই গুপারী স্পেশাল জর্দা দিয়া মিশাইয়া, একেবারে মাথা ঘুরাইয়া রাস্তাত আনি ফালাইছে।'

কেউ বলছে—'ডাঙর মানুহ ন হয়? ফোন করিছে গাড়ী পঠাবলৈ, গাড়ী আহিছে।'

শবুর তখন লজ্জায় 'মা-ধরণী দ্বিধা হও' অবস্থা।

ডাক্তারের আশঙ্কাই ঠিক হয়েছিল। পরদিন থেকেই শবুর পেটে

কি অসহ্য ব্যথা আর যন্ত্রণা। মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি পেটের ভিতর করাত দিয়ে সব কিছু কেটে তছনছ করে ফেলছে। দশটা দিন যে শবুর কি ভাবে কেটে গেল ভাল করে মনে করতে পারে না! একদিকে চলেছে ডাক্তার ওষুধ ইঞ্জেকশন আর অন্যদিকে দীননাথ ও হরেন করের বৌ অর্চনার অক্লান্ত সেবা। সকলের চেষ্টায় শবু সেরে উঠল—কিন্তু আর একটি জীবনের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা প্রাণের রসে সিঞ্চন করা একটি প্রাণ দিনের আলো দেখার আগে, পূর্ণ অবয়ব না পেতেই শবুর দেহের রক্তের স্রোতে ভেসে গেল।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—'উনি ত সেরে উঠলেন। কিন্তু যা ওলট পালট হয়ে গেল, আবার যদি কোন সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেখানে মিসক্যারেজের সম্ভাবনাই প্রবল থাকবে।'

দুঃখে বেদনায় আত্মগ্লানীতে তার মরে যেতে ইচ্ছে করেছে. দিনের পর দিন কেঁদে ভাসিয়েছে। অর্চনা, লক্ষ্মীবালা, দীপিকা, গুপ্তগিন্নী সবাই তাকে এসে এসে সান্ত্বনা দিয়েছে, আশায় বুক বাঁধতে বলেছে।

দীননাথও তার চোখের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—'তুমি অত ভেঙে পোড়ো না. ডাক্তাররা অমন বলেই থাকে।'

শবু ক্ষোভে অভিমানে কেঁদে বলেছে—'আমি যে মাকে চিঠি লিখব ভেবেছিলাম, এখন আমি কি লিখব?'

নিজেদের জীবনের এতবড় ক্ষতি হয়ে গেল তবু দীননাথ কাঁদে নি. শবুকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে—

'এখন কিছু লিখে কাজ নেই. থাকাতে রয়ে সয়ে বোলো।'

চিরঅভিমানী শবু নিজেকেই নিজে ক্ষমা করতে পারে নি, দ্বিগুণ অভিমানে কেঁদে বলেছে—'না, বলতে পারব না। বললে মা মনে আরো কষ্ট পাবে। আচ্ছা, আমার উপর তোমার রাগ ধরছে না? আমার জন্যই এমন হল, আমাকে তুমি বকো. খুব করে বকো।'

দীননাথ শান্ত ভাবে জবাব দিয়েছে—'তোমার কি দোষ বল? আমাদেরই উচিৎ ছিল কাঁচা সুপুরী দিয়ে পান সাজতে বারণ করা। এখানে সবাই কাঁচা সুপুরী খায়—তোমার পানেও তাই দিয়ে দিয়েছে। কাঁচা সুপুরী খেলে মাথা ত ঘুরবেই। এটা নেহাৎই দুর্ঘটনা একটা।'

তবু শবুর মন শান্ত হয়নি, বলেছিল—'আমার একটা কথা রাখবে? এ কথা তুমি কাউকে বলতে পারবে না, আমার দিব্যি রইল। সে রকম সময়

সুযোগ পেলে আমি শুধু মাকেই একথা বলব, আর কাউকে না। সবাই আমার অসাবধানতার জন্য দোষ দেবে। তার চাইতে সকলে জানুক আমি বাঁজা, নিঃসন্তান।'

দুঃখিত দীননাথ বলেছিল—'আমি ত জানি তুমি বাঁজা নও। তুমি আর মন খারাপ কোরো না। তুমি যখন বলছ তখন না হয় কাউকে বলব না, তবে কাঁচা সুপুরী খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার কথাটা বলতে কোন দোষ নেই তা। সব কথা মনের মধ্যে চেপে রাখা খারাপ।'

এক সময় শবুর মনে হয়েছিল, যে পান খাওয়ার জন্য এমন দুর্ঘটনা হ'ল সেই পান খাওয়াই ছেড়ে দেবে। পরে মনে হয়েছে, মা বলেছে সধবা সতী লক্ষ্মী, পান খেতে হয়। সত্যিই ত, পানের কি দোষ? মা শবুকে সাব করে দিয়েছিল সাবধানে চলাফেরা করতে একটা বছর। আর এই এক বছরেই দু দুটো দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার জীবনে—দুটোই পথের দুর্ঘটনা। শবু মনে মনে কাঁদত আর বলত—মাগো, আমি তোমার কথা শুনিনি তাই আমি সব পেতে গিয়েও হারালাম—অবাধ্য মেয়েটাকে তুমি ক্ষমা কোরো মা— জানিনা সব কথা তোমাকে বলার মত মনের বল ভগবান আমাকে দেবে কি না

জীবনের কত কথা না বলা থেকে যায়।

এর পর থেকে দীননাথ একদিকে শবুর মন ও শরীর ভাল করার জন্য ছুটির দিনগুলোতে শিলংয়েই নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত। এমনিতে সুন্দর শৈলশহর হিসেবে শিলংয়ের নাম আছে। কত রকমের পাইন গাছ আছে সেখানে—উঁচু নীচু পাহাড়ে, সবুজে, নানান রঙের পাহাড়ী ফুলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আছে একটা পাহাড়ী নদী উমখ্রা, একটা লেক, পোলো গ্রাউন্ড রেস কোর্স, গল্ফ লিঙ্ক, আপার শিলং, এলিফ্যান্টা ফল্‌স্‌, বড়াপানির জলা গ্যারিসন গ্রাউন্ড। এ ছাড়া রাজভবন, এ্যাসেম্বলী, সেক্রেটারিয়েট, রেডিও ষ্টেশন, এমন কি দুটো সিনেমা হলও। আছে টাউন হল। রবীন্দ্র পাঠাগার থেকে ভাল ভাল বাংলা বই এনে দিত শবুকে পড়তে।

সুন্দর প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় শবুর শরীর সেরে উঠতে দেরী হয় নি কিন্তু মনের ক্ষত কি নিরাময় হয়েছিল?

আর একদিকে দীননাথ ক্ষেপে উঠেছিল চাকরি ছেড়ে দেবে বলে— এখানে তাদের মন টিকছে না। প্রথমে বদলির জন্য দরখাস্ত করল মনের অবস্থার কথা জানিয়ে। ততদিনে কলকাতা অফিসের চাটুকার প্রোমো

পেয়ে দিল্লীতে গিয়ে বসেছে। সেখান থেকে নানা কলকাঠি নেড়ে দীননাথের কলকাতায় বদলিতে বাধা দিয়েছে।

রেগে মেগে মাস্টারী করবে বলে শিলংয়েই বি. টি. কলেজে ভর্তি হয়েছে। রোজ তিন মাইল পথ পাহাড় ডিঙিয়ে কলেজে ক্লাশ করেছে আবার চাকরিও বজায় রেখেছে কোন রকমে। একবছরের কোর্সে বি. টি সে পাশও করেছিল।

কিন্তু সহজে মাস্টারী পাবে কিনা, পেলেও তাতে পেট চলবে কিনা চিন্তা করে বাড়ীটা সম্পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। দরকারে একটা অংশ ভাড়া দেয়া যাবে। প্রথমবারে কলকাতা গিয়ে বাড়ীর অপর অংশটা কোন-রকমে দাঁড় করাতেই সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে ছুটিও।

আর এই ঘর করতে গিয়েই দীননাথ সেবারে ভিৎপূজো করিয়েছিল পুরুত ডেকে।

ত দুটো দুর্ঘটনায় দীননাথের মনের জোর তখন কমে গেছে।

কাজ শুরুর প্রথমদিকে এক বিকেলে দিদি কিন্তু বেহালার বাসায় স্বামী ও ছেলে মেয়েকে রেখে বোনের কাছে বেড়াতে এসেছিল দুদিন থাকবে বলে। দু দিনের জায়গায় তাকে দশ দিন থাকতে হল কারণ পরদিনই তার জ্বর হয়ে পক্স বেরিয়ে পড়ল। একদিকে বাড়ীতে সিমেন্ট বালি ইট চুন সুরকি মিস্ত্রি মজুরের কাজ তার উপর ঘরে পক্সের রুগী। তবু দিদি ত, শবু তার যথাসাধ্য সেবা যত্ন করেছে।

দিদি ত মায়েরই মত। শবু একদিন ভাবল—শিলংয়ের ব্যাপারটা দিদিকে বলে মনটা হাল্কা করি। সেই ভেবে শবু বলেছিল—

'জানিস দিদি, গত গরমের সময় শিলংএ আমার কি হয়েছিল?'

দিদি কিন্তু বলে উঠল—'আমার এখন ওসব শুনতে ভাল লাগছে না। আমি যদি মরে যাই আমার স্বামীকে ছেলে মেয়েকে কে দেখবে? বাবুল আমার একটিই ছেলে, দুটি নেই। ওর যদি কিছু হয় আমি তবে কি করে বাঁচবো। আমি এই অসুখে যদি মরি দুঃখ নাই, বাবুলের যানো কিছু না হয়' বলে কান্না শুরু করে দিল।

সেই মুহূর্তে শবুর দিদিকে খুব স্বার্থপর মনে হয়েছে। কোথায় নিজের দুঃখের কথা বলে একটু সহানুভূতি পাবে আশা করেছিল, উল্টে দিদিই উটকো মরাকান্না জুড়ে দিল। বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলল—

'কাল্পনিক দুঃখে তুই মরাকান্না শুরু করলি, তোর ছেলে মেয়ে আছে,

আর আমার অবস্থা কি তুই ত জানিস। আমার কান্না কে দেখে? তুই যত ভাবছিস, ছেলে বা তার বাবা কি তা ভাবছে? ভাবলে দু দিনের জায়গায় এখানে দশদিন তুই আছিস কেউ একবার দেখতেও এল না পক্স হয়েছে খবর দিয়ে চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও।'

দিদি লজ্জিত হয়ে বলেছিল—'না, এমনি মনে হল তাই বলছিলাম—আমার ভুল হয়ে গ্যাছে। তুই যানো কি বলছিলি?'

শবুর আর সবটা বলার প্রবৃত্তি হয়নি, শুধু বলেছে—'কাঁচা সুপুরী খেয়ে রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম।'

বারো দিনের মাথায় ঘা ভাল করে না শুকোতেই দিদি বেহালায় চলে গেছে। দিদিরও হয় ত মানে লেগেছিল—ঐ যে শবু বলেছে দু দিনের জায়গায় দশদিন। সে ত আর সেভাবে বলে নি। একটা কথারই কত অর্থ হয়!

দিদি যাবার কদিন পরেই মেদিনীপুর যাবার পথে ভব এসেছিল—আর এসেই তারও পক্স হল। আশ্চর্য, ঐ একই ঘরে ভোলা থাকে তার কিছু হয় নি। কদিন আগে দিদি এসে পক্স হয়ে ঐ ঘরে থেকে গেছে শুনে ভব ঠাট্টা করে ছড়া কেটেছিল—

'মাসী এসে বেড়িয়ে গেল
রোগের পুঁটুলি রেখে গেল।'

শবুও জবাব দিয়েছে—'সেবার তোমার দিদি শেফালী পক্স নিয়ে এসেছিল তাতে আমরা ভুগলাম। এবার তুমি ভোগো—যা যা করেছ এক এক করে তার ফল এমনি করে পাবে।'

সারা গায়ে পক্সের গুটি নিয়ে দাঁতে নখ খোঁটার পরিবর্তে নখ দিয়ে ঘা খুঁটতে খুঁটতে দেঁতো হাসি হেসে ভব বলেছিল—'বাঃ, বেশ বলেছ।'

ভবও দশদিন আটকে পড়ল। সুবিধে হয়েছিল দীননাথের ঘর তৈরী করাতে। ভব শুয়ে বসে মিস্ত্রিদের কাজ, সিঁড়ি ও ছাদের সেণ্টারিং ডিজাইন সব দেখিয়ে দিয়েছে। শবুর খাটনি বেড়েছে, একমাস ধরে বাড়ীর কাজের ঝামেলার সঙ্গে সঙ্গে দু দুটো বসন্তের রুগীর সেবা করতে হয়েছে।

ষষ্ঠীতলায় বেড়াতে গিয়ে দীননাথ শুধু কোয়াই পান আর পড়ে যাবার কথাটাই বলেছিল। ছোটকাকা বলেছিলেন—

'আমি ত আসামে গেছি, কোয়াই সুপুরীও খেয়ে দেখেছি—ভীষণ ধক। মাথা ঘুরে যায়।'

শবুর পড়ে যাবার কথায় বাবু পুটু নীলা বেলা মজা পায়, বলে—

'মেজদি, কেমন করে পড়ে গেলি একবার দেখা ত।' মেজদি গেলেই বেশ রগড় হয়, এটাও নিশ্চয় একটা মজার ব্যাপার।

সেও মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে, অন্তরে ক্ষত বিক্ষত হয়েও মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে পড়ে যাবার ভান করে দেখিয়েছে। সবাই মজা পেয়ে হাত তালি দিয়ে নেচেছে আর বলেছে—

'মেজদি এমনি করে দুম পটাস্ হয়ে গেছে।'

শুধু কাকীমা বলেছেন—'এই, অমনি করে পড়ে যাওয়া দেখাসনে শবু, মেয়ে মানুষের কোথায় কখন লাগে তার ঠিক নেই।'

কাকা হেসে বলেছেন—'হুঁ হুঁ, সেবার টেবিলে ধাক্কা লেগে নেলার পেট ফুটো হয়ে গিয়েছিল—কত ডাক্তারবদ্যি চিকিৎসা করাতে হল।'

ঠাকুমা শুধু চোখ দুটো পিটপিট করেছেন।

না, ঠাকুমা কাকীমাকেও শবু তার রুদ্ধ কান্নার ভাগ দিতে পারেনি।

একবারেই বাড়ীর কাজ শেষ হয় নি। পরের বছর শীতের সময় এসে আর এক দফায় ঘরের প্লাষ্টার ও মেঝে করে চুনকাম করা হয়েছিল। তিন বছর হয়ে গেলেও দীননাথ লিখে লিখে কলকাতায় বদলি করাতে পারেনি। মাষ্টারীর জন্য দরখাস্তও অফিস আটকে দিয়েছে। চাকরি ছাড়তে দেবেনা, কলকাতায় বদলি করবে না—তবে কি বেঁধে মারবে? শেষে মরীয়া হয়ে দরখাস্ত করেছিল—আন্দামান আর কাশ্মীর ছাড়া যেখানে খুশি বদলি কর, আর একদিনও শিলং এ থাকতে রাজী নই। উত্তরে পুজোর পরে জানিয়েছিল দীননাথের বদলির বিষয় সক্রিয় বিবেচনাধীন। দীননাথ মনের আনন্দে লক্ষীবালাদের অত সুন্দর বাসা ছেড়ে দিয়ে পয়লা জানুয়ারী থেকে আবার তিন-মাসের ছুটি নিয়ে নিজেদের বাড়ীতে এসে বসেছিল—সক্রিয় বিবেচনার অর্থ এবার বদলি তার হবেই।

না, তিন মাসেও বদলি হয়নি। ছুটি বাড়াবার দরখাস্ত করলে টেলিগ্রাম এল—আর ছুটি নয়—এক্ষুণি ফিরে এস।

আরো তিনটে মাস শিলং এ অন্য একটা বাড়ীতে কষ্ট করে থেকে তবে বদলির অর্ডার পেয়েছিল—পাটনায় যেতে হবে। রাঁচির সেই গোপেন গুপ্ত প্রোমোশন পেয়ে এলে তবে দীননাথ মুক্তি পেল।

ছয়

শুধু মুক্তি নয়, যেন একটা বিয়োগান্ত নাটকের অবসান। সকাল আটটার মধ্যেই রওনা হতে হবে, ট্যাক্সিতে যাবে গৌহাটি, সেখান থেকে প্লেনে চড়ে কলকাতা, তারপর ট্রেনে পাটনায়। ভোর থেকে নেমেছিল মুষলধারে বৃষ্টি, চলেছিল অবিশ্রান্তভাবে শিলং এর গণ্ডি পার হওয়া পর্য্যন্ত।

হরেন কর বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ট্যাক্সি ডেকে এনেছিল। বৃষ্টির মধ্যেই মালপত্র তুলে শবুদের গাড়ীতে উঠিয়ে হরেন নমস্কার করে বিদায় নিয়েছে।

বিদায় শিলং। সুখ দুঃখের চারটি বছর পিছনে ফেলে রেখে আবার এগিয়ে চলা। প্রবল বৃষ্টিতে একটু নেমে বা গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে লক্ষ্মীবালা অথবা কারো সঙ্গে দেখা করা যায় নি। প্রায় সবার অগোচরে শিলং থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। চিরদুঃখিনী শবু তার বহু আকাঙ্খিত প্রথম সন্তান সন্তানা বিসর্জন দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে চিরতরে শিলং ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলে বুঝি শিলংএর প্রকৃতি কেঁদে তার সমবেদনা জানাচ্ছিল। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শবুর চোখেও নেমেছিল—অবিরাম অশ্রুধারা। দীননাথও বেদনায় সহানুভূতিতে পাশে বসে শবুর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বৃষ্টিভেজা শিলংএর দিকে তাকিয়েছিল নির্নিমেষে। কারো মুখে সরে নি কোন কথা। শবুর জন্মদিনেও ধরণী এমনি ভাবে কেঁদেছিল—সেদিনও শবু কথা বলতে পারেনি, শুধু কেঁদেছিল—সেই ছিল তার কান্নার শুরু।

আরো ছ সাত মাস পরে শবু মাকে কথাটা বলেছিল পাটনায়। শীতের শুরুতেই মা গুরুতর অসুস্থ সংবাদ পেয়ে শবু মন্দির শহরে গিয়েছিল মাকে দেখতে—একাই। অফিসের কাজের জন্য দীননাথ যেতে পারেনি, হাওড়া পর্য্যন্ত এসে শবুকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। মা একটু সামলে উঠতে শবু প্রায় জোর করে মার হাড় জিরজিরে দেহখানা তুলে নিয়ে একাই পাটনার পথে রওনা হয়েছিল ভাল সেবা শুশ্রূষা বিশ্রাম ও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য। বাবা গিরিনবাবু অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুমা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—

'ওরে শবু, এমন দুঃসাহস করিস নে। তোর মার শরীরে ত মাত্র কখান'

হাড় অবশিষ্ট আছে, এতখানি দূরের পথ যেতে পথের ধকলেই হয়ত তোর মা মারা যাবে। তুই একা মেয়েমানুষ কোনদিক সামলাবি? তোর মার যদি কিছু হয় তবে নন্দু কানাই তপুকে কে দেখবে? শেষে তুই হয়ত তোর মায়ের মৃত্যুর কারণ হবি।'

শবু কোন বাধা মানে নি। মাকে সযত্নে পাখীর ছানার মত বুকে তুলে নিয়ে পাটনায় এসেছিল। পাটনায় এসে মা পদ্মিনী দেবী খুব দ্রুত সেরে উঠেছিলেন শবুর প্রাণপ্রাণ যত্নে ও পরিচর্য্যায়। একমাসের মধ্যে শবু মাকে নিয়ে গিয়ে পাটনার অত উঁচু গোলঘরের চূড়ায় উঠিয়েছে, পৌষ সংক্রান্তিতে কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে এনেছে।

শবুরা তখন থাকত রাজেন্দ্র নগরে গ্যারেজের উপর ছোট একখানি ফ্ল্যাটে বাড়ীর মালিক ধনপতি বাবু তার স্ত্রী যোগমায়া দেবী ও ছেলেমেয়েরা এসে এসে ডাক্তার বাবুর স্ত্রীর খোঁজ খবর নিত রোজই।

ফেব্রুয়ারীর অর্ধেক যেতে বসন্তের হাওয়া দিতে শুরু করেছিল একটু একটু করে। দক্ষিণমুখো ফ্ল্যাটটাতে প্রচুর রোদ আলো হাওয়া। মার শরীর তখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ঘরের একটা ঘুলঘুলিতে দুটো চড়ুই এসে বাসা বাঁধতে লেগেছে। তাই দেখে কাজের ঝি (এখানে বলে 'দাই') চৌদ্দ পনেরো বছরের সরস্বা বলেছিল—

'ইয়ে চিড়িয়া লছমী হোতি হ্যায়, ইস্‌কো খদেরনা নেহি চাহিয়ে।'

যোগমায়া দেবীও বলেছিল—'ঘরে চড়ুই পাখীর বাসা বাঁধা শুভলক্ষণ, সৌভাগ্যের কথা। গৃহস্থের মঙ্গল হয়। আমাদের ঘরে কিছুতেই বাসা বাঁধে না।'

মা পদ্মিনী দেবী বললেন—'শবু, তোদের চাঁপাতলার বাড়ীতেও চড়ুই বাসা বেঁধেছিল, তাই না?'

সকলের সব কথা শুনে শবুর মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, একবার দুদিন আসছিল কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারেনি। সেবার চড়ুইয়ের বাসা ভেঙেছিল দীননাথ, এবারে কিছুতেই ভাঙতে দেবে না যত অসুবিধে করুক।

যোগমায়া দেবী ও সরলা চলে যেতে শবু মাকে বলেছিল এতদিনের গোপন করা সেই দুঃখের কথা। বলেছে—

'শোনো মাগো, তোমাকে একটা কথা বলি, কাউকে বলবে না। এতদিন যে কথা আমরা কাউকে বলিনি, তোমাকেও বলিনি তোমরা দুঃখ পাবে বলে। চড়ুই পাখীর বাসা বাঁধা, মঙ্গল, সৌভাগ্য এসব শুনে ভাবছি এখন তোমাকে সেকথা বলা দরকার।

'সেবারে ভব সোনার পৈতের সময় সবাই রব তুলল চড়ুইয়ের বাসা ভাঙ। আমার কথা কেউ শুনল না। হুজুগে পড়ে তোমার জামাই নিজে হাতে সে বাসা ভাঙল, বাসার জায়গাটা ইট দিয়ে বন্ধ করে দিল। গরম পড়তে অনেকে বলল, গাঁটুকে স্নান করানো দরকার, না হলে হয়ত পাগল হয়ে যাবে। যেই শোনা অমনি তোমাদের জামাই তাকে স্নান করাতে লেগে গেল। কুকুর ত, জলের কাছে যেতে চায় না, তাকে ধীরে সুস্থে স্নান করাতে হয়, বাবা যেমন করে পিটারকে স্নান করাত। তা নয়, দুপুরে তার মুখের সামনে খাবার ধরে দিলে যখন কুকুরটা খেতে থাকে তখন আচমকা তার গায়ে এক বালতি জল ঢেলে দিত। কুকুরটা খাবার ফেলে পালায়। আমি বলি, খেতে দিয়ে বিরক্ত কর কেন? আমার কথা কেউ শোনে নি। এবার ও দেখে এলাম ভোলা গাঁটুকে বেঁধে রেখে মোটা লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। বললাম—বেঁধে মারিস কেন, তোকে যদি কেউ এমনি করে মারে কেমন লাগবে? ভোলা বলল—ওটা বদমাশ হয়ে গেছে, দিদিমার হুকুম আছে ওকে মারার। কাত্তিক অঘ্রানের কুকুর তার আবার ভাল মন্দ!

'যে বাড়ীর লোকেরা কথায় কথায় পশুপাখীদের এত হেনস্থা করে সে বাড়ীতে ভালটা হবে কি করে? সেই পাপে আমরা ঘরে বসে নিশ্চিন্তে খেতে পাচ্ছিনা, বারবার শিলং পাটনা ঘুরিয়ে মারছে। আর তাইতেই বুঝি আমি সব হারালাম' বলতে বলতে শবু কান্নায় অধীর হয়ে পড়ল।

মা এতক্ষণ নীরবে সব শুনছিলেন। শবুকে কাঁদতে দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

'কি হারালি তুই, কিসের কথা বলছিস তুই আমাকে সব বল।'

শবু আরো কেঁদে বলল—সেই কথাই ত বলব, সে কথা বলতে দুঃখে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।'

বলে একটু একটু করে দীপিকার অভিমান থেকে আরম্ভ করে শিলংএ ঘটে যাওয়া বেদনার অধ্যায় বলে গেল। মা নন্দিনী দেবী স্তব্ধ হয়ে গালে হাত দিয়ে শুনছেন আর তাঁর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে।

শেষে কেঁদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন—'এতবড় একটা ঘটনা এতদিন মনের মধ্যে চেপে রেখেছিস, আমি মা—আমাকেও জানাস নি?'

শবু বলেছিল—শুধু নিজেদের ভুলে আর অসাবধানতায় যে মাশুল দিতে হল, মনের দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে সে কথা তোমাকেও বলতে পারিনি। মা গো, ঐ বছরটা তুমি আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছিলে, আমি তোমার

কথা শুনিনি, তাইতেই আমি পেয়েও সব হারালাম।'

মা ছোট মেয়ের মত শবুকে আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—

'তুই ত ইচ্ছে করে জেনে শুনে কিছু করিস নি, এ সবই হল দৈব ; কাঁদিসনা মা, নিজের উপর অভিমান করে থাকিস না। মন শান্ত কর, ভগবান হয়ত আবার দেবেন। তুই আমার ছেলের কাজ করলি, মরণের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিস, আমাকে কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করিয়েছিস। দীনু আমার ছেলের চাইতেও বড়। ভগবানের উপর ভরসা রাখিস।

'সন্তান থাকা অবশ্যই দরকার, মেয়েমানুষের প্রধান কামনাই হল সন্তান লাভ করা। আমরাও তোদের কথা সব সময় ভাবি। আবার সন্তান থাকলেই কি সব সময় সুখ হয়? আমারও ত দুটো তিনটে পেটে নষ্ট হয়ে গেল, ভাবু অকালে চলে গেল, নন্দু ঐ রকম হয়ে আছে, এখন আবার মিতু জামাই এর সঙ্গে ঝগড়া করে এক ছেলে নিয়ে ঘাড়ে এসে চেপেছে আর দিনরাত অশান্তি করছে। ছেলে মেয়ে নিয়ে কি সুখেই আছি বল? এখন একমাত্র শিবরাত্রির সলতে বলতে কানাই।

'তাই বলছি শবু, ছেলে মেয়ে নেই বলে মনে কোন দুঃখ রাখিস না।'

মার কথায় শবু মনে বল ফিরে পেয়েছিল, বলেছিল—'সবাই জানে আমি শিলং-এ পান খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম, সবাই শুনে হাসে। আমরাও হাসির মধ্যে দিয়ে মনের দুঃখ গোপন রাখি। মাগো, তুমি কিন্তু আর কাউকে একথা বোলো না।'

মা কথা দিলেন—'আচ্ছা, বলব না।'

তিনমাসের মধ্যে শবু মাকে সুস্থ সবল করে ঠাকুমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল—

'এই নাও ঠাকুমা, তোমার ছেলের বৌ।'

ঠাকুমা দুহাত তুলে শবুকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। বাবার চোখে শবু দেখেছিল খুশির আলো।

সেই খুশি ও আশীর্বাদের ফলে কিনা সে জানে না, সেই বছরই বর্ষার সময় মনে আবার আশা জেগেছিল। এক সন্ধ্যায় নেমেছিল মুষলধারে বৃষ্টি। দীননাথের সে রাতেই অফিসের কাজে পাটনা থেকে রাঁচী যাবার টিকিট কাটা ছিল। টিকিটের টাকা লোকসান দিয়ে সেরাতে রাঁচী না গিয়ে দীননাথ শবুকে নিয়ে ক্যাপামীতে মেতে উঠেছিল।

আবার ফলের আশা, প্রাণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ছ মাস যেতেই আবার সব ভেসে গিয়েছিল। অফিসের ডাক্তারনী মিসেস্ সিন্হার চেম্বারে গিয়ে শবু কেঁদে বলেছিল—

'যেমন করেই হোক নষ্ট হতে দেবেন না।'

ডাঃ সিন্হা সমবেদনার সুরে বলেছিল—'পাষ্ট হিস্ট্রি যা শুনছি আর যা দেখছি তাতে আপনাকে কোন আশা দিতে পারছিনা। যা সব আপসেট্ হয়ে আছে মিস্ক্যারেজ থেকে বাঁচানো যাবে না।'

সেই শেষ। তারপর থেকে শবুর জীবনে আর স্বপ্ন দেখার সুযোগ ঘটে নি।

এ সব কথা এখন ভাবতে গেলে তার মনে হয় যে দুর্ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে তার পর তার বেঁচে থাকাই একটা দুর্ঘটনা। তবু চির অভিমানী শবু সে দুঃখ বুকে নিয়ে আজও বেঁচে আছে।

পরে তাকে জীবনে আরো অনেক কিছু হারাতে হয়েছে।



পর্ব—২

এক

কথায় বলে বারো বছরে এক যুগ। এই এক যুগের মধ্যে আগের দু-দুটো দুর্ঘটনার চাইতেও বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তার জীবনে। মাত্র দেড় বছর আগে শবু তার মাকে হারিয়েছে।

রাত সাড়ে আটটার গাড়ীতে তারা দুজন পাটনা স্টেশন থেকে রওনা হয়েছিল আর রাত নটায় পাটনা সিটি আসার আগে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা ও আবেগে শ্রান্ত অবসন্ন শবু তন্দ্রার ঘোরে মাকে দেখেছিল, মা বললেন--

'শবু, তুই এসেছিস? এবার আমি আবার ভাল হয়ে উঠব। আমার শরীরে এখন আর কোন অসুখ নেই।'

সেদিনও ছিল শুক্রবার, আষাঢ শেষের অমাবস্যা রাত, তার দুদিন পরেই রথ। হঠাৎ দুপুরে কানাই এর কাছ থেকে 'মাদার সিরিয়াস কাম উইথ অমদি' টেলিগ্রাম পেয়ে সেই রাতেই শবু আর দীননাথ রওনা হয়েছিল মন্দির শহরের উদ্দেশ্যে—মাকে দেখবে বলে। মাকে দেখা হয়নি···।

কি করে যে কি ঘটে গেল ভাবতে গেলে শবুর চোখে শুধু অশ্রু বন্যাই নামে না—মনে হয় বুকের হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি উপড়ে আসবে।

সেবার মাকে সুস্থ সবল করে কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে বাবা ঠাকুমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সকলের আশীর্ব্বাদ নিয়ে শবু ফিরে গিয়েছিল পাটনায় তার স্বামীর কাছে। মনে তখন তার অসীম তৃপ্তি। ফেরার সময় তপু সঙ্গ নিয়েছিল, পরীক্ষার পর পাটনায় বেড়িয়ে আসবে বলে। মা পাটনা বেড়িয়ে এল আর সে যাবে না? মার সঙ্গে তপুর নাকে নাকে হিংসে।

আরো তিনমাস পরে তপুকে রাখতে গিয়ে শবু দিন পনরো সেখানে ছিল। বাড়ীর বড়বৌ ঘরে ফিরে আসায় ঠাকমা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আর নিশ্চিন্ত হয়েই বুঝি তিনি পরপারে তাঁর স্বামীর কাছে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হতে লেগেছিলেন। এমনিতেই বয়স তাঁর নব্বইয়ের কাছাকাছি। জীবনে সুখ সৌভাগ্য ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অকালে পতি বিয়োগ, স্বামীর ভিটে

থেকে উচ্ছেদের মত অসহ্য বেদনা, দুঃখ কষ্টের সংসার, শিশুনাতির মৃত্যু সবকিছু আকণ্ঠ পান করা হয়ে গেছে। বার্ধক্য জরা তাঁর দেহকে তখন একটু একটু করে ঘিরে ধরেছে। চিঠিপত্র আর পড়তে পারেন না। অনেক কিছুই ঠিকমত স্মরণ করতে পারেন না।

হয়ত রাত করে উঠে হাত মুখ ধুতে বসেন। শবু ঠাকুমার কাছে রাতে থাকে, জিজ্ঞেস করে—

'ও ঠাকুমা, কি করছ তুমি?'

'রাতের খাবার খেয়ে মুখ ধোয়া হয়নি, তাই মুখ ধুচ্ছি।'

'না ঠাকুমা, তুমি মুখ ধুয়েছ, আমিই ত তোমার মুখ ধুইয়ে দিলাম।'

'ঐ দেখ, আমি ভুলে গেছি।'

শবু ঠাকুমাকে ধরে এনে আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়।

এক ভোর রাতে উঠে ঘরে আলো জেলে তরকারি কুটতে বসে গেছেন। খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে শবু জিজ্ঞেস করল—

'ও কি করছ ঠাকুমা?'

'রান্নার সময় হয়ে গেছে, তরকারিগুলো কেটে কুটে ধুয়ে রাখি, বড়বৌমা একা সবদিক সামলাতে পারবে না।'

'আজ তোমার একাদশী, তুমি ত আজ মন্দিরের প্রসাদ ছাড়া কিছু খাবে না। এদিকে আমি আছি মিতু আছে তুমি কেন তরকারি কুটবে? ভাল করে সকালও ত হয়নি।'

'তাই বলছিস, তবে থাক। বড় বৌমার কষ্ট হবে, তাই।'

শবু আবার ঠাকুমাকে যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিল।

একদিন বিকেলে ঠাকুমা বললেন—

'আরে শবু, আজ আমার এখনো খাওয়া হয়নি. বড়বৌমাকে বল আমাকে খেতে দেবে।'

'ঠাকুমা গো, সকাল দশটা এগারোটায় তুমি খেয়েছ, আমি জায়গা করে তোমাকে নিয়ে গিয়ে আসনে বসালাম. মা খাবার বেড়ে এনে তোমাকে খেতে দিল, বরানগর থেকে চিঠি এসেছে সেই গল্প করল।'

নাঃ, সবই তাঁর ভুল হয়ে যাচ্ছে। এখন উঠতে বসতে তাঁর মুখে শুধু 'বড়বৌমা'। ততদিনে বড়কাকা রিটায়ার করে বালেশ্বর থেকে চলে এসেছেন বড় কাকীমাও এসেছেন দুই ছেলে শঙ্খ ও সঞ্জয়কে নিয়ে। কিন্তু ঠাকুমার

মুখে শুধুই 'বড়বৌমা'। মা আর মিতু মিলে ঠাকুমার দেখাশোনা করে, শবু ক'দিনের জন্য ঠাকুমার ভার নিয়েছে।

মা একদিন দুঃখ করে শবুকে বললেন—

'মা বোধ হয় আমাদের মায়া কাটিয়ে এবার চলে যাবেন। এ ক'দিনে মা মেজবৌকে ঠিক চিনেছেন, দিনান্তে একবারও তার নাম করেন না। সে চিনুন না চিনুন, তার চাইতে বড় কথা মা চলে গেলে এ বাড়ীতে আমার মন টিকবে না। একেই এ বাড়ীতে হাওয়া আসে না, এখানে এসেই নন্দর অসুখ করল। আবার ওরা দেখেছে একটু একটু করে অশান্তি পাকিয়ে উঠছে। মা গেলেই এ বাড়ীতে থাকি, এই বড় বাড়ীর মায়া, সকলের মায়া কাটিয়ে চলে যান— আমরাও তখন এ বাড়ী ছেড়ে ভাড়া বাড়ীতে গিয়ে উঠব।'

ক'দিন সেবা যত্ন পেয়ে শবুকে ঠাকুমা একদিন কাছে ডেকে বিদায় চাইলেন, ঠাকুমা বললেন

'শবু তুই আমার অনেক সেবা করলি, মাকে যত্ন পেয়ে ভাল করে তুললি। আশীর্বাদ করি তোর দীর্ঘ পরমায়ু হোক, শেষ দিন পর্যন্ত যেন তোর শাঁখা সিঁদুর বজায় থাকে।'

ঠাকুমার দু চোখে আনন্দাশ্রু নেমেছিল, শবুর চোখে বেদনার। কেঁদে বলেছিল—

'লম্বা পরমায়ু চাইনা ঠাকুমা, শুধু শাঁখা সিঁদুর যেন বজায় থাকে আমার।'

ঠাকুমা বলেছিলেন— অমন করে বলিস না, তোর মা কি এমন হয়েছে? আমারই এখন সব মায়া কাটাবার দিন হয়েছে, বড়বৌমা আদর করে ঘরে ফিরেছে এখন সবাইকে রেখে এখন আমার তাঁর কাছে যেতে চাই।'

সেদিন শ্বশুর ছেড়ে দেবার আগের সময় শবুর তাই মনে হয়েছিল, সত্যি ঠাকুমা বুঝি এবারে সকলের মায়া কাটিয়ে চলে যাবেন।

পাটনায় ফিরে মাত্র মাসখানেক যেতে বছরের কদিন পরে মার কাছ থেকে শবু চিঠি পেয়ে জানতে পেরেছিল—ঠাকুমা চলে গেছেন। বিয়ের পর পঁচিশ বছর ধরে যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হয়েছেন তাঁর বিচ্ছেদে বড় কাতর হয়ে কত দুঃখ করে মা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠি পড়ে শবুও কেঁদে আকুল হয়েছিল।

কদিন ধরে বারবার শুধু মনে হয়েছে পরম স্নেহময়ী ঠাকুমা চলে গেছে। সেই কোন অজপাড়াগাঁয়ের শ্যামলা মেয়ে, বাপ মা আদর করে নাম রেখেছিল

নিরু, নিঝ'রিণী, গ্রামে থাকতে সব সময় চোখে পিচুটি পড়ত, বিয়ে হল মহিম কান্তি মৈত্রের সঙ্গে, সমুদ্রের তীরে মন্দির শহরে এসে জল হাওয়ার গুণে তাঁর চোখের অসুখ সেরে গিয়েছিল। তাঁর মনে ছিল অদ্ভুত উদারতা। সবাই যখন তাঁর বাপের বাড়ীর গ্রামকে নিয়ে ফুটানিগঞ্জের হাট বলে হাসাহাসি করত ঠাকুমাও খিলখিল করে হেসে সে হাসিতে যোগ দিতেন। নাতি নাতনীদের জন্য ছিল অসীম স্নেহ ও দরদ, কাউকে মারধোর করা একদম পছন্দ করতেন না। এমন কি বাবা কখনো কানাইকে মারতে গেলে নিজে ছুটে গিয়ে বাধা দিতেন। এখনো মনে পড়ে বাবাকে ঠাকুমা বলছেন—

'ওরে গিন্নিন, তোরাও ঐ রকম ছিলিরে।'

মা চলে যাবার ছ বছর আগে ঠিক রথের সময়টিতেই ঠাকুমা চিরবিদায় নিয়েছেন।

ঠাকুমার শোকে শবু যখন কাতর সেই সময় এক সন্ধ্যায় পাটনার বাসায় এসেছিল রবি মাস্টার। নাম তার রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য—স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক। বিজ্ঞানের ছাত্র, অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ পৈতৃক সূত্রে জ্যোতিষী বিদ্যায়ও দখল আছে, কথা বলার গুণে সবাইকে মোহিত করে রাখতে পারে, মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারে, চা, পান, সিগারেট, নস্যি, দোক্তা, খৈনী কোনটাতে অরুচি নেই। বয়সে দীননাথের থেকে বেশ বড় কিন্তু বন্ধুত্ব প্রায় সমানে সমানে।

একদিন মাস্টার বলেছিল এক নেশাখোর মামার গল্প। নেশার ঝোঁকে এমন সব আজগুবি গল্প ছাড়ত যে হজম করাই মুস্কিল। সেজন্য তাকে সামাল দিতে তার ভাগ্নে সব সময় সঙ্গে থাকত।

একদিন এক নেশার আড্ডায় মামা গল্প জুড়েছে—আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে দেখি পথ আগলে পড়ে আছে এক বিরাট গুঁড়ি। ঠেলে সরাতে গিয়ে দেখি কাঠের গুঁড়ি নয়, বিরাট এক বানরের ততোধিক বিরাট লেজ সেটি—তা প্রায় দু মাইল লম্বা হবে।

পাশে থেকে ভাগ্নে চিমটি কাটল—বড্ড বেশী হয়ে গেল, মামা।

—আচ্ছা না হয় এক মাইল।

আবার চিমটি।

—আচ্ছা ধর আধ মাইলই হবে।

আবার চিমটি খেয়ে বিরক্ত মামা বলল—আচ্ছা, তবে এক ফার্লংই হবে,

আর কম করতে পারব না। ডু ইউ মীন টু সে মাঙ্কি হাজ নো টেইল এ্যাট অল? এরপরে বলবে বানরের লেজই থাকে না।

গল্প শুনে শবু তপুর হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল। দীননাথ বলেছে—

'আপনি একসঙ্গে যতগুলো নেশায় অভ্যস্ত, এমন গল্প আপনার মুখেই মানায়।'

মাস্টার বলেছে—'যে দ্রব্যগুণে এমন অবস্থা হয় আমার তাতে আসক্তি নেই হে লাহিড়ী।'

কোনদিন আবার মুখে মুখে কবিতা আওড়ায়—

"দীনবন্ধু বণিকের রইল পড়ে খামার
ভিটে রইল বউ রইল, কে কার আপনার
রাম নাম সত্য হ্যায়।
মুদিখানায় ছিল অনেক তৈজস মুখশুদ্ধি
বাড়ী, দোকান, সাজানো বাগান—উড়ে গেল বুদ্ধি
রা-ম না-ম সৎ হ্যায়।'

কখনো আবার অন্য স্বাদের কবিতা—

'কামারের হাপরের ফোঁস ফাঁস
যেন লক্ষ শ্রমিকের দীর্ঘশ্বাস।
রক্তিম লোহায় ওঠে হাতুড়ির আওয়াজ
ঘাম আর মেহনতে না হয় কোন কাজ?'

অবাক হয়ে দীননাথ জিজ্ঞেস করেছে—'এ কবিতা কার রচনা?'

'রবীন্দ্রনাথ।' মাস্টারের নিরাসক্ত জবাব।

আরো অবাক হয়ে দীননাথ বলেছে—'রবিঠাকুর এমন কবিতা লিখেছেন বলে ত শুনিনি।'

'আমি কি বলেছি রবিঠাকুরের?' মাস্টারের মুখ রহস্যময়।

ওমা, তাই ত! ওনার নামও তো রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য।

সেই মাস্টার এসে শবুর শোকের কথা শুনে প্রাথমিক কিছু সান্ত্বনা দিয়ে পরে বলেছিল—

'গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—মৃতের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা শোক করে না, বাসাংসি জীর্ণানি…ইত্যাদি। আসলে মৃত্যুটা কি? ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিকেরা বলবে—কতগুলি কোষের সমষ্টি নিয়ে যে একটি জীবন সেই সব কোষের

মৃত্যু। আমি বলব, ঠিক তা নয়। মৃত্যু মানে একটি ইচ্ছার মৃত্যু। জন্মের পর থেকেই একটা ইচ্ছা একটা সত্তা একটি প্রাণীকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। সচেতন অবচেতন উভয় ভাবেই করে। খাবার ইচ্ছায় খায়, ঘুমোবার ইচ্ছায় ঘুমায়, চলবার ইচ্ছায় চলে, কাজ করার ইচ্ছায় কাজ করে। মহাভারতে ভীষ্মের যে ইচ্ছামৃত্যুর কথা আছে, আমার মনে হয় সেটাই জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক দিক নির্দেশ। যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা নাই, ইচ্ছাকে কার্য্যকর করার ক্ষমতা নাই, সব ইচ্ছার যেখানে শেষ সেই ত মৃত্যু।'

দীননাথ তর্ক তুলেছিল—'অপরিণত বয়সে, যেখানে ইচ্ছার শেষ হয়নি মোটেই, সে মৃত্যুকে কি বলবেন? কিম্বা অপঘাত?'

'সেখানেও ঐ ইচ্ছারই মৃত্যু ঘটছে। প্রথমটায় বাঁচতে ইচ্ছা করছে কিন্তু শরীরের কলকব্জাগুলো বিরূপ যাচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত ইচ্ছা হার মানছে। দ্বিতীয়টা হঠাৎ আঘাতে, অপ – হন্ + ঘঞ ভাব = অপঘাত, ইচ্ছা কোনকিছু করার সুযোগই পেল না।' পরে মাস্টার মশাই শবুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল 'অতএব বৎসে, শোক করিও না।'

দীননাথ— 'আপনার এই তত্ত্বের উৎস কোথায়?'

'সবশুদ্ধ সংরক্ষিত'—স্বভাবসিদ্ধ হেঁয়ালীতে মাস্টার জবাব দিয়েছিল।

শবু মাস্টার মশাইয়ের জন্য চা তৈরী করতে করতে ভাবছিল—কথাটা খুবই খাঁটি। কখনো কোন বর চাইতে হলে শ ইচ্ছামৃত্যু বরই চাইবে।

আরো ছয়বছর পরে মার মৃত্যুতে শোকাহত শবু বারবার ইচ্ছামৃত্যু কামনা করেছিল—কিন্তু পায়নি।

দুই

মনে হয় যেন মাত্র সেদিনের কথা। গত সাতষট্টিতে সারা দেশে ভোটের বাদ্যি বেজেছে, শবুরা তখন বদলির অপেক্ষায় কলকাতায় ছুটি নিয়ে বসে আছে। সে ভোটে অনেক ওলট পালট হয়ে গেছে, বাংলায় অজয়, বিহারে ঠাকুর, উত্তর প্রদেশে চরণ বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে।

কানাই তখন বি এ পাশ করে বাবার সঙ্গে এ্যাপ্রেন্টিসগিরি করছে। কলেজে পড়াকালেই সে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকদিন জেল খেটে এসেছে। কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশনে সহ সম্পাদক (নাটক) পদে জয়ী

হয়ে ছোটখাটো নেতাও বনে গিয়েছিল। কলেজ ও প্রায় সারা শহরের বড় বড় বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে ছাত্রদের ভোটের ছড়া ও প্রচার বহুদিন লেখা হয়ে ছিল। পরে দেখে শবু জিজ্ঞেস করেছিল—

'হ্যাঁরে কানাই—'ভোট ফর অসিত কান্তি মৈত্র' এসব কে লিখেছে? তুই জিতেছিলি?'

কানাই গর্বের সঙ্গে বলেছিল—'দেখে চিনতে পারছিস না কার হাতের লেখা? হ্যাঁ, আমিই প্রথম বাঙালী, কলেজ ইউনিয়নে জিতেছি। তুলসী সঙ্গে না থাকলে হ'ত না।'

কানাই শিল্পী, কানাই নাটক করতে পারে, কানাই ছাত্র আন্দোলনে জেল খেটেছে, তাকে ঠেকায় কে?

সেই কানাই সাতবছির ভোটের আগে মাকে বোঝাল—

'মা, তোমার ত দুটো ভোট—এবার এই সব চিহ্নে ভোট দেবে।'

মা বললেন—'সে' যে বলে অন্য চিহ্নে দিতে।'

কানাই অভিমানে বলেছে—'বাবা তোমাকে যা বলল তাই করবে? আমি তোমার ছেলে না? যারা তোমার ছেলেকে জেলে আটকে রাখল তাদেরকেই ভোট দেবে?'

মা বললেন—'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।'

ভোট দিয়ে বাড়ী ফিরলে কানাই জিজ্ঞেস করল—

'মা, তুমি কাকে ভোট দিলে?'

স্বভাব সরল মা বললেন—'একটা 'সে' যাকে বলেছিল তাকে, আর একটা তুই যাকে বলেছিলি—তাকে।'

'মা, তুমি যে কি!' বলে কানাই ক্ষোভে আশ্চর্য্য হয়েছে।

মার ছেলেমানুষী যাবার নয়। তার চাইতে বড় কথা, তিনি কার কথা রাখবেন আর কার কথা ফেলবেন—একদিকে তাঁর স্বামী অন্যদিকে ছেলে।

মার তখন সমস্ত চিন্তা কানাইকে কেন্দ্র করেই। নন্দুর ভাল হবার কোন লক্ষণ আর দেখা যাচ্ছে না, যদিও মা তার জন্য বার-ব্রত-উপোষ করে চলেছেন একবার কঠিন অসুখে ভুগে উঠেও।

ওদিকে কানাই ক্ষেপে উঠেছে চাকরি করবে বলে। একবার কাউকে আগে কিছু না জানিয়ে গেল রণপুর না কোথায় এক গ্রাম-সেবকের চাকরি করতে। সেখানে মাঠে বসে পায়খানা করতে হয়, নিজে হাতে রান্না করতে

হয় দেখে দু দিনেই চাকরি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

এবার সে বলছে ষ্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি নেবে। ওর বন্ধু তুলসী, কল্যাণ, নিত্য সবাই সেখানে ঢুকবে বলে দরখাস্ত দিয়েছে, কানাইও সেই সঙ্গে আছে।

মা কানাইকে বোঝাতে লাগলেন—

'বাবা কানাই, ও সব চাকরির চেষ্টা করিস না। তোর বাবা-মার বয়স হচ্ছে। চাকরিতে কবে কোথায় বদলি করে দেবে—শবুরের অবস্থা দেখছিস ত, একবার শিলং একবার পাটনা ঘোরাচ্ছে। বাড়ীতে তোর অসুস্থ দাদা নন্দু, তুই না থাকলে কে তাকে দেখবে—আমরা ত চিরদিন থাকব না। 'সে' ত বলে—চাকরি করে আর কত টাকা মাইনে পাবে, হৈম অবিনাশ এত বছর চাকরি করল কি করতে পেরেছে—তার চাইতে আমার কাছে কাজ শিখুক, জীবনে কখনো আর্থিক কষ্ট থাকবে না।'

শেষে কানাই কথাটা মেনে নিয়েছে, বাবার ডিস্‌পেন্সারীতে যাচ্ছে, হোমিওপ্যাথির ডাক্তার হবার চেষ্টা করছে।

সব চাইতে ভাল হয় যদি ওকে বিয়ে দিয়ে দেয়া যায়। সেখানেও একটা ব্যাপার আছে। শহরেরই একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভাবসাব হয়েছে, সেই মেয়ে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে কানাই রাজী হবে না। মেয়েটি অবশ্য ব্রাহ্মণ ঘরেরই। কিন্তু মেয়ের বাপ ছেলের বাবা কাকাদের বন্ধু সেই ছোটবেলা থেকে, স্কুল কলেজে একসঙ্গে পড়েছে, গান বাজনা নাটক নিয়ে মেতে থেকেছে। এত কাছাকাছি পরিচিত ঘরের মেয়ে—অপরিচিত একটা নতুন বৌ ঘরে নিয়ে এলে যতটা ভাল লাগে তা লাগবে না, মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। তবু ছেলের মুখ চেয়ে বাবা মা সেই বিয়েতেই রাজী হয়েছেন। মেয়ের বাপও হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

মার কাছ থেকে বিয়ের চিঠি পেয়ে মনের আনন্দে শবু সে বিয়েতে যোগ দিতে গিয়েছিল, সঙ্গে দীননাথ। বিয়ে সেই যতীন কাকার মেয়ে কাকলীর সঙ্গেই। ততদিনে মা বাবারা নিজেদের বাড়ী ছেড়ে ভাড়া বাড়ীতে উঠেছেন—কৈলাস ভবন। এই বাড়ীতেই মা বিয়ে হয়ে নতুন বউরূপে প্রথম দিন উঠেছিলেন। ঠাকুমা এককালে সে বাড়ীতে তাসের আড্ডায় যেতেন।

বিয়ে মাত্রেই আনন্দের। তবু সবাই তেমন আনন্দ বোধ করতে পারেনি। বড় ভাই নন্দু থাকতে ছোট কানাইয়ের বিয়ে। কিন্তু নন্দুর যে ভাল হবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, কি করা যাবে। ঠাকুমাও মাস আটেক

আগে চলে গেছেন—তাঁর আর নাত-বৌ দেখা হল না। মা সেই সব কথা বলে বারবার চোখের জল ফেলেন, শবুর চোখেও জল নামে।

বাড়ী বাড়ী গিয়ে নেমন্তন্ন করাও এক সমস্যা। বাবা ডাক্তারখানা ছেড়ে সে কাজে যেতে পারেন না। বাড়ীতে পুরুষ মানুষ বলতে আর নন্দু, কানাই ও দীননাথ। কানাই নিজেই বিয়ের বর, আর দীননাথ হল বাড়ীর জামাই। শেষে শবুই তপুকে সঙ্গে করে নেমন্তন্ন করতে বেরিয়ে পড়েছিল। যেখানে গেছে সেখানেই সবাই 'আরে শবু যে, কতদিন তোকে দেখিনি' বলে আপন লোকের মত কথা বলেছে। দেখে দেখে তপু এক সময় বলেই ফেলেছে—

'মেজদি, তোকে সবাই চিনল কি করে? অথচ দেখ, আমাকে যেন কেউ চিনতেই পারছে না। তুই-ই বা সবার বাড়ী চিনলি কি করে?'

তপু তখন ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে, থাকেও সেখানে—আর শবুর সেই কত বছর আগে বিয়ে হয়েছে, বাইরে বাইরে থাকে; তপু এ অনুযোগ করতেই পারে। সে ছেলেমানুষ তাই ভাবতে পারে না তার মেজদিও একদিন ছোট ছিল, শিশুকাল থেকে জীবনের প্রথম আঠারোটা বছর ঐ শহরেই কাটিয়ে গেছে, শহরের প্রতিটি ধূলিকণা তার পরিচিত। জবাবে বলেছিল—

'দেখ তপু, তোর বিয়ে হয়ে তুইও হয়ত একদিন বাইরে চলে যাবি, তুই যখন আসবি তখন সবাই তোর সঙ্গেই কথা বলবে, তোরও কাউকে চিনতে অসুবিধে হবে না। এখন যে তুই এখানকার ঘরের মেয়ে—তাই কিনা বল?'

কানাইয়ের বিয়েতে বড়মামা ছোটমামা ও শুভদা-দাদা এসেছিলেন। মামাদের তখনও হিন্দুস্থানে কোন বাড়ী ঘর হয়নি, আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। শুভদা তার শ্বশুরের দেওয়া বাড়ীতে থেকে সেলস্‌ম্যানগিরি করে। ছোটমামা এসেছেন খবর পেয়ে বড়কাকা ছুটে এসেছিলেন—একদৃষ্টে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ।

বড় কাকা বললেন—'এই ছোট রায় মশাই এককালে কি রসিক ব্যক্তিই না ছিলেন।'

ছোটমামা বলেছেন—'তুমিও কম রসিক ছিলে না। এখন তুমি আমি দুজনেই বুড়া।' অনেকক্ষণ ধরে দুজনের স্মৃতির রোমন্থন চলেছিল।

মার সঙ্গে বড় মামার চাইতে ছোট মামারই বেশী গল্প সল্প হ'ত—দুজনে খুব মনের মিল। চেহারায়ও—দেখলেই বোঝা যায় দুই ভাই বোন।

দুটি পরিচিত মুখ এ বিয়েতে দেখা যায় নি। রামুদা আর হোতার মা

কেউ আর ইহ জগতে ছিল না, এসেছিল শুধু হোতা। শবুর দুই মায়ের এক মা চলে গেছে।

বিয়েতে শবুর বন্ধু হীরাদেরও নেমন্তন্ন ছিল। হীরার বছর দুই আগে বিয়ে হয়েছে, স্বামী থাকে কলকাতায় আর সে থাকে মন্দির শহরে মাস্টারী নিয়ে। তাদের একটি মেয়েও হয়েছে। হীরার দিদির বিয়ে দেওয়া যায়নি।

কানাইয়ের বিয়ে মোটামুটি মিটল। বধূ বরণ করতে গিয়ে মা নন্দুর কথা মনে করে কেঁদে অস্থির হলেন। নতুন বৌকে নিয়ে দাদাকে প্রণাম করতে গিয়ে কানাইও ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগল। সে দৃশ্য যে দেখবে সেই না কেঁদে পারবে না।

বিয়ে সেরে ফেরার আগে মা শবুকে বলেছিলেন—

'ছেলের বৌ ঘরে আনার সাধ আমার পূর্ণ হল, নাতি নাতনীর মুখ দেখার সৌভাগ্য আমার হবে কিনা জানি না। নন্দু ঐ রকম হয়ে রইল, তার জন্য মরেও ত শান্তি পাব না। এখন বাকি রইল তপুর বিয়ে। কিন্তু মিতুটা আমার গলার কাঁটার সামিল হয়েছে এখন। দেখি যদি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বামীর ঘর করতে পাঠাতে পারি। তুইও মিতুকে একটু বুঝিয়ে বলে যাস। ওকে কিছু বলাই দায়—সব সময় 'উল্টো বুঝলি রাম' হয়ে আছে কিছু বলতে গেলেই ফোঁস করে ওঠে। এখন তার ভাই-বৌ ঘরে এসেছে, সে পরের মেয়ে যত ভাল আর চেনা জানা ঘরেরই হোক কতদিন ঘাড়ে-এসে-বসা ননদকে ভাল চোখে দেখবে? তার উপরে মেয়ের আমার যা উড়নচণ্ডী স্বভাব হয়েছে। আমি যতদিন আছি ততদিনই ভাল—তারপরে তার কপালে যা আছে।'

যতদিন বাঁচবে মার দুশ্চিন্তা যাবার নয়।

সেই মিতুও শেষে বছরখানেকের জন্য আবার স্বামীর ঘরে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে আর একটি ছেলে হতেই কঠিন অসুখে পড়েছিল। আবার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে অসুস্থ অবস্থায় দুই ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল। ডাক্তাররা বলল মিতুর টি. বি. হয়েছে। দু মাসের বাচ্চাকে ফেলে তাকে নিয়ে গিয়ে কটকের হাসপাতালে ভর্তি করা হল—প্রায় বছর খানেক ধরে তার চিকিৎসা চলতে লাগল। মা তাঁর রুগ্ন শরীর নিয়ে বাচ্চা মানুষ করতে লাগলেন।

সে সময় কাকলী আট ন' মাসের মাথায় এক মৃত পুত্র-সন্তান প্রসব করে

যার দুঃখ আরো বাড়িয়ে তুলেছে। একদিকে কানাই এর প্রথম সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার দুঃখে কাঁদেন অন্যদিকে অসুস্থ মিতুর দুই ছেলেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেন।

এই সময়ই রথের কিছুদিন আগে শবুরা মন্দির শহরে বেড়াতে গিয়েছিল। করবীর শাশুড়ী রথ দেখবে বলে তাদের সঙ্গ নিয়েছে।

কৈলাস ভবনে এসে শবু দেখল মা একা হাতে দুই ছেলেকে সামলাচ্ছেন আবার সংসারও আগলাচ্ছেন। ছোটটাকে দিনরাত নাওয়াচ্ছেন খাওয়াচ্ছেন, গু-মুত পরিষ্কার করছেন, সাজাচ্ছেন, ঘুম পাড়াচ্ছেন। অবশ্য বাড়ীতে রান্না করার ঠিকে রাঁধুনী একজন আছে। তবুও ছেলেটার দেখাশোনা করে। কাকলীর প্রথম ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে, সে শোকার্ত।

প্রথমেই শবু মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—

'মাগো, কানাইয়ের প্রথম ছেলেটাই নষ্ট হল কি করে?'

মা কেঁদে বলেছিলেন—'কেমন করে বলি! আগে থেকেই হাসপাতালের ডাক্তার দেখানো, ওষুধ পত্তর সব নিয়ম মতই চলছিল। কাকলীর বাপের ডাক্তার এলোপ্যাথিতে বিশ্বাস তাই তোদের বাবার হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করেনি। আমিও ভেবেছি—ডাক্তারই ত দেখছে, পোয়াতী আর পেটেরটা ঠিক থাকলেই হল। শেষে অসময়ে ব্যথা উঠল, হাসপাতালে গেল কিন্তু পেটেরটাকে বাঁচানো গেল না।'

কানাই মুখখানা করুণ করে বলল—

'জানিস মেজদি, ঐটুকু একটা বাচ্চাকে পুঁটুলিতে জড়িয়ে হাসপাতালেই আমার শ্বশুর মশাই বললেন—যাও, তালবনিয়ার মাঠে এটাকে পুঁতে দিয়ে এসো।

'সঙ্গে একটা লোক নেই, আমি একটা রিক্সা করে হাসপাতাল থেকে তালবনিয়ায় গেলাম। সেখানে বালি সরাবো, মাটি খুঁড়ব কি—আমি পুঁটুলিটা খুলে ছেলেটাকে আপাদ মস্তক দেখতে লাগলাম, কি বলব মেজদি, ছেলে ঠিক আমার মত কালো, চোখ মুখ হাত পা সব আমার মত। আমি তাকে কোলে করে আদর করছি আর কাঁদছি। শুধু কেঁদেই চলেছি। শেষে রিক্সাওয়ালা মামারা আমাকে অনেক বোঝাল, সান্ত্বনা দিল, নিজে হাতে মাটি খুঁড়ে আমাকে দিয়ে বাকি কাজ করাল। মামারা না থাকলে আমি হয়ত সেখান থেকে আসতেই পারতাম না। আজো সময় পেলে আমি সেই তালবনিয়াতে যাই, সেখানকার মাটির উপর হাত বুলিয়ে বলি—খোকা, তুই শান্তিতে ঘুমো—

আর চোখের জল ফেলি।' কানাইয়ের দু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কানাইয়ের বর্ণনা শুনে উপস্থিত সকলেই কেউ আর চোখের জল আটকে রাখতে পারে না। শবু তার হারানো মাতৃত্বের কথা আবার নতুন করে অনুভব করে। করবীর শাশুড়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—

'তোর শ্বশুর ঐভাবে একা তোকে না পাঠালেই পারত। প্রথম সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়া কত বড় দুঃখের।'

ক্রমে শোকের আবহাওয়া কমে এলে মা পদ্মিনী দেবীর অবস্থা দেখে করবীর শাশুড়ী মন্তব্য করেছিলেন—

'ঠাকরেন দেখি বেটার বৌএর জায়গায় নিজেই বুড়ী বয়সে নতুন পোয়াতী হয়েছেন। বয়েস কত হল, পঞ্চাশ না ষাট? এখন কি কাঁচা টানার মত কোমরে বল আছে?'

মা হেসে বললেন—'কি করব বেয়ান, পেটের শত্রুর শত্রু, ফেলতে ত পারি না।'

দুই বেয়ানে ভাব হতে দেরী হয়নি, বিশেষ করে যখন জানা গেল তাঁরা উভয়েই পাবনা জেলার মেয়ে আবার পাবনা জেলাতেই দু জনের শ্বশুরবাড়ী। শবুর বাপের বাড়ী পাবনা জেলায় বলে মঙ্গলাদেবী তাকে কত কথা শুনিয়েছেন কিন্তু তাঁরই মেজ জামাই এমন কি মাতুলও যে পাবনা জেলার সে বেলায় তাঁর মুখে মধু ঝরে। শবু কিছু ভোলে না।

মা আবার এক ছেলেমানুষী কাণ্ড করে বসলেন। একদিন বেয়ানকে সমুদ্রে স্নান করাতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে বাঁচাতে নিজেই ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে পা মচকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ী ফিরলেন। দশদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হল, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। বাবা রীতিমত অসন্তুষ্ট হলেন, আসল মূল যে বেয়ান ঠাকরুন তার উপরও বিরক্ত হলেন কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিছু বললেন না।

মার অবস্থা দেখে শবুরও করবীর শাশুড়ীর উপর রাগ ধরতে লাগল। এক জেলায় বাড়ী বলে দুই বোনের মত সব সময় এত গল্পে মেতে থাকে যে শবু মার সঙ্গে গল্প করার সুযোগই পায়না। তার উপর তাঁর জন্যই মার পা ভাঙল। কিন্তু রথের দড়ি না টেনে তিনি যাবেন না। শেষে প্রথম রথের দড়ি টানিয়ে এনে পরদিন দীননাথ গিয়ে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলে শবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। মাকে বলেছে—

'দেখ মাগো, কয়বীর শাশুড়ীকে এনে তোমাকে কি বিপদের মধ্যেই ফেলেছিলাম। আমিও এ কয়দিন তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারিনি।'

মা বলেছিলেন—'আহা, অমন করে বলিস না। বুড়ো মানুষ একটু তীর্থ দর্শন হল, সমুদ্রে স্নান তীর্থ দর্শনেরই অঙ্গ। শেষ বয়সে তীর্থ করে গেল, কত পুণ্য হল বল ত।'

মা যেন সর্বংসহা—পরের জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগকেও আমল দেন না। কিছু বললেই বলবেন—আমি আমার মা এবং শাশুড়ীর কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে আত্মীয় কুটুম্ব ও অতিথিদের হাসিমুখে আপ্যায়ন করতে হয়।

তিন

আবার শীতের শুরুতে কানাইয়ের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এসেছিল— মাদার হসপিটালাইজড্ কাম উইথ মেজদি। টেলিগ্রাম পেয়েই শবু ও দীননাথ ছুটেছিল মন্দির শহরে। পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য চাঁপাতলায় নেমেছিল। মঙ্গলাদেবী ওদের হঠাৎ আসার কারণ জেনে বাঁকা মন্তব্য করেছিলেন—

'ঠাগ্‌রেনের দেখি ঘুরে ঘুরেই অসুখ হয়।'

অসুখ করাটাও বুঝি অপরাধ!

কৈলাস ভবনে পৌঁছে বাবাকে প্রণাম করে শবু কেঁদে জানতে চেয়েছে—

'বাবা, মায় কী অসুখ করেছে, এখন কেমন আছে?

বাবা চিন্তিতভাবে বলেছেন—

'এখন একটু ভাল আছে। আগের জণ্ডিস ভাবটা আবার দেখা যাচ্ছে। পেটটা উদুরীর মত ফুলে উঠেছিল আবার পেটের মধ্যে চাকা মত কি যেন হয়েছে। কিছু খেতে পারেনা। আমিই চিকিৎসা করছিলাম কিন্তু আমিও নিজের উপর ভরসা রাখতে পারছিলাম না। কানাই তপুরা কান্নাকাটি করতে লাগল হাসপাতালে পাঠাবার জন্য। শেষে কানাই আর তার বন্ধুরা এ্যাম্বুলেন্সও ডেকে নিয়ে এল। আমি বললাম—যাও, ভাল হয়ে এস।' বলতে বলতে বাবার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

কাকলী বলেছিল—'মেজদি, আপনি ভয় পাবেন না, মা এখন অনেক

ভাল আছেন। হাসপাতালের কেবিনে গেলেই দেখতে পাবেন। এখন সবাই সেখানে আছে।'

ছুটল হাসপাতালে। শবুকে দেখে মা হেসে একটা হাত বাড়িয়ে দিতে শবু মার গা খানি ধরে কেঁদে ফেলল। জিজ্ঞেস করল—

'মা গো, এখন তুমি কেমন আছ?'

মা আদর করে শবুর চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেয়ে দুর্বল গলায় বললেন—

'এখন আমি ভাল আছি মা, তুই এসে গেছিস এবার আমি ভাল হয়ে উঠব।'

এক সময় কানাই শবুকে পাশে ডেকে নিয়ে বলেছিল—

'মাকে যে কি অবস্থায় এ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে এনেছি তুই কল্পনা করতে পারবি না মেজদি। ঐদিন না আনলে মাকে বোধ হয় বাঁচান যেত না। হোমিওপ্যাথির দোষ নেই, সময়মত ওষুধ পড়া চাই আর ওষুধটাও খাঁটি হতে হবে যা এখানে সব সময় পাওয়া যায় না। এলোপ্যাথি ওষুধে ইঞ্জেকশনে মিরাকল দেখাতে পারে। তাছাড়া হাসপাতালে স্যালাইন গ্লুকোজ ডাক্তার নার্স সব ব্যবস্থা আছে। তোরা ত ভর্তি হবার পাঁচদিন পরে এলি—মা এখন অনেক ভাল।'

কিছু পরে ডাক্তারখানায় যাবার আগে বাবা এলেন, মাকে জিজ্ঞেস করলেন—

'কেমন আছো'? কণ্ঠে ঝরে পড়ল অসীম দরদ।

মা লাজুক হেসে বললেন—'ভাল আছি।'

গিরিনবাবু বললেন—'তুমি ত এখন অনেক ভাল আছ। তোমার শবু এসে গেছে আর ভাবনা কি? আবার শবুর সঙ্গে পাটনায় গিয়ে শরীর ভাল করে নিয়ে আসবে।'

মার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শবু তাড়াতাড়ি মার একখানা হাত ধরে বলল—

'হ্যাঁ মা সত্যি, তুমি পাটনায় চল। আবার তুমি আগের মত ভাল হয়ে উঠবে।'

মা বললেন—'হ্যাঁ, যাবো।'

আবার শবু মাকে পাটনায় নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে ছিল দীননাথ আর তপু। তপু আই এ পাশ করে বসে ছিল—তার বিয়ের কথা ভাবা হচ্ছিল।

তার মধ্যে মার এই অসুখ। বাড়ীর জন্য চিন্তা ছিল না, কাকলী আছে, মিতুও হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে। শবুর মনে হয় অসুস্থ শরীরে এক বছর ধরে মিতুর ছোট ছেলেটাকে টানতে গিয়েই মার আবার অসুখ করেছে। সে যা হবার হয়েছে, এখন মাকে সেবা যত্ন করে ভাল করে তুলতে হবে। ঠাকুমা বেঁচে নেই, থাকলেও এবার নিশ্চয়ই নিজেই আগ্রহ করে মাকে শবুর সঙ্গে পাঠাতেন। বাড়ীতে তখন দুজন বাড়তি লোক—পটু আর বাবুল।

ছোটকাকার ছেলে পটু আর দিদির ছেলে বাবুলকে নকশালী মারামারি কাটাকাটির ভয়ে পড়াশুনা ফেলে রেখে তাদের বাবা মায়েরা মন্দির শহরের শান্ত পরিবেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সমুদ্রের তীরে এই চির শান্ত শহরে সমুদ্রের ঢেউগুলোই শুধু নিরন্তর অশান্ত সেখানে অন্য কোন তরঙ্গ এসে সহজে তার শান্তি নষ্ট করতে পারে না। তারই মধ্যে বাবুল আবার বাড়ীর দেওয়ালে 'নকশালবাড়ী জিন্দাবাদ' লিখে রেখে দিদিমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে মজা করত।

মাঝখানে পাটনাতে কাজের ঝি পাওয়াতে অসুবিধে দেখা দেওয়াতে ফেরার পথে বিপিন নামে এক ছোকরা চাকরকে দীননাথ সঙ্গে নিয়েছিল। করবীই বিপিনকে যোগাড় করে দিয়েছে।

রাজেন্দ্রনগর পাড়াটা পাটনার বর্দ্ধিষ্ণু এলাকা হলেও শবুরা প্রথম যখন নৃপতিবাবুর বাড়ীতে ভাড়া এসেছিল তখন তার একপাশে বেশ বড় একখণ্ড ভুট্টার ক্ষেত ছিল। পাশেই আবার নালা রোডের মাঝখানে ধাপের মত একটা মহাবীরের মন্দির - মহাবীরস্থান। ভুট্টা ক্ষেতের এক পাশের খাটাল থেকে শবুরা দুধ নেয়, খাটালের মালিকের বৌ বা মেয়ে ফুলমতিয়া রোজ দুধ দিয়ে যায়। ফুলমতিয়া দুধ নিয়ে এলে মোটামুটি খাঁটি দুধ পাওয়া যায় কিন্তু তার মা বা দাদা যেদিন আসে সে দিন দুধে জলের অস্তিত্ব বেশ বোঝা যায়। ফুলমতিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু এখনও গওনা হয় নি—বারো তের বছরের মেয়েটি, আর বেশ সরল।

গত বছর ঐ ভুট্টার ক্ষেত কিছুটা সাফ করে রামলীলার আসর বসেছিল কার্তিক অঘ্রানে। মাকে যখন দ্বিতীয়বার নিয়ে এসেছিল তখন অঘ্রানের মাঝামাঝি, রামলীলারও তখন দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যম পর্ব চলছিল।

শবু বলেছিল 'মা গো, এবার বাড়ীর ছাদে বসেই যাত্রা দেখতে পাবে, রোজ নিত্য নতুন কত তামাসা হয়।'

সন্ধ্যায় ঢোল করতালের আওয়াজ উঠতেই শবু রোজ মাকে ছাদে চেয়ার পেতে বসিয়ে গরম চাদর দিয়ে ঢেকে ঢুকে দেয়। রোজ রামায়ণের কিছুটা অংশ নাচ গান সংলাপের মধ্যমে অভিনীত হয়—তার সঙ্গে বাড়তি কিছু রঙ্গ তামাশা। রোজ একবার করে অধিকারী হাঁকতে থাকে—আইয়ে, ভগবান রাম-সীতাকো মালা চঢ়াইয়ে। চার আনা আট আনা এক টাকা দিয়ে যারা মালা চড়ায় তাদের নামে সমস্বরে জয়ধ্বনি ওঠে—জয় হো জয় হো। যারা রামলীলা দেখতে আসে তাদের দৈনিক দশ পনরো পয়সার টিকিট লাগে। শবুদের টিকিট লাগে না তারা পাশের ছাদ থেকেই দেখতে পায়। অধিকারী সেটা লক্ষ্য করে হাঁক ছাড়ে—কোঠা পর সে দেখনেবালে, কুছ্ পূজা দিজিয়ে। শবুরা এক দু টাকা নীচে দাঁড়ানো ছোকরাটার বাড়ানো হাতে উপর থেকে ফেলে দেয়। অধিকারী হাঁক ছাড়ে—কোঠা পর্সে দেখনেবালী মাইজী কি—দর্শককুল সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠে—'জয় হো, জয় হো।'

দেখে দেখে মা রোজ ছেলেমানুষের মত খুশি হন। ধনপতিবাবুর স্ত্রী ছেলে ছেলের বৌমা এলে তাদের সঙ্গে রামলীলার গল্পই হয় বেশী। নাটকের হিন্দী কথা বার্তা সব বোঝা যায় না, ধনপতিবাবু বাঙালী হলেও বাড়ীর সবাই হিন্দীতে পোক্ত। মা যেটুকু না বোঝে ওরা সেটা বুঝিয়ে দেয়। তাতে আরও ভাল লাগে—মা দূর থেকে রাম-সীতার সাজে দুই ছেলেকে প্রণাম জানায় দশ পনরো পয়সার দর্শকদের সঙ্গে সঙ্গে।

মা কত অল্পেতেই খুশি হ'ত। মাস পাঁচেক আগে দীননাথ মোটর বাইক কিনেছে। দু দুবার লু লেগে যখন সে দুর্বল হয়ে পড়ত তখন সে সাইকেলও চালাতে পারত না। সেইজন্য অফিস থেকে লোন নিয়ে গাড়ীটা কিনেছে। সেটা দেখেও মা খুশি হয়ে বলেছিলেন—

'কি সুন্দর কালো কুচকুচে চেহারা, ঠিক আমাদের কানাইয়ের মত।' মা দুনিয়ায় সর্বত্রই কানাইকে দেখে।

শবু বলেছিল—'গাড়ীটা তোমার ভাল লেগেছে মা? আমারও। আমি এর নাম দিয়েছি আদরিণী।

পাশ থেকে দীননাথ বলেছে—'আদরিণী নাম্বার টু।'

তপু জানতে চেয়েছে—'ওয়ান কে জামাইবাবু?'

'তোর মেজদি'—দীননাথের জবাব।

মা বললেন—'বলছিলি তুই নাকি ওটার পিছনে বসা শিখেছিস, আমাকে

একটু চড়ে দেখা।'

মাকে খুশি করতে সে দীননাথের সঙ্গে গাড়ীর পিছনে বসে একটু ঘুরে এসেছে। তারপরে দীননাথ যখন তপুকে পিছনে বসিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল তখন মা খুশিতে হাত তালি দিয়ে বলে উঠলেন—

'বাঃ, তপুটাও বসা শিখে গেল।'

স্কুলের বড়দিনের ছুটিতে করবীর ছেলে বাসু এসেছিল। সারা দুপুর মা তপু বাসু ও শবুতে মিলে জোর লুডো খেলা হত। শবু সব সময়ই মার পার্টনার। কিন্তু প্রায়ই হেরে যায়। ছোকরা চাকর বিপিন বড়ই চালু, বলে দেয় বাসু ভীষণ ঘর চুরি করছে। মা ছেলেমানুষের মত রেগে গিয়ে বাসুকে বলে—

'বাসু, তোর সঙ্গে খেলবো না, তুই ঘর চুরি করলি কেন?'

বাসু ধরা পড়ে গিয়ে বলে—'না দিদিমা, আর হবে না। এই বিপ্‌নে, ফের যদি কিছু বলবি মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।' বিপিন বাসুদের পাড়ার ছেলে—আগে থেকেই চেনা জানা।

বিপিন হাত জোড় করার ভঙ্গীতে বলে—'এবারটি মাপ করে দাও গুরু।'

শবু ধমক দিয়েছে—'দেখ বাসু, খেলার মধ্যে আবার চোট্টামি কেন? ফের যদি খেলতে বসে ফিট্‌লেমি করবি তবে তোকে বাদ দিয়ে তিন জনেই খেলব।'

এবার বাসুর হাত জোড় করার পালা, বলে—'এবারটি মাপ করে দাও সেজমামী। এসো দিদিমা, এবার তুমি আর আমি পার্টনার।'

বাসু আবার ঘর চুরি করে, জিতেও যায়। মা কিছু বুঝতেই পারে না। শবু দেখে বুঝেও কিছু বলে না, মা জিতলে তার কোন দুঃখ নেই।

কিন্তু তপু ছাড়বার পাত্রী নয়, বলে—'চুরি করে জেতা আবার জেতা নাকি, তা সে মা-ই হোক আর তার পাতানো নাতিই হোক।'

আবার পার্টনার বদল, আবার খেলা শুরু।

ঐ বছর সে সময় পাটনায় রবীন্দ্র ভবনে নাটক প্রতিযোগীতা হচ্ছিল। দীননাথ তিনখানা সীজন টিকিট কেটেছে। রোজ সন্ধ্যায় দু জন দু জন করে গিয়ে নাটক দেখা, অন্য দিন তপু আর বাসু যায় দীননাথের সঙ্গে, যেদিন ভাল নাটক থাকে সেদিন মা আর শবু যায়। শেষ দিন কলকাতার এক বড় দল নাটক করবে, সেদিন ওরা পাঁচ জনই গিয়েছিল, সঙ্গে বিপিন ফাউ।

পাটনার কদম কুঁয়ার সংস্কৃত প্রসার সমিতির মাঠে একটা এক্জিবিশন চলছিল। তার শেষ দিনে মাকে নিয়ে হেঁটে সবাই সে মেলা দেখল। শবু দীননাথের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চওড়া পাড় দেওয়া সাদা খোলের একটা শাড়ী মাকে কিনে দিয়েছিল। মা শবু ও তপুকে দুটো সুন্দর শাড়ী কিনে দিয়েছে। ছোট ছোট জিনিষ দেখলেই মার লোভ হয়। সে রকম নক্সা কাটা ছোট্ট ছোট্ট বাঁশের ঝুড়ি দেখে মা দুটো কিনলেন, একটা শবুকে দিয়ে বললেন—

'শবু এটা তুই তোর সাজের ডালি করিস—স্নো পাউডার চুলের ফিতে চিরুণী কাঁটা সিঁদুর সব রাখতে পারবি।'

আজও শবু মার দেওয়া সে ঝুড়ি সাজের ডালি হিসেবে ব্যবহার করে।

একমাসের মধ্যে মার শরীর বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে ওষুধ, হাওয়া পরিবর্তন ও শবুর অক্লান্ত সেবায়। দীননাথ তোল তুলল রাজগীর নালন্দা বেড়িয়ে নিয়ে আসবে।

পয়লা জানুয়ারী সকালে রাজগীর রওনা হল—মা তপু ও শবু বাসে, দীননাথ বাসু ও বিপিন মোটর বাইকে। রাজগীরে সারদা আশ্রমের দুটো ঘরে থেকে রেঁধে খেয়ে দু দিন ধরে উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান, বেড়ানো, নালন্দার বৌদ্ধ বিহার দেখে সব হৈ হৈ করে ঘুরে তৃতীয় দিনে সবাই পাটনা ফিরেছিল।

শবুর মনে গভীর দুঃখ রয়ে গেছে—মাকে রাজগীরের রোপওয়েতে চড়াতে পারে নি সেখানকার ধর্মঘটের জন্য। ফলে বিশ্বশান্তি স্তূপও মার দেখা হয় নি। পরে অবশ্য শবু সে সব দেখেছে কিন্তু মা সেখানে গিয়েও দেখতে পায় নি, আর কোনদিন পাবেও না—সে দুঃখ তার মরলেও যাবে না।

বাসু কদিন পরেই চলে গিয়েছিল, মা আরো দু মাস ছিলেন। শবু মাকে আর তপুকে নিয়ে রিক্সায় করে সারা পাটনা শহর চষে বেড়িয়েছে—গান্ধী ময়দান, গোলঘর, রাজভবন, সচিবালয়, সপ্তশহীদ, হার্ডিঞ্জ পার্ক, নিউ মার্কেট, পাটনা মার্কেট, মহেন্দ্রু বাজার, মহেন্দ্রু ঘাট যেখান থেকে ফেরী ষ্টীমার ছাড়ে, গঙ্গার ধারে খাজাঞ্চী বাজার কালী মন্দির, পাটনা ইউনিভার্সিটি, বি, ই. কলেজ যেখানে এককালে ছোটকাকা পড়েছে, শূরোত্থান বা বাঙালী আখড়া আর ইস্লামপুর কালীবাড়ী যে দুটোতে হয় স্থানীয় বাঙালীদের প্রধান দুটি দুর্গা পূজা সব সে মাকে দেখিয়েছে। এমন কি পাটনা সিটিতে গিয়ে গুরু গোবিন্দ সিং এর গুরুদ্বারা পর্যন্ত দেখিয়ে এনেছে অটো ট্যাক্সিতে চাপিয়ে। পাটনার

পথে পথে শবুর সে সব স্মৃতি ছড়িয়ে আছে।

চীনা-ডাক্তার চ্যাংকে দিয়ে মার কয়েকটা দাঁত তুলিয়ে আবার নতুন দাঁত বাঁধিয়েও দিয়েছে। পুরোনো তোলা দাঁত কিছু পাটনায় গঙ্গায় আর কিছু মন্দির শহরের পাশের সমুদ্রে ফেলা হয়েছে।

ধনপতিবাবুর ছেলে সণ্টু ভাল গীটার বাজায়। তাই দেখে তপু নেচে উঠেছিল সে-ও গীটার শিখবে। সণ্টু বলল—

'আমি দেবুদার কাছে শিখেছি, যদি বলেন আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি সপ্তাহে এক বা দুদিন করে বাড়ীতে এসে শিখিয়ে যাবে, মাসে পনরো টাকায় হয়ত রাজী করাতে পারব।'

সণ্টুর ছোট ভাই বিণ্টু বলেছিল—'হাঁ তপু মাসী, শিখে নিন, দেবুদা বহুৎ বঢ়িয়া বাজায়'। বিণ্টু পাটনায় জন্মে ও থেকে আধা হিন্দুস্থানী বনে গেছে—বাংলা বলে বটে তবে অর্ধেক হিন্দী মিশিয়ে আর বাংলা লেখা পড়ায় একেবারে মা সরস্বতী।

মা বললেন—'দেখ তপু, তাল তুলিস্‌নে। দুদিন পরে ফিরে যেতে হবে, সেখানে তোকে আবার কলেজে ভর্ত্তি করতে হবে, তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।'

তপুও জেদ ধরল—'তোমরা কলেজেও পড়াচ্ছো না, বিয়েও দিচ্ছ না। আমি বসে বসে কি করব? আমি গীটার শিখব।'

মা বললেন—'শুনলি কথা, আমরা নাকি ওর বিয়ের চিন্তা করছি না। তোর বিয়ে না দিয়ে যে আমি মরতেও পারব না।'

শবু বলেছে মাকে—'শিখুক না হয় দুচার মাস, কলেজের সেসন শুরু হতে ত দেরী আছে।'

বিণ্টু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছে—'কাকীমা, আপনিও ঐ সঙ্গে শিখে নিন না। আপনার হাতের আঙুলগুলো ঠিক কলাকারের মত।'

দীননাথ একবার শবুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছে—'হাঁ, লেগে পড়। তুমি ত একজন গাইয়ে শিল্পী, এবারে বাজিয়ে শিল্পী হবে।' সে যে গান গাইতে পারে না তাই নিয়ে এখনও সবাই ঠাট্টা করে।

মা শবুর কথা মেনে নিয়ে তপুকে বলেছিলেন—'শেখ তাহলে গীটার, যখন জিদ্দি ধরেছিস তখন কি আর ছাড়বি? এ মেয়ের হাতের বুড়ো আঙুল বাঁকে না, জিদ্দিও হয়েছে তেমনি। 'সে' ত বলে—মেয়েদের মধ্যে তপুটাই একটু ঝগড়া করতে পারে। এই মেয়ে যে কি করে পরের ঘর করবে!'

শুরু হয়ে গেল তপুর গীটার শেখা, প্রথমে সন্টুর পুরোনো হাওয়াইয়ান গীটারে, পরে বেবু মাষ্টার কলকাতা যাতায়াতে একটা নতুন গীটার কিনে এনেছিল। সন্টু বাজাতো ইলেকট্রিক গীটার।

দেখতে দেখতে বসন্ত পঞ্চমী, শিবরাত্রী এবং হোলিও পার হয়ে গেছে। মা তখন বাড়ী ফেরার জন্ত উতলা হয়ে উঠেছেন। মুখে সে কথা বলেন না, অন্ত কথায় বোঝা যেত। বলতেন—

'ঐ দেখ শবু, সামনের কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া গাছ দুটোতে কচি পাতা আসছে। ঘরে যে চড়ুই দুটো বাসা বাঁধছে তার কোনটা মর্দা আর কোনটা মাদী চিনিস?…'

বলে মা কি করে ফুল দেখে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া চেনা যায়, যে চড়ুইটার গলার নীচে কালো ছোপ সেটা মর্দা—চিনিয়ে দিয়েছিলেন। আরও বলেছেন—'একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিস শবু? সব প্রাণীর মধ্যে পুরুষরাই দেখতে সুন্দর হয়। যেমন ময়ূরের পেখম আছে, ময়ূরীর নেই। তেমনি সিংহের কেশর, হরিণের শিং, হাতীর দাঁত, মোরগের ঝুঁটি, সাপের মাথার মণি—ওদের স্ত্রী জাতির কারোর থাকে না। অন্ত সব প্রাণীদের মধ্যেও এরকম আছে আমরা বুঝতে পারি না। মানুষের মধ্যেও পুরুষরা দেখতে সুন্দর হয়—মেয়েদের সৌন্দর্য্য শুধু সাজের ঘটায় ও কোমলতায়।'

শবু মার মুখে পুরুষ-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিন্তাস শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আদর করে ঘরের চড়ুই দুটোর নাম দিয়েছে 'মুঁদু' আর 'ঝুঁদু'।

বসন্তকাল এসে গেছে, বাবার জন্ত নিশ্চয়ই মার মন খারাপ লাগছে, নন্দুর কথা কানাইয়ের কথাও বারবার বলেন। কাকলীরও তখন সাত মাস চলছে। অতএব মাকে তখন আর ধরে রাখা যায় না। ঠিক হয়েছ তপু এখন যাবে না, সামনের সপ্তাহে বেবু মাষ্টার কলকাতায় যাবে মা তার সঙ্গে যাবে, কানাই আগে থেকে কলকাতায় এসে মাকে নিয়ে যাবে। তপুকে একা ফেলে শবু যেতে পারে না, দীননাথের তখন অফিসে অনেক কাজ।

আর সময় নেই, শবু মার সঙ্গে মনের আশ মিটিয়ে গল্প করে নিয়েছিল। এই সময়ই মা একদিন বলেছিলেন—

'শবু, তোর আর দীনুর জন্ত আমার কাশী বিশ্বনাথ দর্শন হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছে হয় রামেশ্বর সেতুবন্ধ দেখে আসি, তোদের ঠাকুমা একবার ওখানকার একটা দলে ভিড়ে দেখে এসেছেন। কিন্তু এখন আমার শরীরও

তেমন শক্ত নয়, আর কে-ই বা আমাকে অতদূরে নিয়ে যাবে।'

শবু বলেছে—'মাগো, তোমাদের জামাই মাঝে মাঝে দক্ষিণে বেড়াতে যাবার কথা বলে। যদি আমাদের কোনদিন যাওয়া হয় তোমাকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।'

পাটনা থেকে রওনা হবার আগে মাকে স্থানীয় পরিচিতদের বাড়ীগুলোতে দেখা করিয়ে এনেছে, তারাও এসে এসে দেখা করে মার স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে সব থেকে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল ধনপতি-যোগমায়া, বিদ্যুৎ ও তার বাবা মা গোকুল-কমলা, মণি প্রিন্টার্স ও মণি জুয়েলারীর মালিক মণিবাবু, বিরজা গুপ্ত ও তার বৌ আর রবি মাস্টারের সঙ্গে।

আর সব শেষে মার সেই যাবার দিনটি। সারাটা দিন মা আর শবুর কান্নার বিরাম ছিল না। এত কান্না দেখে তপুই একসময় বিরক্ত হয়ে বলেছিল—

'মা যেন প্রথম শশুরবাড়ী যাচ্ছ, অত কাঁদার কি আছে।'

শবুরও মনে হয়েছিল, মা যেন তার ছোট্ট অবুঝ মেয়েটি, নতুন শশুর ঘর করতে চলেছে। মা যে শবুর গোপন দুঃখের সব খবরই রাখেন, তাই এই হতভাগিনী অল্পায়ু মেয়েটার জন্য তাঁর দুঃখ আর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। দুজনেরই মনে হয়েছে—কত কথা বলার ছিল সব বলা হল না। আর কি কোনদিন এমন দীর্ঘ তিনমাস সময় মা-মেয়েতে একসঙ্গে কাটাতে পারবে?

পাটনা ষ্টেশনে মাকে ট্রেনে তুলে দেবার সময় অনেক কষ্টে শবু চোখের জল আটকে রেখেছিল—যাত্রার সময় চোখের জল ফেললে নাকি অমঙ্গল হয়। বারবার শুধু মাকে মনে করিয়ে দিয়েছে—

'টাকা পয়সা ও টিকিট ঠিক মত রেখেছ ত' 'জলের বোতলটা কাছে আছে ত', 'পানের সরঞ্জাম কোথায় রেখেছ মনে আছে? সঙ্গে দেবু মাষ্টার আছে—কোন ভয় নেই বুঝলে।'

ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হতেই শবুর দু চোখ বেয়ে অশ্রু-বন্যা নেমে এসেছিল। তপু বলেছিল—

'মেজদি, তুই এত কাঁদছিস্ কেন? তোর যেন সবই বেশী বেশী।'

শবু বলেছে—'তোর আর কি, ক'মাস পরেই মা বাবার কাছে চলে যাবি। মা না থাকলে যে আমার কেমন লাগে বলে বোঝাতে পারব না। এতদিন

ধরে মা যে ঘরে ছিল এখন গিয়ে দেখব সে ঘর মা-শূন্য।'

'তুই বড্ড বেশী ভাবিস রে মেজদি' বলতে বলতে তপুরও গলাটা ধরে এসেছিল—হাজার হোক মেয়ে ত।

আর শবু? তার জীবনে স্মৃতি আর ভাবনা ছাড়া আর কি আছে? তার সেই মা আর নেই। যত দিন বাঁচবে সে শুধুই ভাববে আর ভাববে।

এর পরেও শবুর মার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে—কিন্তু কোন বারই বেশী দিনের জন্য নয়।

চার

কথা ছিল তিন মাস পরে তপুকে মন্দির শহরে পৌঁছে দিয়ে এক সপ্তাহ থেকে আবার পাটনার পথে রওনা হবে শবু। কিন্তু সেখানে গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে তার ভীষণ টাইফয়েড হল। এর আগে সত্যিকারের অসুখ বলতে পাটনায় শবুর একবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল—সে সময় তপু সেখানে ছিল, তারও সেই অসুখ হয়েছিল। দীননাথ কাজের ঝি মল্লার সাহায্যে একাই দু জনের সেবা করেছে, ওষুধ পথ্যি দিয়েছে, রান্নাও করেছে। এবারে দীননাথ রয়ে গেছে কতদূরে পাটনায়, ব্যস্ত অফিসের কাজে।

শবুর টাইফয়েড হওয়াতে বাবা মাকে বলেছিলেন—'শবু তোমাকে দু'বার সেবা যত্ন করে ভাল করে তুলেছে, এবারে তুমি তার সেবা কর ভাল করে।'

যে মেয়ের জীবনে কোন বড় অসুখ করেনি সে মেয়ে চোখের সামনে অসুখে পড়ে আছে আর মা তার সেবা করবেন না তা কি কখনো হয়? মা তাঁর প্রাণঢালা সেবা যত্নে শবুকে ভাল করে তুলেছিলেন। একুশ দিন ধরে ভুগে ভুগে শবু শেষে অন্নপথ্য করেছিল, মার মুখে হাসি ফুটেছিল। আরো একটু সুস্থ হলে দীননাথ এসে তাকে পাটনায় নিয়ে গেছে। এত বড় একটা অসুখের মধ্যেও দীননাথ আসতে পারে নি। অসুখে ভুগে তখন তার শরীর খুব দুর্বল। অসুখের শুরু থেকে শুধু বারবার মনে হয়েছে—এবারে সে বুঝি মরে যাবে, আকুল ভাবে চেয়েছে স্বামী তার কাছে আসুক। অথচ সে আসে নি, তখন তার অফিসে নাকি প্রচণ্ড কাজ। কথাটা অবশ্য সত্যিই, শবুও তা জানে। তবু কী এমন কাজ যে স্ত্রীর কঠিন অসুখেও আসতে পারে না! দুর্বল মনে ভেবেছে স্বামী হয়ত তাকে আর তেমন ভাল বাসে না। মরেই যেত

সে—একমাত্র মার অক্লান্ত সেবা যত্নে সেরে উঠেছে। আর সেই থেকে সেবারের জুন মাসের ঘটনার মত এটাও তার জীবনের আর একটি অন্ধকার সময় বলে শবুর মনে হয়েছে। সেজন্ত স্বামীর প্রতি একটা চাপা অভিমান তার আজও আছে। সেবারে পুরো একটা মাসই শবু মার সান্নিধ্য পেয়েছি‚ যার অর্ধেকটাই কেটে গেছে প্রবল জ্বরের ঘোরে।

আগেই জানা ছিল কানাই কাকলীর একটি মেয়ে হয়েছে। শবু আর তপু পাটনা থেকে গিয়ে পৌঁছতে কানাই মনের আনন্দে বলেছিল—

'মেয়ের চোখ দুটো কি সুন্দর হয়েছে দেখ মেজদি, ঠিক কাকলীর চোখ দুটোর মত।'

কাকলীর চোখ দুটো বড় বড় টানা টানা। কানাই নাকি ওর চোখ দুটোর জন্তই ওকে ভালবেসেছিল। মেয়েটাকে দেখে শবু আর তপু খুশিতে অধীর হয়ে উঠেছিল। মা বাবার খুশির কথা বলার নয়, প্রথম নাতনী ত।

তারই মধ্যে শবু দেখেছিল মিতুর বাঁকা হাসি। জিজ্ঞেস করেছিল—
'কিরে মিতু, অমন করে হাসছিস যে?'

'তা-রি-তো একটা মেয়ে হয়েছে তাও আবার রোগা পটকা।' বলে মিতু আবার মুখ বাঁকিয়েছে।

'সে কিরে, ও যে তোরও ভাইঝি'—শবু বলেছে।

'হোক, আমার দুটোই ছেলে, তাদের স্বাস্থ্যও ভাল—তাই ওরা আমার ছেলেদেরকে দেখতে পারে না, হিংসে করে।'

'ওরা কারা'—জিজ্ঞেস করেও শবু তার কোন জবাব পায় নি। কিন্তু এক বছর ধরে মিতুর অসুখের মধ্যে মা তার ছোট ছেলেটাকে কিভাবে মানুষ করেছে, কানাইও দুই বোনপোকে কত আদর করে শবু ত দেখেছে। কাকলীর কথা আলাদা—তখন তার প্রথম ছেলেটি মারা গেছে। তবু মা থাকতে মিতুর ছেলেদের হেলাফেলার প্রশ্নই নেই।

দেখে শুনে মনে হয়েছে, নন্দুর অবস্থা ত ভাল হলই না। তার উপর মিতুদের নিয়ে মার জীবনে আবার নতুন করে অশান্তি সৃষ্টি হতে চলেছে।

তার পরেও দু-তিনবার শবু বাপের বাড়ী গেছে দশ পনরো দিন করে থেকেছে, মাকে মোটামুটি সুস্থই দেখেছে। সেবার পুজার সময় দুর্গা বাড়ীতে পার্থসারথি নাটকে কানাই কৃষ্ণ সেজেছে বলে মাকে কত উৎসাহ নিয়ে রাত জেগে নাটকের আসরে বসে থাকতে দেখেছে। 'কানাইয়ের পার্ট অপূর্ব হয়েছে

—সবাই এক বাক্যে বলেছিল। মা নাটক দেখতে দেখতে পাশে বসা শবুকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বারবার বলছিলেন—

'দেখ শবু, দেখ, কানাইকে কি সুন্দর মানিয়েছে, একটুও পেন্ট করতে হয় নি। ঠিক যেন শ্রীকৃষ্ণ।' মার কাছে কানাই আর কৃষ্ণ অভিন্ন—সে যে সবে ধন নীলমণি।

আর শেষ দেখা সেই মাঝ বসন্তে। তপুর বিয়ে ঠিক হয়েছিল সে সময়। একই সঙ্গে তিনটে বিয়ে—ছোট কাকার মেয়ে নীলা, মামীমার ছেলে তুলু আর শবুর বোন তপুর। নীলার বিয়ের পাঁচ দিন পরে তুলুর বিয়ে আর তুলুর যে দিন বৌভাত সেদিন মন্দির শহরে তপুর বিয়ে। তাই বেশ কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে দীননাথ আর শবু এসেছিল প্রথমে চাঁপাতলায়। মামীমার মাথার উপর পুরুষ অভিভাবক নেই—তুলুর বৌভাত শবুদের বাড়ীতেই হবে। তাই দীননাথ শবুকে বলেছিল—

'তুলুর বিয়েতে বরকর্তা গৃহকর্তা সবই নাকি আমি। তপুর বিয়েতে আমার যাওয়া হবে না, তুমি কারো সঙ্গে চলে যেয়ো। ওখানে বাবা আছেন, কানাইও এখন সেয়ানা হয়েছে, আমি না গেলেও চলে যাবে।'

অবস্থার খাতিরে তাই মেনে নিতে হয়েছিল। তবে অন্য কারো সঙ্গে যেতে হয় নি। কানাইকে সঙ্গে করে মা এসেছিলেন এক সঙ্গে নীলার বিয়ে আর তপুর বিয়ের বাজার সারতে। নীলার বিয়ে মিটিয়ে দিয়ে সবাই মিলে তপুর বিয়ের বাজার সেরে মার সঙ্গে শবু গিয়েছিল মন্দির শহরে তপুর বিয়ের তিন দিন আগে। নীলার দ্বিরাগমনের জন্য কাকীমা যেতে পারেন নি।

বাড়ীতে পৌঁছতেই বাবা উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

'কই, দীননাথকে দেখছিনা, সে এল না?'

মা বললেন—'তপুর বিয়ের দিনই তার মামাতো ভাইয়ের বৌভাত, তার উপরই সব ভার তাই দীনু আসতে পারবে না।'

বাবা হতাশ হয়েছিলেন—'সুশীল অসুস্থ, দীননাথ আসবে না, আর এক জামাইয়ের কথা না বলাই ভাল। আমি একা কি করে সব দিক সামলাব?'

শবু বলেছে—'বাবা—কানাই আছে, পুটু বাবুল এসেছে, শঙ্খ আসছে, ওরাই তোমাকে সাহায্য করবে।'

বাবার দুশ্চিন্তা তাতে একটুও কমে নি—'এত বড় কাজ এসব ছেলে ছোকরাদের দিয়ে হয়? তোদের মার শরীর ভাল না—ওদিকে ছোট বৌমা

আসতে পারলেন না, হৈম নেই তাই মেজ বৌমার নাকি সব কাজ করা চলে না—তোদের মাকেই বা কে সাহায্য করবে?'

'সে তুমি ভেবোনা বাবা, আমি আছি মিতু কাকলী বুলা আছে।' শবু বাবাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছে।

'তোরাও ত সব ছেলেমানুষ' বাবার ইতস্তত ভাব কাটতে চায় না।

শবু বলতে পারে না, বাবা আমি আর ছেলেমানুষ নেই,—বলতে লজ্জা করে। বাবা-মার কাছে ছেলেমেয়েরা চিরকালই ছেলেমানুষ।

মা বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—'মনে নেই শবু প্রায় একা তার ননদের বিয়ে দিয়েছে।'

'তাও ত বটে' বলে বাবা অন্য কাজে গেলেন।

ততক্ষণে শবুর নজর পড়েছে কানাইয়ের দ্বিতীয় মেয়েটার দিকে—পাঁচ মাসেরটি হয়েছে, গায়ের রং একটু ময়লার দিকে—মুখে আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমোচ্ছে। বাবা নাকি বলেছেন—এই মেয়ের গায়ের রংটাই মিষ্টি। শবু মাকে বলল—

'মা, বড় মেয়েটার নাম তোমরা রেখেছো মিঠি, আমি এটার নাম দিলাম দিঠি। দিঠি মানে আঁখি।'

কানাই বলে উঠল—'মেজদি, তোর দেখি বাংলা ভাষায় অগাধ জ্ঞান। আমি মিঠির সঙ্গে চিঠি ছাড়া আর কোন মিলই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

পাশে দাঁড়ানো মিতুর হাসিটা আরও বাঁকা দেখাল।

ওদিকে তপু তার বিয়ের জন্য কেনা জিনিষ পত্তর খুঁটিয়ে দেখতে লেগেছে। তার খুঁত খুঁতি আর যায় না—

'মা, এটা কেন এরকম এনেছো, ওটা ভাল হয়নি, এর চাইতে কত ভাল ভাল শাড়ী এখানে প্রুষ্টিদের দোকানেই পাওয়া যায়।'

মা বললেন—'আর জ্বালাসনে তপু! আমরা পাঁচ জনে মিলে সব পছন্দ করে আনলাম. এখন ঐ নিয়েই সন্তুষ্ট হ'। তোর বিয়েটা হলে আমি বাঁচি।'

তপু তর্ক করে—'বাঁচবে আবার কি?'

'তা নয়ত কি? কুচ্ছিৎ নয় খুঁতো নয় তবু এই মেয়ের বিয়ে ঠিক করতেই তার তেইশ বছর পার হয়ে গেল। বিয়ে যদি ঠিক হল ত এটা পছন্দ নয়, ওটা অপছন্দের। তোরও বিয়ে হবে না, আর আমিও মরতে পারব না।'

তপু মুখ ফসকে বলে ফেলল—'আমার বিয়ে দিয়েই যেন তুমি মরছ!'

শবু জিভ কাটল—'ছি তপু, অমন করে বলিস না, কোন দেবতা কখন কোথায় থাকে। মা গো, তুমি তপুর কথায় রাগ কোরোনা।'

তপু সত্যি সত্যিই কিছু ভেবে বলেনি। আসলে প্রতিটি নতুন কেনা জিনিষ নিয়ে খুঁত খুঁত করাটা তার স্বভাব। পরে এই তপুই সবাইকে গর্ব করে দেখাবে—এই দেখ কি সুন্দর হয়েছে, আমার মা পছন্দ করে কিনেছে।

দিদির মেয়ে বুলা মাঝখান থেকে বলল—'দিদিমা, তপু মাসীর বিয়েতে কত কি দিচ্ছ—আমার মার বিয়েতে কিছুই দাওনি।'

তপু বলল—'আমার মা আমাকে দিচ্ছে, তোর কি? তোর বিয়ের সময় তোর মা অনেক কিছু দেবে। তুই ত বাবা মার এক মেয়ে আর আমরা চার বোন।' তপু তখন মার পক্ষে।

বুলা বলল—'হ্যাঁ চার বোন, তাই চার বোনকে সব কিছু সমানভাবে ভাগ করে দিতে হয়।'

কানাই বলল—'দেখ বুলা, তোর মুখে এ সব কথা মানায় না—বড়দি ত কোনদিন বলে না।'

বুলা থামল না, বলে চলল—'বলে কিনা তুমি জানবে কি করে ছোটমামা? তুমি ত বারে বারে কলকাতা যাও, শবু মাসীদের বাড়ীতে থাকো, বরানগরে থাকো—কবার আমাদের বাড়ী বেহালায় গ্যাচো? দাদা সেবার এসে তার এক বন্ধুর ঘড়ি কেনার জন্য দেড়শটা টাকা নিয়েছিল তার জন্য আজও তোমরা তাগাদা দিচ্ছ।'

কানাই বলল—'আমি ষষ্ঠীতলা, চাঁপাতলা দু'জায়গায় থেকে পড়েছি—ওদিকেই আমার বেশী চেনা জানা, বন্ধুবান্ধব। বেহালায় কি তা আছে? তুই দেখি খুব ঝগড়ুটে হয়েছিস!'

অবস্থা ঘোরালো দেখে বাবুল ততক্ষণে সেখান থেকে সরে পড়েছে। কিন্তু বুলা তবু ফোঁস করে উঠল—'যা সত্যি কথা তাই বলব।'

শবু বলল—'দেখ বুলা, দিদি বা আমার বিয়ের সময় সংসারের যা অবস্থা ছিল সেই অনুপাতে বাবা মা আমাদের সাধ্যমতই দিয়েছেন। আমার সে জন্য কোন দুঃখ নেই, যতদূর জানি দিদিরও নেই। বন্ধুর জন্য টাকা নিলে তাগাদা ত করবেই, নিজের জন্য নিলে কি করত? জামাইবাবুর অসুখের সময় মা টাকা দেয়নি? তুই ছেলে নিয়ে মিতুকে বাবা মা দেখছে না? যার যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দাদু দিদিমার মনে কি দুঃখ দিতে আছে?'

মা এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বুলার কথা শুনছিলেন, শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—

'কিছুর মেয়েটা ত বড় বিচ্ছু হয়েছে!'

যথারীতি বিয়ে শাদী মিটে গেছে। তপুর বিয়েতে বাবা মা খরচের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করেন নি—তপু যে সব থেকে ছোট মেয়ে, বলতে গেলে বাবা মার জীবনে সেই ছিল শেষ বড় কাজ। জামাইও খুব ভাল হয়েছে—সুন্দর ফুটফুটে ফর্সা ছোট্টখাট্ট চেহারা। বাবা নিশ্চয়ই এই জামাইকে 'বাবাজীবন' সম্বোধন করে চিঠি লিখতে পারবেন।

সেই সময় শবু দেখেছে মাকে নতুন উদ্যমে এক চতুর্দশী কিশোরীর মত কাজ কাম করতে। কে বলবে এই মানুষ দু দুবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। বাবা এক সময় অস্থির হয়ে বলেছেন—

'ওরে শবু, ওরে কানাই, তোরা তোদের মাকে সামলা। তাকে এই দেখছি নীচের উঠোনে ছাদনাতলার কাজ দেখা শোনা করছে, আবার দেখছি দৌড়ে দৌড়ে তিন তলায় ছাদে উঠেছে কাজের তদারক করছে। আবার অসুখে পড়লে যে আর তাকে বাঁচানো যাবে না।'

মা লজ্জায় কনে-বৌয়ের মত রাঙা হয়ে বলেছেন—

'তাই বললে কি হয়? মেয়ের বিয়ে, কোন অনুষ্ঠানে যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায়?'

শবু বলল—'মা গো, তুমি যা যা বলছ আমরা সবাই মিলে তাই করছি, তুমি কেন আমাদের কথা শুনছ না?'

কানাই মাকে ধমক দিল—'মা, তুমি আর একবারও ওপর নীচ করবে না। বল কি করতে হবে, আমরা করছি।'

কিসের কি। একটু পরেই মা কোন ফাঁকে আবার নীচে নেমে গেছেন। একটা জিনিষ পাঁচবার না দেখলে বিশ্বাস হয় না, সব জিনিষ নিজে হাতে না করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাঁকে আটকে রাখবে কে? বাসি বিয়ের দিন জামাইকে স্নান করাতে হবে সেখানেও তিনি জামাইয়ের তেল সাবান গামছা নিয়ে উপস্থিত।

শবু বলল—'মা, আবার তুমি কেন নীচে এলে, আমিই ত আছি।'

মা করুণ হেসে বললেন—'আর আজকের দিনটাই শবু, কাল থেকে ত আর কোন কাজ থাকবে না।'

এমনভাবে মা কথাগুলো বলেছিলেন যে শবু বাধা দিতে পারে নি।

নতুন জামাই অমল বাথরুম থেকে বেরিয়ে—'আমার চশমাটা যেন কোথায় রাখলুম' বলে কুয়োর বাঁধানো পাড়ের উপর হাতড়াতে লাগল।

মা তাড়াতাড়ি চশমাটা তুলে তার হাতে দিয়ে বললেন—

'বাবা অমল, চশমা না হলে কি তোমার খুবই অসুবিধে হয়?' ছেলে প্রথমে যখন তার বন্ধু দেবনাথের সঙ্গে মেয়ে দেখতে এসেছিল তখনই তিনি ছেলের চোখে চশমা দেখেছিলেন—কিন্তু সেটা যে এতখানি তাঁর ধারণা ছিল না। মনটা বুঝি তাঁর খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

অমল চশমাটা মুছে চোখে দিতে দিতে লাজুক হেসে বলেছিল—

'হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকেই আমাকে চশমা নিতে হয়েছে।'

শবু বলল—'এই ত জামাইয়ের স্নান হয়ে গেছে, চল মা, আমরা উপরে যাই।'

অমল বলেছিল—'হ্যাঁ চলুন মা, আমি আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।' অমল বুদ্ধিমান ছেলে, সকলের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝে নিয়েছিল মার শরীর ভাল না।

আর সেই মেয়ে-জামাইয়ের রওনা হবার কালে মার সকি কান্না। তপু যত কাঁদে মা কাঁদে তার দ্বিগুণ। কেঁদেছে শবু, বড় কাকীমা, মিতু, কাকলী এমন কি বাবার চোখেও ছিল জল। আর কেঁদেছে কানাই একেবারে ছেলে-মানুষের মত। ওরা দু'ভাই বোন ছিল যেন দুই বন্ধুর মত।

সকলের এত কান্না দেখে তপুর শ্বশুর অভিভূত হয়ে বলেছিলেন—

'আহা, আপনারা এত কাঁদছেন কেন? আমার স্ত্রী খুবই কোমল প্রকৃতির। আপনাদের মেয়ে তার কাছে কন্যাস্নেহেই পালিতা হবে। আমাদের ঘরে মেয়ে নেই, বড় বৌমা আমাদের সে অভাব পূরণ করবে।'

মা কেঁদে বলেছিলেন—'সবই জানি, তবু মন যে মানে না।'

সব মিটে যেতে মা একদিন শবুকে বললেন—

'আমরা সব কন্যাদায় থেকে মুক্ত হলাম। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি কই? এত বড় একটা বিয়ে গেল, বাড়ীর বড় ছেলে নন্দু অবোধের মত পড়ে রইল কিছুই বুঝতে পারল না। অথচ সব ভাইবোনের জন্য ওর যত মায়া-মমতা ছিল তেমন আর বুঝি কারো ছিল না।

'এখন কদিন পরে আছে তপুদের দ্বিরাগমন, সামনে আসছে জামাই ষষ্ঠী—সেটাও পার দিতে হবে।

'আর সব চাইতে বড় দুশ্চিন্তা মিতুকে নিয়ে। সে ত স্বামীর কাছে ফিরে যাবে না বলে যেন পণ করেছে। এদিকে বোকা বোকা ভাবে থাকে। আবার মাঝে মাঝে কোথায় যায় কার সঙ্গে মেশে বোঝাও যায় না, বারণ করলেও শোনে না। একবার কানাই রেগে ওকে বেদম মারল—তাতেও মেয়ের লজ্জা হল না। আমি কোন মুখে কানাইকে বাধা দেব? আবার মেয়ের তেজ আছে, বলে—আমার ছেলে দুটোকে খেতে দিতে পারবে না বলে দাও, এখানেও দাসীর মত খাটছি, আলাদা থেকে নিজেই আমি ওদের খাওয়াব।

'আমি মা, এ অবস্থায় ওকে ফেলে দিই কি করে, ছেলে দুটোর কি হবে? সব কথা সবাইকে বলতে পারি না, তুষের আগুনের মত বুকের ভিতর জ্বলতে থাকে। যতটা পারি সামলে রাখি।

'কাকলী পরের ঘরের মেয়ে। এ সব অনাসৃষ্টি সে কি করে সহ্য করবে—তাকে যে দু' দুটো মেয়ে নিয়ে ঘর করতে হবে। মিতু কাকলী কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। কাকলীকে দোষ দিতে পারি না। আমারই অসহ্য লাগে। এই চরিত্তিরের জন্য মিতুর যে কোথাও ঠাঁই হবে না, কারো সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে না। ওর জন্য, নন্দুর জন্য আমি যে মরেও শান্তি পাব না।'

বলতে বলতে মা হু হু করে কেঁদে ভাসিয়েছিল। কোন সমাধান, কোন সান্ত্বনা দিতে না পেরে শবুও শুধু কেঁদেই মার বেদনার অংশ নিতে চেয়েছিল। কি করে মাকে দু' দুটো দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দেবে শবু ভেবে পায় নি। কেঁদে বলেছিল—

'মাগো, তুমি অত ভেবো না। মিতুর যা হবার হবে। তুমি নিজের শরীরের যত্ন নিও, বাবার কথা ভেবো।'

মা বলেছেন—'কিছু ভাবব না ভাবি, তবু ভাবনা এসে যায়। ভাবি তোর আর দীপুর জন্যও। এক এক সময় ভাবি তোরা যে পেয়েও হারিয়ে বসে আছিস তোদের কি হবে? আবার ভাবি আমাদের সব থেকেও আমরা কী সুখে আছি! তোর দু' দুটো ফাঁড়াও কেটে গেছে, আবার যদি ফাঁড়া আসে আমি কি তোকে বাঁচাতে পারব?'

শবু বলেছে—'আমরাও আর কিছু না পাওয়ার কথা ভাবি না মাগো। আমরা যেমন আছি তেমনি যদি শান্তিতে যেতে পারি সেই ভাল।'

বলতে গেলে সে-ই মার সঙ্গে শবুর শেষ কথা। আর শেষ দেখা হয়েছিল মন্দির শহর স্টেশনে—কানাইয়ের সাথে মা এসেছিলেন শবুকে ট্রেনে তুলে

দিতে। স্টেশনে পৌছে না মা, না শবু—কেউ বেশী কথা বলতে পারে নি। ট্রেন ছাড়ার আগে মাকে প্রণাম করে শবু বলেছিল—

আসি মাগো, তুমি সাবধানে থেকো, ভাল থেকো। কানাই মাকে সাবধানে বাড়ী নিয়ে যাস।'

কানাই বলেছে—'সাবধানেই নিয়ে যাব, সাবধানে রাখব—তুই কিছু ভাবিস না মেজদি।'

হ্যাঁ, কানাই থাকতে মার অন্য কোন ভাবনা নেই—সে মাকে খুব ভাল বাসে। মিতুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে কাকলী এক সময় আলাদা সংসার পাততে চেয়েছিল। কানাই তাকে বুঝিয়েছে—অসুস্থ মা, অসুস্থ দাদা ও বৃদ্ধ বাবাকে ফেলে কোথায় যেতে চাও বল, আমি যেতে পারব না। কাকলী আর সে কথা বলেনি। তৈরী বাড়ী ফেলে মা বাবাকে আবার ভাড়া বাড়ীতে থাকতে হচ্ছে বলে কানাই নিজে উদ্যোগ নিয়ে কৈলাস ভবনের পাশে এক-খানা জমি ধরে রেখেছে। তপুর বিয়ে গেল, এবার সেখানে ধীরে সুস্থে একখানা বাড়ী করে মা বাবা দাদাকে নিয়ে সবাই মিলে সে বাড়ীতে উঠবে। কানাইয়ের মত ছেলে হয় না।

শবুকে অন্যমনস্ক দেখে মা বললেন—'কি ভাবছিস, গাড়ী ছাড়ার সময় হয়ে গেল। সাবধানে থাকিস।'

'আচ্ছা। মাগো, তুমি আমাকে চিঠি দিও।'

শবুকে আশীর্বাদ করে চুমু খেয়ে মা বললেন—

'দেবো। তুইও চিঠি লিখিস্ মা। দুর্গা, দুর্গা।'

ট্রেনটা তখনই চলতে আরম্ভ করেছিল। শবুর সারা অন্তর জুড়ে বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল—লিখব মাগো, লিখব। যখন তুমি কাছে নেই তখন তোমার নিজে হাতে লেখা চিঠিই যে আমার একমাত্র সম্বল, তোমাকে চিঠি লেখাই যে আমার সব থেকে আনন্দের কাজ।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শবু মাকে দেখছে, মা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে তাঁর আদরের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে আছেন। কানাই দুই হাতে মাকে এক ছোট্ট মেয়ের মত জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে তার মেজদিকে দেখছে।

সে-ই শেষ দেখা! মাকে দেখা সেই ছবি আজও শবুর মনে আঁকা আছে। আজও চোখ বুজলে শবু মার সেই ছবি দেখতে পায়—শুধু মার মুখটাই সে ছবি থেকে বুঝি মুছে গেছে কিছুতেই রূপ ধরে দেখা দেয় না।

পাঁচ

শুপুর বিয়ের মাস খানেক পরেই বাংলা নববর্ষ। শবু আশায় ছিল, আর কয়েকদিনের মধ্যে মার আশীর্বাদী চিঠি আসবে নববর্ষ উপলক্ষে।

তার আগেই এসেছিল এক দুঃসংবাদ। দমদম থেকে মহী পাটনা এরোড্রোমের এক বন্ধুর সাহায্যে টেলিফোনে দীননাথকে খবর পাঠিয়েছে—চাঁপাতলার বাড়ীতে গত পয়লা বৈশাখ সন্ধ্যারাতে হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাজ পড়ে বড় নারকেল গাছ ও পাঁচটা শুপুরী গাছই মরে গেছে, অন্য গাছগুলোও সামান্য করে ঝলসে গেছে, বাড়ীর ইলেকট্রিক লাইন বহু জায়গায় পুড়ে গেছে—অন্য জান মালের কোন ক্ষতি হয় নি। এমন একটা দুর্দৈব ঘটনা কেন ঘটল শবু আর দীননাথ দু জনেই আলোচনা করে কোন অর্থ খুঁজে পায় নি। ফলন্ত ছয় ছয়টা গাছ মরে গেছে বলে দু জনেই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যায় রবি মাষ্টার আসতে শবু তাকে জিজ্ঞেস করেছে—

'আচ্ছা মাষ্টার মশাই, বাড়ীতে বাজ পড়লে কি হয়? আমাদের বাড়ীতে নাকি বাজ পড়ে কতকগুলো ফলন্ত নারকেল ও সুপুরী গাছ পুড়ে গেছে। এর আরো কোন অশুভ ফল আছে কি?'

মাষ্টার কিছুক্ষণ ভ্রূ দুটো কুঁচকে ভেবে মাথা নেড়ে বলল—

'খুব খারাপ, খুব খারাপ। গুরুদশা অবশ্যম্ভাবী।'

দীননাথ ঝাঁঝিয়ে উঠল—'রাখুন মশাই আপনার জ্যোতিষী। আমার দাদা ইঞ্জিনীয়ার, সে বলেছে বাড়ীর লাগা 'সলিট্যারী হাইটে' নারকেল বা তালগাছজাতীয় কিছু থাকলে বাড়ীতে বাজ পড়ার ভয় থাকে। গুরুদশা আসছে কোথেকে?'

সে এসব বিশ্বাস করে না। মাস্টার একবার শুপুর কবে বিয়ে হবে জিজ্ঞেস করাতে, মেয়ের বাবার বয়স কত জেনে নিয়ে বলেছিল—আরো দু বছর পরে হতে পারে। শবু জানতে চেয়েছিল—দেখুন ত আমার আয়ু কত, সধবা যেতে পারব কিনা? মাস্টার তার হাত দেখে প্রথমটা চমকে উঠে পরে বলেছিল—সিঁথির সিঁদুর অবশ্যই অটুট থাকবে—আয়ুর কথা সঠিক বলা যায় না, মনে হয় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পার হলে ষাট সত্তরে অনায়াসে বিচরণ করবে।

বাপের বয়স জেনে মেয়ের বিয়ের সময় হাঁকে, আয়ুর ব্যাপারে 'এ্যাও হয় ওও হয়' গোছের জবাব শুনে দীননাথ মাস্টারকে 'হাতুড়ে জ্যোতিষী' বলে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি।

এবার দীননাথের কথায় মাষ্টার জবাব দিল—

'শাস্ত্রে নারকেল গাছকে বলেছে 'ব্রাহ্মণ'। বাড়ীর নারকেল গাছ ঐ ভাবে মারা যাওয়াতে ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগে। সেও একরকমের কুলক্ষণা। তবে আমার ধারণা এর পরও কিছু আছে। ভাবি যে তর্ক করা শিখেছ লাহিড়ী। তুমি কি বলতে চাও তোমাদের ঐ চাঁপাপুর না নিরপুর গ্রামে একক উচ্চতায় শুধু তোমাদের বাড়ীতেই একটা নারকেল গাছ ছিল? তা যদি না হয়, তার চাইতেও উঁচু উঁচু গাছ থাকতে বাজ তোমাদের গাছটাকেই কেন বেছে নিল? দেয়ার আর মোর থিঙ্গস্ ইন হেভেন এণ্ড আর্থ—দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে তার ব্যাখ্যা করতে যেয়ো না।'

মাস্টারের কথাগুলো শবুর মাথায় চেপে বসেছিল। যেখানে বাজ পড়েছিল সেখানে মা মঙ্গলা দেবী ছিলেন—তিনি গুরুজন। তিনি সশরীরে সুস্থই আছেন। বাবা কালীনাথ আগেই গত হয়েছেন। বাকি থাকে শবুর বাবা-মা গিরিনবাবু আর পদ্মিনী দেবী। দুই জনের মধ্যে মার শরীরটাই ভেঙে পড়েছে, তবে কি মা··· ।

আর ভাবতে পারে নি। এদিকে মার কাছ থেকে নববর্ষের চিঠিও আসেনি। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মাকে একখানি চিঠিতে নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়ে দীননাথের হাত দিয়ে পোষ্ট করিয়েছে।

মাষ্টার মশাইয়ের কথাগুলো অবিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন। প্রতিটি কথাই যেন গভীরভাবে ভেবে বলে—সেখানে লঘুতার কোন ঠাঁই নেই। সেবার শবু মার হাতটাও দেখতে অনুরোধ করেছিল। মাষ্টার মার হাতখানা মুহূর্ত মাত্র দেখে হাত ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলেছিল—

'বুঝলেন বৌদি, যে দেশে মানুষের গড় আয়ু ত্রিশ বছরের কাছাকাছি সেখানে ষাট পঁয়ষট্টি বছর বাঁচাটা অনেকটা ব্যতিক্রমের মত। লাহিড়ীর মত সরকারী চাকরি করলে আমাকে হয়ত এখনই বানপ্রস্থে পাঠাত। স্কুল মাষ্টার বলে কর্পূরী সরকার আমাদের চাকরির মেয়াদ কিছু বাড়িয়েছে। তার আগেই কর্মস্থল আমাকে ত্যাগ করে না আমাকেই কর্মস্থল ত্যাগ করতে হয় কে বলতে পারে?'

কথাগুলো হেঁয়ালী বা দার্শনিকতা ভরা হলেও তার ভিতরে একটা প্রচ্ছন্ন

ইঙ্গিত ছিল না কি ? মার বয়সও এখন··· ।

দীর্ঘ পনরো দিন অপেক্ষার পর মার সেই চিঠি এসেছিল। দীননাথের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়েই শবু সেটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছে।

মা লিখেছেন—কল্যাণীয়া, মা শবু, তোমরা আমাদের শুভ নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করিও। তোমার পৌঁছা সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমার নিজের শরীরও তত ভাল না। তার উপর কানাইয়ের ছোট মেয়েটার ভয়ানক অসুখ, ৪টে কষের দাঁত একসঙ্গে উঠছে। থেকে থেকে যেমন হাগা তেমনি বমি কিছু পেটে থাকছে না। বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কাঁদার ক্ষমতাও নাই। বড় চিন্তায় আছি। আজ একটু ভাল মনে হচ্ছে। তাই চিঠি লিখছি। তপু অমলের ভাইয়ের বিয়েতে ভুবনেশ্বরে গিয়েছিল। তারপর দিন অমল এসে তপুকে এখানে রেখে গিয়েছে। এখানে আমরা সকলে একপ্রকার ভাল। আশা করি তুমি আর দীনু ভাল আছ। তুমি দীনু আমার আশীর্বাদ নিও। চিঠির উত্তর দিও। ইতি—আঃ তোমার মা—

চিঠি পেয়ে ও পড়ে শবু আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। এই ত মা নিজে হাতে চিঠি লিখেছে, মা ভাল আছে, সবাই ভাল আছে। চিঠিটা বারবার করে পড়েছে—প্রতিটি কথা তার মুখস্থ হয়ে গেছে, এমন কি চিঠির মাথায় লেখা 'শ্রীহরি' ও ঠিক আছে। দীননাথকেও ছোট্ট করে একটুখানি লিখে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়েছেন। কোন কিছুতেই ভুল নেই—শুধু শবুর শেষ চিঠিটার কোন উল্লেখ নেই, হয়ত তখনও চিঠিটা পান নি। মার চিঠিতে তারিখ দেওয়া আছে ২৬শে এপ্রিল। মা লিখেছেন—আমার নিজের শরীরও তত ভাল না। নিশ্চয়ই তেমন কিছু খারাপ নয়।

সে তখনও জানেনা মায়ের লেখা সে-ই শেষ চিঠি। তারপর বৈশাখ গিয়ে এসেছে জ্যৈষ্ঠ মাস—চলে গেছে জামাইষষ্ঠী। কবে আষাঢ় মাস এসে গেছে তা খেয়াল নেই। তার আগে জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরমে পাটনায় লু লেগে দীননাথ তিন দিন ভুগে উঠেছে।

গরমের শেষ দিক থেকেই শবুর যে কি হয়েছে বুঝতে পারে না। গা হাত পা যেন সব সময় জ্বালা করে, সারা শরীর চুলকোয়, জায়গায় জায়গায় ব্রণ বা ছোট ছোট ফুস্কুরীর মত কি যেন বেরিয়েছে সেই গুলোই বেশী চুলকোয়। শরীরের যন্ত্রণায় আর অস্বস্তিতে ভাল ঘুম হয় না—না রাতে, না দিনে—কাজে উৎসাহ লাগে না।

মাষ্টারের পরামর্শে মাসখানেক স্থানীয় এক হোমিওপ্যাথকে দেখিয়ে ওষুধ খেল তাতেও কোন উপকার পাচ্ছে না। লোকে বলছে—রক্ত দূষিত হয়েছে, কাঁচা হলুদ গুড় দিয়ে খাও, গায়ে হলুদ মেখে স্নান কর, গায়ে চন্দনের প্রলেপ লাগাও। কিছু করেই আরাম পাচ্ছে না। শেষে দীননাথ একদিন বলল—

'চল একদিন এখানকার মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

তাই শুনে বাড়ীর দাই শীলুয়াকী মা শবুকে বলল—

'উহা অচ্ছী ইলাজ নহী হোতী উহা মৎ যা। তু কুর্জিমে যা।'

সবাই পাটনার মিশনারী হাসপাতাল কুর্জিতে দেখাতে বলছে। তাই কুর্জিতেই দীননাথ শবুকে নিয়ে গেল। সেখানে স্কিন স্পেশালিষ্ট ভাল করে দেখে ওষুধ ও মলম দিয়ে বলে দিল আবার পনেরো দিন পরে আসতে। চলছে সে ওষুধ তবু কোন উপকার হচ্ছে না।

বিংজা গুপ্তর বৌ একদিন বেড়াতে এসে অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল—

'দিদি, আপনার বাবা মার শরীর ভাল আছে ত? সেখান থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন?'

না, পায়নি। মার চিঠিটারও উত্তর দেওয়া হয়নি, শরীরে একটু স্বস্তি পেলেই শবু মাকে চিঠি লিখবে।

দশ দিন হয়ে গেছে কুর্জির ওষুধ চলছে। কানাইয়ের কাছ থেকে চিঠি এল। লিখেছে—মার শরীর খুব খারাপ—আগের সবগুলো উপসর্গ এক সঙ্গে দেখা দিয়েছে। বাড়ীতে রেখে সিভিল সার্জন ও অন্যান্য ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। মা হাসপাতালে যেতে চাইছে না। ওষুধে মাঝে মাঝে কাজ হচ্ছে। মা বারবার মেজদির কথা বলছে। মেজদি একবার যেন আসে। তবে চিন্তার তেমন কারণ নেই, বাবা থেকে আরম্ভ করে সবাই মিলে মায়ের সেবা ও শুশ্রূষা চলছে। মেজদিরা একবার এলে ভাল হয়।

শবুর চিঠি পড়া হলে দীননাথ জিজ্ঞেস করল—

'কি করবে, যাবে এখনই? ওদিকে আর পাঁচ দিন পরে কুর্জিতে যেতে বলেছে।'

শবু যেন তার সব বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, নিজের থেকে কিছু ভাবতে পারে না, নিজের ইচ্ছায় বুঝি কিছু করতেও পারে না—শরীরের যন্ত্রণায় সে অস্থির, পাগলের মত হয়ে গেছে। মনে হয় কতদিন সে ঘুমোয় নি—

একটা নিশ্ছিদ্র গভীর ঘুমের জন্য সে পাগল। বাড়ীর রান্না খাওয়া শীলুর মা ও দীননাথের সাহায্যে কোন রকমে চালিয়ে যাচ্ছে। শবু আর কিছু ভাবতে পারে না—কানাইয়ের চিঠিটাও যেন তেমন বোধগম্য হচ্ছে না।

দীননাথ আবার বলল—'পাঁচদিন পরে কুষ্ঠিতে দেখিয়ে সেদিনই রওনা হওয়া যাক, কি বল? কানাইও লিখেছে—চিন্তার তেমন কারণ নেই, সিভিল সার্জন দেখছে।'

অবসন্ন শবু বলল—'তাই কর।'

পাঁচটা দিনও যায় নি, তিন দিন পরেই এল সেই টেলিগ্রাম। অসময়ে দীননাথকে অফিস থেকে ফিরতে দেখে শবু এগিয়ে গিয়েছিল। দীননাথের শুকনো মুখ দেখে আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠেছিল। দীননাথ বলেছে—

'কানাই যাবার জন্য টেলিগ্রাম করেছে, অফিস থেকে ছুটি করিয়ে নিয়ে এসেছি, আজ রাতের গাড়ীতে আমরা যাব। কুষ্ঠির জন্য আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।'

শবু কাঁপা হাতে টেলিগ্রামটা খুলে পড়ল—'মাদার সিরিয়াস—কাম উইথ মেজদি'। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুতি সেরে নিয়ে দুজনে রাতের গাড়ীতে উঠে বসেছিল। মাঝখানে দীননাথ একবার বলেছিল—

'তিন দিন আগে পাঠানো টেলিগ্রাম আজ এল! ধন্য ডাকবিভাগ!'

অবসন্ন শরীরে প্রায় বোধশূন্য মন নিয়ে শবু ভেবেছিল—মার কাছে যাবে, মার শরীর একটু ভাল হলে আবার পাটনায় নিয়ে আসবে। নিজের শরীরের ঘা-যন্ত্রণা এখানকার হোমিওপ্যাথি আর কুষ্ঠির ডাক্তারেও ভাল করতে পারল না—বাবার এক পুরিয়া ওষুধ খেলেই সব ঘা যন্ত্রণা সেরে যাবে···। আর সেই সময়ই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মাকে দেখেছিল—মা বলছিলেন—শবু এসেছিস? ··

ছয়

মনে পড়ে সেদিনও ছিল শুক্রবার। ট্রেনে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে হাওড়ায় নেমে বরানগর ছুঁয়ে গিয়েছিল চাঁপাতলায়। ষষ্ঠীতলায়ও শুধু অসুখের টেলিগ্রাম এসেছে।

বাড়ীতে মা মঙ্গলাদেবী দীননাথের মুখে ওদের আসার কারণ শুনে আবার

কি মন্তব্য করেছিলেন শবু শোনেনি। সে গিয়েছিল মামীমার সঙ্গে দেখা করতে। মামীমা সব শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—

'যাও, মাকে দেখে এস। পারলে আবার মাকে পাটনায় নিয়ে যেয়ো। কিন্তু শ্রাবণী, তোমার শরীরের যা গুলো দেখে ত আমার ভাল লাগছে না।'

'কেন, কি হয়?'

'না, লোকে বলে ভাল নয়।'

বিকেলে শবু আর দীননাথ আবার এল ষষ্ঠীতলায়, সেখান থেকে সামান্য কিছু খেয়ে রাতের গাড়ী ধরতে হাওড়া ষ্টেশনে যাবে। পথে আসতে রথতলায় মোড়ে কালকের রথের আগাম প্রস্তুতি দেখে এসেছে।

কাকীমা বললেন—'দিদির অসুখের খবর এসেছে, আমারও একবার যাওয়া দরকার। শ্রীলা, এলা বা নীলা কাউকে আগে থেকে খবর দিয়ে আনলে আমি তোদের সঙ্গেই যেতে পারতাম শবু।'

কাকা বললেন—'যাওয়া বললেই যাওয়া? কাল রথ, ট্রেনে কি প্রচণ্ড ভিড় হবে। আর ওখানে ষ্টেশনে নামলেই কলেরার ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবে।'

কাকীমা বললেন—'তাই বলে ত আর অসুখ শুনে চুপ করে বসে থাকা যায় না। যাক, তোরা আজ যাচ্ছিস, আমি নাহয় এখানকার ব্যবস্থা একটা করে দুদিন পরেই যাব।'

কাকীমা দীননাথকে খাইয়ে দিয়েছেন, আলাদা একটা থালায় ভাত বেড়ে ডাকলেন—

'আয় শবু, খাবি আয়।'

শবু পাতে বসে সবে ভাতে হাত দিয়েছে, সিঁড়িতে একজোড়া পায়ের আওয়াজ উঠে এল, একটা হাঁক শোনা গেল—'টেলিগ্রাম'।

শবুর হাতটা যেন ভাতের থালায় আটকে গেল।

কাকা সই করে টেলিগ্রামটা নিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলেন। দু চারটে ফিসফাস কথা কানে এল তারপরই সব চুপচাপ।

শবু আর্তস্বরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল—

'কাকা, কিসের টেলিগ্রাম?'

কেউ কোন জবাব দিল না, সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে। পর মুহূর্তে কাকীমাকে পাশের ঘর থেকে অস্বাভাবিকভাবে ছুটে আসতে দেখে একটা বুকফাটা হাহাকারে বজ্রাহতের মত শবু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল—

'মা, মাগো, তুমি কোথায়!'

শবুর আর বুঝতে কিছু বাকি নেই। সব প্রশ্নের জবাব সে পেয়ে গেছে সকলের নীরবতার মধ্য দিয়ে। আকাশে মেঘ থাকলে যে কোন সময় বজ্রপাত হতে পারে—ক'মাস আগেই যেমন বাড়ীতে বাজ পড়েছিল। একটা ক্ষীণ আশা ততোধিক ক্ষীণ সুতো অবলম্বন করে ঝুলছিল—একটি টেলিগ্রামের আঘাতেই সেটা ছিঁড়ে পড়ল। বাড়ীতে দেখে আসা বাজে পোড়া ডাল-পালাহীন নারকেল আর সুপুরী গাছগুলোর মতই রিক্ত সর্বস্বান্ত শবু বুকভাঙা কান্নায় মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর আর্তনাদ করছে—

'মা, মাগো—মা, মাগো'।

শবুর চোখে তখন সবই অন্ধকার। তার আর বেঁচে থাকার এতটুকু ইচ্ছা নাই। তার সব ইচ্ছার শেষ—আসুক সেই ইচ্ছার মৃত্যু।

মৃত্যু আসেনি। আশ্চর্য্য—শবু মুহূর্তের জন্য জ্ঞানও হারায়নি! যদি হারাতো তবে ক্ষণিকের জন্য অন্ধকারের ওপারে মার দেখা হয়ত পেত। শুধু এক অসীম শূন্যতায় সে বারবার ডুকরে কেঁদে চলেছে—

'মাগো, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!'

কাকীমা ছুটে এসে শবুকে জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। পাশের ফ্ল্যাটের শান্তি-বৌ কান্না শুনে এসে শবুকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

ঠিক হয়েছিল, সেই রাতেই কাকীমাও শবুদের সঙ্গে যাবেন। শান্তি বৌ শবুকে কিছু ফলমূল খাওয়াবার চেষ্টা করেছিল শবু কিছু দাঁতে কাটতে পারেনি। তারপর যন্ত্রচালিতের মত কাকীমা আর দীননাথের সঙ্গে ট্যাক্সিতে করে হাওড়ায় এসে একসময় মন্দিরশহরগামী ট্রেনে উঠে বসেছিল।

ট্রেনে নাকি ডাকাতদল উঠেছিল উলুবেড়িয়ার কাছাকাছি, একটা ষ্টেশন পরে গাড়ীর গতি কম হতে তারা জানালা গলে নেমেও গেছিল। তারা ছোরা পিস্তল বার করেনি তবে তাদের সর্দারটি শবুর হাতে গলায় কানে সোনার গয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এসেছিল। শবু জেগে বসেও সে সব কিছু দেখেনি, সে শুধু মার জন্য কেঁদে চলেছিল, দুচোখ বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল আর ভাবছিল। সর্দার কি ভেবে সাকরেদদের কি ইশারা করে শবুর পাশ দিয়েই জানালা গলে ধীরে চলা ট্রেন থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েছিল—তার গায়ে হাত দেবার চেষ্টাও করেনি।

কি ভাবছিল শবু? কান্নার সঙ্গে সঙ্গে শবুর ভাবনারও বিরাম ছিল না।

মনে পড়ছিল ষষ্ঠীতলায় বাড়ীতে সেই আচমকা আসা খবরের পর শবু কেঁদে বলেছিল—

'কাকা, আমার মা চলে গেছে। আমি আর গিয়ে কি করব, কিই বা দেখব ?'

কাকা শবুর মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—

'যা, এই সময় যেতে হয়। গিয়ে দাদার পাশে দাঁড়া। এই সময় দাদার কি কষ্ট হচ্ছে ভেবে দেখ।'

বেদনায় কাকার গলাও বুজে এসেছিল। বৌদি যে তাঁর জীবনে কতখানি জুড়ে ছিল তার সবটা শবুও জানে না। তাঁর বাল্য-কৈশোরে প্রায় সমবয়সী এক বৌদিকে পেয়েছিলেন, প্রায় পঞ্চাশটা বছর সুখে দুঃখে তাঁরা পরস্পরের কত অন্তরঙ্গ ছিলেন।

আর বাবা? তাঁর তখনকার শোকাহত মূর্তি শবু কল্পনাও করতে পারছিল না।

শবু আবারও কেঁদে বলেছিল—

'কাকীমা, আমায় যে মা বলে ডাকার কেউ রইল না, পদ্মিনী দেবীর নাম পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল।'

কাকীমা নিজে কেঁদেও সান্ত্বনা দিতে বলেছিলেন—

'দিদি সতীলক্ষ্মী ছিলেন—স্বামীর কোলে মাথা রেখে সধবা গেছেন, এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়? তোদের মধ্যে তাঁর নাতি নাতনীদের মধ্যে দিদি বেঁচে থাকবে।'

তাইতো! কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল। মা আর শবুর অব্যক্ত ধ্যান ও কামনা ছিল সধবা যাওয়া। মা সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, শবুকে পথ দেখিয়ে গেছেন।

কিন্তু সে ত এখনই মাকে হারাতে চায় নি। ভেবেছিল আবার মার সঙ্গে দেখা হবে, আবার মাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে সেবায় যত্নে সুস্থ করে তুলবে। মনে পড়েছিল তপুর বিয়ের সময় তপুর মুখ ফসকে বেরিয়ে আসা কথাগুলো—আমার বিয়ে দিয়েই যেন তুমি মরছ। কথাগুলো কি অদ্ভুতভাবে সত্যি ফলে গেছে। তপুর বিয়ে হল, দ্বিরাগমন—জামাইষষ্ঠী—, মোট চারটে মাস যেতেই মা সত্যি সত্যি চলে গেল।

তবু হয়ত মাকে বাঁচানো যেত। কানাই লিখেছিল—মা বারবার মেজদির কথা বলছে। মার নিশ্চয়ই আশা ছিল আবার শবু গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াবে,

শুধু মনের জোরেই মা আবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসবে। মনের জোর থেকে অনেক অসাধ্য সাধন হয়। শবুর মনে হচ্ছে, সে কাছে থাকলে যমেরও সাধ্য ছিল না মাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

কিন্তু কি যে অলুক্ষণে ঘা হল তার সারা শরীরে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে মার কথা ভাবতেও পারল না। যখন মা রোগশয্যায় শুয়ে বার বার 'শবু' 'শবু' বলে ডাকছে, কানাইয়ের চিঠিও মার সেই ডাক তার কাছে পৌঁছে দিল তখনও সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এ যে তার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। মাগো, আমি তোমাকে ভুলে ছিলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করো—বলে সে মন খুলে কাঁদতেও পারছে না।

এগুলো কীসের ঘা! ঠিক মায়ের অসুখের সময়ই কেন এ ঘা হল আর তাকে অস্থির করে তুলল? পাটনায় বিরজা গুপ্তর বৌ ঐ ঘা দেখেই বাবা মার কুশল জানতে চেয়েছিল। চাঁপাতলায় মামীমাও বলেছিলেন, লোকে বলে ভাল না। তারা দুজনে কী বলতে চেয়েছিল? মা বাবা চলে যাবার আগে কি ছেলে মেয়েদের গায়ে এমন অলুক্ষণে ঘা হয়? কানাই বা আর কোন ভাইবোনের কি এরকম হয়েছে? বাবা কালীনাথের মৃত্যুর আগ দিয়ে ত তাঁর ছেলে মেয়েদের এসব কিছু হয়নি, শুধু তার অল্পদিন আগে দীননাথের টাইফয়েড হয়েছিল।

আচ্ছা, পাটনার রবি মাষ্টার ত অনেক কিছু জানে। সে-ও ত তাকে ঘা সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়নি? অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ বলে তার মনে দুঃখ দিতে চায়নি? মার অসুখ সংবাদ নিয়ে যেদিন কানাইয়ের চিঠিখানা এসেছিল সে রাতেও বেড়াতে এসে মাষ্টার সব শুনেও কিছু বলেনি। তাকে দীননাথ এমন কথাও বলেছিল যে শবুর ঘায়ের চিকিৎসা শেষ না হলে তারা যেতে পারছে না। শুনে মাষ্টার ভাল মন্দ কোন মন্তব্য করে নি।

উল্টে সে রাতে মাষ্টার হঠাৎই মুখেমুখে মহাভারতের ব্যাখ্যা করতে লেগেছিল। বলেছিল—

'বল ত লাহিড়ী, তোমরা ত বারিন্দির, মাথায় অনেক বুদ্ধি, বুদ্ধির প্যাঁচে মাথায় ঢোকানো পেরেক স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসে, তোমার পেটেও অনেক বিদ্যে। বল ত—অভিমন্যু যখন চক্রব্যূহ ভেদ করে সপ্তরথীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে নিহত হ'ল অর্জুন তখন দূরে সংসপ্তক রণে ব্যস্ত সঙ্গে তার কৃষ্ণ সারথি। শ্রীকৃষ্ণ ত সবকিছু জানত—নিজে সে বিষ্ণুর অবতার—সব জেনে সে

কেন অর্জুনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ?’

দীননাথ কথাটাকে নস্যাৎ করে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—

‘আসলে কৃষ্ণ কিছু জানতই না। বুদ্ধির জোরে সবাইকে সম্মোহিত করে রাখত। কিছু ঘটে গেলে তখন ‘আমি আগেই জানতাম, আমিই সব করিয়েছি’ বলে নিজেকে মহামানব বলে জাহির করত।’

মাষ্টার একটা রহস্যময় হাসি হেসে বলেছিল—

‘তোমার মত অর্বাচীনের কাছে এ রকম জবাবই আশা করেছিলাম। ভেবেছ এই রকম একটা ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের বিভা-বুদ্ধি জাহির করবে। ব্যাপারটা তা নয়। আমি বলছি শোনো, বৌমা তুমিও শোনো।—

‘সংসপ্তক যুদ্ধে জয়ী হয়ে কৃষ্ণ অর্জুন ফিরে এসে পাণ্ডব শিবিরে শোকের ছায়া দেখতে পেল। পরে জানা গেল এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে—অর্জুন পুত্র অভিমন্যু অন্যায় সমরে নিহত হয়েছে। ক্ষাত্র তেজে প্রজ্বলিত হয়ে পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে অর্জুন তৎক্ষণাৎ জয়দ্রথকে বধ করার প্রতিজ্ঞা নিল। পরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করল—সখা, তুমি ত অন্তর্যামী—সব জেনেও কেন তুমি অভিমন্যুকে নিহত হতে দিলে ?

‘কৃষ্ণ বলল—এর প্রয়োজন ছিল, না হলে তুমি জয়দ্রথ ইত্যাদি মহারথীদের বধে জ্বলে উঠতে না। সখা, তুমি কাছে থাকলে তোমার একান্ত স্নেহের পাত্র অভিমন্যুকে বধ করে কার সাধ্য ? স্নেহবৎসলা সিংহীর কাছ থেকে সিংহ শাবককে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এমন সাধ্য কার আছে ? যে যাকে সর্ব্বাধিক স্নেহ করে, ভালবাসে তার সামনে থেকে নির্দিষ্ট প্রাণটিকে কেড়ে নিয়ে যায় সে সাধ্য স্বয়ং শমনেরও নেই। সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী স্মরণ কর—সেখানে যমরাজও পরাস্ত। তাই প্রকৃতির নিয়ম হল—অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রিয়তম জনকে অন্যমনস্ক অবসন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন নিরুপায় কিম্বা বিচ্ছিন্ন করে তবে তার প্রাণাধিক জনের প্রাণ হরণ করা। আর একটা কথা—যার কাল পূর্ণ হয়েছে সে যাবেই, তাকে ধরে রাখা যায় না, তার জন্য শুধু শোক করাই যায়।

‘চলি হে লাহিড়ী, অনেক রাত হ’ল’—বলে দীননাথকে আর তর্ক করার সুযোগ না দিয়ে মাষ্টার বাড়ীমুখো রওনা হয়েছিল। তাকে যেন চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

শরীরের যন্ত্রণায় সেদিন মাষ্টারের কথাগুলো দুর্বোধ্য হেঁয়ালীতে ভরা মনে হয়েছিল। এখন শবু বুঝতে পারছে মাষ্টার সেদিন আজকের সম্ভাবনারই আভাস দিয়েছিল। সত্যিই ত শবু আর মা একখানে থাকলে কোন শক্তিই

তাদের আলাদা করতে পারত না। তবে কি সর্বশক্তিমানের ইচ্ছা ছিল না মাকে আর বাঁচিয়ে রাখার? মার শরীরে নিশ্চয়ই শবুর চাইতেও বেশী যন্ত্রণা হচ্ছিল। মার কি কাল পূর্ণ হয়েছিল?

মাগো, তোমাকে আমি একবার শেষ দেখাও দেখতে পেলাম না। তোমার কি কষ্ট হচ্ছিল জানতে পারলাম না। তুমি আমার কথা কেন বার-বার বলতে তাও জানা হল না। যে পৃথিবীতে তুমি নেই সে পৃথিবীতে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ?

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে সারারাত না ঘুমিয়ে একসময় মন্দির শহরে পৌঁছে ভাড়া বাড়ী কৈলাস ভবনের সামনে গিয়ে কাকীমার সাহায্যে অবসন্ন দেহে শবু রিক্সা থেকে নেমেছিল।

সাত

এই সেই বাড়ী যেখানে মা প্রথম বউ হয়ে এসে উঠেছিল—আর সেই বাড়ী থেকেই মা শেষ যাত্রা করেছে। এ বাড়ী শবুর তীর্থভূমি। কি নিঝুম লাগছিল বাড়ীটা, প্রাণের সাড়া আছে বলে মনে হচ্ছিল না। কানাই নীচের ঘরের দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়েছিল—পরনে তার কাচা ও উত্তরী জড়ানো।

এক মুহূর্ত কারো মুখে কথা সরলো না, তার পরে ভাইবোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অবিরল ধারায় কাঁদতে লাগল। শবুর মুখে শুধু 'মা, মাগো' ডাক আর কানাইয়ের মুখে 'মেজদি মা নেই'। কতক্ষণ ধরে দুজনে কেঁদে চলল।

কাকীমা শবুকে ধরে উপরে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির পাশে নন্দুর ঘর। শবু নন্দুর একখানি হাত ধরে কেঁদে জিজ্ঞেস করল—

'নন্দু, মা কোথায় রে? বল।'

নন্দু ভাষাহীন মুখে তাকিয়ে রইল, তার দু চোখেই জল। অবোধ যে সেও বোঝে তার মা চলে গেছে। তবু সে হয়ত খিদে পেলে অভ্যাসমত ডাকবে 'মা খেতে দাও' বলে—সে ডাক কি করুণই না শোনাবে!

দু চোখে জল নিয়ে কাকলী অভ্যর্থনা জানালো। কাঁদছে মিতু তার ছেলে দুটো আর কানাইয়ের মেয়ে মিঠি। কাঁদতে কাঁদতে তপুর জ্বর এসে গেছে। মেজদি গিয়ে তার বিছানার পাশে বসতে সেও অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল।

বাবা উপরের চিলেকোঠা থেকে অলস পায়ে নেমে এসে ঘরে একটা চেয়ারে বসলেন। মনে হল বাবা বুঝি হঠাৎই বেশী বুড়ো হয়ে গেছেন। শবু এগিয়ে গিয়ে বাবার দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদে বলল—

'বাবা, তোমার খুব কষ্ট, না বাবা?'

গিরিনবাবু কিছুক্ষণ অটল পাষাণ মূর্ত্তির মত বসে থেকে ধীরে ধীরে বললেন—

'তোর মায়ের আয়ু ফুরিয়ে গিয়েছিল মনে হয়। না হলে আগে যে ওষুধে কাজ হয়েছে এবারে তাতে কাজ হল না কেন? আয়ু ফুরিয়ে গেলে স্বয়ং ধন্বন্তরীও কিছু করতে পারে না।'

শবু কেঁদে বলল—'বাবা, আমি যে আবার মাকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে তুলব বলে রওনা হয়েছিলাম।'

গিরিনবাবু কাপড়ের খুঁটে চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চশমা মুছতে মুছতে কান্না ভেজা গলায় বললেন—

'তোদের মায়ের সব অসুখ এখন সেরে গেছে, এখন সে ভাল আছে। শেষের দিকে সে শুধু তোকে খুঁজত, বলত—শবু কোথায়, শবুকে ডাক।'

বাবার মুখে মার কথার প্রতিধ্বনি শুনে শবুর বুকের ভিতর হাহাকার করে উঠল, মনের মধ্যে কেবলই শুনতে পাচ্ছে, মা বলছেন—শবু কোথায়, শবু কোথায়?

গিরিনবাবু একসময় উঠে দাঁড়ালেন, বাইরে যাবার মুখে অসহায়ভাবে বললেন—

'ছোট বৌমা এসে গেছেন, মেজ বৌমাও আছেন—কি কি করণীয় তাঁরা সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন।' হঠাৎ শবুর দিকে তাকিয়ে সারা গায়ে ঘা দেখে বলে উঠলেন—'হ্যাঁরে শবু, তোর গায়ে এ সব কি?'

শবু আফশোসে ভেঙে পড়ল, বলল—

'তা ত জানিনা বাবা। দেড়মাস ধরে হোমিওপ্যাথি এলোপ্যাথি করেও কিছুতে সারছে না। ঘায়ের যন্ত্রণাতে অস্থির হয়েই আমি সময় মত মার কাছে এসে পৌঁছতে পারলাম না।'

'আমি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নিয়ে আসব'—বলতে বলতে অন্যমনস্ক ভাবে নীচে নেমে গিরিনবাবু ডাক্তারখানার দিকে হেঁটে চললেন। একটা রিক্সা ডাকিয়ে আনাতেও ভুলে গেছেন।

বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল—যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত এক বিরাট বটগাছ—

বিশালত্ব আছে, নেই সেই জীবনীশক্তি, কোনরকমে শুধু দাঁড়িয়ে আছেন। কিম্বা যেন সতীহারা মহাদেব।

কানাইয়ের ছোট মেয়েটাকে কোলে নিয়ে শবু বারবার কেঁদে বলছিল—'মা আমাকে কতবার শবু কোথায় বলে খুঁজেছিল, আমি আসি নি, আসতে পারিনি। মাকে আমি একবার শেষ দেখাও দেখতে পেলাম না।...'

তপু বলেছিল—'সত্যি মেজদি, মা তোকে কত ভালবাসত তা আমি এবারেই বুঝলাম। আমরা সবাই কাছে আছি তবু মা কেবলই বলত—শবু কোথায়, শবুকে ডাক। ছোড়দি 'শবু' বলে ডাকলেই কাছে গিয়ে বলত—এই ত মা, আমি আছি, বল। মা একবারমাত্র তার দিকে তাকিয়ে দু হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলত—আঃ তুই এলি কেন? শবু কোথায়? দাদা বলত—মেজদিকে খবর দিয়েছি, মেজদি আসছে। অমনি মা দরজার দিকে তাকাত।'

মিতু বলছিল—'আমি মার কত সেবা করলাম, তবু আমাকে দেখতে পারত না। আমাকে কিছু দিয়েও গেল না।'

তপু আবার বলেছে—'মেজদি, শেষ সময়ে তুই মাকে দেখিসনি ভাল হয়েছে। সে দৃশ্য, মার সেই রোগে শুকিয়ে যাওয়া চেহারা তুই সহ্য করতে পারতিস না। আমিও সহ্য করতে পারতাম না। বাবা মাকে ওষুধ খাওয়াতে এলে কেঁদে বলতাম—বাবা, তুমি বরং একটু বিষ এনে দাও, মার কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না।'

কানাই বলেছিল—'জামাইষষ্ঠীতে অমল এল, তপু আগে থেকেই এখানে ছিল। মা কত উৎসাহ নিয়ে জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠান করল। অমল চলে গেল আর মা বিছানা নিল, মনে হয় মা এর জন্যই যেন বেঁচে ছিল। একটু একটু করে জ্বর হতে লাগলো, মা শরীরের যন্ত্রণায় ছটফট করত, কিছু খেতে পারত না, শরীর রোগা হতে হতে বিছানার সাথে যেন মিশে গেল। তার মধ্যে মাঝে মাঝে 'শবু' বলে ডাকত। এদিক ওদিক তাকাতে দেখলে কি খুঁজছো, জিজ্ঞেস করলে বলত—শবু কোথায়, শবুকে ডাক। শেষের চব্বিশ ঘণ্টা মা আর তেমন ছটফট করেনি। রাতে মা বাবাকে বলল—শুনছো, আমি যাচ্ছি, আমি মাকে দেখতে পাচ্ছি। শুনে বাবাও কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল—যাবে কেন, আর দুদিন বাদে রথ, তুমি রথ দেখতে ভালবাস, প্রতিবছর রথ দেখতে যাও, এবার রথ দেখবে না? মা অতি কষ্টে দুহাত

কপালে ঠেকিয়ে বলল—মা এসে দাঁড়িয়ে আছে, আমার রথ দেখা হবে না।' পরদিন রাত ন'টায় মা চলে গেল। রাত দুটো নাগাদ ঘাটে গিয়ে পৌঁচেছি কী মুষলধারে বৃষ্টি, আগুন জ্বালানো যায় না। সবাই বলল—ভাল মানুষ চলে গেল তাই পৃথিবী কাঁদছে', বলতে বলতে কানাই আবার কেঁদে ভাসালো।

দুঃখে অভিভূত দীননাথ একসময় বলেছে—'কানাই তোর আগের চিঠিটা যদি টেলিগ্রামের ভাষায় হত তবে হয়ত আমরা সময়মত আসতে পারতাম।'

কান্না জড়ানো গলায় কানাই বলল—'কী করে জানবো, জামাইবাবু? দু-তিন জন ডাক্তার মার চিকিৎসা করছে, তাদের মধ্যে এখানকার সিভিল সার্জনও আছে। মাঝে মাঝে ওষুধে কাজ হচ্ছে, আবার অনেক সময় হচ্ছেও না। সেবারের মত মাকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতাম তবে কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু শেষে সিভিল সার্জনও যখন আর কোন আশা দিতে পারল না তখন আর কিছুই করার ছিল না। তখনই সব জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠালাম।'

দীননাথ বলল—'সে টেলিগ্রামও আমরা তিন দিন পরে পেলাম। যেদিনের টেলিগ্রাম সেদিন পেলেও আমরা অন্ততঃ শেষ সময়ে এসে পৌঁছতে পারতাম, মনে আমাদের একটা সান্ত্বনা থাকত—শেষ দেখা দেখতে পেয়েছি।'

কাকীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন—'সবই ভাগ্য, না হলে কে ভেবেছিল দিদি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে। তবে আমাদের একটাই সান্ত্বনা এ বাড়ীর কত্তামা, মা ও আমরা তিন বৌএর মধ্যে দিদিই প্রথম সধবা গেল।...'

কাকলী বলেছে—'মা প্রায় সজ্ঞানেই গেছেন। সবাইকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। বাবাকেও শুয়ে শুয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। দুর্বল হাত দুটো তুলে ধরে হাতের শাঁখাজোড়ার দিকে চেয়ে থাকতেন, কপালে শাঁখা ছোঁয়াতেন। তখন মার মুখে দেখছি অদ্ভুত এক তৃপ্তির হাসি। আমি মার হাতের নোয়া যত্ন করে রেখেছি, মার ব্যবহারের সিঁদুরও।'

কাকীমা বলেছেন—'দিদি মহা ভাগ্যবতী! কাকলী, ঐ সিঁদুর আমাকে একটু দিস, পারলে এক গাছি নোয়াও।'

শবুও বাদ যায় নি, সেও মার একটা সিঁদুরের কৌটো নিয়েছে, মার এক খানি নোয়া আজো সে পরে আছে।

সে সময় বাবার দুঃখ কষ্ট দেখে বেদনায় শবুর বুক ফেটে গেছে। মা'

নেই, বাবা সারাদিন কার সঙ্গে কথা বলবে, গল্প করবে? মার হাতে সাজা পান না হলে বাবার ভাল লাগে না, এখন থেকে কে বাবাকে পান সেজে দেবে? তবু দু সপ্তাহ পরে তাকে চলে আসতে হয়েছিল শুধু মাত্র মার স্মৃতি খানি বুকে নিয়ে।

বাবার ওষুধে শবুর গায়ের ঘা সম্পূর্ণ সেরে গেছিল—কিন্তু দাগগুলো সব মিলায় নি। মার অন্ত শবুর মনের ক্ষতই বুঝি বাইরে ঘায়ের দাগ হয়ে রয়ে গেছে।

তারপরে একটা বছর সে মার শোকে শুধুই কেঁদেছে, আজও মাকে মনে পড়লে কাঁদে।

মা চলে যাবার মাস পাঁচেক পরে শবুর মন ভাল করতে নভেম্বরের শেষ দিকে দীননাথ তাকে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে নিয়ে গেছে। গেছে রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, দেখেছে মিনাক্ষী মন্দির—আর মনে মনে সে কেঁদে বলেছে—

মাগো, তুমি এই সব তীর্থে আসতে চেয়েছিলে, আমিও তোমাকে নিয়ে আসব বলেছিলাম। আমাদের সেই আসা হ'ল কিন্তু তোমাকে নিয়ে আসতে পারলাম না। মাগো, আমার চোখ দিয়ে তুমি সব দেখ।···

ফেরার পথে তারা আবার মন্দির শহরে নেমেছিল। বাবাকে দেখে শবুর বুক ফেটে গেছে। তাঁর সেবা যত্নের ত্রুটি ছিল না, কাকলী বাবা ও নন্দুর যথেষ্ট সেবা যত্ন করত। তবু মনে হয়েছে বাবা যেন বাড়ীতে থেকেও অন্য লোকে বাস করছেন। মার ব্যবহারের টুকিটাকি কয়েকটা জিনিষ অতি যত্ন করে চিলে কোঠায় তাঁর শোবার ঘরে সাজিয়ে রেখেছেন। ছোট্ট মিঠি একদিন বলেছিল—

'দাদু বলেছে রোজ রাতে দাদীর সঙ্গে গল্প করে। কোন দাদী জান তো? আকাশের দাদী।'

যে কটা দিন শবু সেখানে ছিল, বাবা ও নন্দুর দেখাশোনা করেছে, সকালে বিকেলে মিঠি ও দিঠিকে সঙ্গে নিয়ে মার পরিচিত বন্ধুস্থানীয়া মহিলাদের বাড়ী গিয়ে মার কথা বলে ও তাঁদের মুখ থেকে মার কথা শুনে প্রাণভরে কেঁদে বাড়ী ফিরেছে। কিম্বা হয়ত শুধুই পথে পথে ঘুরেছে আর ভেবেছে—এখানকার পথের ধুলোতে আছে মায়ের স্পর্শ, মায়ের স্মৃতি। মা এখানকার ধূলিকণাতেই মিশে আছে। সে-ও যেন একদিন এখানকার ধূলিকণাতে মিশে যেতে পারে—অন্তর দিয়ে সে প্রার্থনা করেছে।

কাকীমা বলেছিলেন—তোদের মা ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের মধ্যে বেঁচে থাকবে।

আরো পরে কানাই কাকলীর আর একটি মেয়ে হয়েছে—দেখতে নাকি অবিকল মায়ের মত। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'মিষ্টি'। শবুর মনে হয়—মা-ই বুঝি আবার ফিরে এসেছে। এখনো সে তাকে দেখেনি। গিয়ে দেখতে হবে সত্যিই সে তার মা কি না, তার মুখখানি মায়ের মতই মিষ্টি কি না।



পর্ব—৩

এক

এই বারো বছরে দুর্ঘটনার ফলে শবু তার মাতৃত্বের কামনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, হারিয়েছে তার পরম পূজনীয়া ঠাকুমাকে, জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা একমাত্র ধ্যানজ্ঞান মাকে হারিয়ে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে রক্ত ঝরেছে। এ ছাড়াও মৃত্যু এসে আরো কয়েকটি প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

প্রথমেই মনে পড়ে সেই আপন ভোলা বড় কাকার কথা। এমন সদা-পরিহাস-প্রিয় মানুষটির শেষ জীবনটা হয়ে উঠেছিল বড়ই করুণ। কানাইয়ের বিয়েতেই শবু বড় কাকাকে দেখেছিল শেষবারের মত। কাকা যেন তখনই কেমন জবুথবু থপথপে হয়ে পড়েছিলেন। আগে একবার নাকি ছোটখাটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। বাবা তার থেকে বেশ বড় কিন্তু সে তুলনায় বাবা তখনও বেশ শক্ত সমর্থ।

সে সময় শবু দেখেছিল কাকার মুখে কাঁচা পাকা একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ সবাই বলত ষ্ট্যালিনের গোঁফ। শবুরও তাই মনে হত—অথচ আগে কখনো কাকা গোঁফ রাখতেন না, একেবারে চাঁছা পরিষ্কার মুখ।

কাকার বড় ছেলে শঙ্খ লেখাপড়ায় বেশ ভাল—কাকাও যে ডাক্তারী পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেয়েছিল। কাকা রিটায়ার করে নতুন বাড়ীতে সপরিবারে এসে বসেছেন। ঠাকুমা মারা যাবার পর অশান্তি এড়াতে বাবা মা কৈলাস ভবন ছাড়া করে উঠে এসেছেন। অশান্তি তখন তাড়া করে ফিরছে বড় কাকাকে।

শঙ্খ বাইরে হোষ্টেলে থেকে পড়ছে। তার স্বভাব মোটামুটি ভদ্র ও নম্র। কিন্তু তার ছোটভাই সঞ্জয় বড় দুরন্ত ও ডানপিটে। অনেক সময় কাকা এসে বাবার ডিস্‌পেন্সারীতে বসে থাকেন। লোকের সঙ্গে কথা খুব কমই বলেন উদাসভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকেন।

মাঝে মাঝে কৈলাস ভবনে এসে মার কাছে দুঃখের কথা বলতেন—

'বৌদি, আর ত পারি না।'

মা জিজ্ঞেস করতেন—'কেন, কি হল বট্‌ঠাকুরপো?'

'কি যে হল তার কি বলব, সঞ্জয়টা আর তার……।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গুম্ মেরে যেতেন।

তিনি কি বলতে চান তা আর জানা যেত না।

বড় কাকা তখন নানান রকম মানসিক ও পারিপার্শিক অশান্তিতে ভুগছেন আর হয়ত তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কথা ভাবতেন।

বড় কাকাও নিষ্কৃতি পেলেন। কাকীমা একদিন বিকেলে সঞ্জয়কে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে সদর গেট ভিতর থেকে বন্ধ দেখে ডেকে সাড়া না পেয়ে সঞ্জয় প্রাচীর টপকে গেট খুলল। বাড়ীতে ঢুকে মা ও ছেলেতে দেখল হৈমবাবু ভিতরের বারান্দার একটা জানালার ঠিক নীচে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থাতেই মারা গেছেন—মুখটা হাঁ করা চোখ দুটো বিস্ফারিত। হয়ত একা বাড়ীতে হঠাৎ তাঁর ষ্ট্রোক হয়েছিল কিম্বা কোন কিছুতে ভয় পেয়ে হঠাৎই মারা গেছেন। শেষ সময়ে তাঁর কাছে কেউ ছিল না—না স্ত্রী, না দুই ছেলের এক ছেলেও।

মার কাছ থেকে চিঠিতেই শবু বড়কাকার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিল। পরে তপুর বিয়েতে গিয়ে মার কাছে সব শুনেছে। বড়কাকীমার তখন রিক্ত শুভ্র বেশ, শঙ্খ সঞ্জয় পিতৃহীন।

বড়কাকা বড় ভালমানুষ ছিলেন। একজন ভালমানুষের জীবনের কি করুণ পরিণতি। কাকা চলে গেছেন, তার জন্য মাকেও কাঁদতে দেখেছে বড়কাকীমাও অবশ্যই কেঁদেছেন। বড়কাকার কথা মনে হলে এখনও শবুর কান্না পায়, মনের ভিতরে কান পাতলে শুনতে পায় বড়কাকার কথাগুলো—

'হাউরে শুলান, পাছে পাছে ঘোরে' 'ভালমন্দ খাবার জিনিষ আগে বাড়ীর ছাওয়াল পাওয়াল শুলানরে দিতে হয়' কিম্বা 'শঙ্খটা খেলোই কিনা।' বড় কাকা শিশুদের ভালবাসতেন।

চলে গেছে বাবুলালও নীলা তপুদের বিয়ের বছর দেড়েক আগে। সে সময় শবুরা একবার পাটনা থেকে কলকাতায় গিয়েছিল। ষষ্ঠীতলায় দেখা করতে গিয়ে দেখেছে বাবুলাল শয্যাশায়ী। ছোট কাকা বলেছিলেন—ওর পেটে মস্তবড় একটা টিউমার হয়েছে, সেটা যেদিন ফাটবে…… ।

বাবুলাল অতশত বোঝে না। মেজদি এসেছে দেখে শুয়ে শুয়েই খুশি হয়ে তার একখানা হাত ধরে সাগ্রহে বলেছিল—

'মেজদি এস্‌ছিস? থাক্‌বি ত?'

শবু তাকে আদর করে বলেছিল—'কেমন আছিস রে বাবু?'

বাবুলাল কেঁদে বলেছিল—'ভাল না মেজদি, আমার পেটে রোজ রোজ ব্যথা করে। আমি মরে যাব।'

'কাঁদিস না বাবু, তুই ভাল হয়ে যাবি'—সান্ত্বনা দিতে শবু বলেছিল।

আবার বাবু বলেছিল—'মেজদি তুই থাকবি ত? আমাকে নারকেলের নাড়ু করে খাওয়াবি?'

শবু আশ্বাস দিয়ে বলেছিল—'হ্যাঁ খাওয়াব, আমাদের বাড়ীর গাছের নারকেল দিয়ে নাড়ু বানিয়ে কাল পরশুই এনে তোকে খাইয়ে যাব। তুই এখন একটু ঘুমো লক্ষ্মী ভাই।'

বাবুলাল পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল। ছোটকাকীমা একদিকে চোখের জল ফেলেছেন আরদিকে বাবুর সেবা করে চলেছেন।

ওর বয়স তখন তেইশ চব্বিশ বছর। জন্ম থেকেই সে জড়বুদ্ধি, বয়স হলেও বয়সকালের বিশেষ পরিবর্তন বা চাহিদা তার মনে এসে থাকলেও কোন প্রকাশ নেই। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাকি একবার ওকে পরীক্ষা করে বলেছিল—ওর বুদ্ধির স্তর পাঁচ বছরের শিশুর স্তরেই আটকে আছে—এর আর বিকাশের সম্ভাবনা নেই। বাড়ীতে কাকা তাকে দুঃখ করে বলেছিলেন—

'বাবু, তুমি একা কোথাও যাবে না, ডাক্তার বলেছে তোমার বুদ্ধি নেই।'

অবোধ বাবু কথাটায় মজা পেয়েছে, কাউকে সামনে পেলেই ডেকে বলেছে—

'জানিস, আমার ভুব্বি নাই।'

তবু বয়সের গুণে কিছু বুদ্ধির কাজ দৈহিক কাজ করতে পারত। কার্ড দেখিয়ে বুথ থেকে বোতলের দুধ আনা, রেশনে বা কেরোসিনের দোকানে লাইন দেয়া, বাড়ী থেকে ফর্দ করে দিলে দোকানে দেখিয়ে মুদিখানা থেকে বাকিতে জিনিষ বয়ে আনা, কলে জল না এলে সকলের সঙ্গে বালতিতে করে কুয়ো থেকে জল আনা। ঘরে বাইরে পাড়ায় দোকানে কেউ তাকে অনাদর করত না, বাড়ীর আর সকলের মত সেও একটু কাজ করে দিত। অবসর সময় কাছেই ষষ্ঠীতলার মোড়ে একাই দাঁড়িয়ে বাস চলাচল দেখতে দেখতে এক অজানা পুলকে ওর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠত। বাড়ীর বা পাড়ার কেউ ওকে দেখতে পেয়ে বলত—

'বাবু, চল, বাড়ী চল।'

অনেকক্ষণ বাস দেখার আনন্দে খুশি হয়ে সে বাড়ী ফিরে আসত।

কিছু একটা অন্যায় করে ফেললে, হাত থেকে কিছু পড়ে ভেঙে গেলে কেমন অদ্ভুত সরলতায় হাত দুটো কচলাত, অথচ কেউ তাকে শিখিয়েও দেয়নি অপরাধ করলে ঐ রকম করতে হয়।

বুদ্ধি নেই বাবুলালের। কিন্তু তাই কি? একবার নকশাল আমলে পথের ধারে একা একা পুলিশের ভ্যানের নজরে পড়ে গিয়েছিল। গাড়ীতে তুলেও নিয়েছিল। কিন্তু নিতান্তই জড়বুদ্ধি বুঝে বরানগর বাজারের সামনে ওকে নামিয়ে দিয়েছে। পাড়ার একজন তা দেখতে পেয়ে ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে সব কথা বলে গেল। বাড়ীর সবাই বলতে লাগল—

'বাবু আর তুমি কখনো একা একা রাস্তায় যেও না, পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।'

বাবু বলল—'আমাকে ধব্বে কেন? আমি পার্টি কব্রি না, পুটু পার্টি কয়ে।' এড়ানো জিভে তার 'র' উচ্চারণ 'য়' এর মত শোনায়।

কলকাতার আবহাওয়া জড়বুদ্ধিকেও রাজনীতি শেখায়।

বাবুলালকে তৃপ্তি করে নারকেলের নাড়ু, সন্দেশ খাইয়ে ভারি মন নিয়ে শবু সেবার পাটনায় ফিরেছিল। আর মাত্র মাস দুই পরে কাকীমার চিঠিতে জেনেছিল—অবোধ বাবুলাল সকলকে ছেড়ে চলে গেছে।

ছোটকাকা-কাকীমার প্রথম ছেলে হল, কাকা আনন্দে পদ্মিনী দেবীকে বললেন—বৌদি, এতদিনে শবুর একটা ভাই হল। তার আগে নন্দু কানাই হয়েছে কিন্তু গায়ের রংয়ের দিক থেকে বাবুলালই ছিল শবুর কাছাকাছি। ঠাকুমাও খুশি হয়ে বলেছিলেন—ছেলেটা পয়মন্ত হয়েছে, বাপের চাকরি আর ছেলের জন্ম প্রায় একই সময়ে হল। প্রথম ছেলে, বাবা মা কত ধুমধাম করে ফটো তুলে অন্নপ্রাশন দিল। শেষে দেখা গেল সে ছেলে ঐ রকম। পরে ঠাকুমা আফশোষ করে বলতেন—অবিনাশ, এ ছেলেকে নিয়ে তোরা যে সারাজীবন দুঃখ পাবি। সেই ছেলে শেষ পর্যন্ত সবাইকে মুক্তি দিয়ে গেল। পয়মন্ত ও পরমায়ু মনে হয় বিপরীতধর্মী।

মনে হলেই শবুর চোখে জল আসে। দুঃখিত হয়েছে দীননাথও—কারণ সে-ই ছিল বাবুলালের সবচাইতে কাছের জামাইবাবু। ষষ্ঠীতলায় গিয়ে পৌঁছামাত্রই বাবুলাল হাত দুটো ধরে ঝুলে পড়ে বলত—

'জামবাবু, গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে চলুন।'

দুই

আর গেছে চিনু। সে বড় অদ্ভুত যাওয়া—যা কেউ কোনদিন ভাবে নি। মামীমার স্বামী হারিয়ে গেছে—মেজ ছেলেটাও অকালে একুশ বছর বয়সে চলে গেল। মামীমার দুঃখে পাষাণ গলে।

অদ্ভুত বলাটাও বোধ হয় ঠিক নয়। তখনকার দিনে ঐ বয়সের ছেলেদের ঐ রকম ভবিষ্যতই প্রায় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে জন্য এককালে কাকারা তাঁদের ছেলে পুটুকে, দিদি জামাইবাবু তাদের ছেলে বাবুলকে নিরাপদ দূরত্বে নিস্তরঙ্গ মন্দির শহরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। ফলে পুটু বা বাবুল তাদের পড়াশুনা ঠিকমত করতে পারেনি, চাকরির চেষ্টা করতে পারেনি, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হিসেবে অর্দ্ধশিক্ষিত থেকে নানা কোম্পানীর সেলসম্যানগিরি করে নিজেদের বেকারত্ব ঘোচাবার চেষ্টা করে চলেছে আজও। পুটু আবার স্পষ্টবক্তা, বলে—

'এজেন্ট, সেলসম্যান, রিপ্রেজেন্টেটিভ ওসব গালভরা নামের আড়ালে আমরা হলাম গিয়ে আদি ও অকৃত্রিম বেচারাম। একরকম হকারের কাজই করি আমরা।'

চিনু ওদের বয়সীই একজন। চিনু দুরন্ত সাহসী ছিল। লেখাপড়ায় মন ছিল না, নানা অকাজে তার যত আগ্রহ ও উৎসাহ। কিন্তু তাই বলে কারো কোন অনিষ্ট করত না। সে সাপের লেজ ধরে মাথার উপর বন্‌বন্‌ করে ঘোরাতে পারত, রাত বিরেতে শ্মশানে মশানে গিয়ে ঘুরে আসতে পারত। স্কুলে পড়তে পড়তে ছেষট্টির ছাত্র আন্দোলনে ভিড়ে অনশন করে হঠাৎই রাজনীতির আঙিনায় ঢুকে পড়েছিল বিনা প্রস্তুতিতে। সাতষট্টি, উনসত্তরের ভোটে সে একজন রীতিমত লাল ভলান্টিয়ার।

ছেষট্টির ছাত্র আন্দোলনের ধাক্কা সুদূর শিলংয়েও গিয়ে পৌঁচেছিল। সে সময় পুলিশ বাজারে পুলিশের গুলিও চলেছিল—শবু ওকল্যাণ্ডে লক্ষ্মীবালাদের বাড়ীতে বসে কয়েক শ হাত দূরে বন্দুকের দুম্ দুম্ সুই সুই আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। শহরে কারফিউ জারী হয়েছিল, লোকে বলছিল তিন চার জনকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে। আবার সেই সময়ই শহরের ও আশ-পাশের খাসিয়ারা হিলষ্টেটের জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। অসমীয়াদের সঙ্গে তারা

থাকবে না। লক্ষ্মীবালারা সরকারী লোন নিয়ে রাজধানী শহর শিলংয়ে বাড়ী বানিয়ে বাস করছিল—তারা বিপদ গুণেছিল। লক্ষ্মীবালা বলেছিল—

'কিয় হিল্ স্টেট্ দিম্? অহমীয়া মাহুবিলাক কোত যাব? রিফিউজী হব? হিল্ স্টেট্ নি দিম্।'

শেষে যখন শোনা যেত হিল স্টেট হবেই তখন ক্ষুব্ধ লক্ষ্মীবালা বলেছিল 'গ্যারিসন গ্রাউণ্ডর স্বাধীনতা দিবসর প্যারেডত মই ন যাম। আমার কাকতি বাবুর দর চরকারি চাকুরিয়াবিলাক যাব পারে আন অসমীয়াবিলাকে কুনেও না যাব, কেতিয়াও না যাব।' অথচ আগের বছরই শবু প্যারেড দেখতে যাবে না শুনে বলেছিল—

'না যায় কিয়? মই যাম্—মই প্রতি বছরত যাম্।'

সাতষট্টির ভোটে অনেক ওলট পালট হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার হয়েছিল—মাথায় ছিল অজয়-জ্যোতি। আর সেই সময়ই একটা নতুন নাম শোনা গিয়েছিল নকশালবাড়ী। উত্তর বঙ্গের অখ্যাত গ্রাম নকশালবাড়ী হঠাৎই আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

পাটনার বাসায় মাস্টার ও দীননাথের মধ্যে অনেক সময় রাজনীতির আলোচনা হত। মণি প্রিণ্টার্সের ছাপাখানায় তাদের কয়েকজন সহমতের লোকজনের আনাগোনা ছিল, সেই সূত্রেই মাস্টারের সঙ্গে আলাপ, ঘনিষ্ঠতা। মাঝখানে মাষ্টার হঠাৎ অতি বিপ্লবী হয়ে উঠেছিল। আর তখনই দুজনের আলোচনা অনেক সময় তর্কাতর্কিতে গিয়ে পৌছত।

প্রথম প্রথম মাস্টার বলত—'ওহে লাহিড়ী, ওরা কি বলতে চায়, করতে চায় ভাল করে জানা দরকার।'

দীননাথ বলত—'সবাই মিলে একমত হয়ে না চলে একটা ছোট গ্রুপের কি সাধ্য বিপ্লব করে?'

দিন যায়, মাস্টার বলে—'না হে, কাগজে দেখছি ইউনিভার্সিটির জুয়েল জুয়েল সব ছাত্ররা একে সমর্থন করছে।'

দীননাথ বলেছে—'জুয়েলের সঙ্গে জনগণও থাকা দরকার।'

আবার কিছুদিন পরে মাস্টার বলে—'ওরা কি রকম জোতদার পুলিশ সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

'কয়েকজন চুনোপুটি বা মূর্তির গলা কেটে কি করে বিপ্লব হয় বুঝিনা।' —দীননাথের জবাবে সংশয় প্রকাশ পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে দুবার ফ্রন্ট সরকার হল, ভেঙে গেল দেখে মাস্টার বলে—'দেখছ ত লাহিড়ী, ভোট করে কিছু হবে না, অস্ত্র পথটাই ঠিক।'

দীননাথ সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছে—'দেখুন অস্ত্রপথে কিছু করতে পারেন কিনা।'

আগের দুটো যুদ্ধ—চীনভারত আর পাক-ভারত যুদ্ধের পর শেষে অন্য বাংলার যুদ্ধও হয়ে গেছে। বাহাত্তরে পশ্চিমবঙ্গের ইলেকশনও হয়ে গেছে।

মাস্টার সংশয় প্রকাশ করেছে—'আচ্ছা লাহিড়ী. রিগিং এর কথা যা শুনছি তা কতটা সত্যি মনে হয়?'

দীননাথ বলেছে—'ওখানে আত্মীয়স্বজনদের কাছে শুনেছি তারা ভোট দিতেই পারে নি।'

মাস্টার ব্যঙ্গ করে বলেছে—'কর ভোট-যুদ্ধ! এই কিছুদিন আগে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নিয়ে তোমরা দিল্লীশ্বরীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে। এখন রিগিং করে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভবী ভুলবার নয়। ঐ জন্যই আমি সুনীল জগন্নাথ রামাবতারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিনি যদিও তারা আমার এককালের রাজনৈতিক বন্ধু। এখন তোমাদের সঙ্গেও রাখিনা। সশস্ত্র সংগ্রামই ঠিক পথ। তোমরা সংশোধনবাদীরা করবে বিপ্লব!'

দীননাথ বলেছে—'ভাল কাজকে সমর্থন করব, অন্যায় কাজের বিরোধিতা করব—এইটাই ত সৎ নীতি। কলকাতায় ত যান না, জানেনও না। সেখানে একদল সৎভাবে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে চাইছে, আবার তাদেরই মধ্যে অনেকে ভয়ে বা আদর্শচ্যুত হয়ে অন্যদলে ভিড়ছে। সুযোগ বুঝে পুলিশ অন্যদেরকে এক এক করে খতম করছে।'

'কি রকম! কি রকম?' মাস্টার আগ্রহে খাড়া হয়ে বসেছে।

তখনই দীননাথ সে তথ্য জানিয়েছিল, বলেছে—

'অনেক খবর ত কাগজেই পড়ছেন। আমি যে ঘটনার কথা বলছি সেটা কোন কাগজে ছাপা হয়নি, হবেও না। তাই বলে ভাববেন না আমি কোন বানানো কথা বলছি। আমার এক আত্মীয় চিনু ছাত্র রাজনীতি থেকে হঠাৎ যেন কাদের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী হয়ে উঠল। বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গোপন আস্তানায় ঠাঁই নিয়েছিল, শুধু তার মার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হ'ত গোপন স্থানে। তখন সে একজন বড় নেতা, তার দু পকেটে দুটো চেম্বার। বয়স মাত্র আঠারো উনিশ।

'বাহাত্তুরে ইলেকশনে 'জয় জয়কার' হয়ে যাবার পর চারদিকে কেমন

সব ছত্রভঙ্গ অবস্থা, অনেকে বসে পড়েছে, অনেকে অন্যদলে ভিড়ে গেছে। চিনু সে সব ঘোরপ্যাঁচ বোঝেনি, একমনে বাকিদের নিয়ে বিপ্লবের সাধনা করে চলেছে। বছরখানেক তার আর কোন খবর নেই। একদিন চিনুর দাদা তুলু এসে আমাদের জানাল—শুনছি চিনু বারাসাত ষ্টেশনে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, অথচ পুলিশ আমাদের বাড়ীতে একটা খবরও দেয় নি। ভালই হয়েছে, জানতে পারলে মা কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে যাবে।

'আরো কতমাস পরে রাতের অন্ধকারে চিনুর এক বিপ্লবী বন্ধু এসে তার মাকে বলল—মাসীমা, চিনু বারাসতে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, আপনাকে খবরটা দিতে এলাম, তারিখটা আমি ঠিক জানি না। মা পুত্রশোক বুকে চেপে বললেন—বাবা, তুমি এই বিপদের মধ্যে আবার খবর দিতে এলে কেন, কেউ যদি দেখে ফেলে ? ছেলেটি বলল—ভয় নেই মাসীমা, আমরা এখন অন্যদলে। আমি চলি।

'আশ্চর্য্য ! এই ছেলেরাই আগে এসে এসে চিনুর মার হাত থেকে শুকনো রুটি নিয়ে খেত আর তাঁকে গোর্কী বর্ণিত 'মা' চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করত। মশাই, এমন ব্যাপার কখনো দেখেছেন বা শুনেছেন ?'

মনযোগ দিয়ে সব শুনে মাস্টার অভিভূতের মত বলেছিল—'না হে লাহিড়ী তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। এ ত বড় ভাবনার কথা !'

দীননাথ কোন বানানো কথা বলেনি। চাঁপাতলার বাড়ীতে তুলু একদিন হঠাৎ চিনুর এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানিয়েছিল। তুলু বারণ করায় কথাটা তক্ষুণি মামীমাকে জানানো হয়নি। তবু মার মন ত, মাঝে মাঝে মামীমা এসে শবুর কাছে দুঃখ করে বলতেন—

'অনেকদিন চিনুর খবর পাই না, নিশ্চয়ই ওর কিছু হয়েছে। না হলে একটা চিঠিও দেয় না কেন ?'

শবু কিছু বলতে পারত না। শুধু মনে পড়ত চিনুর কচি কচি প্রায় মেয়েদের মত মুখখানা। কেমন ভদ্র ও নম্র তার ব্যবহার ছিল।

তারপর মামীমাও যখন খবরটা জানলেন, শবুদের সঙ্গে দেখা হতেই কেঁদে বলেছিলেন—

'অনন্ত খবরটা দিয়ে চলে গেলে একা একাই বসে কাঁদতে লাগলাম। তুলু এলে তাকে বলতে সে বলল—আমি আগেই শুনেছি, তুমি দুঃখ পাবে বলে তোমাকে বলিনি। আমি যে দুঃখে দুঃখে পাষাণ হয়ে গেছি শ্রাবণী,

নতুন করে আর দুঃখ কি পাব !

'আমার তিন ছেলের মধ্যে চিনুটারই সকলের জন্ত, আমার জন্ত মায়া মমতা বেশী ছিল। কষ্টের সংসারে যখন ভাল খাবার জোটাতে পারিনি তখন তুলু ভুলু তা নিয়ে বাছবিচার করলেও চিনু কখনো কিছু বলেনি। যা দিয়েছি সোনা মুখ করে খেয়েছে, সস্তা বা ছেঁড়া জামা কাপড় হাসিমুখে পরেছে। অন্ত দু ছেলে বাড়ীতে আমার কুটোটি ভেঙে সাহায্য করে নি কিন্তু চিনু হাতে হাতে আমাকে কত কাজ করে দিত।

'চিনু চিরকালই অবুঝ ও দুরন্ত ছিল কিন্তু কারো ক্ষতি করত না। পড়াশুনা হল না বলে আমার দাদাকে বলে একটা সামান্ত কাজে ঢোকালাম মাইনে পেয়ে সবটাকা আমার হাতে তুলে দিত, নিজের জন্ত কিছু রাখত না। কণ্ট্রাক্টারের অধীনে ঐ চাকরি করতে গিয়েই চিনু ঐসব ছেলেদের সংস্পর্শে আসে। ঐ অনন্ত, সুমন্ত, চিরঞ্জীব আমাদের বাড়ীতে আসত, চিনুকে কমরেড বলে ডাকত, আমার হাতে তৈরী রুটি ভাগ করে খেত, কত দেশের কথা পরিবর্ত্তনের কথা বলত। আমি বাধা দিই নি, ভাবতাম ওরা ত ভাল কথাই বলছে, সকলের ভাল করতেই চাইছে।

'তাই তোমাদের মামা নিরুদ্দেশ হবার মত চিনুরও এই পরিণতি আমি ভবিতব্য বলে মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু দেখ, অনন্ত সুমন্তরা কেমন সময় বুঝে সরে পড়ল। চিনু তা পারে নি কারণ সে ছিল সরল আর সাহসী।'

বলতে বলতে মামীমা কাঁদতেন আর শবুর দু চোখ দিয়েও টস্ টস্ করে জলের ধারা নেমে আসত। সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথা শবুর মুখে যোগাত না।

তিন

পাহাড় ও শীতের রাজ্য শিলংএ চার বছর কাটিয়ে পাটনায় এসে বেশ ভাল লেগেছিল। তাই প্রায় নির্বিবাদে সাত আটবছর পাটনাতেই কাটিয়ে দিয়েছে দুজনে। এখানে বেশ একটা পরিচিত মহলও গড়ে উঠেছে।

বাড়ীওয়ালা ধনপতিবাবু—যোগমায়াদের পরিবার ও মাস্টার ছাড়া আর যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে গোকুল বাবু, স্ত্রী কমলা, মেয়ে মুকুল ও ছেলে রঞ্জিৎ আর বিদ্যুৎ এর কথা। বিদ্যুৎই বেশী

আসে, সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে—গল্প, তাস দাবা লুডো খেলা, একটু একটু গীটার বাজানো এই সব নিয়ে মাতিয়ে রাখে। এখন সে বি এস্ সি পড়ে। ওরা ভাই বোন সবাই ইংলিশ মিডিয়ামে জুনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করেছে। অসম্ভব ভদ্র ব্যবহার বিদ্যুতের।

গোকুলবাবুদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বড় অদ্ভুত ভাবে। প্রথম পাটনায় এসে দীননাথ বাঙালী কোথায় কোথায় আছে খুঁজে বেড়াত। এক অফিসে কোন এক চক্রবর্তী আছে শুনে সেখানে ছুটেছিল আলাপ জমাতে। অফিসের দারোয়ান বলল—

'চক্রবর্তীবাবু আজ নেহি আয়ে হ্যায়।'

দীননাথ মরীয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল—'আউর কোই বাঙালী বাবু হ্যায় অফিসমে?'

'হ্যাঁ, হ্যায়। ছোটা ইঞ্জিনীয়াব ভট্টাচার্য্যি সাহাব।'

আলাপ হল গোকুল ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। দীননাথ বলেছিল—

'আপনাদের কলকাতা অফিসের অবিনাশ মৈত্রকে চেনেন? তিনি আমার খুড়শ্বশুর হন।'

গোকুলবাবু বলেছেন—'তিনি আমার কলীগ, নাম জানি, সাক্ষাৎ পরিচয় নেই।'

'আপনাদের দেশ কোথায় ছিল?'

'রাজশাহী, আমি সেখান থেকেই ওভারসীয়ারি পড়েছি, থাকতাম ঘোড়া-মারায়।'

'আমরাও রাজশাহীতে থেকে কলেজে পড়েছি, থাকতাম পদ্মার ধারে পোড়াকুঠিতে। আমার দাদা হৃদিনাথ লাহিড়ীও সেখানে ওভারসিয়ারী পড়েছে।'

'হৃদিনাথ লাহিড়ী ত আমার ক্লাশ মেট ছিল, ক্লাশের ভাল ছেলে। তবে আমরা বারেন্দ্র নই, বৈদিক। আমার স্ত্রী অবশ্য বারেন্দ্র শ্রেণীর, পাবনার মেয়ে।'

ব্যস, দুয়ে দুয়ে চার মিলে যেতেই দুই পরিবারে আসা যাওয়া ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়েছিল।

গোকুল বাবুর স্ত্রী কমলা শবুকে বলেছিল—'বিয়ে হয়ে থেকে দেশ ছাড়া। পঁচিশ বছর ভূপালে ও পাটনায় কেটে গেল। রিটায়ার করে আমরা পাটনাতেই থাকব, অবশ্য বেনারসে সারনাথের দিকে আমাদের কিছু জমিও কেনা আছে।'

কমলাদি ও শবু যেন দুই বোনের মত, কারো মন খারাপ লাগলেই অপর-জনের বাড়ী গিয়ে গল্প করে মন হালকা করে। রাজেন্দ্রনগর আর মেছুয়াটুলি খুব কাছাকাছি—তারা থাকে মেছুয়াটুলিতে।

বড়ছেলে রঞ্জিৎ হঠাৎই একটি বিহারী মেয়েকে বিয়ে করে বসলে কমলাদি প্রথম প্রথম খুব ভেঙে পড়েছিল। অনেক কেঁদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই মেয়েকে ছেলের বৌ হিসেবে ঘরে তুলেছে।

তখন তপু পাটনায় ছিল। সবাই মিলে সে বিয়ের বউভাতে গেছে। বউটি কিন্তু বেশ ভাল হয়েছে, এত সুন্দর বাংলা কথা বলে যে বিহারী বলে মনেই হয় না। পরে আসা যাওয়াতে আরো দেখেছে সে বউ বাংলা গল্পের বই পড়তে ওস্তাদ, শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণের অনেক বই তার পড়া।

সেই গোকুলবাবু এক সময় বদলি হয়ে মন্দির শহরে গিয়েছিল। আরো আশ্চর্য্যের কথা শবুর মা যখন চলে গেল তখন কমলাদি মুকুল ও বিদ্যুৎ সেখানে ছিল, শেষ সময় যাকে তারা দেখেছে। তার কিছু আগ দিয়ে তারা গোকুল বাবুর কাজের জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিল সমুদ্র আর রথ দেখতে। এখন পাটনাতে কমলাদিই একমাত্র মানুষ যার কাছে গিয়ে শবু মার জন্য কেঁদে মার গল্প করে হাল্কা হতে পারে, পায় সান্ত্বনা।

কিছু আত্মীয় স্বজনও খুঁজে পাওয়া গেছে পাটনায়। যোগমায়াদির বাড়ীর আর এক অংশের ভাড়াটে বীরু বাকচী, তার বৌ ও এক ছেলে। বীরু বাকচী শেফালীর ননদের দেওর, সে-ই খবর দিয়ে কঙ্করবাগের কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার করে লঙ্গরটুলির বাঙালী এলাকার কাছে ঐ রাজেন্দ্র নগরে নিয়ে এসেছিল। তারই এক বন্ধুর গাড়ীতে শবুরা একবার কাশী ও একবার দিল্লী গিয়েছিল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে—দুবারই সঙ্গে ছিল গাড়ীর মালিক আর দীননাথের অফিসের এক বন্ধু রাম বাবু।

মাত্র বছর দুই আগে খুঁজে পেয়েছে দীননাথের খুড়তুতো বোন ফুলির মাসী মেসো ও তাঁদের এক ছেলেকে। মেসো সান্যাল মশাই হলেন পোস্ট মাস্টার—একেবারে দেবতুল্য মানুষ, আদর্শবান। পাটনায় রবি মাষ্টার গোকুলবাবু ও সান্যাল মেসোকে শবু গুরুজনের মত শ্রদ্ধা করে।

আর দীননাথের গ্রামের দশরাজের জ্ঞাতি সুষমাদির দেখা পেয়েছে একে-বারে শেষদিকে। মহী অফিসের কাজে পাটনায় এসে সুষমাদির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। তারা নাকি গর্দানীবাগে পঁচিশ বছরের বাসিন্দা।

সুষমার দাদা সুনন্দদাও সেখানে থাকে এক মেয়েকে নিয়ে, স্ত্রী মারা গেছে। নিজে চাকরি করে আবার বোনের সংসারও দেখে।

স্থানীয় কিছু বিহারী পরিবারের সঙ্গেও মেলামেশা হয়েছে। বছর চারেক ধনপতি বাবুদের বাড়ীতে ছিল। বাড়ীর ঐ অংশ আরো বাড়িয়ে কারখানা খুলবে বলে শবুদেরকে অন্য বাসা খুঁজে নিতে বলেছিল। তার অনেক আগে বীরু বাবুরা কলকাতায় বদলি হয়ে গেছে। বাড়ী ছাড়ার কথায় শবুর কান্না পেয়েছিল, ঐ বাড়ীতেই মা এসে দুবার থেকে গেছে।

খুব অল্পদিনেই বাসা পেয়েছিল লঙ্গরটুলিতে তিনখানা ঘর, ঘরের লাগা স্কুলের বিরাট খেলার মাঠ, ও পাশে স্কুল ও ছাত্রদের হোস্টেল, এক পাশে টীচার্স কোয়াটার। এখন শবুরা সেই বাড়ীতেই আছে, বাড়ীর মালিক সুমনজীর শ্বশুর। সেই সূত্রে আলাপ সুমনজীর স্ত্রী যমুনা, শালা বাব্বা, দু বছরের মেয়ে গুড্ডীর সঙ্গে, এমন কি যমুনার বাবা মা আর এক বোন সরযূর সঙ্গেও আলাপ হয়েছে যদিও তারা দেশের বাড়ীতে থাকে বিক্রমগঞ্জে। যমুনা একটা প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারনী হয়েছে, ফলে দু তিন বছরের গুড্ডী শবুর খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। শবুর সঙ্গে উঠোনে দাগ কেটে কেটে খেলা করে—

'হাম ইহা গুড়ুরানী' অর্থাৎ এই জায়গা আমার।

শবু ঠাট্টা করে বলেছিল এই অংশটা তার মায়ের নয়, পাবে তার মাউসী সরযূ। কিন্তু সে দিতে রাজী নয়, তাই সারা উঠোন দাগ কেটে চলত। ঐ টুকু মেয়ের বৈষয়িক জ্ঞান দেখে অবাক হতে হয়।

আর আছে বিদ্যুতের চেয়ে ছোট স্কুলে পড়া বাব্বা—দীননাথ ট্যুরে গেলে পাহারা দিতে বাব্বা শবুদের একটা ঘরে রাতে এসে শোয়।

'জানতে হ্যায়, জিয়াজী ইহাকা অল ইন অল—কুছ নেহি করতে হ্যায়, সির্ফ ইহা তোড়ো, উহা বনাও—লে আও রূপয়া বিক্রমগঞ্জসে।' বাব্বা অর্ধেক রাত পর্যন্ত শবুর কাছে তার বালক মনের ক্ষোভ সরলভাবে প্রকাশ করে। সুমনজী থাকে প্রায় ঘরজামাইএর মত। মুখে তার বড় বড় কথা—হাম এম এ পাশ কিয়া, অভি পি এইচ ডি কা তৈয়ারি কর রহে হ্যায়।

মোটর বাইকে চেপে পাটনা ও আশপাশের সব জায়গা ঘুরে দেখেছে। মানেরে শোন নদের এক নহরের ধারে দিয়ারা গ্রামে ভুট্টা মকাই এর ক্ষেতের পাশে গিরিন্দর সিংএর বাড়ীতে গেছে, সিং এর বৌ, মা, জ্যেঠি, ভাই বৌ ও মেয়েদের সঙ্গে শবুর আলাপ হয়েছে। বড়ী-খগোল, দানাপুরে রামবাবুর বাড়ী গেছে, দেখেছে তার বৌ ছেলেমেয়েদের। সোদিসোপুরে

সুদাম সিং এর গ্রামের বাড়ীতেও গেছে তারাও এসেছে। ফতুহাতে তেওয়ারী-জীর বাড়ীতে গিয়ে তার মা, বৌ ও মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তারা মৈথিলী ব্রাহ্মণ। বাড়ীতে কথায় বার্তায় চালচলনে বাঙালীদের সঙ্গে তাদের অনেক মিল। আরেক অফিসবন্ধু বিশেশ্বর সিং দীননাথকে গাড়ী চালানো শিখিয়েছিল। সেও খুব আসে যায়।

পাটনায় পৌঁছে প্রথম সাতদিন তারা ছিল কঙ্করবাগ কলোনীতে। সেখানে চমনলালের বৌ শবুকে একখানা একখানা করে মোটা রুটি বানাতে শিখিয়েছিল। আর ছিল পাশাপাশি কোয়ার্টারের প্রসাদজী, সিন্‌হা, পাণ্ডেজী, লালাজীর ঘরনীরা ও মিঞা সাহেবের বিবি। তখন শবুর হিন্দী ভাষায় জ্ঞান সামান্যই—ওরা সব হিন্দীতে বহুত গপ্‌সপ্ করে যেত, সে শুধু হাসি দিয়ে আর মাথা নেড়ে কাজ সারত। প্রসাদজীর বৌ খুব সাজগোজ করত। বোরখা পরা মিঞার-বিবি তাকে কটাক্ষ করে বলত—'বুড়ী ঘোড়ী, লাল লাগাম'।

এত বছর পাটনায় থেকে একটা জিনিষ বুঝেছে—এখানে জাত-পাতের বিচার খুব। প্রথম কথাই হল কে কোন জাত—ভূমিহার, রাজপুত, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ না যাদব? এ ছাড়াও কুর্মি, কাহার, দুশাদ আরো কত। সুমন, লাল, প্রসাদ, সিন্‌হা, রামবাবু—সবাই কায়স্থ, গিরিন্দর, সুদাম—ভূমিহার, বিশেশ্বর সিং—রাজপুত, তেওয়ারী, পাণ্ডে, মিশ্রজীরা ব্রাহ্মণ।

মোটামুটি নির্বিবাদে পাটনার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে দেশের আকাশে জমল মেঘ, নেমে এল ঘোর অন্ধকার। এদিকে দীননাথও ক্ষেপে উঠেছে কলকাতায় বদলির জন্য।

শিলংএ থাকতেও সেখানকার অবস্থা একটু একটু করে অশান্ত হয়ে উঠছিল। খাসিয়ারা প্রসেশন বের করে দাবি তুলেছিল—'উই ওয়ান্ত হিল স্তেত্ (উই ওয়ান্ট হিল স্টেট)। এখন ত সেখানে হিল ষ্টেট মেঘালয় রাজ্য গড়ে উঠেছে। যখন হিলষ্টেটের দাবি উঠেছিল তখন দীননাথ তাদের অফিসের এক খাসিয়ামামাকে (খাসিয়া ভাষায় বাবুকে বলে মামা, বিবিকে বলে মামী, বোনকে বলে কং) জিজ্ঞেস করেছিল—

—'লিঙো মামা, তুম লোক হিল্ ষ্টেট মাংতা—সব কুছত বাহার সে আতা, পাকিস্তানকে সাথ লড়াইকে বাদ মছলি ভি নেহি আতা—তুমলোক খায়গা কিয়া? কাকিয়াৎ (মদ) খানেসে পেট ভরেগা?'

লিঙো মামা জবাব দিয়েছিল—'ইঠু হামারা দেশ হামলোক পাহাড়ী—

চোরি নেহি করতা, ঝুট নেহি বোলতা—তুমলোক আকে শিখায়া। তুম উদ্‌খার (সমতলবাসী) লোক—ভাগো, হামলোক পাথর খাকে বাঁচেগা।'

শুনে শবুর ভয় করত, সরল পাহাড়ী লোকগুলো ক্ষেপে গিয়ে কি কাণ্ড বা ঘটায়! অসমীয়াদের উপর ওরা বেশী চটা। কিছু খাসিয়া ভাষাও শিখেছিল—সালা বাম্‌জা—ভাত খাওয়া হয়েছে, ভি চা—চা খাও, আলে হাঙনে—এখানে এস, সঙ্—বস, এম্—না, ভঃ—হ্যাঁ, ওয়াই আর লাই সাউ সান—এক দুই তিন চার পাঁচ। এইরকম কিছু শব্দ আর কি।

হিল্ ষ্টেট হয়ে গেলে লক্ষ্মীবালারা শিলংয়েই আছে না সেখানকার বাড়ী-ঘর বিক্রি করে রিফিউজী হয়ে নতুন রাজধানী দিসপুরে আস্তানা খুঁজে নিয়েছে জানা নেই। তবে ওরা যে ক্ষুব্ধ তা ওদের কথা থেকেই বোঝা যেত। লক্ষ্মীবালার আঠারো উনিশ বছরের কলেজে পড়া ছেলে বিজয় বলত—

'আপনি কহকছুন মাহী, কিমান অন্যায় কথা নহয়? নেফা গোল, নাগাল্যাণ্ড গোল, সিলেট গোল—এতিয়া খাসিয়াবিলাক হিল ষ্টেট মাগিছে, মিজোবিলাকে মিজোরাম মাগিছে। বেলেগ বেলেগ জাতি নিজর ষ্টেট মাগিব আরু লাহে লাহে আমার আসামটোক খণ্ড খণ্ড করিব। তর অসমিয়াবিলাক কোন পিনে যাব? আনহাতে আসামর ভাঙর সরু সোরা ছোয়ালীবিলাক মাতি পারে—আসাম অসমীয়ার, ই রাজ্যত অপর কুনেও থাকিব নোয়ারে। আসামর ওপরত অবিচার ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাইছে, কি করিব লাগে বিচারি কহকছুন মাহী?'

শবু জবাব দিতে পারে নি। মনে হয়েছে সেখানেও একটা ঝড়ের আভাস একটু একটু করে ঘনিয়ে আসছে।

আর পাটনাতে সাত বছরে এমন একটা ঝড় উঠেছে যে তার ঝাপটায় সারা দেশ থরথর করে কাঁপছে।

এই পাটনাতেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর গান্ধী ময়দানে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা শবু শুনেছে। সত্তর সালের প্রথমদিকে বাংলার দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে পড়ে। মার্চের শেষে জ্যোতিবাবু মিটিং করতে এলে পাটনা ষ্টেশনে তাঁকে গুলি করে মারার চেষ্টা হয়েছিল। সেদিন বিকেলে শবু সে মিটিংয়েও গিয়েছিল সেই গান্ধী ময়দানে—নেতার বাঙালীমার্কা হিন্দী বক্তৃতা শুনে মজা পেয়েছে। আবার মনে মনে এও ভেবেছে, মাত্র ছ ঘণ্টা আগে সেই গুলিটা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হত তবে কি যে হতে পারত! সেরাতে রেডিওর খবরেও সারাক্ষণ শুধু ঐ ঘটনার কথাই বলেছিল।

পরে শুব বলেছিল—'ট্রেন এ্যাক্সিডেন্টে তোমাদের কিছু হয়নি, গুলিতে তোমার ভাসুর ঠাকুরেরও কিছু হয়নি।'

'রাখে হরি মারে কে ?'—শবু জবাব দিয়েছে।

জয়বাংলা যুদ্ধের পর ঐ ময়দানেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'বাবুজীর' বক্তৃতাও সে শুনেছে দীননাথের সঙ্গে গিয়ে।

এদিকে সারা বিহার রাজ্য নাকি অনাচার ভ্রষ্টাচারে ডুবে গেছে। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানাতে সচিবালয়—বিধান সভার দিকে মিছিল নিয়ে গেল। চলল লাঠি গ্যাস গুলি—পুড়ল বাস। হঠাৎই পাটনা সরগরম হয়ে উঠল—ছাত্ররা গফুর মিঞার পদত্যাগ দাবি করে তার কুশপুত্তলিকার শবযাত্রার মিছিল বের করল। পুলিশ আরো কঠোর হল। ছাত্ররা নেতাবিহীন অবস্থায় কদিন স্বতঃস্ফূর্ত কিছু আন্দোলন করে শেষে গিয়ে উপস্থিত হল জে, পির কাছে। এতদিন শুধু এলোমেলো মিছিল বের হ'ত আর মুখে মুখে আওয়াজ উঠত—

'গফুর মিঞাকা এন্তেকাল হো গয়া, জানাজা নিকলা'—'গফুর মিঞা—হায় হায়।'···

শুরু হ'ল জেপির নেতৃত্বে দলহীন অহিংস আন্দোলন। জেপির নেতৃত্বে মিছিল বের হলে আবার চলল পুলিশের লাঠি। অদ্ভুত এক মৌন মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করল, এক টুকরো করে কাপড় দিয়ে সকলের মুখ বাঁধা, সঙ্গে নেই কোন দলীয় পতাকা। নালারোডের মহাবীর স্থানের মোড়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে শবু জেপিকে সেই মিছিলে যেতে দেখেছে। কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটে মিটিং করতে গিয়ে জেপিকে নাজেহাল হতে হল।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে আন্দোলন একেবারে তুঙ্গে উঠে গেল, বিহারের আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। হাইকোর্টের রায়ে প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচন বাতিল হয়েছে। এলাহাবাদ থেকে রাজ ছুটে এসে জেপির সঙ্গে মিলে গান্ধী ময়দানে মিটিং ডেকেছে। সেখানেও শবু গেছে দীননাথের সঙ্গে। সেখানে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে—শুধু গফুর হটাও নয়, দিল্লীর তখ্‌তও উল্টে দিতে হবে—ভ্রষ্টাচারের অবসান চাই। সারা দেশ তখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। সারা বিহার আন্দোলনে উদ্বেল।

একরাতে খেয়ে উঠে শবুরা শুতে যাবে, রাত তখন দশটা—পাশের বাড়ীর ভাড়াটে সোম এসে ডাকল—

'লাহিড়ী দা, লাহিড়ী দা, তাড়াতাড়ি বাইরে আসুন।'

সোম, সোমের বৌ ও এক ছেলে আর যমুনাদের বাড়ীর দোতলায় নতুন ভাড়াটে চন্দ্র ও তার বৌ মেয়ে এখন শবুদের নতুন প্রতিবেশী। সোম ও চন্দ্রের দুই বৌতে মিলে শবুর আকাশে চাঁদ আর অস্ত যেতে দেয় না, সারাদিন চলে গল্প আর আড্ডা।

ডাকাডাকি শুনে দুজনেই বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। দীননাথ জিজ্ঞেস করল—

'কি ব্যাপার, কারো অসুখ নাকি?'

'শোনেন নি, আজ রাতে ভূমিকম্প হবে, পুলিশের গাড়ী করে মাইকে বলে গেছে কেউ যেন ঘরে না থাকে, ফাঁকা মাঠে বা রাস্তায় যেতে বলেছে। এ বাবা বিহারের ভূমিকম্প, যে সে কথা নয়।'

দীননাথ বলল—'রাত আটটা থেকে ত কারফিউ লেগেছে, রাস্তায় যাবে কি করে লোকে? আর ভূমিকম্পের কথা কি আগে থেকে বলে দেয়া যায়?'

সোম বলল -'নিশ্চয়ই যায়। দিল্লী থেকে গফুর মিঞার কাছে টেলিফোন এসেছে, রাত বারোটার সময় ভূমিকম্প হবে। চলুন দেখবেন নালারোডে হাজারে হাজারে লোক বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।'

বাব্বা পাশেই ছিল, বলল—'হাম ভি এ্যায়সাহি শুনা, ভূকম্প হোগা।'

'যত্ত সব আজগুবি কথা! টাইম বেঁধে কেউ ভূমিকম্পের কথা বলতে পারে? মনে হচ্ছে কারফিউ বানচাল করার একটা চাল। চলুন, আপনাদের ভূকম্প দেখে আসি, রাতের ঘুমের বারোটা বাজল'—বলে দীননাথ সোম চন্দ্র আর সুমনজীর সঙ্গে নালারোডের দিকে এগিয়ে গেল।

শবু যমুনা সোম চন্দ্রের বৌরা বাব্বা আর বাচ্চারা গরমের রাতে বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে বসে গল্প করতে লাগল। সাহস করে কেউ ঘরে যেতে পারছে না, সত্যি যদি ভূমিকম্প হয়?

প্রাকৃতিক ভূমিকম্প হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রিক ভূমিকম্পে সারা দেশ কেঁপে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেশে জরুরী অবস্থা জারী হয়েছে, জেপি সহ হাজার হাজার লোক জেলে বন্দী—জোর অনুশাসন পর্ব শুরু হয়েছে। সে অবস্থা এখনও চলছে, সবার মুখ বন্ধ।

পাটনা থেকে ছুটি নিয়ে রওনা হবার কথায় শবু দীননাথকে জিজ্ঞেস করেছে—

'এমার্জেন্সীতে শুনছি লোকের ছুটিছাটা বন্ধ করে দিচ্ছে। তুমি ছুটি নিয়ে

যাচ্ছ, আবার ছুটি বাড়াবে বলছ। যদি না দেয়, যদি জেলে ধরে নিয়ে যায়?'

'যায় যাবে। তাই বলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যাবে না? ওদের সে নৈতিক সাহস আছে?'

বদলির জন্য দীননাথ বেপরোয়া, এমার্জেন্সী মানে না, জেলকে ভয় পায়না।

শবু আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার নেই। এমার্জেন্সী, ধর-পাকড় নিয়ে তার মাথা-ব্যথার কারণ নেই। বরং মাত্র একবছর আগে শবুর মা চলে গেছে সে দুঃখ সে এখনও ভুলতে পারেনি। বাবা ও কানাইয়ের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি আসে, তাই পড়ে মায়ের অভাব আরো বেশী করে অনুভব করে। রথের দুদিন আগে সারাদিন সে উপোস দিয়ে রইল, মার লেখা পুরোনো চিঠিগুলো বের করে বারবার করে পড়ে ও এলবামে সাজানো মার ফটোগুলো দেখতে দেখতে কেঁদে আকুল হল। ভেবে আশ্চর্য্য হল—একবছর হয়ে গেছে মা নেই, অথচ শবু এখনও দিব্যি বেঁচে আছে। মার অভাবে সে একটা দিনও বাঁচতে পারবে না ভেবেছিল সেই মাকে হারানোর পরে এক এক করে ৩৬৫ দিন কেটে গেছে। একটা বছর শবু শুধুই কেঁদেছে, আজো কেঁদে চলেছে মার জন্য। এ চোখের জলের বন্যা তার কোনদিন থামবে না। শুকোবে না।

চার

বন্যা এসেছিল পাটনা শহরেও। সে এক ঐতিহাসিক বন্যা। পাটনায় দুটো ঋতুই প্রবল—শীত ও গ্রীষ্ম—হাওয়া চলে 'পচ্ছিয়া' (পশ্চিমা)। শীতে সে হাওয়া কন্‌কনে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মে তাতে আগুনের হল্কা। দখিনা বাতাসের দেখা মেলে না, পুরবৈয়াঁর দেখা মেলে শুধু বর্ষায়। তপু এসে পাটনার শীত গ্রীষ্ম দেখে ভয় পেত। শীতে তার গায়ে জ্বর এসে যেত। গ্রীষ্মে লু লাগার ভয়ে পথে বের হতে ভয় পেত। দীননাথ তাকে আরো ভয় পাইয়ে দিতে বলত—

'এই দেখ তপু, খবরের কাগজে লিখেছে গয়া, বিহারশরিফ, বক্তিয়ারপুর বারৌণীতে মোট ১০জন মারা গেছে।'

তপু ভয় পেয়ে বলত—'মেজদিরে, তুই আমাকে মন্দির শহরে রেখে আয়। এখানে দেখি সবই বেশী বেশী—কি শীত, কি গ্রীষ্ম।'

শবু দীননাথকে বলেছে—'কেন শুধু শুধু মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছ বলত ? শোন তপু, যারা খুব গরিব, ঝুপড়িতে থাকে, লেপ কাঁথা নেই গায়ে দেবার মত, পেট ভরে খেতেও পায়না তাদেরই কেউ কেউ শীতে মারা যায়, গরমেও মরণ ঐ গরিবদেরই। তুই ভয় পাস না।'

সেই পাটনাতে যে আবার বন্যা হতে পারে কেউ ভাবেনি। একবার নাকি পুনপুন নদী বাঁধ ভেঙে এসে রেল লাইনের দক্ষিণের কঙ্করবাগ, গান্ধী কলোনীর মত কিছু এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছিল। কঙ্করবাগের যে কোয়ার্টারে শবুরা সাতদিন ছিল সেটা নাকি এক কোমর জলের নীচে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু রেল লাইনের উত্তরে মূল পাটনা শহরে বন্যা আসবে কেউ ভাবেনি। পাশেই গঙ্গাকে একমানুষ সমান উঁচু পাকা বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

তবু পাটনা শহর বন্যায় জলে তলিয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে শবুরা দেখল সামনের রাস্তা জলে ডুবে গেছে, পায়ে পায়ে জল এগিয়ে এসে বাড়ীর উঠোন ডুবিয়ে ঘরের মেঝের ইঞ্চিখানেক নীচে এসে থমকে গেল। রাব্বা উপর থেকে ডেকে বলল—

'আইয়ে বহেনজী, ছাত পর সে নালা রোডকে ওর চাহিয়ে, দেখিয়ে পানিকা কেয়া রফ্‌তার হ্যায়।'

নালা রোড দিয়ে তখন তরতর করে নদীর মত স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পাশে স্কুলের খেলার মাঠে জল ঢুকে শবুদের ঘরের মেঝে থেকে একফুট উঁচুতে উঠেছে, প্রাচীর ঘেরা থাকায় সে জল ঘরে আসতে পারছে না। মাঠটাকে দেখাচ্ছে হ্রদের মত। নীচু টীচার্স কোয়ার্টারগুলো জলের তলায়—মাষ্টাররা সপরিবারে পলাতক।

বন্যার জলের দুরন্ত গতি শবু আগের দিনই দেখে এসেছিল। ২৫শে আগষ্ট বেলা দশটায় দীননাথ অফিসে বেরিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ী ফিরেছিল—শ্রীকৃষ্ণপুরী, নিউ সেক্রেটারিয়েট সব রাতারাতি একমানুষ জলের নীচে ডুবে বসে আছে। সন্ধ্যের আগ দিয়ে দীননাথ শবুকে মোটর বাইকের পিছনে বসিয়ে বন্যা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। বেইলী রোডের দিকে এগোতে পারেনি, ডাক বাংলো রোড হয়ে এক্‌জিবিশন রোড ধরে গান্ধী ময়দানের পশ্চিম দিয়ে গোলঘর, বাঁশঘাটের (শ্মশান) পাশ দিয়ে বোরিং ক্যানেল রোড পর্যন্ত গিয়েছিল। পাশে গঙ্গা ফুঁসছে, বাঁধের লকগেটগুলো দিয়ে চুইয়ে জল এসে রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। পনরো মিনিট পরে ফিরতে গিয়ে সেই ডাক বাংলো রোডেই ওরা জলবন্দী হয়ে পড়েছিল।

শেষে এক হাঁটু জলের মধ্য দিয়ে জোর করে গাড়ী চালিয়ে কিছুটা এসে ভট্টাচার্য্যি রোড কদম কুঁয়া তখনও শুকনো পেয়ে বাড়ী ফিরতে পেরেছিল।

বাড়ী ফিরতে যমুনা জিজ্ঞেস করেছিল—'কেয়া দেখা বহেনজী ?'

শবু দীননাথের কাছে শোনা আন্দাজের কথা বলেছিল—'লাগতা হ্যায় কাল সুবে তক্ ইয়ে মহল্লা ডুব যায় গা।'

দীননাথ ততক্ষণে তক্তা পেতে গাড়ীটা বারান্দায় তুলেছে।

যমুনা অবিশ্বাসের স্বরে বলেছিল—'কা বোলতী হ্যায় ? ঘর ঘর মে পানি ঘুস্ যায়গা ? অসম্ভব—না-মুস্কিন হ্যায়।'

বাব্বা এরই মধ্যে সাইকেলে কয়েক চক্কর ঘুরে এসেছে, দিদির কথার প্রতিবাদ করে বলেছে—

'কাঁহে নেহি ঘুসেগা ? উধার শ্রীকৃষ্ণপুরী, প্যাটেল নগর, মন্দিরি মহল্লা সারে কে সারে পানিমে দহ গেয়া—ইধার কাঁহে নেহি ঘুসেগা ?'

এখন সেই যমুনা ছাদে বসে গালে হাত দিয়ে জলের রফ্‌তার দেখছে।

সোম হাঁটু জল ভেঙে হৈ হৈ করতে করতে এল—

'হে বাবা শোণ, পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে এসে তুমি পাটনা শহর ডুবিয়ে দিলে ? পাশে থেকে মা গঙ্গাও এত বছরে যা পারেনি তুমি তাই করে মা গঙ্গাকে লজ্জা দিলে ? লাহিড়ীদা, আপনারা দেখছি অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, আমাদের ঘরে একটু জল ঢুকেছে। ভাবছি খাট চৌকির উপর সংসার তুলে নিয়ে কটা দিন চালিয়ে দেব।'

দীননাথ বলল—'আমরা এখনো ডুবিনি, কিন্তু মাঠের প্রাচীর ভাঙলে যে কি হবে।'

চন্দ্র বাবু বলল—'আমরা ত দোতলায় আছি, সোমদা না হয় কদিনের জন্য আমাদের এখানে উঠে আসুন।'

সোম বলল—'এখন ত চলে যাচ্ছে, পরে যা হয় দেখা যাবে। আচ্ছা শোনা যাচ্ছে নাকি দানাপুরের মিলিটারীরা তাদের বারুদ ভিজে যাচ্ছে দেখে ভোপ দেগে মাঝরাতে শোণ নদীর বাঁধ উড়িয়ে দিয়েছে। থুড়ি—নদী নয়, শোণ নদ—বাবা শোণ।'

সুমনজী বলল—'মিলিটারী হো আউর কোই ভি হো—ইস্‌কে পিছে দেবীজী জরুর হ্যায়। পাটনাকে আদমী বহুৎ জেপিকো মানতা হ্যায়, ইস্ লিয়ে পটনাকো ডুবা দিয়া।'

কত লোকের কত রকম ব্যাখ্যা। এদিকে দশ বারো দিন অফিস টফিস

সব বন্ধ। কলে সুতোর মত ঝির ঝির করে জল আসছে, রেডিও জল ফুটিয়ে খেতে বলে বলে গলা ভেঙে ফেলেছে। পাটনা রেডিও ষ্টেশনও জলে ডুবে গেছে, গলার আওয়াজ বড় ক্ষীণ। কিন্তু এতদিন খাওয়া দাওয়া চলবে কি করে ?

বাব্বা বলেছিল—'পটনা—৪ বাঁকীপুর সবসে উচা হ্যায়, কভি নেহি ডুবেগা।'

ওর কথা আংশিক সত্যি হয়েছে, লঙ্করটুলি ডুবলেও মেছুয়াটুলি ডোবে নি। গঙ্গার পাড় ঘেঁষে যে সব জায়গা—গোলঘর থেকে পাটনা সিটি মোটে ডোবেনি। এদিকে শ্রীকৃষ্ণপুরী থেকে কদমকুয়া রাজেন্দ্র নগর পর্য্যন্ত সব এলাকায় খরস্রোতে নৌকো ভাসাতে হয়েছে, প্রত্যেকটি রাস্তা এক একটি দুরন্ত স্রোতের নদীতে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিন গান্ধী ময়দানে যখন জল ঢুকতে আরম্ভ করছিল সেই সময় পাশ দিয়ে যেতে যেতে শবু দেখেছিল অল্প কয়েকটি জলের ধারা রাস্তার উপর দিয়ে সাপের মত কিলবিল করতে করতে ময়দানে গিয়ে নামছে—ধীরে ধীরে সন্তর্পণে। আর একদিন পরে দেখা গেল তার কি ভীষণ স্রোত।

দীননাথ কোমর জল ভেঙে মেছুয়াটুলি থেকে বাজার করে এনেছে, দৈনিক স্থানীয় খবরের কাগজও যোগাড় করেছে। কাগজে পাটনার কত জলছবি—এমন কি গফুর মিঞার জায়গায় যে মিশিরজী এসেছে তারও বাড়ীর এক-তলায় জল, গরুবাছুরগুলোকে দোতলায় তুলেছে। বিদ্যুৎদের বাড়ী ডোবে নি—আর টিমটিম করে হলেও জল ও বিদ্যুৎ কোনোটাই শবুদের বন্ধ হয়নি।

সোমবাবুরা শেষ পর্য্যন্ত ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। তৃতীয় রাতে তাদের বাড়ীর দিকেই প্রাচীর ভেঙে স্কুলের মাঠের জল পথ করে নিয়েছিল—তাদের ঘর আর উঠোন দিয়ে জল ছুটেছিল তীব্রগতিতে। রাতারাতি কোন রকমে প্রাণ হাতে করে সোমেরা তাদের বাড়ীওয়ালার তেতলায় চিলেকোঠায় আশ্রয় নিয়েছিল—তারাই রেঁধে খাইয়েছে ক'দিন।

মিলিটারী হেলিকপ্টারে করে জলবেষ্টিত পাটনা শহরে উপর থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলা শুরু হয়েছিল। একদিন একটা প্যাকেট স্কুলের হাতা-টাতেও ফেলেছিল, অন্য লোক জল ভেঙে এসে কুড়িয়ে নিল। প্যাকেটে চিড়ে ছোলা গুড় ছিল না রুটি চাপাটি ছিল দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

শীলুয়ার মার প্রতি শবু কৃতজ্ঞ—এক বুক জল ঠেলে রোজ দুবেলা এসে কাজ করে গিয়েছে। পাশের গলিতেই ওরা থাকে, বস্তি হলেও তাদের ঘরগুলো উচু

ন্যে ভোবে নি। আর বন্যা সম্বন্ধে শেষ কথা বলেছিল দশ বারো বছরের শীলুয়া। বন্যার জল তার হাঁটু অবধি নামতেই যার সঙ্গে কাজ করতে এসে একেবারে পাকা বুড়ীর মত গালে হাত দিয়ে শবুকে বলেছিল—

'এয়সা বাঢ় হম জিন্দগীমে না দেখলি, মাইজী।'

শীলুয়া তার বারো বছরের জীবনে এমন বাড় বন্যা কখনো দেখেনি, আর গত বারো বছরে শবুর জীবনে কম শোকের বন্যা বয়ে যায়নি।

পাটনায় এখন দেখা যায় পথের ধারে বাড়ীর দেওয়ালে প্রাচীরে গোলঘরে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডে লাল দাগ টানা, সঙ্গে লেখা 'এইচ. এফ্. এল-৭৫'—

পাঁচ

আর আছে পাটনায় কতজনের আসা যাওয়ার স্মৃতি। শিলং এ থাকতে এক পাঁচুকাকা আর চাঁপাতলার প্রতিবেশী মোহন একদিনের জন্য গিয়েছিল। তারা গিয়েছিল চাকরির ইণ্টারভিউ বা পরীক্ষার সূত্রে। আর পাটনায় এসেছে গেছে বহু আত্মীয় স্বজন বারে বারে—দফায় দফায়, শুধুই বেড়াতে।

মা পদ্মিনী দেবী ও তপু দু দফায় এসে বেশ কয়েক মাস করে থেকে গেছে। মা দুবারই যোগমায়াদিদের বাড়ীতে থেকে গেছেন, সে স্মৃতি শবু কোনদিন ভুলবেনা। তপু দ্বিতীয়বার এসে যখন গীটার শেখার জন্য থেকে গেল, তখনই বাসা বদল করে ওদের যমুনাদের বাড়ীতে আসতে হয়। এখানে থাকতেই বিপিন একদিন শবুরা সিনেমা দেখতে গেলে ঘরের তালা ভাঙার চেষ্টা করে না পেরে চুপে চাপে কলকাতা পালিয়ে গেছে। চুরি করার চেষ্টা তার সফল হয়নি।

এসেছে কানাই বিয়ের পর পর কাকলীকে নিয়ে একবার, আরো পরে কাকলী ও মিঠিকে নিয়ে আর একবার। ওরা শবুদের ছুটো বাংলাই দেখেছে। পাটনা থেকে রাজগীর নালন্দা বেড়িয়ে এসেছে। মানেরেও বেড়াতে গেছে শবুদের সঙ্গে, সেখানে অনেক ফটোও তুলেছিল। দ্বিতীয়বারে দীননাথের মোটর বাইকে কাকলীকে পিছনে বসিয়ে কানাই সারা পাটনা চষে বেড়িয়েছে। ওরা মাত্র পাঁচ সাতদিন করে থেকে চলে গেছে শবুকে অনেক আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়ে।

মা চলে যাবার পর দক্ষিণ ভারত ঘুরে ফেরার পথে কলকাতা থেকে দিদির মেয়ে বুলাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল—মাসখানেক ছিলও। শবু ভেবে- ছিল—একদিকে সে জীবনে সব হারিয়ে রিক্ত হয়ে গেছে তার উপরে মাকেও হারিয়েছে—দিদির মেয়ে কিছুদিন কাছে থাকলে হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা পাবে। ফল হয়েছিল উল্টো।

প্রথম প্রথম তাকে নিয়ে যাত্রা থিয়েটার সিনেমা দেখে, বিদ্যুৎ বাব্বাদের সঙ্গে খেলা গল্প করে একরকম কাটছিল। মাঝখানে দীননাথ দিন তিনেকের জন্য ট্যুরে গেল। আবার শবুর মন খারাপ হয়ে গেল। তখন মাত্র মাস ছয় আগে মা চলে গেছে। সেই ছ মাসে দীননাথ একদিনের জন্যও শবুকে ফেলে কোথাও যায়নি। শবু যে তখন দিন রাত মার জন্য কাঁদত। তাই দীননাথ অফিসের সময়টা ছাড়া আর কোথাও এমন কি ছাপাখানার আড্ডাতেও যেত না।

দীননাথ বাইরে যাওয়াতে শবুর মার কথা বারবার মনে হচ্ছিল চোখে নামছিল জল। বুলা জিজ্ঞেস করেছিল—

'শবু মাসী কাঁদছো ক্যানো, মেসো বাইরে গ্যাছে বলে? আমার বাবা কতবার অসুখ হয়ে হাসপাতালে গ্যাছে, আমার মা একদিনও কাঁদেনি।'

শবু কেঁদে বলেছে—'তা নয় রে, আমার মা চলে গেছে ত, মার কথা আমি ভুলতে পারিনা।'

বুলা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলেছে—'কি যে তোমরা দিদিমার জন্য কাঁদো শবু মাসী, বুঝি না। দিদিমা তোমাদের জন্য কি করেছে, তোমাদেরকে কি দিয়েছে? ছাখো আমার মাকে, কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে মা আমাদের দুভাই বোনকে মানুষ করেছে। তোমরা মাসীরা বা দিদিমা—আমার মার পায়ের কড়ে আঙুলেরও যুগ্যি নও।'

শবু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছে— 'তুই কি বলছিস বুলা! দিদিমা তোর মায়ের পায়ের যুগ্যি নয়—এতে যে তোর মাকেও অপমান করা হয়। দিদিমা যে তোদের মায়েরও মা।'

'হোক মায়ের মা, গুরুজন। তোমরা বা দিদিমা মার মত দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছ? একা হাতে স্বামীর সেবা, সংসার চালানো সব করেছ? অথচ সেবারে দাদা কটা টাকা নিয়ে সময়মত দিতে পারেনি বলে সবাই মিলে কথা শুনিয়েছে। সেই জন্যই মা আর বাপের বাড়ী যায়না, দিদিমা মরে গ্যালে তাও মা যায়নি একবার।' বুলা এক নাগাড়ে বলে গেছে।

শবু অবাক হয়ে ভেবেছে, দিদি ত এরকম ছিল না। মনে পড়েছে দিদির বিয়ের পর মা দিদিকে বলেছিলেন—বাপের বাড়ীর দুঃখ কষ্টের কথা মনে রাখিস না, পরে দেখবি সে সব সুখের স্মৃতি হয়ে আছে। দিদি নিজে ত কখনও শবুকে এসব কথা বলেনি। তবে কি ছেলে মেয়েরাই মাকে বিগড়ে দিচ্ছে ?

তার বার বার মনে হয়েছে—বুলাটা বড়ই স্বার্থপর আর হিংসুটে প্রকৃতির। এর চাইতে বুলা না থাকলে সে নিরিবিলিতে মার জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারত। শেষে এক মাসের মাথায় বুলার দাদা বাবুল এক বন্ধুকে নিয়ে পাটনায় বেড়াতে এসে কদিন থেকে বুলাকে নিয়ে গেলে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

অথচ এই বুলাকে নিয়েই শীলুয়ার মা বড় এক অদ্ভুত কথা বলেছিল। বাড়ীতে লোকজন আসত, অনেকদিন করে থাকত শীলুয়ার মার কাজও বাড়ত। তা নিয়ে কিন্তু কোনদিন কিছু বলে নি বরং খুশী হত, বলত—মেহমান ভগমান হোতা হ্যায়। বুলারা চলে গেলে একদিন শীলুয়ার মা বলেছিল—

'তেরী বহেনকি লেড়কী কুছ কাম নেহি করতী থী, লেকিন তু কুছ নেহি বোলতী—ইস্ লিয়ে কি উ আপনাকে থী আউর উলোগ গোতনীকে থী।'

শুনে শবু অবাক! বুলা নিজের বোনের মেয়ে বলে সে কিছু বলেনি আর তার জা এর ছেলে মেয়েরা কাজ করত না বলে সে নাকি বিরক্ত হত। ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম। বুলার ব্যবহারে মনে মনে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে সে কোন কিছু বলবে না ঠিক করেছিল।

অনেক আগে বড়জা বীণার বড় মেয়ে স্বপর্ণা একা একাই বেড়াতে এসেছিল। বলত—

'আমার শরীর ভাল না, বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ভাল করতে এসেছি।'

একটা মাস সে শুধু শুয়ে বসে কাটাল আর কোথায় কোথায় যেন লম্বা লম্বা চিঠি লিখত কিম্বা গীটার বাজাত। কোথাও বেড়াতেও যেতে চায়নি।

তারপর একদিন সে একা একাই সোদপুরে ফিরে গেল।

তার কিছু পরে এসেছিল ওদের সব থেকে ছোট বোন সুরমা—ছিল মাত্র দু সপ্তাহ। খুব সাজতে গুজতে ভালবাসত। সুযোগও পেয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্র ভবনে তখন দশদিন ধরে নাটক প্রতিযোগীতা হচ্ছে। রোজ গালে ঠোঁটে রং মেখে কাকা কাকীমার সঙ্গে গিয়ে নাটক দেখত আর বলত—

'দিদি ফিরে গিয়ে বলেছিল—ওখানে ভীষণ বোর লাগবে। আমার কিন্তু পাটনা খুব ভাল লাগছে।'

ভাল লাগলেও তার বেশীদিন থাকা হয়নি। একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে বলে তাকে সোদপুরে ফিরে যেতে হল। মহী সরকারী কাজে মাঝে মাঝে পাটনায় আসত। সে-ই সুরমাকে নিয়ে এসেছিল, নিয়েও গেল।

সুরমার বিয়েতে শবুরা কলকাতায় গেছিল। বড় ভাসুরের নির্দেশে দীননাথই কন্যা সম্প্রদান করেছিল। কিন্তু তার আগে ঘটে গেছে অন্য একটা কাণ্ড।

বড়জা বীণা শবুকে ডেকে বলেছিল—

'শোনো শ্রাবণী আমার দুঃখের কথা। এই ত কদিন আগে তোমার ভাসুর আমাকে ভরদুপুর বেলা বলল—আজ কালীঘাটে তোমার বোনের বাড়ীতে সুপর্ণার বিয়ে, ইচ্ছে হয় যেতে পার। আমি যাই নি শ্রাবণী। সুপর্ণা পাড়ার এক কায়স্থ ছেলেকে ভালবেসে রেখেছে, তাকেই সে বিয়ে করবে। অন্য সব দিক থেকে ছেলেটি ভাল। কিন্তু কায়স্থ ছেলের সঙ্গে বিয়েতে আমি মোটেই রাজী হতে পারিনি। এদিকে মেয়ের বাপ বলে—আমি ওসব জাত টাত মানিনা। না মানলে কি চলে, আরো দুটো মেয়ে আছে, একটা ছেলে আছে—তাদের বিয়ের বেলায় কথা উঠবে না? সব নষ্টের মূল ঐ সোনা—সে নিজে ঐ কীর্ত্তি করেছে, বড় মেয়েকে পথ দেখিয়েছে আবার ঐ টুকু স্কুলের ছেলে পার্থ যে একটা সাহার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে তাকেও ইন্ধন যোগাচ্ছে।

'তোমার ভাসুর কথা শোনায় 'তোমার মেয়ে' বলে। ছেলে মেয়ে কি আমি পেটে করে এনেছিলাম বাপের বাড়ী থেকে? কিছু বলতে যাও ত দেখ কি রাগ আর জেদ! ভীষণ রাগী আর জেদীর বংশ—কেউ বাবার মত অমন মাটির মানুষ নয়। যেমন মা তেমন পুত, যেন এক একটি ভূত। মা গুণে পুত'—বীণা বলে আর কাঁদে আবার অন্যকথায় অভ্যাসমত হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শবু বলেছে—'সত্যি দিদি, এরা যা রাগী আর একরোখা, আমার মাঝে মাঝে খুব ভয় করে। ঐ যে চাঁপাতলায় আমাদের বাড়ীর পাশের জমিটাই আপনার দেওর ভবকে দিয়ে কেনাল। আমি কত করে বললাম—একেবারে পাশে বা সামনে না কিনে একটু দূরে কোথাও কেনাও। ওরা যখন একসঙ্গে থাকবেই না তখন গায়ে গায়ে জমি বাড়ী করে কেন অশান্তি ডেকে আনবে? আমার কথার কোন মূল্যই দিল না—নিজে যা ভাল বুঝবে তার উপরে কারো

কথাই শুনবে না। বলে—অশান্তি, অশান্তি আবার কিসের?' বলতে বলতে শবুর দু চোখ ছলছল করে উঠেছে। সেই প্রথম সে অপরের কাছে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।

বীণা শুনে বলেছে—'ওমা, তাই নাকি? তবে ত তোমরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মেরেছ। আমরা কেমন দূরে দূরে বাড়ী করেছি—আমাদের সম্পর্কও ভাল আছে। পাশাপাশি মানেই লাঠালাঠি। কথায় বলে—পাশাপাশি করে বাস, লাঠালাঠি বারোমাস।' বলে হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। বীণা সুখেও হাসে দুঃখেও হাসে।

কথাটা শবু আর বলেছিল মা, ঠাকুমাকে। তাঁরাও ঐ এক কথাই বলেছিলেন—পাশাপাশি বাড়ী করা ভাল না। মা শেষে যখন সুযোগ পেয়ে জামাইকে সে কথা বলেছিলেন তখন দীননাথ চিন্তিতভাবে বলেছিল—

'জমি কেনা হয়ে গেছে, এখন ত আর ফেরানো যাবে না।'

ততদিনে হয়ত বাবুর কানে জল ঢুকেছে—কিন্তু হাতের তীর তখন ফসকে গেছে।

সুষমার বিয়েতে মহী গরহাজীর ছিল। সে নাকি বলেছে—সুপর্ণার অমন বিয়ে দিল, আমি ওবাড়ীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না।

মেজো মেয়ে সুবর্ণার বিয়ে তখনো হয়নি, পার্থ স্কুল ফ্যাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে ওভারসীয়ারীতে ভর্তি হবে বলে অপেক্ষা করছে। সুবর্ণাও বি. এ পরীক্ষা দিয়েছে। বড় ভাসুর তাকে একখানা চিঠি পাঠাল—পার্থ সুবর্ণাকে পাটনায় পাঠাচ্ছি, ওরা দু জনই প্রচণ্ড অবাধ্য হয়ে উঠেছে, আমি না লেখা পর্যন্ত ওদেরকে সোদপুরে আসতে দেবে না।

এসে গেল পার্থ আর সুবর্ণা। প্রথম প্রথম কিছুদিন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়াল। সান্যাল মেসো, সুষমাদির বাড়ী, বিদ্যুৎ, পাশের খেলার মাঠ এই সব নিয়ে হৈ হৈ করে মেতে রইল। তারই মধ্যে সুনন্দদার মেয়ের সঙ্গে ওদের মামাতো ভাইয়ের বিয়ের জন্য মামাকে বলবে বলে কথা দিল।

মাসখানেক না যেতেই দু ভাইবোনে ছটফট করতে লাগল—

'ও সেজকাকু, আমাদের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও। আমাদের কলেজ আরম্ভ হয়ে যাবে।'

দীননাথ বলে—'দাঁড়া, বড়দা টাকা পাঠাবে বলেছে, টাকা পাঠাক।' আসল কথাটা ভাঙে না।

পার্থ বলে—'এই বর্ণা, আর আমরা মাকে চিঠি লিখি, বাবাকে বলে টাকা পাঠাবে।' পার্থ সবার ছোট ও একমাত্র ভাই বলে সকলের আদুরে। সব দিদিকে সে নাম ধরে ডাকে—পর্ণা, বর্ণা, রমা। শবুকেও ছোটবেলায় যার দেখাদেখি শ্রাবণী বলত, এখন বড় হয়ে সেজকাকী বলে।

চিঠি যায়, কিন্তু উত্তর আর আসেনা। পার্থ বলে—'সেজকাকী, তুমি কাকুকে বল, আমাদের সোদপুরে পাঠিয়ে দেবে।'

শবুর উভয় সঙ্কট, কিছু বলতে পারে না।

সুবর্ণা বলে—'এই পার্থ, ভাবতো, এখন সোদপুরের মানুষগুলো কি করছে।' দুজনে বসে বসে সোদপুরের গল্প করে। ওদের দেহ পাটনায় কিন্তু মন পড়ে আছে সোদপুরে।

সুবর্ণা আবার স্কুলের মাঠে যারা খেলাধুলা করে তাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে। তারা অবশ্য বয়সে অনেক ছোট, তবু তাদেরই কেউ কেউ সুযোগ পেলে সিটি বাজাতে ছাড়ে না।

সবদিক থেকেই কেমন যেন অবাঞ্ছিত বিরক্তিকর একটা অবস্থা। আর সেই সময়ই শবু মার চিঠি পাচ্ছে না, শরীরের ভিতরও কি যেন হচ্ছে যার ফলে কিছুদিন বাদে গায়ে ঘা-চুলকুনি মত হয়েছিল। তার উপরে যারা থাকতে চায় না তাদের জোর করে আটকে রেখে মন যোগানো, সেবা যত্ন করার ঝকমারিও আছে।

এমনি অবস্থাতেই শবুর মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক মন্তব্য হয়ত বেরিয়েছে, আর সেই সূত্রেই শীলুয়ার মার বিজ্ঞজনোচিত বিশ্লেষণ—আপনাকে হ্যায় আউর গোতনীকে হ্যায়।

শেষে বড় ভাসুর যখন লিখল—পার্থকে ভর্তি করার সময় হয়েছে, ওদের পাঠিয়ে দাও—দুভাই বোনের আর একদিনও তর সয়নি, পরের ট্রেনেই রওনা দিয়েছে।

পোষ্টমাস্টার সান্যাল মেসো পরে একদিন দীননাথকে বলেছিলেন—

'পার্থ ছেলেটা একদিন আমার কাছে হাতের ঘড়ি ও পৈতের আংটিটা রেখে টাকা চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম—টাকার দরকার হলে তোমার কাকাকে বল, নিশ্চয়ই দেবে। আমি টাকা দিইনি—এ বয়সের ছেলেমেয়েদে মতিগতি জানি ত।'

ছয়

এসেছিলেন মামীমা অনিমা দেবী, তুলু ও ভুলু। চিনু আসতে পারেনি, সে তখন রাজনীতি নিয়ে খুব ব্যস্ত। মামীমারা আসছেন খবর পেয়ে শবু কাকাকে লিখে ছোট মেয়ে বেলাকেও তাদের সঙ্গে আনিয়েছিল। মামীমারা তাঁর এক ভাইয়ের বাড়ী কাশীতে গিয়ে সেখান থেকেই কলকাতা ফিরেছিলেন। কদিন বাদে ভোট দিতে শবুরা কলকাতা যাবে, বেলা ওদের সঙ্গেই ফিরবে।

এমন সময় প্রথমবার কানাই কাকলী পাটনায় বেড়াতে এসেছে। একদিন বেলাকে নিয়ে তারা রাজগীর নালন্দা ঘুরে এল।

দীননাথ কানাইকে বলল—'এমন সময় এলি, পরশু ভোট, আমরা যে ভোট দিতে যাব বলে ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছি।'

শবু বলল—'কানাই কাকলী প্রথম পাটনায় এসেছে, ওদেরকে ফেলে রেখে আমরা কি করে যাব?'

দীননাথ বলল—'দুনিয়া রসাতলে গেলেও আমাকে ভোট দিতে যেতেই হবে।'

কানাই তার জামাইবাবুকে চেনে। বলেছিল—

'তুই ভাবিসনা মেজদি, আমরা ত আর দিন দুই তিন পাটনায় থাকব, তারপর বেনারস ঘুরে বাড়ী ফিরব। সে দুদিন আমরা এ বাড়ীতে থেকে দোকানের রুটি চাপাটি খেয়ে বেশ পিক্‌নিকের মেজাজে ঘুরে বেড়াব। বেনারস যাবার সময় যোগমায়াদিদের হাতে ঘরের চাবি দিয়ে যাব।'

অগত্যা তাই ঠিক হয়েছিল। ওদের তখন নতুন বিয়ে হয়েছে, বন্দোবস্তটাও বেশ মানানসই হল—যেন নিরিবিলিতে হানিমুন আর কি।

দীননাথ মুচকি হেসে বলেছিল—'এটা বরং ভালই হবে, তুমি আমি থাকলেই রসভঙ্গের সম্ভাবনা।'

না, দীননাথ একেবারে কাঠখোট্টা নয়। তবু শবু কানাইকে সাবধান করে দিয়েছিল—

'যখন বাইরে যাবি, বনোয়ারীকে বলে যাবি। ও খুব বিশ্বাসী লোক, যোগমায়াদিদের বাড়ীতে মোজেইকের কাজ করে আর রাতে রোটি চোখা

বানিয়ে খায় আমাদের সামনের উঠোনেই, শোয় আমাদের সিঁড়ির নীচে।'

শুধু বেলাই আসেনি, ছোটকাকার মেয়ে শ্রীলাও এসেছিল, সঙ্গে জামাই অপূর্ব।

শ্রীলা—অপূর্বর বিয়ে যেমন একদিকে সৃষ্টি করেছিল নানা মানসিক দ্বন্দ্বের তেমনি যুগিয়েছিল কিছু রঙ্গ-রসের উপাদানও।

শ্রীলার বিয়ে হয়েছিল শবুরা শিলংএ যাবার এক বছরের মধ্যেই। অপূর্বদের পদবী মিত্র—কায়স্থ। বলতে গেলে শবুর শ্বশুর কুল আর পিতৃকুলে সেই প্রথম অসবর্ণ বিয়ে। অতদূর শিলং থেকে তাদের সে বিয়েতে আসার প্রশ্নই ছিলনা। দীননাথ ত এরকম বিয়ে হচ্ছে জেনে রেগে গিয়েছিল। শবুর মনে পড়েছিল মিতুর বিয়েতে যাবার সময় ট্রেনে এক সময় শ্রীলা বলেছিল—মেজদি, আমরা ব্রাহ্মণ, মৈত্র—মিত্র নই। তখন থেকেই মেয়েটা মনে মনে এজন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তখনই শ্রীলা ও সোনার মেলামেশা দেখে তার মনে হয়েছিল—নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

পরে ষষ্ঠীতলায় শবুরা গেলে ঠাকুমা চুপে চুপে বলেছিলেন—

'দেখ্ কি বলব শবু! মেয়ে ত ঐ কীর্ত্তি করে বসে আছে, রেজিস্ট্রিও করেছে। এদিকে অবিনাশ আর ছোট বৌমা বাড়ীতে মেড়াপ বেঁধে রোশনাই করে বিয়ের যোগাড় করছে। আমি বলি—অমন মেয়েকে দূর করে দাও, তার জন্য আবার এত আড়ম্বর কীসের? অবিনাশ আমাকে ধমক দেয়—মা তুমি কিছু বোঝো না, তুমি চুপ করে থাক, তোমাদের কাল আর একাল এক নয়। আমি চুপ করেই রইলাম—চিরকালই তোদের বাপ কাকাদের ধমক খেয়ে চুপ করেই থেকেছি' বলতে বলতে ঠাকুমা দুঃখে অভিমানে কেঁদে ফেলেছিলেন।

সত্যি, ঠাকুমার কাছে সেটা ছিল অসহনীয় মানসিক আঘাত। শবু কোন সান্ত্বনা দিতে পারেনি।

ছোট কাকীমা কাছে এসে একসময় প্রশ্ন করেছিলেন—

'অনেকদিন পরে ঠাকুমা নাতনীতে দেখা হয়ে কী সব গল্প হচ্ছে?'

শবু কথা ঘুরিয়েছে—'না, ঠাকুমাকে বলছিলাম, আমার ছোট দেওর সোনা এক কায়স্থ মেয়ে বিয়ে করেছে।'

কাকীমা একটু চুপ করে থেকে করুণ হেসে বললেন—'আজকাল ঘরে ঘরেই এসব হচ্ছে।'

আর শবুর মা বাবার অবস্থা কি? পরে মন্দির শহরে গিয়ে শবু সে কথা শুনেছে। মা বলেছিলেন—

'শ্রীলার বিয়ের কথা শুনে 'সে' ত রেগে আগুন, বলে ও বিয়েতে কেউ যাবে না। পরে বলে—শ্রীলা জামাইকে নিয়ে কখনো বেড়াতে এলে ওদের বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না।'

কানাই মাঝখান থেকে ফোড়ন কেটেছিল—

'দেখ মেজদি, একদিন পরে বাবা আবার বলল—ওরা খেয়ে উঠলে খবরদার বলে দিচ্ছি, ওদের এঁটো পরিষ্কার করবে না। আচ্ছা তুই-ই বল মেজদি, ওদের বাড়ীতেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি, খেতে বসবে কি করে?' বলে কানাই ভ্রূ চোখ ট্যারা করে তাকিয়েছিল। শুনে শবু হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায়নি।

বালক কানাইয়ের চোখে শ্রীলা ছিল এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব, এ সময় যৌবনের স্বাভাবিক ঔদার্যে সে শ্রীলাদির বিয়েতে কোন দোষ খুঁজে পায় নি। মুস্কিল হয়েছিল বাবা—ঠাকুমাদের নিয়ে—শবুরাও পড়েছিল দোটানায়।

দুপুরে খাওয়ার পরে পান সাজতে সাজতে মা বলেছিলেন—

'শুনছো, শবুর ছোট দেওর সোনাও নাকি এক কায়স্থ মেয়েকে বিয়ে করেছে।'

বাবা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করেছিলেন

'তবে ত শবুর পিতৃকুল শ্বশুরকুল দুই-ই গেছে, আর ভাবনা কি?'

পরে একবার শ্রীলা-অপূর্ব মন্দির শহরে বেড়াতে গিয়ে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। বাবা অপূর্বর সুন্দর মার্জিত ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন।

সেই শ্রীলা ও অপূর্ব তাদের বাচ্চা মেয়েটাকে দাদু দিদিমার কাছে রেখে পূজোর মধ্যে পাটনায় বেড়াতে এসেছিল। শবুরা তখন বাঙালী আখড়ায় সন্ধ্যারতি দেখছে। সন্টু ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বের করে বলল—

'কাকীমা, আপনাদের বাড়ীতে দুই স্বামী-স্ত্রী কারা যেন এসেছে।'

কারা এসেছে ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে দেখে শ্রীলা আর অপূর্ব যোগমায়াদিদের ঘরে সোফায় বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

অপূর্বর ব্যবহারে ওরাও মুগ্ধ হয়েছিল। হাজার হোক উচ্চ শিক্ষিত, কলেজের প্রফেসার। যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র—এক কথায় বলতে গেলে অপূর্বর ব্যবহারও ছিল অপূর্ব। দীননাথও মনে কোন ক্ষোভ না রেখেই সবাইকে নিয়ে পাটনার গান্ধী ময়দানে তার বন্ধুর দেওয়া পাসে দশেরা উৎসব

যতটা সম্ভব কাছ থেকে দেখিয়ে এনেছিল। শবু সেই প্রথম দেখেছিল নকল রাম লক্ষণ সীতা সেজে কিছু অভিনয়ের পর বিরাট বিরাট কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ ও রাবণের খড়ের মূর্তিতে আগুন ধরানো।

দুদিন থেকে অপূর্ব শ্রীলা যখন ফিরে গেল তখন দীননাথ ও শবুর তাদের প্রতি বিরূপভাবের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। একটা ব্যাপার দেখে ওরা আশ্চর্য্য হয়েছিল। অপূর্ব প্রতিবার খাবার পরে নিজের এঁটো বাসন উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কলতলায় রেখে দিত। শবু বারণ করতে গেলে শ্রীলা বলেছিল—

'মেজদি, বারণ করে ফল হবে না। আমাকেও এঁটো বাসন তুলতে দেয় না, পাতে খেতে দেওয়া দূরের কথা।'

শবুর মনে হয়েছিল অপূর্ব না জেনেই বাবা-মার সমস্যার সমাধান করে রেখেছিল।

ওরা চলে গেলে দীননাথ ঠাট্টা করে বলেছিল—'অপূর্ব যেন টগর বোষ্টমীর উল্টো সংস্করণ। মনের সব সংস্কার একসঙ্গে ঝেড়ে ফেলা কঠিন। মানুষটা খাঁটি।'

যাই হোক সব মিলিয়ে সব দেখে শুনে শবুর মনে হয়েছে, শ্রীলা তার উপযুক্ত জীবনসাথীই পেয়েছে।

শ্রীলার পরের বোন এলাও এসেছিল পাটনায় জামাই রমেনকে নিয়ে। তারা বেশ কয়েকদিন ধরে হানিমুন মুডে পাটনা রাজগীর বেড়িয়ে অনেক ফটো তুলে ফিরে গিয়েছিল।

এলা ও তার পরের বোন নীলার বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্মণ ঘরেই। শবু দুই বিয়েতেই গেছে, মা-ও এসেছেন। এলার বিয়ে ঠাকুমাও দেখে গেছেন।

এলার বিয়ে থেকে নীলার বিয়ে—মাঝখানে ফারাক প্রায় চার বছরের। এই সময়ের মধ্যে ছোটকাকার আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে।

এলার বিয়ের সময় কাকা সভ্য রিটায়ার করেছেন, হাতে এসেছে কিছু টাকাপয়সা—। ঠাকুমা তখন কাকাকে বলেছিলেন—

'ওরে অবিনাশ, তুই ত রিটায়ার করলি, এ বিয়েতে বেশী খরচ করিস না। এখনো তোদের দুই মেয়ের বিয়ে বাকি।'

কাকা-কাকীমার পক্ষে সে কথা মানা সম্ভব হয়নি। ঘর-বর, আত্মীয়-স্বজন, লোক-লৌকিকতা—কোনটিকে ত ছোট করে দেখা যায় না। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী ভরে গিয়েছিল, বিয়েটাও হয়েছিল তেমনি জমজমাট।

পরে শবু ঠাকুমাকে দুঃখ করে বলতে শুনেছে—

'অবিনাশ হিসেব করে চলতে জানেনা, ভবিষ্যতের জন্য ভাবে না। ঘরে সঞ্চয়ও বিশেষ কিছু নেই। ছোটবৌমাও কোন বাধা দেয় না। ঐ টুকু টুকু মেয়েদের দামী দামী ফ্রক কিনে দেয়, দুমাসেই সে সব ছোট হয়ে যায়। আমি বলি—এখন দু আড়াই গজে চলে যাচ্ছে, যখন দশহাতেও কুলোবে না তখন এদের ঢাকবে কিসে? এদিকে বাবু-পুটুর পৈতেও দেয়া হয়নি।'

তখন কথাগুলো শুনে শবুর মনে হয়েছিল, ঠাকুমা বড় বেশী চিন্তা করে। এলার বিয়েতে কী এমন বেশী ধুমধাম হয়েছে? সমাজে বাস করতে গেলে এটুকু করতেই হয়। বুড়ো মানুষরা তাদের পুরোনো ধ্যান ধারণাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, একটুতেই ভাবে বুঝি…।

কিন্তু অনেক ঝড় ঝাপটা পার দেওয়া বুড়োমানুষের কথা ফলে গিয়েছিল নীলার বিয়ের সময়—তখন ঠাকুমা আর বেঁচে নেই।

নীলার বিয়ের সময় কাকাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। কাকার সামান্য কটা পেনসনের টাকা, পুটুর বেচারামের অল্প-কিছু রোজগার—ঘরে সঞ্চয় অতি সামান্যই। দুই জামাই অপূর্ব-রমেন কিছু সাহায্য করেছে, কিন্তু একটা বিয়ের পক্ষে সে আর কতটুকু! আত্মীয় স্বজনও বিশেষ কেউ আসেনি। তবু একটা বিয়ের খরচের চাপ—যার বেশীর ভাগ দায় পুটুর ঘাড়ে এসে পড়েছিল, ধরে ধরে টাকা যোগান দিতে হয়েছে তাকে।

অনভিজ্ঞ প্রায় নাবালক বেচারী পুটু—সে এত টাকা পাবে কোত্থেকে? মাসখানেক যেতেই কোম্পানীর খাতায় তার হিসেবের গরমিল ধরা পড়েছে। সে নাকি তিন হাজার টাকা কোম্পানীর তহবিল থেকে খরচ করে বসে আছে। হাজার হোক ছেলেমানুষ ত বটে, ব্যাপারটার গুরুত্ব সে আগে বুঝতে পারেনি। দুই জামাই অপূর্ব ও রমেন এক হাজার করে দিয়েছে, ঘর থেকে পাঁচশ—তবু আরো পাঁচশ টাকার ঘাটতি। দীননাথকে কাকীমা সে কথা জানাতে সে পাঁচশ টাকা দিলে অবস্থা সামাল দেয়া গেছিল।

শবু দীননাথকে বলেছিল—'পুটু বিপদে পড়েছে, টাকাটা দেয়াই উচিৎ, হাজার হোক পুটু আমাদের ভাই।'

দীননাথ বলেছে—'আরো একটা কথা। শ্বশুর বাড়ী দূরে বলে আর ঠাকুমা থাকাতে শ্বশুর বাড়ীর বেশীরভাগ আদরযত্ন আমি কাকা কাকীমাদের কাছেই পেয়েছি। আমাদের অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ নয়।'

কথাটা ঠিকই বলেছিল। ও বাড়ীতে তিন তিনটে জামাই আসা সত্ত্বেও

দীননাথই ওদের আদি ও অকৃত্রিম জামাইবাবু—সবাই মেজদি মেজজামাই বাবুকে বেশী ভালবাসে।

শবু বলেছে—'তোমার টাকার দরকার হলে কানাই দেবে।'

'শেষে কানাইয়ের কাছে হাত পাততে হবে, আমার কি এতই অধঃপতন হবে!' দীননাথের মানে লেগেছে কথাটা।

করবীর ছেলে বাসু এসে পাটনা বেড়িয়ে গেছে। এ ছাড়া কলকাতা যাতায়াতে ওদের বাড়ীতেও শবুদের যাওয়া আসা আছে। করবীর ছেলেদের পৈতের জন্য দীননাথ দুইশ টাকা দিয়েছিল, একমাত্র মেয়ের বিয়েতেও তিনশ টাকা দিয়েছে। মেজ ননদাই বিনয় প্রকাশ করে বলেছিল—

'আপনাদের সবার কুড়িয়ে বাড়িয়েই ত কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাওয়া।'

ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা ছিলনা। ছোট থাকতেই মেয়েটাকে নিঃসন্তান এক পিসে-পিসীর কাছে গছিয়ে রেখেছিল, তারাই বিয়ের আর্থিক দায়িত্ব বেশীর ভাগ বহন করেছে। বড়ই ধড়িবাজ মেজননদাইরা।

সেই বিয়ের সময়ই শবু দেখেছিল করবীর শাশুড়ীকে গলায় বিরাট একটা টিউমার নিয়ে জীবনের শেষ আনন্দ অনুষ্ঠান নাতনীর বিয়েতে বেনারসী শাড়ী পরে নেচে কুঁদে খুশিতে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে। পরে বছর খানেকের মধ্যে তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছিলেন—শবুর মার বেশ আগ দিয়েই।

করবীর শ্বশুর শাশুড়ী থাকতেন এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে। তাঁরা থাকেন এক ছেলের বাড়ীতে, মায়ের খাওয়া দাওয়া সেই ছেলের বাড়ীতে। করবীরা সেই পাড়াতেই একটু দূরে বাড়ী করেছে, শ্বশুর রোজ দু বেলা সেখানে গিয়ে খেয়ে আসেন। মেজননদাই আর একমশারীর গল্প করে না। এখন বুড়ী মরে যাওয়াতে দু ছেলের পক্ষ থেকেই বুড়োর জন্য সেবা ও পাহারার প্রতিযোগীতা চলছে—বুড়োর ভাঙা সিন্দুকে নাকি গুপ্তধন আছে। করবীদের ধারণা শেষ দু পাঁচ ভরি সোনা যা আছে তা তারাই পাবে কারণ শ্বশুর তাদের অন্নভাগেই আছে।

আরো এসেছিল শেফালীর ভাসুর অঞ্জন তার বৌ অলকা ও তিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে। বীরু বাকচী তার দিদির দেওর, দীননাথ তার ভাইয়ের সম্বন্ধী। সুতরাং দুই সম্পর্কের খাতিরে দু বাড়ীতেই তারা থাকা খাওয়া করে গেছে। ওদের বাড়ীতে অলকার লক্ষীমন্ত পয়মন্ত বৌ বলে নাম আছে কারণ তার বিয়ের পরেই নাকি অঞ্জনের চাকরিতে ভাল রকম উন্নতি হয়।

অলকাকে শবুর বেশ ভাল লেগেছিল—বেশ সরল ও মন খোলা।

শেফালীর দেওর রঞ্জনও এসেছিল একদিনের জন্য চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে।

হয়ত অঞ্জন অলকাদের বর্ণনায় আকৃষ্ট হয়ে শেফালী-কাঞ্চনও এসেছিল, সঙ্গে তাদের একমাত্র মেয়ে ঝর্ণা। এখানে দীননাথের সম্পর্কই নিকটতম, তাই শবুদের বাড়ীতেই তাদের থাকা খাওয়া, গীরু বাকচীদের বাড়ীতে দু এক বেলা নিমন্ত্রণ রক্ষা করা।

শেফালীদের সঙ্গে অনেক ঘুরে বেড়ানো, ফটো তোলা গল্প গুজব চলেছে কদিন ধরে: সবাই মিলে বুদ্ধগয়াতেও ঘুরে এসেছে। সেখানে ফল্গু নদীতে নেমে বালি খুঁড়ে জল বের করতে করতে যে গল্প শুনেছিল তাতে শবুর মন হঠাৎই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল।

রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে তখন বনবাসে। গয়াতে ফল্গু নদীর তীরে এসে মনস্থ করলেন ফল্গুর তীরে পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করবেন। সীতাকে সে কথা জানিয়ে বনচারী রাম লক্ষ্মণ আগে মহামায়ার মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন। সময় বয়ে যায় তারা আসেনা দেখে সীতা নিরুপায় হয়ে সামান্য উপাচারে এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে সে কাজ করলেন।

বেলা গড়িয়ে শেষে রামলক্ষ্মণ ফিরলে সীতা জানালেন—দুজনের ফিরতে দেরী দেখে তিনি নিজেই সে কাজ করেছেন। তা বললে ত হবে না—সাক্ষী কে? সাক্ষী—ব্রাহ্মণ তুলসীগাছ গাভী বটবৃক্ষ ও ফল্গু নদী। প্রশ্ন করাতে এক বটগাছ ছাড়া আর সবাই কাজের কথা অস্বীকার করে সীতার অভিশাপ কুড়োলো। সীতার অভিশাপে ফল্গু নদীর জল মুহূর্তে শুকিয়ে গেল, নদী এসে সীতার পায়ে কেঁদে পড়ল। সীতা দয়াপরবশ হয়ে বললেন—তাঁর অভিশাপ বিফল হবেনা—তবে এর পর থেকে সে অন্তঃসলিলা হয়ে বেঁচে থাকবে, বাইরে থেকে তার জল দেখা যাবে না, জগতের লোক তার তীরে বসে পিণ্ডদান করলেই তবে সে কাজ সার্থক হবে। সীতার আশীর্বাদে বট আজও অক্ষয়-বটরূপে বিরাজমান।

গল্প গল্পই। তবু শুনে শবুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে যে কলঙ্কিনী রাধা ও দুঃখিনী সীতার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। তাই শাশুড়ী দিয়েছে তাকে অন্যায় অপবাদ আর স্বামী তাঁকে করেছে অবিশ্বাস ও অবহেলা।

দীননাথ জিজ্ঞেস করেছিল—'আমি আবার তোমাকে অবিশ্বাস করলাম

করে, অবহেলাই বা পেলে করে ?'

শবু বলেছে—'মনে আছে সেই জুন মাসের কথা, নির্দোষ আমাকে রিফিউজী কলোনীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে—সেটা অবিশ্বাস অপমান নয় ? আর অবহেলা ? ভবর ঐ জমি কেনার ব্যাপারে কত বারণ করলাম—তার কোন মূল্য দিয়েছ ? অমন দেবচরিত্র রামচন্দ্র সেই তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করেনি তার কথার মূল্য দেয় নি—তুমিও সেই দলে। সীতার ভাগ্য আর রামের ভাগ্য থেকে আমরাও রেহাই পাব না'—বলতে বলতে শবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

দীননাথ মুখখানা করুণ করে কথাগুলো শুনে গেছে, কোন কথা বলতে পারে নি। আজ পর্যন্ত স্বামীর বিরুদ্ধে শবুর মাত্র এই ছুটিই অভিযোগ। আর একটু আধটু যা আছে তা উপর উপর—তেমন ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

কদিন পরে শেফালীরা কাশীতে গেল। কথা ছিল সেখানে তিন চারদিন থেকে সোজা কলকাতা ফিরে যাবে। রওনা হল এক ছুপুরের গাড়ীতে। পরদিন রাত দশটায় আবার সবাই হঠাৎ এসে হাজির।

শবু জিজ্ঞেস করল—'তোমরা নাকি ওখান থেকেই কলকাতায় যাবে, ফিরে এলে যে ?'

শেফালী বলল—'ওখানে গিয়ে স্বর্ণা বায়না ধরল—এ জায়গা ভাল না, আমি মামা মামীর বাড়ী যাব। কিছুতেই থাকবে না, কান্নাকাটি করতে লাগল। তাই একদিনে যতটা পারা যায় কাশী দেখে বিকেলের গাড়ীতেই চলে এলাম।'

সেটা ছিল বড়দিনের ছুটির সময়। কাঞ্চন বলল—'এখানকার বড় বড় পাবতা মাছ আর জ্যান্ত চিংড়ি ছেড়ে হোটেলের খাবার ভাল লাগল না। তাই পাটনার পাবতা আর বৌদির হাতের রান্না খেতে চলে এলাম।'

কথাটা ঠিকই। পাটনার মাছ তরকারির স্বাদের সুখ্যাতি সকলেই করেছে, দামেও সস্তা ছিল। আর ছিল গ্রীষ্মে দানাপুরের কাছে দীঘার ল্যাংড়া আম যার স্বাদ ভোলা যায় না। তপু আম ছুধ খেয়ে মোটা হয়ে গেছিল। তপুর ধারণা ওর স্বাস্থ্য ভাল হওয়াতেই নাকি পাত্রপক্ষ ওকে সহজে পছন্দ করেছিল। মেজদির প্রতি সে কৃতজ্ঞ।

শেফালীরা আরো তিনদিন থেকে কলকাতায় ফিরে গেছে। ওরা চলে গেলে দীননাথ বলেছিল—

'বোধ হয় হাতের টাকা পয়সায় টান পড়েছিল, হোটেলে থাকা খাওয়া

চালানো যেত না, তাই মেয়ের নাম করে চলে এসেছে।'

তাতে দোষের কি হয়েছে? লোকে বেড়াতেও আসবে, অসুবিধেয় পড়লেও আসবে—না হলে আত্মীয় স্বজন আর কিসের?

আর এসেছিল সোনা—মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। বেচারা সোনা! ওভারসিয়ারের চাকরিতে রেলে ঢুকে মেদিনীপুরেই থাকতে পারবে ভেবে সেখানেই এক কায়স্থ মেয়েকে বিয়ে করল, বাড়ীও কিছুটা করেছে। এমনি অবস্থায় পড়ে গেল ছাঁটাইয়ের মুখে। শেষে গার্ডের চাকরি কবুল করে কিছুদিন ট্রেনিংও নিয়েছে। তা ছাড়া উপায় ছিল না, বিয়ে করেছে একটি মেয়ে একটি ছেলেও হয়েছে—চাকরি না থাকলে খাওয়াবে কি করে? আবার পরে রেল থেকেই তাকে ওভারসিয়ার হিসেবে এলাহাবাদে ডেকে পাঠিয়েছে সেখানে জয়েন করতে যাবার পথে পাটনায় নেমে দাদা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

শবু জিজ্ঞেস করেছিল—'গোপা ও ছেলেমেয়ে দুটো এখন কোথায়?'

সোনা জবাব দিয়েছে—'এখন তারা মেদিনীপুরের বাড়ীতে আছে। এলাহাবাদে গিয়ে কোয়ার্টার যোগাড় করেই সবাইকে নিয়ে যাব। বাড়ীটা শালারা দেখাশোনা করবে।'

পরে দীননাথ বলেছিল শবুকে—'তুমি বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম জয় করলে, কায়েত-গিন্নী তোমাকে টপকে অযোধ্যা জয় করতে চলেছে।'

সোনার বিয়ে হয়ে থেকে দীননাথের মুখে 'কায়েত-গিন্নী' ছাড়া অন্যকোন উল্লেখ নেই। পরে সোনা বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে এলাহাবাদেই বাসা বেঁধেছে।

এমনি করে শবুর বাপের বাড়ীর শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কের প্রায় কারোই পাটনায় আসা বাকি নেই।

সাত

আসে নাই শুধু দুই জন। একজন ভব আর একজন মঙ্গলাদেবী।

ভব পাটনায় আসে নি। মাঝে মাঝে চাঁপাতলার বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

শবুরা শিলং এ থাকতে মা মঙ্গলা দেবী বেশ ঘটা পটা করে গোপা সোনার

বৌভাতের ব্যবস্থা করেছিলেন চাঁপাতলার বাড়ীতে। এখনো মঙ্গলা দেবীর মুখে গোপার গুণগান শোনা যায়—গোপা বড়ই সেবা-পরায়ণা, গোপা বড়ই সুশীলা। গোপা কখনো একটা মাসও শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করেনি। শবুরা লম্বা ছুটিতে বাড়ী গেলে মঙ্গলা দেবী পনরো দিন একমাসের জন্য গিয়ে মেদিনীপুরে থেকে এসেছেন মাত্র।

সেবার তারা দ্বিতীয়বার শিলং থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে এসেছে শীতের মধ্যে। মা মঙ্গলা দেবী বললেন—

'এই ত দীনু এসে গেছে, আমার শ্রাবণী বৌমাও এসে গেছে। আমি আসার জন্য চিঠি লিখব ভাবছিলাম।'

হঠাৎ এই সদয় ব্যবহারে শবু একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল। পরের কথা শুনে সে আশ্চর্য্যভাব কেটে গেল। মা বললেন—

'সামনের মাঘেই ভবার বিয়ে দেব ঠিক করেছি, তোরা না থাকলে এ বিয়ে পার দেবে কে?'

দীননাথ বলল—'আমাকে এবার নতুন ঘরগুলোর মেঝে পাকা করতে হবে, ঘরের প্লাষ্টার করাতে হবে। হয় মাঘের প্রথমে বিয়ে দিন, না হলে মিস্ত্রিদের কাজ শেষ হলে ফাল্গুনের শেষে দেবেন।

মা বললেন—'না, আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে, পরে তোরা থাকতে থাকতে আমি গিয়ে ওদের ঘর বসত করিয়ে দিয়ে আসব। মালতী ঐ টুকু কচি মেয়ে প্রথমটা না দেখিয়ে দিলে পারবে কি করে?'

শবু জিজ্ঞেস করল—'মালতী কে?'

'আরে ঐ যে আগের বাড়ীওয়ালার নাতনী হরিমতী—শশুরের নামে নাম তাই আমি ওর নাম দেব মালতী বা মোতি।'

হ্যাঁ, সোনার বর্ণনার রূপের কাঁঠাল সেই হরিমতীর সঙ্গেই ভবর বিয়ে হয়েছে। শবু গায়ে গতরে খেটে বিয়ে পার দিয়ে দিয়েছে। মঙ্গলা দেবী জাঁক জমকের কিছু কম করেন নি। হৃদিনাথ বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে, করবীরা, শেফালীরা সোনা ও গোপা তাদের প্রথম মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। মাতুল ও ঝন্টুও এসেছিল। আসেনি মহী—সে কারো সঙ্গে বড় একটা যোগাযোগ রাখত না তখন। আসেনি বড় মেয়ে জবারা কেউ—তার দুই ছেলেকেই চোর বদনাম দিয়ে মঙ্গলা দেবী তাড়িয়েছেন। ভোলাটা পরীক্ষায় অত ভাল ফল করেছিল তবু তারও বদনাম জুটল। কলকাতার কলেজেও পড়া হল না।

আর খবর দেওয়া হয়নি দুঃখিনী মেজবৌ রেখাকে—তাকে আনন্দের

বাসরে ডেকে এনে বিভূষিত করা হয়নি।

সব মিটে গিয়ে কাজের জায়গায় রওনা হবার আগে শবু ভবকে বলেছিল 'ভাল ছেলে দেখছি ঘর বসত করার নাম করে বৌ নিয়ে আগেই পগার পার হচ্ছো।'

'দেখ কতদূর কি হয়'—ভব হেঁয়ালীতে জবাব দিয়েছে।

ভাল ছেলে তার কর্তব্য ভোলেনি অবশ্যই। বছর দেড় দুই পরে মেয়ে হবার মাস তিনেক আগ দিয়ে বৌকে চাঁপাতলার বাড়ীতে রেখে গিয়েছিল। মেয়ে হওয়ার সময় ভব লম্বা ছুটি নিয়ে এসে থেকেছে। সে সময় শবু মন্দির শহরে যাবার পথে বাড়ীতে দিন দুই ছিল। তখন মা মঙ্গলা দেবীর মুখে উঠতে বসতে 'মোতি' আর 'মোতি'। মালতী কী খেতে ভালবাসে তাই রেঁধে খাওয়াচ্ছেন, ঠিকমত নাওয়া খাওয়া হচ্ছে কিনা, মেয়েটার যত্ন আত্তি করা সবদিকেই তিনি নজর রেখেছেন।

আড়ালে হরিমতী বা মালতী শবুকে বলেছিল—

'কাকীমা—আগে আপনাকে কাকীমা বলতাম, এখন সেজদিই বলি কেমন? শুনুন সেজদি, আমি এখন শাশুড়ীর সুনজরে আছি—আপনি আমার সঙ্গে বেশী কথাটথা বলবেন না।'

শবু কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলে না, বেশী কথাও বলতে পারেনা।

আবার বছর দুই বাদে ভব, মালতী ও মেয়েকে চাঁপা-তলায় দেখেছিল। কয়েক মাস আগে ভব বৌ-মেয়েকে মার কাছে পাঠিয়েছিল কর্তব্য করতে পরে নিজে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এবারে মালতীর মুখে অন্যকথা শোনা গেল।

মালতী শবুকে বলেছিল—'এখন আর মার সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই। আমি বাপের বাড়ী দেখা করতে গেলে রাগ করেন, বাপের বাড়ী থেকে কেউ এলে মুখ ঘুরিয়ে থাকেন। আমিও ভাল হতে চাই না।'

মঙ্গলা দেবীকেও দেখা গেল না একবারও 'মোতি' 'মোতি' করে সোহাগের ডাক ডাকতে, মেয়েটাকেও একবার কোলে করছেন না। উল্টে চাপা গলায় ভবর উপর তর্জন করছেন—

'কিরে ভবা, তুই দেখি বাড়ী ছেড়ে একদণ্ডও কোথাও যাস না, খুব যে বৌ পাহারা দিচ্ছিস। ভাবছিস আমি কিছু বুঝিনা—না? মনে রাখিস আমি তোদের পেটে হই নি, তোরাই আমার পেটে হছিস। আমি তোদের নাড়ী নক্ষত্তর সব জানি।'

শবু ভবকে জিজ্ঞেস করেছে—'কি রকম বুঝছ ?'

ভব মিটিমিটি হেসে জবাব দিয়েছে—

'শুধু দেখে যাও।'

যেবার ভবর নামে জমি কেনা হল, তারপরে দেখা হতে মালতী জিজ্ঞেস করেছিল—

'আচ্ছা সেজদি, এই বাড়ীটা কার ?'

'ভব কি বলে ?' শবু পাল্টা প্রশ্ন করেছে।

'ও ত বলে, সবটাই সেজদা করেছে।'

'তোমার কি মনে হয় ভব মিথ্যা বলেছে ?'

'না, মানে, শুনেছিলাম এক অন্নে থাকলে সকলের সমান ভাগ থাকে।'

'সে ত জানি না, উকিলরা বোধ হয় সঠিক বলতে পারবে।' শবুর মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। কাল বিয়ে হয়ে এসে আগেই বাড়ীর ভাগ বুঝে নিতে চাইছে।

এমনি ভাবে নানা ফক্কিকারি করে মাঝে মধ্যে বার দু তিন দু চার মাস করে মালতীকে মার কাছে রেখে ভব প্রথম প্রথম কিছুটা ভালমানুষীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, পরে আর তাও করেনি। এখন ত তারা আসাম না নেফা কোন দুর্গম অঞ্চলে থাকে, মালতী এসে বাপের বাড়ীতে ওঠে আর মাঝে মাঝে শাশুড়ী ঠাকরুনকে দেখে যায় ভালমানুষ সাজতে। মেয়েকে কলকাতার বাইরে হোস্টেলে রেখে স্কুলে পড়াচ্ছে উভয় সঙ্কট এড়াতে।

বিয়ের আগে থেকেই মালতীর মনোভাব জানা গেছে। মামীমার ওদের বাড়ী যাতায়াত আছে—সেখানে তিনি মেয়ের মায়ের মুখে শুনেছেন সে সব কথা। মেয়ে খুশীতে উপচে পড়ে বলত—

'আমার কি ভাইগ্য, ইঞ্জিনীয়ার ছেলের লগে বিয়া হইব।'

প্রতিবেশিনী মেয়ের এক পিসী বলেছে—

'ছেলের মা-ভিয়ে ত দেখছস, তার লগে থাকন লাগব। শ্রাবণী কাকীও থাকব, হ্যায় ত তর জা হইব।'

মেয়ে মুখ বাঁকিয়ে জবাব দিয়েছে—'আমি কারোর লগে থাকতামই না।'

এখন শাশুড়ী চায় না বৌ এসে থাকুক, বৌ-ও চায় না এসে থাকতে। দুজনেরই ভালমানুষীর মুখোস খুলে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে ভালছেলেও তার মার কাছে আর ভাল নেই।

বাড়ীর ভাগ পাওয়া যাবে না বুঝে মালতীও শেষে বলেছিল—

'পাশের জমিটাই কেন কিনল—ঘরে বসে দিনরাত শাশুড়ীর মুখ দেখতে আর শুনতে হবে। জমিটা দূরে হলেই ভাল হ'ত। আমিত হাতে টাকা জমলেই একটা করে সোনার বার কিনি। জমি কিনে কি হবে? কলকাতায় বদলি নিতেও চাই না।'

অতএব ভব বৌ নিয়ে আসাম নেফা ঘুরে বেড়াচ্ছে—পাটনায় যাবার অবসর সে পায় নি।

আট

আর আসেনি মা মঙ্গলা দেবী। তাঁর যে একেবারে হাত পা বাঁধা তাও নয়। তিনি একা একাই হিল্লী দিল্লী যেতে পারেন। শবুরা লম্বা ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এলেই তিনি একাই বেরিয়ে পড়েন মেদিনীপুর বা এলাহাবাদে সোনার কাছে কিম্বা আসাম বা নেফায় ভবর কাছে। কিন্তু তারা লম্বা ছুটি নিয়ে এসে থাকলে মঙ্গলা দেবী একবারও দীনুর কাছে যাবার নাম করেন না, যানও না।

মঙ্গলা দেবীর খরচের টাকা পয়সা ভব আর সোনা দেয়। আজকাল মহী নাকি খুব মাতৃভক্ত হয়েছে, মাসের প্রথম এক গাদা ফলমূল ঘি মাখন কৌটোর দুধ মিষ্টি কিনে দিয়ে যায়। তার বেশীর ভাগই করবীরা এসে নিয়ে যায়—একা মানুষ কত খাবে?

ঠাকুমা বেঁচে থাকতে শবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'হ্যাঁরে, তোরা প্রাণনাথের মাকে মাসে মাসে হাত খরচ দিস ত?'

শবু বলেছে—'ভব সোনা মহীতে মিলে যা দেয় একার পক্ষে তা অনেক বেশী। তোমাদের জামাই বলে—আমি বাড়ীর কাজ করতে করতে সব সময় ধার দেনায় ডুবে আছি, আর মা ত আমাদের বাড়ীতেই রয়েছে।'

ঠাকুমা বলেছেন—'তবু দিতে হয়। মা ত, টাকা দিলে খুশি হবে, আশীর্ব্বাদ করবে।'

শবু দীননাথকে বলে মাসে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা করে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে।

অম্বুবাচীর উপোসের পর বার দুই মঙ্গলা দেবী কঠিন অসুখে পড়েছেন। একা বাড়ীতে থাকেন, দেখা শোনা করার কেউ নেই। কাছে আছেন

মামীমা আর তাঁর ছেলেরা—যথাসাধ্য করেন তাঁরা তবু মঙ্গলা দেবীর মন পাননা।

শেফালী খবর পেয়ে ছুটে আসে, খোঁজ খবর করে। বলে—'মা, আপনি একা থেকে যে মারা পড়বেন।'

মঙ্গলা দেবী উত্তর করেন—'আমি না থাকলে দীনুর বাড়ী দেখবে কে?'

শেফালী বিরক্ত হয়ে বলেছে—'চুলোয় যাক সেজদার বাড়ী, আপনি চলে যান ভব বা সোনার কাছে, ছোড়দার কাছেও যেতে পারেন কিম্বা সোদপুরে বড়দার কাছে।'

না, তিনি কারো কাছে গিয়ে থাকবেন না, বাড়ীতে আর কাউকে থাকতেও দেবেন না। শেফালীর চিঠিতে মার অবস্থার কথা জেনে দীননাথ হঠাৎ একটা অবাস্তব প্রস্তাব পাঠিয়েছে—ছোট কাকা কাকীমা ষষ্ঠীতলায় ভাড়া বাড়ীতে থাকেন, তাঁদের চাঁপাতলায় থাকতে বললে দু পক্ষেরই সুবিধে। প্রস্তাবটা শুনেই শবুর মনে হয়েছিল—এ হয়না।

প্রবল আপত্তি উঠেছিল মঙ্গলা দেবীর তরফ থেকে। চিঠিতে লিখেছিলেন, যদি বাড়ীতে শশুর শাশুড়ীকে আনা হয় তবে তৎক্ষণাৎ আমি বাড়ী ছেড়ে গিয়ে পাড়াতেই অন্য বাড়ী ভাড়া করে থাকব আর সবাইকে বলে বেড়াব দীনু আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রস্তাবটা অবাস্তব ছিল ঠিকই, কিন্তু তার যে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে ভাবা যায় নি।

ফলে মঙ্গলা দেবীর একা থাকার সমস্যা সমাধান হয়নি। নাতি নাতনীদেরও কাছে থাকতে দেবেন না, আর কারো থাকাও চলবে না। অথচ কেউ এলেই কাঁদুনি গাইবেন—

'এই বাড়ীটার জন্যই আমি কোথাও যেতে পারছিনা। না হলে ভবা সোনার কাছে গিয়ে আমি অনায়াসে থাকতে পারতাম।'

ছেলেরা চারদিক থেকে টাকা পয়সা পাঠায় বা জিনিষ পত্র দেয় আর মঙ্গলা দেবী তা কৃপণের মত খেয়ে না খেয়ে সঞ্চয় করেন। কৃপণতা এমন পর্য্যায়ের যে ইলেকট্রিকের বিল বেশী উঠবে বলে তিনি ঘরের লাইটও বেশী জ্বালান না। কিন্তু লাইট জ্বালাও বা না জ্বালাও আড়াই টাকা মাসে দিতেই হবে—মিনিমাম চার্জ। তাই সামান্য একটু লাইট জ্বালিয়ে সন্ধ্যে লাগতেই দুটো রুটি খেয়ে সারা বাড়ী অন্ধকার করে শুয়ে পড়েন। ঘরের মধ্যে রাত

৮টা পর্য্যন্ত বিশ্বনাথের তৈরী রেডিওটা প্রচণ্ড জোরে বাজতে থাকে। শিলং এ গিয়ে এ্যাক্সিডেণ্টের ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে দীননাথ একটা বড় ট্র্যান্জিষ্টর রেডিও কিনেছিল—মেজদাদারটা বাড়ীতে রেখে গিয়েছিল। অন্ধকার বাড়ীতে জোরে জোরে রেডিওর আওয়াজে বাড়ীটাকে ভূতুড়ে বাড়ী মনে হয়।

আটটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। বুড়ো মানুষ কত আর ঘুমোবেন, রাত বারোটা একটায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তখন আশপাশে সামান্য শব্দে 'চোর' 'চোর' বলে চীৎকার করতে থাকেন। সারাদিন খেটে খুটে পাড়ার লোক তখন গভীর ঘুম ঘুমোয়—চীৎকারে তারা ঘুম ভেঙে ছুটে আসে। হাজার হোক প্রতিবেশী দীনুবাবুর মা একা বাড়ীতে থাকেন, বিপদে আপদে দেখা তাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু মঙ্গলা দেবীর তাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নেই তিনি কারো সঙ্গে কথাটিও বলেন না। গাছের কুল পেয়ারা আম একটাও পাড়ার ছেলেদের দেন না, নারকেল ত নয়ই।

গাছের সামান্যই কটি নারকেল গুপুরী কুল পেয়ারা লোক ডেকে বিক্রি করে দেন, হাতে দুটো পয়সা আসে। এত পয়সা দিয়ে তিনি কি করবেন? যাই করুন তিনি, তাই বলে এত কষ্ট করে রক্ষা করা ফল তিনি পাড়ার চোর ছেলেদের দিয়ে খাওয়াবেন? সে গুড়ে বালি।

খরচের পথও তাঁর জানা আছে। অমাবস্যার লক্ষ্মী পূজো, পৌষ সংক্রান্তি সরস্বতী পূজোয় খুব ধুমধাম করেন। দুই মেয়ে আসে নাতি নাতনীদের নিয়ে। ছেলেরা ছেলের বৌরা কেউ এল ত আরো ভাল। বড়ছেলের বৌ ও ছেলে মেয়েরাও আসে—কিন্তু তাদের আসা যাওয়া প্রায় অচ্ছুতের মত। বড় বৌ বীণা কতবার শবুকে দুঃখ করে বলেছে—

'আমার ছেলে মেয়েদের অনাদর দেখে যেতে ইচ্ছে করে না। নেহাৎ বাড়ীর পূজো, না গেলে নিজেদের যদি কোন অমঙ্গল হয়, তাই যাই কুকুর বেড়ালের মত।'

যে কয়েকবার শবুর সে সব উৎসবে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছে দেখেছে যত হেনস্তা বীণাদিদের আর শবুর। নতুন বিয়ে হয়ে আসা বৌদের মাথায় তুলে রাখছেন, পারলে গোপাকে দিয়েই লক্ষ্মীর ভোগ রান্না করান। কায়েত-গিন্নীকে দিয়ে ভোগ রান্না করান হবে জানতে পেরে দীননাথ বাধা দেওয়াতে ততদূর আর গড়াতে পারেনি। তা ছাড়া শেফালী করবীর ছেলে মেয়েদের আদরের ছড়াছড়ি ত আছেই।

কিন্তু তাতেই বা কতটাকা খরচ হয় আর জাঁকজমক দেখানো যায়।

চাই বড় দরের উৎসব আয়োজন। সোনা ভবর বিয়ে বৌভাত, সাধ অন্ন-প্রাশন যথারীতি করে চলেছেন। এমন কি রিফিউজী কলোনীতে তাঁর দাদার বাড়ী থাকতে ঝণ্টুকে তুলে এনে এই বাড়ীতে থেকেই বিয়ে দিয়েছেন—বৌভাতের উৎসব অনুষ্ঠান করেছেন। শবুরা সে সব জানতেও পারেনি। একমাত্র ভবর বিয়েতেই তারা উপস্থিত ছিল।

ঝণ্টুর বিয়ের কথা শবুরা মামীমা ও পাড়াপ্রতিবেশীর মুখ থেকে জানতে পেরেছে। সে বিয়ের বছর দেড়েক পরে একবার শবুরা বাড়ীতে এলে একদিন মা মঙ্গলা দেবী বললেন—

'দীনু, তোরা ত এসেছিস। ঝণ্টুর বৌ এর বাচ্চা হবে। এই সময় ঝণ্টুর বৌ এর সাধটা এখানে এনে দিয়ে দি।'

তার কিছু আগে শবুদের জীবনে সেই চরম বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেছে, প্রথম সন্তান সম্ভাবনা অকালে ঝরে গেছে। দীননাথ মনের ক্ষোভ মনে চেপে রেখে বলেছে—

'ওদের নিজেদের বাড়ী থাকতে এখানে কেন বিয়ে, সাধ সব দিতে হবে?'

জেঁাকের মুখে নুন পড়ার মত মঙ্গলা দেবী গুটিয়ে গেলেন—'আচ্ছা, তবে থাক। দাদাকে বলে দেব—ওখানেই করতে।'

সেই মুহূর্তে মঙ্গলা দেবীকে শবুর মনে হয়েছিল যেন হিংস্র হায়েনা—যদিও সে দুর্ঘটনার কথা কাউকে জানান হয় নি।

আর একবছর শবুরা বাড়ীতে এলে মা বললেন—'দীনু, পরশু দাদা মারা গেছে। তার শ্রাদ্ধের যোগাড় হচ্ছেনা, ঝণ্টুটা বেকার অন্য ছেলেরা অমানুষ তুই কিছু সাহায্য কর।'

দীননাথ পকেট থেকে পঁচিশটা টাকা বের করে মার হাতে দিল।

পরে শবু জিজ্ঞেস করল—'তুমি ঐ রকম একটা মানুষের জন্য টাকা দিলে!'

দীননাথ বলল—'আপদ বিদায় হয়েছে তাই দিলাম। মনে করা যাক ঘাটের মড়া—সদ্গতি হচ্ছে না, সেই রকম আর কি।'

মানুষ মরে গেলে তার গুণ গাইতে হয়। কিন্তু মাতুলের এমনই চরিত্র ছিল যে দীননাথ ভেবেছে আপদ বিদেয় হয়েছে—আর মানুষটার প্রতি শবুর বিতৃষ্ণা ত আকণ্ঠ।

•

পাটনায় থাকতে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল মহীর কাছ থেকে—মাদার সীরিয়াস কাম শার্প। তড়িঘড়ি শবুরা রওনা হল। মনে তাদের বিরাট

দুশ্চিন্তা—মা তাদের বাড়ীতেই থাকেন, একা থাকেন—সুতরাং তাঁর ভালমন্দ কিছু হলে তারাই যে অনেকটা দায়ী হবে।

বাড়ী পৌঁছে দেখে সেখানে এক উৎসবের আবহাওয়া—মঙ্গলা দেবী আর একটা উৎসব অনুষ্ঠান খুঁজে পেয়েছেন, পার্থর পৈতে দিতে হবে। সোদপুরে তার বাবা আছে, বাড়ী আছে—তবু পৈতে হবে চাঁপাতলায়। খরচ পত্তর সব তাঁর। এরকম আড়ম্বরের সুযোগ পেলে যাদের কুকুর বেড়ালের মত দেখেন তাদেরকেও তিনি মাথায় তুলে নিয়ে নাচতে পারেন। হাতে থাকবে স্বেচ্ছা-কর্তৃত্ব।

তখন সারাভারত রেল ধর্মঘট চলছিল—সরকার জোর করে ট্রেন চালাচ্ছিল। সে সময় ট্রেনে চড়া দীননাথের মতে নৈতিক অপরাধ। টেলিগ্রামের ভাষায় সে নীতির কথা ভুলে গিয়েছিল—পরে উৎসব অনুষ্ঠান দেখে সে নিজেকে নীতিভ্রষ্ট ভেবে নিজের হাত নিজে কামড়েছিল।

সে পৈতের অনুষ্ঠানেও বীণারা প্রায় অবহেলিত—যদিও তারই ছেলের পৈতে হচ্ছে। আর শবু দীননাথ? বিবেকদংশনে বিব্রত দীননাথ পার্থর আচার্য্যগুরু হয়েছিল আর শবু হল আচার্য্যপত্নী।

পরে সেবারে পাটনায় গিয়ে পার্থ পৈতের আংটি ও ঘড়ি বন্ধক দেবার চেষ্টা করে বুঝি গুরুদক্ষিণা দিতে চেয়েছিল।

বাংলায় দ্বিতীয় দফায় ফ্রন্টের আমলে মা মঙ্গলা দেবী নাকি খুবই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন, চোর ডাকাতের উৎপাতে দিনে শান্তি পান না, রাতে ঘুমোতে পারেন না। আগের আমলে তাঁর কোন ভয় ছিলনা। পাড়ায় ভীম সিং নামে নাকি একটা লোক ছিল তার ভরসাতেই নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু ফ্রন্ট ওয়ালাদের উৎপাতে সিংহ পাড়া-ছাড়া—তাদের মতে সে ছিল গুণ্ডার সর্দার। মা মঙ্গলা দেবী ঘন ঘন চিঠি লিখতে লাগলেন—নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি, বাড়ীটা চারদিক ঘেরার ব্যবস্থা কর।

দীননাথ উত্তরে লিখেছিল—আগে আমরা থাকতে কোনদিন চুরি হয়নি, এখন হচ্ছে কেন? যাই হোক, টাকা পয়সা যোগাড় করে যাচ্ছি—যা যা দরকার করব।

শবুর মনে হয়েছে এর কারণ অন্য। কুকুর গাঁঠুর সজাগ পাহারায় বাড়ীতে চোর আসতে পারত না। সেই গাঁঠু বছরখানেক আগে মারা গেছে, তাই চোরের উৎপাত শুরু হয়েছে। গাঁঠুটা সত্যিই গুণের ছিল।

কুকুরটা মারা গেছেও নাকি অদ্ভুত সময়ে, সরস্বতী পুজোর দিনে।

শুভঙ্করীকে গাঁঠুর বিদ্যাবুদ্ধি সংগীত প্রীতির কথা বলে শবু মজা করত, তার সঙ্গে দেখা হলে সে বলতে পারত—দেখ, গাঁঠুটা কেমন সরস্বতীর বরপুত্র ছিল, কেমন দিনে মারা গেছে। শুভঙ্করী এক পাইয়ে বাজিয়ে ছেলেকে বিয়ে করেছে, যাকে নিয়ে স্বামীর সংসারে তাদের একটি মেয়েও নাকি হয়েছে—শবুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।

গাঁঠুর অভাবেই যে চোরের আনাগোনা হচ্ছে সে বিষয়ে শবু নিশ্চিত। গাঁঠুর মৃত্যু সংবাদে সে দুঃখ পেয়েছে ততটাই যতটা পেয়েছিল ছোটবেলায় পিটারের মৃত্যুতে। গাঁঠুর প্রতি সে খুবই কৃতজ্ঞ। ওরই ভরসায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে খোলা বাড়ীতে শবু একা নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থেকেছে।

সেই বাড়ীটাই সম্পূর্ণ ঘিরতে টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে তিনমাসের ছুটিতে পাটনা থেকে শবুরা রওনা হয়েছিল এক বর্ষার মুখে। দীননাথ তার মোটর বাইকটাও ট্রেনের লাগেজ ভ্যানে তুলে নিয়ে বলেছিল—

'এখানে তিনমাস ধরে এটা রামবাবুর হাতে পড়ে থাকলে যে কি অবস্থা করবে কে জানে। বেটা মোটু—আবার কৃপণের একশেষ, পেট্রোল খরচের ভয়ে হয়ত গাড়ী চালাবেই না। তার চাইতে কলকাতায় নিয়ে গেলে অনেক কাজে লাগবে।'

বাড়ীতে পৌঁছতেই মঙ্গলা দেবী এক নিঃশ্বাসে চোরের একটা ফিরিস্তি দিয়ে বললেন—

'তোরা ত মাস দু তিন আছিস, আমি এই ফাঁকে ভবা সোনাদের কাছে মাসখানেক করে থেকে আসি।'

তিনি চলে গেলেন। শবু দেখেছে, বাড়ীতে যখনই একটা বড় কাজ হয় তখনই মঙ্গলা দেবী অন্য ছেলেদের কাছে বেড়াতে যান। আর মিস্ত্রিমজুর ইটবালি লোহা সিমেন্টের সব ঝামেলা শবুকেই পোহাতে হয় একা।

সিমেন্টের পারমিট পেতে দেরী, ইলেকট্রিকের পোল সরিয়ে বসাতে দেড় মাস,—বড়দা হৃদিনাথের পরামর্শ মত চিলেকোঠার ঘর, সামনে পিছনে লোহার গ্রিল, পিছনে লোহার গেট ও উঠোনের উপরটা দু ঘরের মাঝখানে জাফরি কাটা ঢালাই দিয়ে ঘেরা—আড়াই মাসে বাড়ীটাকে রীতিমত দুর্গ তৈরী করে ফেলা হল। একদিক থেকে বাড়ীটা শবুর এখন আরো ভাল লাগছে যে বেশ ঘেরাটোপ বাড়ী হয়েছে, বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছেনা।

দীননাথ মুখে মুখে হিসেব করে বলল—

'বাড়ীটাকে দুর্গ বানাতে চার হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল।'

শবু তখন ভাবছিল অন্যকথা—এত বছরের সাধের ফলন্ত কুলগাছটা উঠোন ঢাকতে গিয়ে কেটে ফেলেছে। কি সুন্দর মিষ্টি কুল হত, বর্ষাকালেও বেশ কিছু কুল ধরত কিন্তু অসময়ের ফল খেতে নেই বলে কেউ খায় না। কুল গাছ কাটা পড়লেও তখন তিনটে নারকেল গাছ, পাঁচটা সুপুরী গাছ, আম গাছ, পেয়ারা গাছ ছিল—সব কটাই ফলন্ত। শবু নতুন করে বাড়ীটার প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করেছিল। দু বছর আগে বাজ পড়ে বড় নারকেল ও সব সুপুরী গাছ মরে গেছে।

সত্যিই অনেক কাজে লেগেছিল মোটর বাইকটা। ওরা গাড়ী নিয়ে এসেছে খবর পেয়ে কানাই ছুটে এসেছিল, কলকাতায় মোটর বাইকে ঘুরে বেড়াবে বলে। কানাই দুঃখ করে বলেছিল—

'দেখ মেজদি, আমি মাকে কত করে বলি বাবাকে বলে আমাকে একটা মোটর বাইক কিনে দাও। মা বলে—'সে' বলেছে ওতে নাকি খুব এ্যাক্সিডেন্ট হয়। আমি বলি—জামাইবাবু যে চালাচ্ছে। মা বলেছে—জামাইবাবুর মত বড় হও তখন কিনো. 'সে' বলেছে—৩৫ বছর বয়সের আগে ওসব গাড়ী চালানো উচিৎ না, বিয়েতে যে নতুন সাইকেল পেয়েছে এখন সেটাই চালাক। ওল্ড ফাদারকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

কানাইয়ের তখন সবে বিয়ে হয়েছে। বাবা মার কাছে তবু সে ছেলে-মানুষই রয়ে গেছে। তাই বাবার প্রতি অভিযোগের তার অন্ত নাই। বিয়ের আগ পর্যান্ত বাবার এসিষ্টেন্টগিরি করে মাসে একশ টাকা করে হাত খরচ পেত। তখন কানাই শবুকে ধরেছিল—

'দেখ মেজদি, দুদিন বাদে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি অথচ আমার হাত খরচ মাত্র মাসে একশ টাকা।'

শবু মাকে বলে মাসে আড়াইশ টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কানাই যেন ওদের চিরকালের শিশু ভাইটি—আব্দার না করলে কিছু পায় না।

মোটর বাইকের কথা শুনে শবু জিজ্ঞেস করেছিল—'বিয়েতে নতুন সাইকেল পেয়েছিস—আগের সে সাইকেলটা কি হল?'

কানাই বলেছে—'সে কথা আর বলিসনা। বাবা সেটাকে ডিস্‌পেন্সারীর পাশের পানের দোকানী পরিয়াকে দান করেছে, বাবা ডিস্‌পেন্সারীতে বসেই তার বাবার স্মৃতিকে দুবেলা দুচোখ ভরে দেখছে।'

নাঃ, কানাইটা সত্যি ছেলেমানুষ, দাদুর স্মৃতি নিয়েও নির্বিবাদে ঠাট্টা করে। সাতদিন মনের আশ মিটিয়ে কলকাতার পথে গাড়ী চালিয়ে মেজদির বাড়ীর নতুন কি কি কাজ হচ্ছে দেখে কানাই মন্দির শহরে ফিরে গিয়েছিল।

শবুও সে সময় কলকাতার পথে মোটর বাইকে চেপে যাদবপুর বেহালা বরানগর ঘুরে এসেছে—কলকাতার পথে দোতলা বাসের ভিড়ে ঐ টুকু গাড়ীতে বসে ভয়ও পেয়েছে। পাড়ায় সকলের সামনে মোটর বাইকে চড়াটাই ছিল শবুর মহা সমস্যা। এক ত সে অঞ্চলে কারো মোটর বাইক নেই, পথের কুকুর বা গরু গাড়ীর আওয়াজে তেড়ে আসে। তার উপর মেয়েমানুষ মোটর বাইকের পিছনে বসে যাচ্ছে ভাবাই যায় না। শবুর লজ্জা করে—পাড়ার হারাণীদি, রায় গিন্নী, চকোত্তি গিন্নী, রুমার মা সবাই এক কালে শবুকে দেখেছে কুঁড়ে ঘরের বাসিন্দা, খালি পায়ে ভর দুপুরে ভাতের ফ্যানের বালতি নিয়ে এবাড়ী ও বাড়ী যাতায়াত করতে।

দীননাথ বলেছে—'ঠিক আছে, বাড়ীর সামনে গাড়ীতে বোসো না, পাড়া ছেড়ে বাইরে গিয়ে চড়বে।'

হারাণীদি উল্টে অনুযোগ করেছে—'দিদি, আপনাকে একদিনও গাড়ীতে চড়ে যেতে দেখলাম না—হুস্ করে এসে যখন বাড়ীর সামনে রাত করে নামেন তখন ভাল করে দেখতে পাইনা।'

শবু বলেছে—'পাড়ার সকলের সামনে আমার লজ্জা করে।'

হারাণীদি বলেছে—'কেন, লজ্জা করবে কেন? এককালে গরিব ছিলাম বলে কি চিরকালই গরিব থাকব?'

হারাণীদির ততদিনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। যে আমলে শবু ফ্যানের বালতি হাতে ওবাড়ী এবাড়ী করত সেই সময় হারাণীদিরাও মাঠের মধ্যে টালির ছাউনি দিয়ে কাঁচা ঘর করে বাস করতে শুরু করেছিল। তখন তার কথাবার্ত্তা ছিল কত সহজ সরল, বলত—

'জানেন দিদি, আমরা হলাম মালাকার—মালী। আমার কর্ত্তা সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে আগে যে চেয়ারে বসত সেখানে খুব বাঁ হাতের রোজগার ছিল। তখন বেশ কিছু সোনার গয়নাও করেছিলাম, তখনকার টাকাতেই এই জমি বাড়ী। এখন অন্য চেয়ারে বদলি হয়ে উপরি আয় বন্ধ হয়ে গেছে।...'

দশ বারো বছর পরেই তার কথাবার্ত্তা অনেক বদলে গেছে, বলেছে—

'আমরা হলাম কায়স্থ—আমাদের পদবী 'কর'। কর্ত্তা এখন আবার ভাল চেয়ার পেয়েছে, বাড়ীটাকে পাকা করে দোতলা ঘর তুলব শিগগীরই। দেশ

গাঁয়ের সূত্রে মেয়েটার একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু তারা হল মালাকার আর ছেলেটাও চাকরি করে সামান্য আর্দালী পিওনের, কোন চেহারা নেই। তাই ওপক্ষের আগ্রহ থাকলেও আমরা আর গা করি নি।'

এই সময়ই ছোটকাকার মেয়ে নীলা আর দীননাথের পাড়ার বন্ধু শশধর বাবুর এক মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল। দুটো ব্যাপারেই দীননাথ তার মোটরবাইকে করে মেয়ের বাবাদের নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা সব পাকা করে এসেছিল।

শবুর মুখে সে কথা শুনে, গাড়ীটা পরমস্ত ভেবে, হারাণী তার স্বামী হরিদাসকে দিয়ে চেষ্টা করিয়ে দুটো কায়স্থ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে চেয়েছিল। শবুর কথায় রাজী হয়ে দীননাথ বারাসতের কাছে কোথায় লক্ষাহাটিতে দু দফায় মোটর বাইকে করে হরিদাসকে আর তার এক ছেলেকে নিয়ে দৌড়েছিল। একবার পলতাতে আর এক বাড়ীতেও গেছিল।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দুটো সম্বন্ধের কোনটাই লাগেনি। বোধ হয় তারা আসল জাতের কথা বুঝতে পেরে আর মেয়ের রূপ দেখে কোন উৎসাহ দেখায় নি। মাঝখান থেকে বারবার যাতায়াতে দীননাথের পেট্রল খরচ বাবদ বেশ কিছু অর্থদণ্ড গেছে। মাত্র বছর খানেক আগে এক লিটার পেট্রোল দেড় টাকা থেকে তিন টাকা অর্থাৎ এক লাফে দ্বিগুণ হয়েছে। যাই হোক সে মেয়ের বিয়ে আজও হয়নি।

এই বাড়ীর কাজের মধ্যেই বৃষ্টি বন্যায় দুদিন বাড়ীঘর ভেসে গেছে, কিছু সিমেণ্টও তাতে নষ্ট হয়েছে। অবশেষে জল নেমে গেছে, বাড়ীর কাজও শেষ হয়েছে, আর তখন মঙ্গলা দেবীও বেড়িয়ে ফিরেছেন। চারদিক ঘুরে দেখে বলেছেন—

'এই ত বেশ হয়েছে, এখন আর চোরের বাপের সাধ্যি নেই বাড়ীতে ঢোকে। দুদি-ই হল আসল ইঞ্জিনীয়ার, ভবা সোনারা কিছু জানে না।'

তিনমাস পরে মঙ্গলা দেবীকে দুর্গের অধিশ্বরী করে রেখে শবুরা পাটনায় ফিরেছিল।

কিন্তু দুটি বিশেষ ঘটনা আজও শবুর মনকে বিদ্ধ করে রেখেছে। সে দুটিতে সে তার শাশুড়ীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধাটুকুও হারিয়েছে। তার একটি ঘটেছিল তাদের পাটনায় বদলি হয়ে যাবার এক বছরের মধ্যেই।

মা পদ্মিনী দেবীকে প্রথমবার অসুস্থ অবস্থায় পাটনায় নিয়ে গিয়ে সেবা

যত্নে শবু তাঁকে ভাল করে তুলে বাড়ীতে রেখে এসেছিল। ফেরার পথে তপু গিয়েছিল তার সঙ্গে পাটনায়। তিনমাস পরে তপুকে মন্দির শহরে রেখে ঠাকুমার শেষ সেবা যত্ন কদিনের জন্য করে মনে এক গভীর দুঃখ নিয়ে পাটনায় ফিরে যাবার পথে শবু এসেছিল চাঁপাতলার বাড়ীতে। কথা ছিল দুদিন পরে তুলুর সাহায্যে সে হাওড়া থেকে পাটনার ট্রেন ধরবে। দীননাথ একা পাটনায় রয়েছে।

দ্বিতীয় দিনেই শবু দীননাথের এক সংক্ষিপ্ত চিঠি পেল। লিখেছে—আমার কলকাতায় বদলির অর্ডার এসেছে, অতএব পরবর্তী চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত পাটনা রওনা হয়ো না—এ সময় তুমি চাঁপাতলায় থাকবে আন্দাজ করেই দুদিন আগে এই চিঠি পাঠাচ্ছি।

যেদিন থেকে চাটুকার নানা কারসাজি করে অন্যায়ভাবে তাকে কলকাতা থেকে বদলি করেছে, অর্ধ-সমাপ্ত বাড়ী ফেলে রেখে চোখের জলে শিলং রওনা হতে হয়েছে সেদিন থেকেই দীননাথের সবকিছু ধ্যানজ্ঞান প্রচেষ্টা দিক-নির্দেশক যন্ত্রের মত একমুখী হয়ে রয়েছে—কবে কতদিনে কি করে সে আবার কলকাতায় বদলি হয়ে আসতে পারবে। যার জন্য প্রয়োজনে মাষ্টারী করার প্রস্তুতি নিয়েছে, বাড়ীটাকে বড় করেছে যাতে এক অংশ ভাড়া দিয়েও আয়ের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করা যায়। শিলং এর পথে জীবনের বড় প্রত্যাশাকে হারিয়ে শবুরা তখন যেন তেন প্রকারেণ শিলং ছেড়ে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

শেষে চার বছর পরে পাটনায় বদলি পেয়ে পাগল কিছুটা শান্ত হয়েছিল। পাটনাতে যাবার ক'মাস পরেই মা পদ্মিনী দেবীর স্মৃতিতে পাটনার মাটি শবুর কাছে পুণ্যময় হয়ে উঠেছিল। তবু বছরে একটা করে কলকাতায় বদলির জন্য দরখাস্ত পাঠান থেকে দীননাথ বিরত হয়নি। এখানে যে ওদের একমাত্র অবলম্বন তিল তিল করে অল্পেঅল্পে গড়ে তোলা নিজেদের বাড়ীটা রয়েছে—সেটাকে ওরা প্রাণের মত ভালবাসে।

বহু প্রতীক্ষিত সেই কলকাতায় বদলির অর্ডার এসেছে। কি অবস্থায় কি পরিপ্রেক্ষিতে এই বদলি হচ্ছে শবু তা জানে না। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফিরে আসতে পারবে জেনে স্বামীর মন যে কি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তা এতদূরে বসেও শবু অনুভব করতে পারছিল। একান্ত পতিব্রতা স্ত্রীর মত তার মনও আনন্দে নেচে উঠেছে। ছেলে বদলি হয়ে ঘরে ফিরছে শুনে মা মঙ্গলাদেবীও নিশ্চয়ই খুশি হবেন, তাঁকেই আগে খবরটা দেওয়া দরকার।

চিঠি হাতে শবু মঙ্গলাদেবীর কাছে গিয়ে জানাল—

'মা, আপনার ছেলের কলকাতায় বদলি হয়েছে।'

'ক্যান?' মঙ্গলাদেবী এক বালতি বরফগলা ঠাণ্ডা জল শবুর উদ্দীপ্ত আনন্দের উপর ঢেলে দিলেন।

'কেন, তা জানি না। চিঠিতে শুধু বদলির কথাই লিখেছে।' বলে সে চিঠিটা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে আর মঙ্গলাদেবী কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থেকে দুপুরের ঘুম বিশ্রাম ফেলে রেখে পাড়ার এক পরনিন্দা পটীয়সী বুড়ীর কাছে চলে গেছেন শবুকে কিছু না বলে।

শবু ভেবে অবাক হয়েছিল—এ কেমন মা, যিনি ছেলে বদলি হয়ে নিজেদের বাড়ীতে ফিরবে শুনে আনন্দিত হন না! বিতৃষ্ণ মন নিয়ে সে ভেবেছিল, অথচ এই মা-ই 'ভবার কেন কলকাতায় বদলি হচ্ছে না' বলে উঠতে বসতে ফোঁস করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। যদিও শবু মনে মনে বেশ বুঝতে পারত, বিয়ের পর থেকে ভব ইচ্ছে করেই কলকাতায় বদলি নেবার চেষ্টা আর করে না। পরে মালতীর কাছেও সে কথার সমর্থন পেয়েছে, সে বলেছে—দূরে দূরে আছি ভাল আছি, কে এসে ঐ শাশুড়ীর সঙ্গে বাস করবে?

পনরোটা দিন বড় কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে শবুকে কাটাতে হয়েছিল। বাড়ীতে মাত্র দুটি প্রাণী—দুজনের মন দুই বিপরীত মেরুতে বাঁধা। বাড়ীর কাজ চলে কলের পুতুলের মত—মুখে নেই বেশী কথা। যে যার মত খায়, ঘুমায়।

আত্মীয় স্বজন সবাই এসে বদলির খবর শুনে আনন্দ প্রকাশ করে, এক করবী ছাড়া। প্রতিবেশিনীরা শুনে খুশী হয়ে বলে—চলে আসুন দিদি, আর কতদিন বাইরে বাইরে থাকবেন, পাঁচ বছর ত হয়ে গেল।

আবার দীননাথের চিঠি এল—কতদিনে বদলি হবে ঠিক বুঝতে পারছি না, ভুলুর সাহায্যে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে চলে এস, আমি পাটনা ষ্টেশনে নামিয়ে নেব। পনরো দিনের দমবন্ধ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শবু আবার পাটনায় ফিরে গিয়েছিল।

শেষ পর্য্যন্ত সে বদলি নেবার হয়নি।

শবু পাটনায় ফিরলে দীননাথ বলেছিল—

'মেঘ না চাইতেই জলের মত হঠাৎই একদিন অফিসে গিয়ে বদলির অর্ডারটা পেলাম—কলকাতার একজন রাঁচীতে যাবে, রাঁচীর লোক পাটনায়

আসবে আর আমি যাব কলকাতায়। আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম, বদলি নিশ্চিত জেনে অফিসে আমাকে আগাম ফেয়ারওয়েলের মালাও পরিয়ে দিয়েছে। অফিসার সেই ফেয়ারওয়েল দিতে গিয়ে বলেছে—দিল্লী সে অর্ডার আয়া, বদলি হোহি গেয়া সমঝ লিজিয়ে। প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল কলকাতা অফিসের লোক ছাড়া পেল কিনা জানতে পারছি না—তারই আগে রওনা হবার কথা। কলকাতা অফিসের মাথার উপর আবার চাটুকার এসে বসেছে—সে কি করছে কে জানে!

দীননাথের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছিল। ছয়মাস ঝুলে থাকার পর বদলির আদেশ বাতিল হয়েছিল। দীননাথ মনের দুঃখে ভেঙে পড়ে বলেছিল—

'চাটুকারটা নানা কলকাঠি নেড়ে কলকাতার ইচ্ছুক লোকটাকে দিয়ে 'রাঁচীতে যেতে অনিচ্ছুক' লিখিয়ে নিয়ে জোর সুপারিশ করে পুরো বদলির অর্ডারটাই ক্যান্সেল করিয়েছে। হেড অফিসকে ছুঁচো গেলার মত নিজেদের অর্ডার বাতিল করতে আর কখনো দেখিনি। অথচ অন্যায় হচ্ছে বুঝেও আমার প্রথম বদলিটা বাতিল করেনি।'

সে বদলি তারপর সাত বছরেও হয়নি। সাত বছর ধরে যাতায়াতে চিঠিপত্রে মঙ্গলাদেবী একবারও জানতে চাননি—বদলির কি হল, বদলি হল না কেন?

আর এক ঘটনা ঘটেছিল এলার বিয়ের ঠিক আগ দিয়ে—সে ঘটনায় মঙ্গলাদেবীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধাটুকুও শবু হারিয়েছে।

এলার বিয়ের দুদিন আগে কলকাতায় এসে শবুরা দুপুরে খেয়ে উঠে গিয়েছিল বেহালায় দিদি কিশুরা কে কেমন আছে খোঁজ খবর করতে। বাড়ী ফিরছে রাত প্রায় আটটার সময়।

পথে আসতে আসতে শবু ভাবছিল—এলার বিয়ে হচ্ছে, এলা আর কানাই প্রায় একসঙ্গে জন্মেছিল। এলার বিয়েতে কানাই নিশ্চয়ই আসবে। মা, ঠাকুমা আসতে পারবে কিনা ঠিক নেই—নন্দুর জন্য মার কোথাও যাওয়া হয় না।

পাড়ায় ততদিনে অনেক বাড়ী হলেও শবুদের বাড়ীটা কিছুটা দূরে রাস্তা থেকেই দেখা যায়। দূর থেকে দীননাথ ও শবু লক্ষ্য করল বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। এটা একটা ব্যতিক্রম। একা বাড়ীতে থাকতে মঙ্গলাদেবী রাত আটটায় কখনো ঘরে আলো জ্বালেন না। শবুরা এলে অন্য ঘর, উঠোনে আলো জ্বলে।

একটু কাছে আসতে দেখতে পেল বাইরের বারান্দার দিকের দরজা খুলে মঙ্গলা দেবী দরজার দু পাশের চৌকাঠে দুহাত রেখে দরজা আটকে অন্ধকারে দাঁড়ানো দুজন মানুষের সঙ্গে কি কথা বলছেন। আলো-অন্ধকারেও শবুর মনে হল নিশ্চয় মা ও কানাই এসেছে। কি আশ্চর্য্য! অন্ধকারে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কেন?

শবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডাকল—

'মা, তুমি? কানাই, তুই?'

সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা দেবী দরজা ছেড়ে দিয়ে রেডিও জোরে খুলে দিয়ে মশারীর ভেতর ঢুকে পড়লেন। ততক্ষণে শবু ও দীননাথ অন্য ঘরের আলো জেলে মা ও কানাইকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল।

শবু জিজ্ঞেস করল—'মা গো, তোমরা কতক্ষণ এসেছ?'

মা বললেন—'এই ত কিছুক্ষণ। তোরা কোথায় গিয়েছিলি?'

শবু বলল—'দিদিদের বাড়ীতে। তোমরা কবে এলে?'

মা পদ্মিনীদেবী বললেন—'আজ সকালেই এসেছি। ভেবেছিলাম আজ বিকেলে তোরা ষষ্ঠীতলায় যাবি, সেখানেই দেখা হবে। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল তোরা গেলিনা দেখে আমিই চলে এলাম কানাইকে সঙ্গে করে।'

তখন বাড়ীটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, ছাদের সিঁড়ি হয়েছে। মা আগের বারে মাত্র দুখানা ঘর দেখে গিয়েছিলেন। শবু খুব যত্ন করে মা ও কানাইকে বাড়ী বাগান বাড়ীর ছাদ সব দেখাল—মা-ও খুব আগ্রহ নিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন, খুব খুশী হলেন।

ঘন্টাখানেক থেকে চা মিষ্টি খেয়ে কানাই আর মা চলে গেলেন, দীননাথ এগিয়ে দিতে গেল। মঙ্গলা দেবী তাঁর ঘরের আলো আগেই নিভিয়ে দিয়েছিলেন, পরে এক সময় রেডিওটা বন্ধ করে তখন ঘুমের ভান করে শুয়ে আছেন। অতএব 'যাই বেয়ান' 'নমস্কার বেয়ান' বলারও সুযোগ নেই।

শবু বসে বসে ভেবেছিল—এ কেমন ধরনের ভদ্রতা কুটুম্বিতা! এক বেয়ান এসেছে আর এক বেয়ানের বাড়ীতে। কোথায় তাকে ঘরে বসিয়ে দুটো কথা বলে আপ্যায়ন করবেন তা নয় দরজা আগলে দাঁড়িয়ে তাকে ধুলো পায়েই বিদায় দিতে চেয়েছিলেন! শবুরা যদি তক্ষুনি না ফিরত, মা তবে বাইরে থেকেই চলে যেত। মা ত রোজ আসেনা, এসেছেও কতদূর সেই মন্দির শহর থেকে। আজ যদি মা শবুদের বাড়ীটা না দেখে ফিরে যেত তবে সে দুঃখ শবু রাখত কোথায়?

মানুষ এত অসামাজিক অভদ্র হয়! মঙ্গলা দেবী না হয় শবুকে দেখতে পারেন না। তাই বলে শবুর সম্পর্কের কারো সঙ্গেও সময়োচিত ভদ্রতাটুকু করতে পারেন না! তবে শবুই বা কেন মঙ্গলা দেবীর সম্পর্কের সবার সঙ্গে ভদ্রতা করবে? তাও যে হয় না, তাতে যে দীননাথকেও অপমান করা হয়। কত দিন আর এ অবস্থা সে সহ্য করতে পারবে? যদি এমন দিন আসে, মনের যদি এমন অবস্থা হয় যে সে সবার সঙ্গে হেসে কথা বলতে পারছে না তবে যেন কেউ তাকে দোষ না দেয়। এটা যে তার শাশুড়ীর শিক্ষা।

এই চরিত্রিরের শাশুড়ীর সঙ্গেই বারো বছর পরে নিজেদের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে আবার তাকে ঘর করতে হবে—আর পাশেই আছে ভালছেলে ভবর জমিটা। এক অজানা আশঙ্কা শবুর বুকে পাষাণভার হয়ে চেপে বসে আছে। আবার কি সেই দুর্মুখ, দুর্নাম, আত্মহত্যার অভিনয়—না আরো বড় কিছু?

নয়

পাটনার আট বছর শবুর জীবনে অনেক সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার স্মৃতিতে ভরা। তবু জায়গাটা ওদের দুজনেরই ভাল লেগেছিল। পাটনা ছেড়ে যেতে সত্যি কষ্ট হচ্ছে।

পাটনার পরিচিত মহলও দুঃখিত ওরা চলে যাচ্ছে বলে। রবি মাস্টার, কমলাদিরা, বিরজাগুপ্ত, মণিবাবু, সান্যাল মেসো, সুষমাদি, সোম, চন্দ্র, বাব্বা সবাই। শুধু সুমনজী গোঁফের ফাঁকে হেসেছে। ঘর খালি হলে দেড়শ টাকার জায়গায় তিনশ টাকার ভাড়াটে বসাবে। তবে এখনই বাড়ীটা ছাড়া হচ্ছে না, তিন মাসের ছুটিতে যাচ্ছে। ঘরে মালপত্তর থাকছে, ভাড়াও দেয়া হবে—তিনমাস পরে কি হয় বুঝে ঘর ছাড়া হবে।

চলে যাবার কথা জানাতে শবু শিলুয়ার মাকে বলল—

'শিলুয়াকী মা, হাম্ চলা যাতা হ্যায়, ফির নেহী আয়গা। এখন তিন মাসের ছুটি তাই ঘর ছাড়া হবে না। তিন মাহিনা বাদ বাবু আকে ঘর ছোড় দেগা। তখন ঘরের চৌকি বেঞ্চ টুল আর যা যা থাকে তোমাকে দিয়ে যাবো। তিন মাহিনা কা তন্‌খা ভি তুমকো দেগা।'

শিলুয়ার মা দুঃখিত হয়ে বলল—

'কাঁহেলা যাইব। অবহি তক্ তো বদলি নেহী হুয়া। তু লোগ এহি রহ

যা। তু বড়ী অচ্ছী হ্যায় মাইজী। তু লোগ চলা যানেসে হমকো বহুৎ বুরা লাগেগা। তু মৎ যা।'

যাওয়া না যাওয়া ত শবুর ইচ্ছায় হয় না। না হলে এমন আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে কার সাধ হয়?

দীননাথ ফিরল অফিস থেকে। দ্বিধা-বিভক্ত মন নিয়ে এক সময় শবু দীননাথের সঙ্গে পাটনা ষ্টেশনে ট্রেনে উঠে বসল। মোটর বাইকটা উঠেছে লাগেজ ভ্যানে। ষ্টেশনে বিদায় জানাতে এসেছে অফিসের মিঞা, চৌবেজী, তেওয়ারীজী, গিরিন্দর সিং, বিশেশ্বর সিং, প্রসাদজী ও রামবাবু—আর বিদ্যুৎ।

দীননাথ অফিসের লোকদের বলল—

লাগতা হ্যায় আপ লোগ মুঝে ফেয়ারওয়েল দেনে আয়ে হ্যায়? হম তো ছুট্টিমে যা রহে হ্যায়।'

মিঞাসাহেব সকলের হয়ে জবাব দিল—'সো বাত তো জাহির হ্যায়। লেকিন হমে সব একিন হোতা হ্যায় কি অপ হামেশাকে লিয়ে পটনা ছোড় রহে হ্যায়। বেহ্তর হোগা কি অপ জরুর লৌটকে আয়েঁ। যো কুছ্ অপনেসে হোতা উসিমে খৈরিয়ত্ হ্যায়……

'(আদমী) সাথ চাহে কুছ্ নেহী হোতা হ্যায়।

(ফির) উহ্ হি হোতা যো মঞ্জুরে খোদা হোতা হ্যায়॥

—আদাব।'

শবু ভাল করেই জানে দীননাথ কারো কথা শুনবে না, এত লোকের সনির্বন্ধ অনুরোধও তার সঙ্কল্প টলাতে পারবেনা।

'নমস্তে, নমস্তে' বলে সকলে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। হাজার হোক আট বছরের জানাশোনা ত। রামবাবু খুব সরল হাসি খুশি মানুষটি, যেন অনেকটা জোকার বিশেষ। লাহিড়ী সাহেবের সে খুব নেওটা। এখন তার চোখ দুটোও রীতিমত ছলছল করছে। মুখখানা করুণ করে বলল—

'নমস্তে লাহিড়ীসাহাব, নমস্কার বৌদি, ইয়াদ রখিয়েগা। ফির কভি মোলাকাৎ হোগী।'

বিদ্যুৎ ওদের দুজনকে প্রণাম করে বলল—'আসি মাসী, আসি মেসো। গিয়ে চিঠি দেবেন। কলকাতায় গেলে দেখা করব।'

বেচারা চোখ মুছতে মুছতে ট্রেন থেকে নেমে গেল। ট্রেন ছেড়ে দিল। শবুর মনেও স্মৃতির পাহাড়, চোখে জল।

পাটনা সিটি পার হলে দীননাথ থ্রী-টায়ারের লোয়ার ও মিডল্ বার্থে বিছানা পেতে শবুকে নীচেরটায় শুতে বলে নিজে মাঝেরটায় শুয়ে পড়ল। সে হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে। বারো বছর ধরে চাটুকারের কোপে পড়ে সে প্রাপ্য প্রোমোশন পায়নি, কলকাতায় বদলিও পায়নি। অবশেষে সরকারে চাকরিই ছেড়ে দেবে সঙ্কল্প নিয়ে পাটনা ছেড়ে সে হয়ত মুক্তির আনন্দে ঘুমিয়ে পড়বে।

কিন্তু শবুর চোখে ঘুম আসছে না। তার সামনে একদিকে অজানা ভবিষ্যৎ আর একদিকে ঘোর আতঙ্ক। চাঁপাতলার বাড়ীটা তাদের প্রাণ—অসীম আকর্ষণ তার প্রতি। তবু মনে হচ্ছে সামনে যেন বিরাট বিভীষিকা, প্রচণ্ড দুর্দিন—এক অনিবার্য্য দুর্দৈব সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

চৌদ্দ বছর বনবাসের পর সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে এল। রাম রাজাও হল। কিন্তু তারপর সীতার ভাগ্যের কথা সবার জানা। মিথ্যা লোকনিন্দায় তাকে নির্বাসন দেওয়া হল। বারবার অগ্নিপরীক্ষার অপমান থেকে নিষ্কৃতি পেতে তাকে মা ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় নিতে হল। মহাভারতে-ও পাণ্ডবদের বনবাস পর্বের পর ঘনিয়ে উঠেছিল কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ।

শবুর জীবনেও বুঝি চৌদ্দ বছরের প্রভাব অসীম। প্রথম চৌদ্দ বছর বয়সে ষ্টোভের আগুনে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে গেছিল। দ্বিতীয় দফায় চৌদ্দ বছরে ঘটল অতবড় এক ট্রেন দুর্ঘটনা আর পরে পরেই শিলংএর সেই পথের দুর্ঘটনা যার পরিণামে তার মাতৃত্বের সব সাধ চিরতরে নষ্ট হল। সেই থেকে মা পদ্মিনীদেবীর মনে ছিল গভীর শঙ্কা—সামনের চৌদ্দ বছর পরে শবুর না জানি কী হয়! সেই চৌদ্দ বছরের বারো বছর কেটে গেছে প্রবাসে। আর দুটো বছর পরে কী হতে পারে—কোন দুর্ঘটনার সে শিকার হবে তা সে জানে না।

দুর্নিবার নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। জীবনের আর একটা অধ্যায় শেষ হয়ে চতুর্থ অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। সে অধ্যায় তার পূর্ণতা পাবে কি—পঞ্চম অধ্যায়ের পরিণতি আসবে কি? পারবে কি নিজেদের বাড়ীতে শান্তিতে বাকি জীবন কাটাতে, না কি তার জীবন প্রবাহ বয়ে যাবে অশ্রুসাগরে—সে আর এক কাহিনী। ভবিষ্যৎই সে কাহিনীর লিপিকার, নিয়তি তার নিয়ন্তা।